বাসাংসি জীর্ণানি

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রভা প্রকাশনী
স্টল নং—৪৩
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

"Basangsi Jeernani" :

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রথম প্রকাশ ঃ
৪ জানুয়ারি, ১৯৬৫

প্রচ্ছদ ঃ
কুমারঅজিত

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ঝর্ণা প্রিন্টারস
১৬, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১/এ গড়পাড় রোড
কলকাতা—৬

—জয় বাবা ভৈরবনাথ! তুমিই এর বিচার করো বাবা! বিচার করো।

সতীশ ভটচাযই একা প্রতিদিন বাবা ভৈরবনাথের কাছে এই বিচারের দাবি করে।

অবশ্য বাবা ভৈরবনাথ নীরবই থাকেন।

গ্রামের এক প্রান্তে একটা মজা পুকুর। এককালে ওটা নাকি টলটলে জলে ভরা থাকতো। পুকুরের উঁচু পাড়ে আম-জাম, তেঁতুল সব গাছই ছিল। অবশ্য আম-জাম গাছগুলোও কারা কেটে সাফ করেছে—টিকে আছে কয়েকটা বিশাল তেঁতুল গাছ আর গোটা দুয়েক তাল গাছ।

এগুলোও যেতো। এ সবই বাবা ভৈরবনাথের সম্পত্তি। লোকজন বাধা দেওয়ায় তেঁতুল গাছগুলো বেঁচে গেছে। ওই একটা বিশাল তেঁতুল গাছের নীচে কয়েকটা ছোটবড় পাথর।

তাকেই তেল-সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছে গ্রামের বৌঝিরা আর সতীশ ভটচায। একটা ত্রিশূলও পোঁতা আছে। রোদে জলে জং ধরে গেছে। এই ত্রিশূলই বাবার মারণাস্ত্র।

সতীশ ভটচায হাঁক পাড়ে।

—কই ত্রিশূল হাতে একবার জেগে ওঠ বাবা। ব্যাটাদের ধ্বংস করে দে। তোর সর্বস্ব লুটে পুটে খাবে ওরা, এর বিচার হবে না? তুই কি নেই বাবা?

সতীশ ভটাচাযের এই অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এই পাঁচগায়ে বাবার বহু দেবোত্তর জমি-পুকুর ছিল। অবশ্য সেই সব জমি-পুকুর এখনও আছে। বড় বড় জমি, সরেশ মাটি—একত্র বিঘে তিন চার করে এক একটা জমি। ধান ছাড়া অন্য ফসলও হয় প্রচুর।

কিন্তু সে সব জমি এখন অন্যের দখলে। তারা জমি চায করবে—বিনিময়ে ভৈরবনাথের গাজনের উৎসবের সময় তারা সেই জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগ জমা দিত গ্রাম ষোল আনার কাছে। বিভিন্ন লোকই ভৈরবের জমি ভাগে চায করতো।

ফসলের ভাগও দিত উৎসবের সময়। তাই দিয়েই উৎসব হতো মহাসমারোহে।

সতীশ ভটাচাযের বাবা ছিল তখন গ্রামের পুরোহিত। ভৈরবের নিত্য পূজারী। অবশ্য ভৈরবনাথ এই মুক্ত আকাশের নিচেই পড়ে থাকেন রোদে জলে ভেজেন।

বাবা ভৈরবনাথের মন্দির গড়ার জন্য টাকাও তোলা হলো। সতীশ ভটচাযের বাবা একাই তোড়জোড় করে টাকা তুললো। সকলেই টাকা-ধান চাল দিয়েছিল। কিন্তু সতীশ ভটচাযের বাবা হঠাৎ ঘোষণা করলো—

—'বাবা স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন তাকে—তিনি মুক্ত আকাশের নীচেই থাকতে চান।'

দুয়ার দালান কোঠা করলে তিনি রুষ্ট হবেন। গ্রামের অকল্যাণ হবে।

ফলে বাবার মন্দির আর হলো না। সতীশ ভটচাযদের বাড়িতে টিন চাপলো। দুবিঘে জমিও বাড়লো।

সতীশের বাবা গত হবার পর সতীশ ভটচাযই বাবার ব্যবসার অধিকার পেল উত্তরাধিকার সূত্রে। কিন্তু ততদিনে লোকজনও শেয়ানা হয়ে গেছে।

তারা তাদেব সন্তানরা এখন ভৈরবের জমি চাষ করে ভৈরবকে আর কিছুই দেয় না। বাবা ভৈরবনাথ এই তেঁতুল তলাতেই পড়ে থাকেন নীরবে, প্রস্তরীভূত তিনি। তাই তিনি নীরবেই থাকেন।

কিন্তু এই বঞ্চনার জন্য ঠকেছে সতীশ ভটচাযই। উৎসবের সময় ভালো পাওনা গণ্ডা হতো। এখন উৎসব আর হয় না। কোন মতে গ্রামের মেয়ে বৌরা পুজো দেয় সামান্যই।

সতীশ ভটচায নিত্য পূজা করে। অবশ্য সেটা কোন ঘটার ব্যাপার নয়। রেকাবিতে এক মুঠো আতপ চাল আর দুটো ফুল কিছু জল তাই ছুড়ে দিয়ে দুকলি মন্তর পড়েই সতীশ অন্যত্র নি পুজো পাঠ করতে যায় যজমান বাড়িতে।

কিন্তু তার মনের জ্বালাটা রয়েই যায়। যেহেতু তারা এসব জমি ভোগ দখল করেছে ঘু বাবাকে বঞ্চিত করে। তাই রাগটা তার রয়েছে তাদের উপর। কিন্তু তারা এই গ্রান পাশের গ্রামেব নামী লোক। প্রকাশ্যে কিছু বলা যায় না। তবুও সতীশ মনে মনে ভাবে বাবার নামে গ্রা একটা আন্দোলন করলে দোষের কিছু হবে না। বাবাকে সে আবার জাগ্রত করতে চায়।

পাঁচগাঁয়ের অবস্থান এক দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে। শালবন ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে চলে গেছে এ পশ্চিমের দিকে। এদিকে কয়েকখানা গ্রামের বুক চিরে চড়াই উতরাই ভেঙ্গে খোয়াঢালা রাস্তা হ সদর থেকে দূরে দামোদরের ওপারের কোন শালবন ঘেরা ছোট স্টেশনের দিকে গেছে।

দুর্গাপুরেব ইস্টিশানে যেতে হলে বিস্তীর্ণ দামোদরের বালিচর পার হয়ে যেতে হয়। আর অ বর্ষায় এর রূপ হয়ে ওঠে করাল ভয়ঙ্কর।

তখন ও পথও বন্ধ থাকে। কখনও খেয়া চলে কখনও খেয়া বন্ধ হয়ে যায়। সদরও বেশ দূর। দুএকটা বাস চলে খোয়াঢাকা পথে। তবে ও কোন স্থিরতা নাই। ফলে পাচগাঁ ম্যাপের বাইরেই থেকে যায় তার নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবনধারা প্রবাহিত হয় নিজের গতিতেই।

পাঁচগাঁয়ের হাটতলা সপ্তাহে দুদিন হাট বসে ছায়াঘেরা এই জায়গায়। একটা প্রাচীন শিব মন্দির রয়েছে --সামনে দিঘি। আর মাঠে বেশ কিছু প্রাচীন বট অশ্বত্থ—অন্যান্য গাছও রয়েছে সপ্তাহে দুদিন এই জায়গাটা লোকজনের ভিড়-কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিছু মেয়েরাও আসে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বাবার পুজো দিতে, হাটবাজার করতেও।

বাকী কটা দিন জায়গাটা নীরব-নিঝঝুম থাকে। তবে ভৈরবতলার মত পরিত্যক্ত থাকে না।

বাবা ভৈরবনাথ গ্রামের ওই তেঁতুল গাছের নীচে নিঃসঙ্গ হয়েই পড়ে থাকে। দিনে তবুও একবার সতীশ ভটচায আসে আর বাবাকে ওই সব নালিশ করে জাগাতে চেষ্টা করে। বাবা জাগলে তারই বিপদ।

তারকক্লষ্ণ রায় এই গ্রামেরই জমিদার। এককালে ভালো অবস্থাই ছিল। এখন পড়তির

দিকে। সতীশ তার কাছেও যায়। কিন্তু তিনি বলেন—গ্রামের, আশেপাশের গ্রামের সকলকে ডাকো। দেবসবার ব্যাপারে একটা বিস্তারিত আলোচনা হোক। প্রতিকার কিছু করতেই হবে। আমিও যাবো সেখানে।

সতীশ ভটচায গ্রামের প্রবীণ মানী লোক নীলাম্বর বাবুকেও বলে একথা। ভক্তি চাটুয্যেও শোনে। সেও বলে—এতো ভালো কথা। বাবা ভৈরবনাথ তোমার সহায় হবেন।

সতীশ ভটচায পাশের গ্রামের জমিদার ধীরেন সিংদেও বাবুকেও ডেকেছে। এর মধ্যে গ্রামের সকলেই জেনে গেছে সতীশ ভটচায এবার বাবা ভৈরবনাথের উৎসব করবেই। তাই সে পঞ্চাশজনকে ডেকে ভৈরবের জমির ফসলের ভাগ পাবার জন্যই বলবে সকলকে।

গ্রামের মেয়েমহলও চায় গ্রামে একটা উৎসব হোক। বাবার গাজন হোক বেশ ধুমধাম করে। তাই তারাও ঘাটে পথে এ নিয়ে আলোচনা করে।

মিষ্টি লোহার মেয়েটা যেন একেবারে অন্য ধরনের । এমনিতে সে সুন্দরীই। রংটা ফর্সার দিকে। দেহে যৌবনের ঢল।

এই গ্রাম থেকে মিষ্টি কোন অজানা আকর্ষণে হারিয়ে গেছিল। হাজির হয়েছিল বেশ ক'হাত ঘুরে বর্ধমানে।

সেখানেই দেহ পশারীদের পাড়াতে থিতু হয়েছিল। কিন্তু তার মন টানতো গ্রামের দিকে। গ্রামেই ফিরবে সে।

এমনি দিনে সে পেয়েছিল লোকটাকে। কোন কারখানার কারিগর। তাকে নিয়েই ফিরে এসেছিল এই গ্রামে। সেও মিটিংএর কথা শোনে। ভৈরবনাথের গাজন হবে, মিষ্টি বলে—বেশ হবে গো।'

সতীশ ভটচায ভৈরবতলাতেই মিটিংএর আয়োজন করেছিল পঞ্চগ্রামের লোকদের নিয়ে। অনেক আলোচনাই হলো। সেই তেঁতুল তলা মুখর হয়ে উঠলো। কিছু নরম গরম তর্কও হলো। কিন্তু আসল কাজের কাজ তেমন কিছু হলো না।

দুচার জন কথা দিল তারা কিছু দেবে।

সতীশ ভটচায যতটা ভেবেছিল ততটা হলো না। তবে গ্রামে-গ্রামান্তরে একটা সাড়া পড়ে গেল তা অবশ্য নয়।

আবার গ্রামের সেই শান্ত জীবনধারা নিজের খাতেই বইতে থাকে।

গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়। মিষ্টি লোহার গ্রামে ফিরেছে। সেই স্বৈরিণীর জীবন ছেড়ে এখন সে সঙ্গে আনা মানুষটাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চায়।

এখানে জীবন বড় কঠিন। সেই মানুষটাও পাশের গ্রামের কামারশালে কাজ করে। সেও মিষ্টির প্রেমে পড়ে ঘর বসত করতে চায়।

গ্রামের আশেপাশের গ্রামের মানুষরা অনেকেই মিষ্টিকে চেনে। এই দামাল মেয়েটার দিকে অনেকেরই নজর ছিল, কিন্তু মেয়েটা ওই লোকটাকে পেয়ে এখন ঘরবাসী হতে চায়।

অন্যের ডাকে সাড়া সে দেয় না। তাই অনেকেই ওই লোকটাকে নিয়েই রসিকতা করে।

—কিসের টোপ দিয়ে এমন শিকার গাঁথলে ভাই

লোকটা বলে,

—মেওয়ার টোপ নয় গো—স্রেফ জলটোপ দিয়েই শিকার গেঁথেছি।

অনেকেই বলে—জব্বর শিকারী হে! স্রেফ জলটোপ দিয়েই শিকার করো।

সেই থেকেই লোকটার আসল নাম মুছে যায়। ওর নাম হয়ে গেছে জলটোপ। ওই নামে সকলেই তাকে ডাকে।

সেদিন মিষ্টি এসেছে হাট করতে। হাট করে বের হয়ে দেখে সামনে লোকটাকে। এসেছিল হাটে। মিষ্টিকে দেখে বলে—তোমার জন্যই কাজ ছেড়ে এলাম।

মিষ্টি হাসে—সত্যি!

—হ্যাঁগো। আজ কাজে যাবো নাই। ঘরে চলো।

জলটোপ চলেছে পিছু পিছু।

বর্ধমানের রূপ-পসারিণীদের হাটে ওকে দেখেছিল প্রথম।......কি এক মায়া ভরা রাত্রি কয়েক বছর আগে।

মদ্যপ লোকটা ওকে দেখে সেদিন থমকে দাঁড়িয়েছিল। স্বৈরিণী এক কামনাময়ী নারী। ঝরা রাত।

—ভিজছো কেনে। ভেতরে এসো গো মানুষ!

—পয়সা নাই।

মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে, আবছা আলোয় ওর দুচোখে কিসের নেশা। দুহাত দিয়ে ক টেনে নিয়েছিল ওকে।

—মনের মানুষ যি গো তুমি। তোমার কাছে পয়সা লোব কি গো কারিগর! এঁসো।

কি এক শাশ্বত আহ্বান!

আজও সুর জাগে বাতাসে। সন সন বাতাস ছোটে শালবনের বুক থেকে। আকাশে হারি গেছে পুঞ্জ সাদা মেঘ। নীল—ঘননীল আকাশ।

চলেছে আগে আগে মিষ্টি।

যৌবনবতী একটি কামনাময়ী নারী!

দেহের ভাঁজে ভাঁজে পুরুষ্টু উদগ্র কামনা!

জলটোপ চলে এসেছে ওরই পিছু পিছু বহু পথ। বহু সবুজ স্বপ্ন-ঘেরা কত মাঠ নদী হয়ে। ক'বছর আগেই ফিরেছে ওরা এইখানে। মিষ্টির গাঁয়ে।

—কই গো!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকছে তাকে মিষ্টি। ঘেমে উঠেছে সুন্দর সুডোল মুখ—বিন্দু বিন্দু ঘাম চুলের সঙ্গে গড়িয়ে পড়েছে, মিষ্টির ডাগর দুচোখে হাসির আভাষ।

—হাঁ করে কি দেখছো কারিগর?

—তোকে! সত্যিই সোন্দর তুই!

—ভর দুপুরে মরণ! চল দিকি, রোদের তাতে রঙ্গ পুড়ে গেল বাপু!

হেসে গড়িয়ে পড়ে মিষ্টি

মন ভরে ওঠে খুশিতে। আকাশ বাতাসে যৌবন-স্বপ্ন ধান-ক্ষেতের বুকে সেই আগামী শীতার আভাষ।

তারকরত্ন রায় কথাগুলো সবই শুনেছে, কানে আসে। এক-কালে ওর দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাকে দেখে যেত গ্রাম-গ্রামান্তরে, হেঁটে—না হয় ঘোড়ায় করে ঘুরেছে। বড় কালীর জঙ্গলমহালে যেতো আদায় ওয়াশীলে।

রতনেশ্বরের মেলার অন্যতম কর্মকর্তা।

কপালজোড়া সিন্দূর-রক্তচন্দনের ত্রিপণ্ড কেটে হুঙ্কার দিয়ে উঠতো,—বলো শিব মহাদেব।

ঢং ঢং বেজে উঠতো নাটমন্দিরে টাঙান ঘণ্টা।

ওটা ওই-ই আনিয়ে দিয়েছিল সেবার কাশী থেকে।

এখন আর বড় একটা বের হয় না তারকরত্ন।

বয়স এমন কিছু হয়নি। সেবার ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছিল বীরভুবনপুরের বনের ধারে টাকুরে ডাঙ্গায়।

অবশ্য অনেকে অনেক কথাই বলে এই নিয়ে।

কেউ বলে জঙ্গলমহলের প্রজারাই বিশেষ কোন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেদিন সন্ধ্যার মুখে অন্ধকারে গাঁ ফিরতি জমিদার তারকরত্নকে একলা পেয়ে একটু জবাব দিয়েছিল মাত্র।

কেউ বলে অতিরিক্ত কারণবারির প্রসাদে মহাকালের কাছারী-বাড়ির চিলেকোঠার ছাদ থেকে আকাশে ওড়বার বাসনা থেকেই এই পরিণতি হয়েছিল।

এমনিতর নানান কথা-কাহিনীই প্রচলিত রয়েছে—ওর পা-টা বিকৃত হওয়ার মূলে; অবশ্য তাতে তারকরত্নের কিছু আসে যায় না, বাড়িতে—কাছারী ঘরে বসেই সব খবর তার নখদর্পণে থাকে।

বয়স হয়েছে ইদানীং, বয়সের ছাপও তার বলিষ্ঠ দেহের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে। চুল সাদা হয়ে উঠছে মাথার চারপাশে!

শরতের মিষ্টি রোদ কাছারী বাড়ির চত্বরে লুটিয়ে পড়েছে। মেঘ মুক্ত নীল আকাশ, কোণের শিউলি গাছটা সারা বছর অনাদৃত হয়ে মরাই-এর আড়ালে আওতায় দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ যেন ওর যৌবন জেগে ওঠে। ফুলসাজে সেজে ওঠা কোন রূপবতী—বাতাসে যৌবন-স্বপ্ন জাগানো সৌরভ মেলেছে, চাঁপাগাছের সবুজ পত্রাবরণের শীর্ষে দু'চারটে সোনা রং-এর ফুল ফোটে।

আনমনে ওই দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

হারানো অতীতের কথা মনে পড়ে, কত স্বপ্নরাঙ্গা দিন! কত মধুসন্ধ্যা!

বৈকালের রোদ বিশাল চত্বরে সারি সারি ধানের গোলার আড়ালে আলোছায়ার ইশারা আনে। সারা উঠান জুড়িয়ে প্রায় পণখানেক ধানের মারাই ছিল।

ইদানীং বাজার দরটা বেড়েছে। তাছাড়া কয়েক বছর আগে মন্বন্তরের সময় ধানটান অনেক ছেড়ে দিয়েছিল—নইলে নাকি 'সিজ' করে নিত ওরা জোর করে।

ধানের সঞ্চয় একবার গেলে আবার জমতে অনেক বছরই লাগে। ঝরণার জল তিরতিরিয়ে ঝরবে, জমবে আরও দেরিতে।

তাই ধানের সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ-পঁচিশ মরাই-এ, তার থেকে আবার চাযবাসের খরচা গেছে।

জায়গাটা অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে স্তূপাকার করা খড়—মরাই-এর বড় কাঠের পাটাতন। ওদিকে মরাই নেই, কেমন চাইতে পারে না তারকরত্ন, শ্রীহীন বলে বোধ হয় জায়গাটা।

—কে?

কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। জীবনরত্ন ফিরছে স্কুল থেকে। ছেলের দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

তারই আদল পেয়েছে ছেলে, তেমনি ফর্সা রং, বলিষ্ঠ চেহারা। বাবাকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করে জীবনরত্ন।

পায়ে পায়ে সরে যেতে থাকে ভিতর বাড়ির দিকে।

—শোন!

বাবার ডাকে থমকে দাঁড়ায়। ছটফট করছে মনে মনে। ওদিকে খেলার মাঠে যাবার দেরি হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধব ইয়ার-বক্সিরাও অপেক্ষা করছে বাইরে। বাবার ভয়ে তাদের ভিতরে আনতে সাহস করেনি।

যা দুর্মুখ লোক—বাবাকে এড়িয়ে চলে তাই জীবন।

তারকবাবু বলে,

—হেডমাস্টারমশাই বলছিলেন, এবার নাকি যাচ্ছেতাই রেজাল্ট করেছ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জীবন বাবার সামনে।

জবাব দেবার ক্ষমতা নেই।

—কি? কথা বলছ না যে?

—ভাল করে পড়ছি এখন।

কোন রকমে সরে আসবার চেষ্টা করে জীবন, জীবনটুকু হাতে করে।

সরে গেল সে।

কাছারীঘরের ওদিকটা কয়েকটা পায়রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরোনো আমলের পাল্কিটাও ব্যবহারের অভাবে জীর্ণ রং-চটা অবস্থায় পড়ে আছে এক কোণে, গৌরবময় অতীতের মত।

কাছারীর নায়েব-গোমস্তারাও বিশেষ কেউ নেই; ঢুলছে দুলে পাইক। চারিদিকে কেমন একটা ক্লান্ত জীর্ণতার ছায়া। সমস্ত বাড়িটা যেন ধুঁকছে।

ধুঁকছে রায়জী বাড়ির অন্তরাত্মা।

—তামাকটা বদলে দে! এ্যাই—

ধড়মড়িয়ে ওঠে দুলে বাগ্দী! কে বলে ওঠে ওদিক থেকে,

—হুজুরের ডাকে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়, আর ব্যাটা বাগ্দীর কি না নিদ্রাই ভাঙ্গে না। কলির কুম্ভকন্নো না কি রে তুই! এ্যা?

ভাঙ্গা গোলা মরাই-এর আড়াল থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উদিত হয় সতীশ ভটচায। তার সকালের বেশ এ নয়।

মাথার শিখায় বাঁধা শুকনো টগর ফুল।

পরনে তার কাচা ধুতি—ফতুয়া, গলায় জড়ানো দড়ি মত পাক দেওয়া উত্তরীয়। ওটা বোধহয় প্রথম দিন থেকেই পাক খাচ্ছে, পাক খেয়ে খেয়ে ওর অবস্থা সতীশ ভটচাযের ধড়ের মতই পাকানো সুঁটকো হয়ে উঠেছে। হাতে তেল-পাকানো সরুকঞ্চির একটি লাঠি—মাথার দিকের গিঁটটা বহু যত্নে খোদাই করে কুকুরের না হয় আর কিছু পদার্থের মত মুখ বানানো হয়েছে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে, ওর পদযুগলে শোভা পাচ্ছে এক জোড়া ক্যাম্বিসের জুতো। চালের বাতার বাঁকে বেশিরভাগ সময় তোলা থাকার দরুণ কেমন তেবড়ে ডোঙার মত হয়ে উঠেছে, এক পুরু ধুলোর আস্তর পড়েছে জুতোয়।

ওর এই বেশবাস-এর দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

এ বেশে ওকে অনেকবারই দেখেছে সে, সব বারই সদরে কোন সাক্ষী দিতে গেছে, না হয় অন্য কোন বিশেষ গুরুদায়িত্ব নিয়ে চলেছে।

তাই জিজ্ঞাসা করে তারকবাবু,

—রাজবেশে কোথায় হে?

সতীশ ভটচাযও ওর সমবয়সীই, মাঝে মাঝে ওর কাছে তারকরত্নের গাম্ভীর্যের মুখোসখানা খুলে পড়ে, হালকার রসিকতার সুরে কথা হয় দু'চারটে।

সতীশ ভটচায জবাব দেয়,

—আজ্ঞে, ওই যে ভৈরব থানে। এত করে বললে, নীলাম্বর, পঞ্চজনের সৎকাজ, না গেলে অন্যায় হবে।

—তা, সৎকাজে আজকাল মতি হয়েছে দেখছি।

তারকরত্নের দিকে চাইলে সতীশ, হালকা সুরেই কথাবার্তা শুরু হয়েছিল, ক্রমশঃ লোকটা যেন বদলে যাচ্ছে।

ওকে চেনে সতীশ। জানে কতখানি ধূর্ত আর কূট-কৌশলী। চুপ করে চেয়ে থেকে বলে ওঠে তারকরত্ন,

—অনেকেই আসছে শুনছি।

—হুজুরকেও তো বলেছে শুনলাম।

সতীশ ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে। জবাব দিল না তারকরত্ন।

বৈকাল হয়ে আসছে। ঢলেপড়া সূর্যের আলো বৈঠকখানার কার্নিস ছেড়ে উঠে ছাদের আলসেতে পড়েছে।

পুরোনো চূণ-পলেস্তরা-করা বাড়ি, বহুকাল তাতে আর কিছু পড়েনি। কালো শেওলা-ঢাকা ছাদের আলসের রোদটুকুও কেমন যেন বিবর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে আলো ঢুকতেও ভয় পায়।

বাতাসে জেগে উঠেছে শিউলিফুলের সৌরভ, এ বাড়ির কঠিন ভিত্তিমূলে ওই যেন একটু অন্য জগতের ইশারা আনে।

সতীশ ভটচায হাওয়া ঠিক বুঝতে পারে না।

এসেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। তা ওর মুখ-চোখ দেখে খানিকটা খুশিই হয় মনে মনে সতীশ ভটচায।

কোন আপোশের পথে রাজি হবে না তারকরত্ন।

না হলেই মঙ্গল। সতীশ বলে ওঠে,

—উঠি হুজুর। ওদিকে ওনারা বোধহয় সব এসে পড়েছেন।

—হ্যাঁ।

সংক্ষেপে তাকে বিদায় জানিয়ে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে তারক। লোকটা চলে গেল।

সতীশ ভটচায যদি পিছন ফিরে দেখত, তাহলে হয়তো বুঝতে পারতো কিছুটা। তারকরত্নের গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে ওঠা ধারাল একফালি হাসিও তার নজর এড়াতো না।

তার মত লোক এর অর্থ বুঝতে পারতো নিশ্চয়।

না, সতীশ ভটচায আর ফিরে চায়নি। বের হয়ে যায় সোজা ফটকের দিকে।

—দুলে!

দুলিচাঁদ হুজুরের ডাকে এসে দাঁড়াল সামনে।

—কেউ এলে বলে দিবি আজ আর দেখা হবে না। বুঝলি?

—আজ্ঞে।

দুলিচাঁদ বোঝে, এরপর হুজুরের সঙ্গে আর কারো দেখা না করাই উচিত হবে। কারণ আজই বিশে বাগ্দী গোয়ালবাড়ির পিছনে বসে সারাদিন জ্বাল দিয়েছে চোরা উনুনে।

এতক্ষণ বোধহয় সতেজ চন্দন রং-এর পানীয় নেমেছে কয়েক বোতল।

হুজুর উঠে গেল।

তারকরত্ন আজ অন্য কাজে ব্যস্ত।

এতদিন ঠিক এতটা ভাবেনি। তাই ওদিকে মনও দেয়নি।

এইবার যেন টনক নড়েছে।

বিশাল বাড়িটা কয়েকটা প্রস্থে ভাগ করা।

আবছা আলোয় আঁধারিতে কেমন রহস্যপুরী বলে মনে হয়। বদ্ধ গুমোট বাতাস।

অন্ধকার গলিপথে কয়েকটা চামচিকে ফর ফর করে উড়ে বেড়ায়। বিরক্ত হয়ে ওঠে তারকরত্ন।

মুখে লাগে ওদের ঝাপটা। সংখ্যায় এত ছিল না তারা, কেমন যেন দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

হঠাৎ বাতাসে একটা সুবাস জাগে। গলিটা শেষ হয়ে অন্দরে যাবার মুখে একটু উঠানের মত মুক্ত আকাশ তলে এসে থেমেছে, একদিকে উঠে গেছে অন্দরের সিঁড়ি।

পথটা অন্য দিকে বেঁকে গেছে গোয়ালবাড়ির দিকে।

—বাবা!

হঠাৎ শিউলিকে দেখে থকমে দাঁড়াল তারকরত্ন।

আবছা অন্ধকারে কি যেন একটা গর্হিত কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। মেয়েকে দেখে এগিয়ে যায়।

—কিছু বলবি?

—মায়ের শরীরটা খারাপ।

তারকরত্নের মনের সব সুর ছিঁড়ে যায়। অন্য কেউ হলে কড়া স্বরেই জবাব দিত। কিন্তু এই একটি জায়গায় অনেক চেষ্টা করেও তারকের মত কঠিন মানুষও কঠিনতর হতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করে,

—জীবন কোথায়? শশী গোমস্তাকে বলো—ডাক্তারবাবুকে খবর দিক। তাছাড়া বারোমাস তিরিশ দিনের অসুখ, ওর আবার বাড়া-কমা কি বল?

শিউলি কথা বলে না, বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

বয়স হয়েছে তার। অনেক দেখেছে এ বাড়ির জীবনযাত্রা। ওই সরু পথটা বেঁকে গেছে অন্দরের শুচিতা থেকে কোন্ ঘৃণ্য নরকের পথে—তাও খানিকটা অনুমান করতে পারে সে আজকাল। রাত্রের আঁধারে তারকরত্নকে মনে হয় অন্য মানুষ।

শিউলি জবাব পেয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু যায় না, যেন ওই সরু পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বলে ওঠে তারক,

—আমি আসছি ওদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে।

দাঁড়াল না। পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল সে। আজ সত্যই তার দরকার রয়েছে—বিশেষ দরকার।

এ সব পরামর্শ সদর কাছারীতে বসে সব সময় হয় না। ভুবন পোদ্দার, হেলু মাস্টার, বীরেন সিংহদেও—অনেকেই এসেছে। স্কুল কমিটির মিটিং বসেছে তারকরত্নের খাসকামরায়।

বীরেন বাধা দিয়েছিল,—আজ পঞ্চ-গ্রামী বৈঠক ভৈরবতলায়, স্কুল-এর মিটিং আজ বন্ধ থাকুক। পরে হবে।

ইউনিয়নবোর্ডের অন্যতম সিডিউল্ড-কাস্ট মেম্বর নিতাই বাগ্দীও আজকাল তারকরত্নের দয়ায় প্রকৃত বস্তুর মর্যাদা বুঝেছে। সন্ধ্যার পরই কেমন যেন চাহিদা অনুভব করে শিরাতন্ত্রীতে।

সুতরাং সে-ই জবাব দেয়,—ইস্কুল আর ধম্মো এক হল বীরেনবাবু? বিদ্যা নিয়ে কথা; কলিকালে বিদ্যেই ধম্মো!

—নিতাই আজকাল দামী কথা শিখেছে হে!

হাসে নিতাই তারকরত্নের কথায়।

হেলু মাস্টারের মনে একটা আশা রয়েছে। আধ-পাগলা বসন্তবাবুকে হটাতে পারলে হেডমাস্টার সেই-ই হবে। তারকবাবু স্কুল কমিটির সেক্রেটারি, সুতরাং তার আদেশেই সব। তাকে খুশি করা দরকার। সুতরাং বৈকালে মিটিং শেষ করে ওখানে যাবে তারা।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসে পড়েছে। ছটফট করছে বীরেনবাবু। আরও দু-একজন। তখনও তারকরত্নের দেখা নেই।

শশী গোমস্তা—নটবর পাঁড়ুই ওদিকে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করেছে। পোলাও আর মাংস: বাতাসে তারই সৌরভ উঠেছে।

তারকরত্ন ইচ্ছা করেই তাদের এই স্কুল-কমিটির মিটিং-এর নাম করে আজ আটকে রাখতে চায়, যেন ওরা ভৈরবতলার মিটিং-এ যোগ দিতে না পারে। অবশ্য ভুরিভোজের আয়োজনও হয়েছে।

ভক্তি চাটুয্যে গলা খাটো করে বলে হেলুকে,

—কি হে মাস্টার, এর তুলনায় ভৈরবতলার শুকনো মিটিং কি ভালো?

হেলু স্বপ্ন দেখছে, হেডমাস্টারের বড় চেয়ারটাতে সে বসেছে, ওর ডাকে চমক ভাঙ্গে। সায় দেয়,—সে আর বলতে।

নীলাম্বরবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেকেই এসেছে; দইগাঁয়ের দত্তমশাই; চাটুয্যে, হরেকিষ্টপুরের বসন্ত মোড়ল, গদারডিহির নোতুন গোঁসাই; এ গাঁয়ের অনেকেই।

তেঁতুলতলার ঘাস আগাছা পরিষ্কার করেছে লোহার পাড়ার দুগো, কিষ্ট, পশুপতি—সবাই। পানু দাস এসে ভবিযুক্ত হয়ে ভৈরবতলায় মাথা ঠেকিয়ে বসে!

সতীশ ভটচায হেঁকে ওঠে—

—ভালো করে পেন্নাম কর পানু, বাড়বাড়ন্ত হোক কারবার।

পানু বিনয়ের অবতার; পরনের কাপড়খানার খুঁট গলায় দিয়েছে; বিনয়ে গদগদ হয়ে হাত যোড় করে বলে,

—আপনাদের আশীর্বাদ কাকা।

সতীশ ভটচাযও বলতে ছাড়ে না।

—সে তো বর্মের মত ঘিরে আছে বাবা। বস। হ্যাঁরে ধরণী এসেছে?

ধরণী মুখুয্যেও এসেছে। ভীরু, শশক-প্রকৃতির একটি লোক। রোদের তাপ এখনও রয়েছে, বগলে ওর সদাসর্বদাই একটি ছাতা লেগে থাকে।

মেঘের আড়াল থেকে রোদ ঠেলে উঠতেই ছাতা মেলতে যাবে, হঠাৎ ফটাস করে ছাতা বন্ধ করে উঠে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাড়ির দিকে চলতে থাকে ধরণী।

—কি হল ধরণী?

সতীশ ভটচাযের হাঁকে ধরণী পিছু ফিরে চাইল। হাতের মুঠো বন্ধ। সেই অবস্থাতেই জবাব দেয়,—এখুনি আসছি কাকা!

---কি ব্যাপার!

দাঁড়িয়েছিল পশু লোহার, সেই জবাব দেয়,---আজ্ঞে আর্সুলা!

---আর্সুলা কি রে? নীলাম্বরবাবুও অবাক হয়েছেন। মিষ্টি হাসছে, বলে ওঠে,

---ঘরের লক্ষ্মী, ছাতার সঙ্গে আইছেন, ওনাকে আবার ঘরে রেখে খুড়ো ঠাকুর ফিরবেন আজ্ঞে।

---সে কি রে?

---হ্যাঁ বাবাঠাকুর, সেবার দুগ্‌গোপুরের হাটে খুড়োঠাকুরের ছাতা থেকে অমনি আর্সুলা বেরিয়েছিল, তা খুড়োঠাকুর খুঁটে বেঁধে এনেছিলেন মা লক্ষ্মীকে চার কোশ পথ, ঘরে এসে তবে ছেড়েছিলেন।

হাসতে থাকে সবাই। ধরণী কোন দিকে না চেয়ে হন হন করে বাড়ির দিকে চলেছে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তখনও চলতি মাতব্বরদের দেখা নেই। হেলু মাস্টার, ভক্তি চাটুয্যে, নিতে, বীরেনবাবু---কেউ এসে পৌঁছোয়নি।

সাইকেল নিয়ে ছুটলো পল্টু।

পশু লোহার মাথা নাড়ে---কে জানে কোথায়।

সতীশ ভটচাযও অবাক হয়ে গেছে। লোকগুলো যেন কর্পূরের মত উবে গেল। নীলাম্বরবাবু বলেন,

---তারকবাবুর ওখানে নেই ত?

---কই দেখলাম না।

---তাই তো!

ধরণী নিশ্চিন্ত মনে এসে বসেছে এবার।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই এসেছে, বাউরী, বাগ্দী-লোহাররা পর্যন্ত। তফাতে বসে আছে তারা। গাঁয়ের ভোল ফিরে যাবে, যদি এতগুলো টাকা বার্ষিক আদায় হয়। হরিচালা হবে, গ্রাম-দেবতা ভৈরবনাথের গাজন হবে। কিন্তু তারাও যেন বুঝতে পেরেছে একটা গোলমাল কো:ায় হয়ে গেছে।

---বাবাঠাকুর!

নীলাম্বরবাবু মেয়েটার ডাকে ফিরে চাইলেন। মিষ্টি লোহার।

হাঁপাচ্ছে সে। ওর চোখে-মুখে কি যেন একটা উৎকণ্ঠার ছাপ।

---কি রে? অবাক হয়েছেন নীলাম্বরবাবু।

---ইদিকে সরে আসুন বাবাঠাকুর।

মেয়েটার গতি সর্বত্রই; একটা গ্যাস লাইটের আলোর আভা পড়েছে ওর মুখে। কেমন যেন বিবর্ণ পাংশু ছায়া ওর মুখে।

নীলাম্বরবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকেন।

ঝড়ের আগে কি যেন একটা দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে সে। আকাশের তারা জ্বলছে কি অসহ্য যন্ত্রণার আভায়। হাওয়া বইছে---সন সন হাওয়া।

রাত নামছে। দুঃস্বপ্নের রাত।

স্বৈরিণী মিষ্টি লোহারও আতঙ্কে শিউরে উঠছে। সেই ভয়ের ছায়া ওর দু'চোখে—নীলাম্বরবাবু নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ওর দিকে।

রাত্রি নেমে আসছে।

বিস্তীর্ণ শস্যরিক্ত মাঠে নেমেছে ফিকে অন্ধকার; আকাশের কোলে ছড়ানো টুকরো মেঘগুলো দিনের শেষ আলোর রং মেখে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল—তারপরই নামে সব-আলো-ফুরানো অন্ধকার।

দু একটা তারা আকাশের বুকে জেগে ওঠে।

দূর-দূরান্তের সবুজ গ্রাম সীমাও হারিয়ে যায় ওই তমসায়।

ভৈরবনাথের ঝাঁকড়া তেঁতুল-বট গাছের মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। বৈঠকে আমন্ত্রিত অতিথিরাও ফিরে গেল। তারকরত্ন আজ তাদের ডাকে আসেনি।

শুধু তাই নয়, আরও ক'জনকে আসতে দেয়নি এই আপোশ আলোচনায় ওই তারকরত্নবাবু।

কথাটা শুনে চমকে ওঠেন নীলাম্বরবাবু।

মিষ্টি লোহারের চোখে-মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর—কি যেন আতঙ্কের ছোঁয়া তাতে মেশানো। বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, বাবাঠাকুর, ভৈরবথানে দাঁড়িয়ে কি মিছে কথা বলবো? অয় বাবা, জিব খসে যাবে নাই, ওনারা সবাই রইছে দেখলাম।

কোন কথা আর বের হয়নি নীলাম্বরবাবুর মুখ থেকে।

যত সহজ ভেবেছিলেন ব্যাপারটা মিটে যাবে, তা গেল না। কি ভাবছেন।

মিষ্টি লোহার পায়ে পায়ে সরে গেল।

চুপ করে কি ভাবছেন নীলাম্বরবাবু; পাঁচখানা গ্রামের লোককে ডাকা-হাঁকার পর এমনি করে অপমান—এটা যেন তাঁর নিজেরই অপমান বলে মনে হয়।

গ্রামের ছেলেরা ইতিমধ্যে অতিথি-সৎকারের ভার নিয়েছে।

চা আর হালুয়া নিজেরাই কার বাড়িতে মেয়েদের দিয়ে করিয়ে এনে পরিবেশণ করছে ওদের তদারকি করছিল অশোক।

মিষ্টি লোহারকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখে কি একটা অনুমান করে এগিয়ে আসে। ক্রমশ ব্যাপারটা শুনেছে সে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ওদিকে একটা গ্যাস জ্বলছে।

দু'একটা হারিকেনও হাজির হয় এবং অশোকই বলে ওঠে,

—সংবাদটা ওঁদের দিন কাকাবাবু! মিছিমিছি রাত করানো কেন ওঁদের?

ইতস্ততঃ করছিলেন নীলাম্বরবাবু। অশোকের কথায় ভরসা পান।

—তুমিই বলো ওঁদের।

মিটিং বসলোই না। তাঁর নিজের অসম্ভব লজ্জা করছে।

অপেক্ষা করে থেকে লোকজন সবাই চলে গেছে। নির্জন হয়ে গেছে আঁধার গাছ-ঢাকা ঠাঁইটা। রাতের বাতাস বইছে—হু হু বাতাস।

গ্রামের বৌ-ঝিরা আজও সন্ধ্যায় দু-একটা প্রদীপ দিয়ে যায় ধ্বংসপ্রায় ও লুপ্তমহিমা দেবস্থানে।
বাতাসে তাও নিভে গেছে।
একান্তেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন নীলাম্বরবাবু। কি যেন ভাবছেন।
অন্ধকারে একটা শব্দ উঠছে।
কুড় কুড় কুড় কুড় ঠ্যাং ঠ্যাং। কুড় কুড় কুড়।
ক্রমাগত উঠছে একটানা শব্দ।

গ্রামের বাইরেই একটা পুরোনো বটগাছ ঘিরে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে; তারই চারিপাশে আঁধার ঢাকা এদিক-ওদিক ছড়ানো ঝুপড়ি। কোন রকমে মাটির দেওয়াল একফালি তুলে বাঁশ খড় দিয়ে ছাওয়াবার চেষ্টাও করা হয়েছে।

বাউরীপাড়ায় নেমেছে রাত্রি।

কোথাও ফাঁকা দাওয়ায় কেউ কাঠকুটো দিয়ে উনুন জ্বেলেছে।

ওদিকে বাউরীদের ছেলেগুলো গাছতলায় গোল হয়ে বসে মাটির খোলের মুখ ছাগলের চামড়া দিয়ে মুড়ে দিশী নাগড়চি বানিয়ে তাই পিটছে।

মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গাটুকুতে কে যেন নাচছে।

ঘুরে ঘুরে নাচছে। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটাকে ঠিক ঠাওর করা যায় না। বেদম নাচছে আর ছেলেগুলো তালে-বেতালে পিটে চলেছে ওই খোলবাদ্যি।

বেজা বাউরীর মেজাজটা ভালো নাই এমনিতেই।

ক'দিন থেকে শরীরটাও খারাপ। তার উপর মুনিব পানু দাসও বেগড়বাঁই করছে। বলেছে,

—খাটতে না পারিস তবে আসিস কেন? রূপ দেখে বেতন দেবো তুকে? বেজা মুখ বুজে কাজ করবার চেষ্টা করে।

দোকানী পানু দাসের বাড়িতে কাজ করা—সে কি যে সে কথা? কয়েক বছরেই দেখেছে গাঁয়ের মুনিষ মান্দের পানু দাস যেন তাদের কাছে আখ-মাড়াই কল। আস্ত আস্ত মোটা আখ যেমন এদিকে ঢুকে ওদিকে বের হয় ছিবড়ে হয়ে—ওর বাড়ির কাজও যেন তাই।

বছরের এ মাথায় যে মুনিষ নধর গতর আর স্বাস্থ্য নিয়ে ঢোকে—বছরের ওধারে সে যখন বের হয় পানুর বাড়ি থেকে অমনি ছিবড়ে হয়েই কাজ ছাড়ে, তার ঘরমুখো আর হয় না সে।

পানু দাসও কাজে লাগাবার আগে থেকে মুনিষ-মাহিন্দারকে কম কাজ করায়—খেতে-টেতেও দেয়; পাল-পরবে দু'চার পয়সাও হাতে দেয়। কিন্তু ক্রমশঃ সইয়ে সইয়ে চাপ দেয়। কঠিন চাপ।

বস্তা বস্তা ধান তোলে গাড়িতে।

বস্তা কি এমনি তেমনি—দু'মণি বস্তা। তাও পঞ্চাশ-একশো করে দৈনিক। মাজা কোমর যায়। টনটন করে গা-হাত-পা।

তারপর আজ যা বাঁকুড়া গাড়ি নিয়ে—মানে দু'রাত দু'দিন পথে পথে রাত জেগে কাটবে;

কাল যা দুগ্‌গোপুর, অর্থাৎ—দু'মাইল করে চার মাইল দামোদরের বুকভরা বালিতে গরু মুনিয লবেজান হয়ে আসবে। তারপর আছে মাঠের কাজ।

বারোমাস পুরতে হয় না, মুনিযের গতরে ক'মাসেই দুব্বোঘাস গজিয়ে যায়।

গেছেও। তা হাড়ে হাড়ে টের পায় বেজা।

কোমর—শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেটে যেন একটা ব্যাথা; গা জ্বর জ্বর করছে। তার উপর গিয়েছিল বাকি বেতন চাইতে। আজ পানু দাস এক রকম হাঁকিয়েই দিয়েছে।

—খাটতে এলে পাবি, না'হলে গায়ে আর কত রাখবো বল।

এসব বিষয়ে পানু দাসের এক কথা।

ওর বাড়ি থেকে চুপ করে বের হয়ে এসেছে বেজা।

দুদিন খোরাকী নেই ঘরে। বুড়ী মায়ের ট্যাকট্যাক কথাও সইতে পারে না।

শূন্যহাতে বেজা ফিরে আসছে। বটতলায় ওদের নাচের আসরের পাশে দাঁড়াল।

—দাদা যি গো? আইস। ছেলেগুলো ওর দিকে চাইল।

—ধর টুকছেন ওই!

ব্যাঙা ওকে বসাবার চেষ্টা করে।

অন্য দিন বসে পড়তো বেজা। সেই-ই এদের পাণ্ডা। কিন্তু আজ তার মন বসে না। দাঁড়াল না, সরে গেল। চলে গেল অন্ধকারে নিজের ঝুপড়ির দিকে।

হাসছে নৃত্যরত মূর্তিটা। এরই মধ্যে একটু থেকে দম নিচ্ছিল টেরি—বলে ওঠে,

—মন দুখাইছে কিনা?

হাসছে মেয়েটা। নির্লজ্জ বেহায়ার মত হাসছে। বেজা ঘরে ফিরছে, কথা বলে না।

ঘরটা অন্ধকার। কেরাসিন তেল খরচ করবার মত বিলাস সামর্থ্য তার নেই। হুমড়ি-খাওয় ঘরটায় তাই রাতের অন্ধকার ঘিরে এসেছে। পাড়ার শেষ প্রান্তে ঘরখানা। উঠোনের-পাঁচিলে বালাই নেই। ফাঁকা—ধূ ধূ প্রান্তর—তার পরই শালবন; একপাশে ধানমাঠ।

সবই যেন তার উঠান।

—এই!

কোন সাড়া নেই। দাওয়ায় উঠে আগড়টা ঠেলে ভিতরে ঢোকে বেজা। ওপাশে পড়ে আছে ময়লা তেলচিটি তালাই।

ওর বুড়ী মা এক পাশে বসে একটা হুঁকোতে তামাক টানছিল। বেজার দিকে চেয়ে তখনও তামুক টানতে থাকে।

—বৌটো কুথাকে গেল? অ্যাঁ?

বুড়ী তখনও টেনে চলে হুঁকোটা; তামাক আর নেই। এক চিমটে তামাক যা ছিল কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আঙরাগুলোর তাপই গলায় লাগছে।

তবুও টেনে চলছে আর কাশছে।

বেজা চেঁচিয়ে ওঠে,—কুথাকে গেল সিটো? এ্যাই মা?

বুড়ী হুঁকো নামিয়ে জবাব দেয়—গুটেক চেঁচাস না। চুপ যা—

বেজা বুড়ীর দিকে চেয়ে থাকে, অন্ধকারে খট্টাসের মত নীল দুটো চোখ ওর জ্বলছে। শন নুড়ির মত চুলগুলো আঁধারে কেমন বিশ্রী লাগছে।

চমকে ওঠে বেজা, ক'দিন থেকেই দেখছে—মা আর বৌটার মধ্যে কেমন যেন আপোশ হয়েছে। যেখানে ঝগড়া আর মুখখিস্তির চোটে চালে কাক-চিল অবধি বসতো না, সেই বাড়িতেই দুটো জানোয়ার হঠাৎ খামচাখামচি থামিয়ে চুপ করে আছে কেন বুঝতে পারেনি। আজ কিছুটা বুঝতে পারে।

আঁধারে বাইরে কিসের একটা ঝটপট শব্দ শোনা যায়। কারা চেঁচাচ্ছে।

তাড়া করেছে পিছু পিছু বাউড়ী পাড়ার ছেলেগুলো। কিন্তু তাকে আর ধরা যায় না। এমন আক্রমণ এখানে প্রায়ই হয়।

কার উঠোন থেকে একটা মুরগী চকিতের মধ্যে ধরে লোভী শিয়ালটা বনের মধ্যে দৌড়েছে। চলে গেল এদের নাগালের বাইরে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বেজা। এ পাড়ার চারিপাশে শিয়ালের মতই ধূর্ত লোভী অনেক শয়তান জানোয়ার ওৎ পেতে রয়েছে শিকারের আশায়। তাদের জিব দিয়ে বিষাক্ত লালা ঝরে—দু-চোখ জ্বলে লালসার আগুনে।

—আগড়টা দিয়ে দে কচুমুখো ছোঁড়া কুথাকার? হিল-হিলিয়ে শীতের বাওড়া আসছেনি?

বুড়ীর কর্কশ গলা খন্ খন্ করে ওঠে।

বেজা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ক'দিন ধরে সেই-ই এদের পোষ্য। জানে বৌটা কোথায় গেছে—কোন অন্ধকার নরকের রাজ্যে।

পারতো সে—আগেকার সেই বলিষ্ঠ জোয়ান বেজা বাউরী তার শক্ত দুটো হাতে ওদের টুঁটি ছিঁড়ে দিতে। কিন্তু আজ!

মা তখনও গজগজ করছে,—মরদ! গুণা নাই তার ফানা আছে। চুপ মেরে শুয়ে থাক।

বেজা এসে শূন্য তালাই-এ এলিয়ে পড়ল। পেটের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।....গাটা জ্বর জ্বর করছে। মাথার ভেতরটা কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা।....ঘুম আসে না।

নিস্তব্ধতা নেমেছে বাউরী পাড়ায়। থেমে গেছে ওদের নাচ গানের আসর।

কোথায় দূর বনের মাঝে একটা শিয়াল ডাকছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—একটা—অনেকগুলো। বেজা চুপ করে পড়ে থাকে।

রাত নেমেছে—তখনও ফেরেনি বৌটা।

জলটোপের কাজের বিরাম নেই। সারাদিন লোকটা কিছু না কিছু একটা নিয়ে থাকবেই। সাধারণ, অতি সাধারণ চেহারা, কালো মাঝারি গড়ন, মাথার চুলে পাক ধরেছে আশে-পাশে। সামনের দাঁতগুলোও দু-একটা গেছে পান-জরদার তেজেই বোধ হয়। বাকিগুলোও যাই যাই করছে।

হাঁটবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে যেন পথ নিরীক্ষণ করে চলেছে। কথাবার্তা বলে কম—আর যদিও বা দু-একটা বলে—তাও মিষ্টি একটু হাসির আভায় সুরেলা হয়ে ওঠে।

সাগরী বাউরী বলে, —মিষ্টির মনের মানুষ কিনা তাই হাসিটুকুনেও মিষ্টি মাখানো। লয় গো?

হাসে জলটোপ, কথা বলে না। জলটোপ নামটার মানে একটা আছে। কিন্তু ওই নামের আড়ালে মানুষটার আসল নামটা এ গ্রামে চাপা পড়ে গেছে।

মিষ্টি গুনগুনিয়ে ভাদুর সুর ধরে।

—চল ভাদু, চল দেখতে যাবি
আনীগঞ্জের বটতলা;
হেলে দুলে দেখতে যাবি
কয়লা খাদের জল তুলা।।

গান ওর মুখে মুখে। গান থামিয়ে বলে ওঠে মিষ্টি,

—রাত হয়েছে খাবি না?

পিদিমের আলোয় জলটোপ নিপুণ হাতে একতাল মাটি দিয়ে একটা মূর্তি গড়ছিল। বাঁশের চ্যাচাড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে চাঁচছে ওব দেহ—হাতগুলো মসৃণ করে তুলছে।

মিষ্টি এগিয়ে এসে থেমে যায়। নামানো চৌখুপী লণ্ঠনটা তুলে ভাল করে মূর্তিটা নিরীখ করতে থাকে। ক্রমশঃ ওর চোখে ফুটে ওঠে বিস্ময় আর আনন্দের চিহ্ন।

—অয়, করেছিস কি রে?

হাসে জলটোপ,—কেনে হল কি তুর?

মিষ্টির দুচোখে কেমন জমাট আনন্দ, পুরুষ্টু, নিটোল দেহে একটা সজীব লাবণ্য, কপালে কাঁচপোকার টিপটা মানিয়েছে সুন্দর।

—ময়ূরচাপা ঠাকুর যি রে?

জলটোপ কাদা মাখা হাতটা ধুতে ধুতে বলে,—বানালাম তুর জন্যে।

—সত্যি! হ্যাঁরে?

ওর মনে গভীর একটা নিবিড় আশা—কত নিশীথরাত্রের ব্যর্থ কান্নার প্রকাশ ওর চাহনিতে।

স্বৈরিণী মিষ্টি কেমন যেন বদলে গেছে।

এগিয়ে আসে লোকটার দিকে, কেমন যেন একটা ব্যাকুলতা মিষ্টির দু-চোখে—কণ্ঠস্বরে।

—পুজো করাবি তা'হলে?

কথা বলে না জলটোপ। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মিষ্টির মনে যেন হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—ভিড় করে আসে। কি এক নিবিড় বদনার দিন।

গ্রামের দিনগুলো এখনও ভোলেনি মিষ্টি। কি এক নেশার ঘোরেই সে লালসা আর ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। ঘরে এসে বসেনি এমন লোক গ্রামে কমই ছিল। ঘরের বাতায় কয়েকটা কোও রাখতে হয়েছিল এবং বামুনদের জন্য কড়ি-বাঁধা হুঁকোও সাঙ্গায় টাঙ্গানো থাকতো।

কি এক মোহের বশেই বৃহত্তম জগতে পা বাড়িয়েছিল মিষ্টি। বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট পল্লীতেও জমিয়ে তুলেছিল তার রং-এর আসর। সে আজ ক'বছর আগেকার কথা। জীবনে অনেক দেখেছে। ভোগও করেছে। টাকা-পয়সার মুখও দেখেছিল। এমনকি শাড়ি গহনাও বানিয়েছিল অনেক। হঠাৎ কেমন যেন বদলে যায় মিষ্টি।

বিচিত্ররূপিণী নারী, বহু বিচিত্র তার মনের গতি প্রকৃতি। হঠাৎ একদিন আবার গ্রামে ফিরে আসে, সঙ্গে ওই লোকটা।

অমন দু-একবার এসেছে মিষ্টি—কিন্তু থাকতে আসেনি। এবার তার হালচাল দেখে অনেকে একটু বিস্মিত হয়—খুশিও হয় দু-চার জন—কেউ কেউ পুরোনো কর্তারা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখে না।

মিষ্টির সঙ্গের লোকটা ক'দিনেই ধ্বসে পড়া ঘরখানাকে আবার নোতুন করে ছাইয়ে নেয়, সামনে ছ্যাঁচা বাঁশের সুন্দর বেড়া দিয়ে নিজের হাতেই গাছপালা লাগিয়ে মনোরম একটা পরিবেশ গড়ে তোলে।

পথ-চলতি মানুষ দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ঘরের ছাউনি—বেড়ার শিল্প কাজ দেখে বাহবা দেয়। মনে মনে খুশি হয় মিষ্টি। বলে,

—ই যে বালাখানা বানিয়েছিস রে?

হাসে জলটোপ,—গরীবের ভাঙ্গা ভিটে, কোঠা বালাখানা পেলি কুথায়?

—এই আমার ঢের।

এ ঘরে মন বসে যায় মিষ্টির। উড়ু উড়ু মন বসে—যেমন ডালে বসে ছন্নছাড়া ঘর-পালানো পাখি।

পানু দাসের ভাই ছানু ছোকরা ক'দিন থেকেই দেখছে। আগেকার সেই মিষ্টি আর নাই—কোথায় বদলে গেছে। কাছে এগোবার পথ নেই। হাসে সত্যি, কিন্তু মিষ্টির সে হাসিতে আর নেশার মাদকতা নেই—কাছে ডাকবার ইশারা নেই। জ্বালা করা সেই হাসি। গ্রামের অনেকেই তা টের পেয়েছে।

ওই লোকটাকে ঘিরেই মিষ্টি আজ নোতুন ঘরের স্বপ্ন দেখছে এটা অনুমান করতে দেরি হয় না। নিরীহ বোকা বোকা মানুষটা। মিষ্টির মন ভরাবার কি যাদু সে জানে ওরা টের পায় না। সেদিন ওকে ছানুই পথের ধারে দাঁড় করিয়ে বিড়ি এগিয়ে দেয়।

লম্বা ত্যাড়াঙ্গা ছানু; কুশ্রী রসিকতার ভাব ওর মুখে। ছানু বলে, লাও হে।

লোকটা জবাব দেয়,—আজ্ঞে উ তো চলে না?

—তবে কি সিগ্রেটই চলে? তা ভালো।

ছানু দাসের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর। লোকটা হাসে সহজ ভাবেই।

—আজ্ঞে ওসব কোনটাই চলে না।

—সে কি! ছানু দাস একটু অবাক হয়। আরও উপস্থিত দু'চারজনের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি হয়ে যায়। পরক্ষণেই ছানু বলে ওঠে,

—তা আজ্ঞে আপনার 'মুউন' (মোহনা) গোঁড়াটা গোটাটাই যে ছেড়ে গেইছে। বিড়ি খাবেন কুথাতে?

লোকটার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়, অর্থাৎ সামনের দাঁতগুলো সবই পড়ে গিয়েছে-সেই ইঙ্গিতই করছে ওরা।

ব্যাপারটা মিষ্টিরও নজর এড়ায়নি।

এসে দাঁড়াল ছানুর সামনে, মুখোমুখি। একবার লোকটাকে বলে ওঠে,—ঘর খুলা আছে যাও দিনি?

লোকটা সুড় সুড় করে বাড়ির দিকে চলে গেল। ওরই জন্য বোধহয় মিষ্টি এতক্ষণ মুখ খোলেনি! ও চলে যেতেই এগিয়ে যায় ছানুর দিকে।

—লজরে ধরেছে নাকি, হ্যাঁরে?

দিনে দুপুরে রাস্তায় উদ্ভট প্রেম নিবেদন মিষ্টির কাছে নোতুন কিছু নয়, আজ চটে উঠে সে। মিষ্টি বলে ওঠে,

—বল্! এই ছেনো।

ছানু পা পা করে খামারের দিকে এগিয়ে যায়। বাকি দু'একজনও সরে পড়ে এদিকে ওদিকে হাসতে থাকে মিষ্টি লোহার।

—মরদ! কুকুরগুলো কুথাকার।

ছানুই কেন, গ্রামের অনেকেই বুঝতে পারে—লোকটা মিষ্টিকে গেঁথে ফেলেছে! অনেক বড় মেছোল দামী টোপ চার দিয়ে যে মাছকে ঘায়েল করতে পারেনি, ওই লোকটা শুধু বঁড়শি বিনিটোপে—স্রেফ জলে জলটোপ দিয়েই গেঁথেছে ডাগর কইটাকে।

ছানু তখনও হাসছে, ওদের কাছে বলে ওঠে,

—জলটোপ, ছাপ জলটোপ দিয়ে গেঁথেছে বুঝলি।

সেই থেকে নামটা কেমন করে চালু হয়ে গেছে! জলটোপ।

মিষ্টিও জানে সে সত্যিই কোথায় বাঁধা পড়ে গেছে।

প্রেম—কামনা—ভালবাসা—বিলাসের উপকরণ সব কিছুই যেন আজ তার কাছে যে মিথ্যা একটা আতঙ্কের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে, মনের কোণে উঁকি মারে অন্য একটি গো সুরময় আশা!

রাত নেমে আসে। ফিকে কুয়াশার লাজ-উত্তরী জড়ানো কোন কুমারী রাত্রি। সমাপ্ত কার্তিকের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে মিষ্টি।

প্রণাম করে মিষ্টি—স্বৈরিণী মিষ্টি লোহার গলবস্ত্র হয়ে।

হাসছে জলটোপ।

—কি হ'ল রে তুর, অ্যাঁ?

রাত নির্জনে কেমন বদলে যায় মেয়েটা; দুচোখ জলে ছাপিয়ে আসে। কাছে টেনে লোকটা।

কাঁদছে মিষ্টি—ব্যাকুল ব্যর্থ অন্তরের সেই কান্না। ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদছে।

নিথর রাত্রি নেমেছে পল্লী-সীমায়।

হেমন্তে শেষ....শীত আসছে। ইতিমধ্যেই শীতের আভাষ দেখা দিয়েছে আকাশ বাতাসে—শালবন সীমায়। কঠিন কাঁকুরে ডাঙ্গাটা কেমন রুক্ষ কর্কশ হয়ে উঠেছে, তারপরই শুরু হয়েছে ক্রমঃনিম্ন ধান ক্ষেতের সীমানা। সিঁড়ি সিঁড়ি নেমে এসেছে। উঁচু জমিতে ঝুলুর-কার্তিক-কলমা ধানে এসেছে হলুদের আভা, মঞ্জরী ভারাবনত ধান ক্ষেত বাতাসে মাথা নোয়ান দিয়েছে। তারও নীচের তলের ক্ষেতগুলোয় তখনও সবুজ ছিটোনো।

থোড়গুলো থেকে উঁকি মারছে শূন্য মঞ্জরী—রাতের আঁধারে ওরা বৃন্ত উন্মুক্ত করে জেগে থাকে, জাগর রাত্রির প্রহরে কখন তাদের উন্মুখ ধান শীর্ষে স্পর্শ পাবে এককণা শিশিরের, সার্থক হবে ওদের শূন্য বুক ফসলের সম্ভাবনায়।

সূর্যের আলোয় কেমন গাঢ় হলুদের স্বপ্ন, ঘাসের বুকে ঝকঝক করে শিশির-কণা মুক্তোর আভা নিয়ে। পুকুর পাড়ের খেজুর গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে কলসী কাঁখে কোন বধূর মত—শীত আসছে।

পূর্ণতার ঋতু! ধরিত্রীর মানস-কন্যা।

তারকরত্ন সেই সন্ধ্যার পর থেকেই কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছে। জানে এর পর ওরাও চেষ্টা করবে ভৈরবনাথের মামলা যেমন তেমন করে দাঁড় করাতে, করাবেও।

তার জন্য তারকরত্নও তৈরি।

অনেক বছরই উড়িয়ে খেয়েছে—মামলা জুড়লে নিদেন সাত-আট বছর চলবেই। তারপর দেখা যাবে। সুতরাং দেবোত্তর একচকে পঞ্চান্ন বিঘে নাখেরাজ সম্পত্তির ধান প্রথম চোটেই খামারে তোলবার আয়োজন করেছে। গ্রামের দক্ষিণসীমায় ঘন বাঁশ বন আর মন্দার গাছের জঙ্গল। শখ করে বাঁশঝাড় লাগিয়েছিল তারকরত্নের পূর্বপুরুষ—আজ তা গ্রামের দক্ষিণ সীমা কেন, অন্যদিকেও মাথা তুলেছে।

রকমারি বাঁশ; তল্‌তা-বেউড়-কীচক-গুড়িসার-সটকা-গেঁড়ি-ভেলকি—নানা জাতের; বাতাসে ওদের পাতা নড়ে, ঝাঁক বন্দী পাতা—কীচক বাঁশের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র, সেই ছিদ্র-পথে বাতাস আনাগোনা করে সুর তুলে গভীর রাতে—কেমন উদাসী একটানা সুর। মনে হয় কে যেন কাঁদছে, শুধু কাঁদছেই।

তারকরত্নের বিশাল বাড়িটার পিছন থেকে পাঁচিলঘেরা গোয়াল, গোলাবাড়ি আর খামারের শুরু; ওখানে কারা যেন রাত্রি গভীরে কাঁদে।

সত্যিকারের কান্না না কীচক বাঁশের রন্ধ্রে ঝড়ো বাতাসের সুর কে জানে!

মাটি থেকে সুর ওঠে—সুর ওঠে আকাশ বাতাসে। তৃপ্ত মনের সুর। যতদূর চোখ যায় দূরে ওই কাটাবাঁধ আসুড়ে পলাশডাঙ্গা অবধি সবুজ মাঠের রং সোনা বরণ হয়ে উঠেছে। বাতাসে শিষ দেয় দোয়েল, খঞ্জন উধাও পাখা মেলে নেচে বেড়ায়। কেমন মিষ্টি মৌ মৌ সুবাস।

বড় বাকুড়িতে রাঁধুনী-পাগল ধান পেকেছে—ওদিকে কারকাচিতে পেকে উঠেছে গোবিন্দ-ভোগ, তারই তীব্র সৌরভে সোনামাঠ ভরে উঠেছে। ভোরের শিশির স্নাত নরম ধানগুলো কাস্তের ধারে কেটে চলেছে। বেলা বাড়বার আগে রোদের তেজ চড়চড়ে হয়ে উঠলেই ধান

শুকিয়ে যাবে, খসে পড়বে ওর মঞ্জরী থেকে পূর্ণগর্ভা ধান, তাই সকাল বেলাতেই যতটা পারে ওরা কাজ এগিয়ে নেয় শিশির থাকতে থাকতে। মুনিষগুলো ধান কাটছে।

শিশির-ভেজা ধান আর ঝকঝকে কাস্তের উপর পড়ছে দিনের প্রথম আলো। কেমন ঝিকিমিকি তোলে।

নিতে বাউরী গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে মাঠ থেকে আলের মাথায় উঠে এল।

—শালো ইরির মধ্যে শীত যেন জেঁকে আইছে। দে দিকিনি একটান। বসে পড়ে আলের উপরেই।

বেজা বাউরী কোন রকমে এরই মধ্যেও কাজ করতে এসেছে। না করে উপায় নেই। বুড়ী মা গজগজ করে।

—বসে বসে কাঁড় গিলছিস, ক্যানে?

—শরীল যুৎ নাই।

—কাঁড়া গতরটো ত লাগছেক।

কথার জবাব দেয়নি বেজা; বৌটাও কেমন যেন মাথা সোজা করে কথা কয় আজকাল। সেই এইটুকুন মেয়েটার আজ ভরা যৌবন এসেছে। লেবি হয়ে উঠেছে বামুন-বেণে পাড়ায় লবঙ্গ।

সেই লেবি হাসে—খিলখিলিয়ে হাসে কেমন ঢেউ তোলা হাসি, সোয়ামীকেও মানে না।

—এ্যাও।

গর্জন করে বেজা।

লেবি ঝাঁট দিচ্ছিল সেদিন তারকরত্নের বাইরের গোয়ালে। খামারের বাঁশ বনের ছায়াঘেরা ঠাঁইটা। কেমন থমথমে।

বেজাকে ধরে নিয়ে গেছে বেগার দিতে—ওর জমিতে ঘর বসত করে, তাই ধান কাটার সময় বেগার দিতে হবে। লেবির রোজগারই আজ রক্ষা। বেজার নিজের রোজগার কমে গেছে।

একে পয়সা কড়ি মিলবে না, ঘরেও ওই অবস্থা—মনে সুখ নেই। হঠাৎ ধানের পালুই-এ থেকে গোয়ালের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় বেজা।

হাসছে জীবনবাবু। ওই তারকবাবুর ছেলে।

সেই সঙ্গে ওই লেবিও হাসে, কেমন বিচিত্র সেই হাসি।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে, মনে হয় ধানপালুই থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে ওই ছোটবাবুর বেহায়া হাসি থামিয়ে দেবে—কল্লা মিটিয়ে দেবে তার নিজের বৌ ওই লেবি হতচ্ছাড়ির।

কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল।

লেবি ঝাঁট দিয়ে চলেছে—তালপাতার শিকের মোটা ঝাঁটা দিয়ে বাবুদের গোয়ালের গোবর-

খিঁচ সাফ করেও তুলতে পারে না। আর হাসছে মনে মনে। হঠাৎ সামনে ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। বেজার সারা গায়ে ধানের কুটি—মাথায় জীর্ণ গামছাটা বাঁধা।

কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে বেজা,—ক্যাক ফ্যাক করে হাসছিলি কেনে?

মেয়েটা ওর দিকে চাইল—ধূর্ত, কেমন তীব্র চাহনি। সাধারণ মেয়েটা কেমন যেন নোতুন চাহনি পেয়েছে ওর ডাগর চোখে। বেশ মাথা তুলেই জবাব দেয়,—কেনে?

—খপরদার হাসবি না, লাজ লাগে না?

হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটা। প্রতিবাদ করে না—ঝগড়া করে না—হাসছে। মনে হয় বেজার পৌরুষকে ধিক্কার দেওয়া সেই হাসি—নিঃশেষ অবজ্ঞাই ফুটে ওঠে ওর প্রতিটি শব্দে।

সরে এল বেজা। কি যেন ভাবছে।

যেমন করে হোক নিজেই কাজ করবে সে। ওর রোজগারে আর বসে বসে খাবে না।

কি যেন পরম বেদনায় আর ধিক্কারে এতবড় জোয়ানটা ঘায়েল হয়ে গেছে। কত আশা করে ঘর বেঁধেছিল—সেই ঘরে আগুন লেগেছে তা বেশ বুঝতে পেরেছে বেজা।

ওর বুক পুড়ছে—তবু মনে মনে এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে।

তাই কাজ করতে আসে। এ সময় কাস্তে ধরতে পারলে যেমন করেই হোক পাইমাপা চার সের ধান আর মুড়ি মিলবে, তাই কাজ করতে এসেছে আজও।

কিন্তু দু-চার গণ্ডা ধান কাটবার পরই কেমন যেন হাঁপিয়ে আসে, টান ধরে বুকে পিঠে। কন-কনে বাতাসে মনে হয় বুক কাঁপছে। একটু তামাক হলে দম পাবে, জোর পাবে দেহে।

তাই বেজা আগে থেকেই আলের মাথায় বসে রোদ-পিঠ করে হুঁকো টানছিল। নিতেকে উঠে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে কলকেটা নামিয়ে দেয়। নিতে গরম তাতা কলকেটা হাতের তালুতে ধরে বেশ আরাম বোধ করে—কেমন উষ্ণ একটা অনুভূতি।

শরীরের হিম জমা ভাব যেন ওই তাতে গলছে—একটা তৃপ্তি আসে। দু-চোখ বুজে টানছে কড়া দা-কাটা তামাক।

গরম ধোঁয়াটা শরীরের কোষে কোষে একটা কবোষ্ণ অনুভূতি আনে—চোখ বুজে একদম ধোঁয়া টেনে বেশ তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করছে সেটা নিতে।

হঠাৎ চোখ খুলে দেখে বেজা তখনও তেমনি গুম হয়ে ঠায় বসে আছে। একটু অবাক হয় নিতে।

—কি হ'ল রে তুর?

—না। যেছি মাঠকে।

চুপ করে গিয়ে ধানে কাস্তে লাগাল বেজা।

নিতেও কথা বাড়াল না।

ওদিকে দেখা যায় তারকরত্নের বড় ছেলে জীবনবাবু মাঠের দিকে আসছে। হাওয়ায় উড়ছে ওর গায়ের গরম শালখানা। পিছনে পিছনে আসছে ছানু দাস।

—ভোর থেকে কবার তামুক খেলিরে নিতে? এ্যাঁ?

জীবনবাবু নিতে বাউরীকে যেন হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে—কি এক গর্হিত কাজ করেছে। নিতে কলকেটা নামিয়ে জবাব দেয়,

—আজ্ঞে যা জাড়, তার ওপর এই লেহর—

ছানু দাস ফোড়ন কাটে—তাই রোদ পুইছিলি?

ওদিকে বেজাকে দেখে বলে ছানু,

—আজ্ঞে বেজাবাবু যি, ভাল আছেন?

ছানু দাসের লম্বা লিকলিকে শরীরটা যেন সাপের মত পাক দিচ্ছে। বেজা কাস্তে থামিয়ে একবার ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

জীবনবাবু কথা বললো না। সরে গেল ওপাশে।

ওরা আবার ধান কাটায় মন দেয়।

নীচেকার বাকুড়িতে ছানু দাস ধান গুনছে। দু-এক আঁটি তুলে নিয়ে পরখ করে ধানের ফলন।

বেজা, নিতে বাউরী আর অন্য মুনিষগুলো একবার চেয়ে দেখল মাত্র। এসব তারা জানে।

ব্যাপারটা একটু গোপনেই। বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে জীবনবাবু কিছু হাতখরচ বাড়তি রোজকার করে নেয়—ছানু দাসের তাই দরকার। দোকানদার মানুষ—সব রকমই ব্যবসা করে সে। এটাও তার বেশ লাভেরই ব্যবসা! নকড়া-ছকড়ায় মাঠ থেকেই বেশ কিছু ধান কেনে।

ধান পরখ করছে সে।

নিতে বাউরী কি ভেবে একবার ওদের দিকে চেয়ে থাকে। আবার কাজে মন দেয়।

রোদ বেড়ে ওঠে। পুব দিকের মহুয়াডাঙ্গা, তাল-বন-সমাকীর্ণ পুকুরের সীমানা ছাড়িয়ে সূর্য উঠেছে আকাশে। বাতাসে একটা উষ্ণ মধুর উত্তাপ, আকাশে সকালের শিশির-ধোয়া আমেজ, কেমন ধোঁয়াটে একটা ভাব।

ওখানে লোকটা তখনও ধান কেটে চলেছে অবিরাম গতিতে। পিছনে তার কিরষাণ ভিকু, তাল রাখতে পারছে না। মাজা টনটন করে ওঠে। উঠে এসে আলের মাথায় ওদের কলকেটা তুলে টানতে থাকে। রোদটা বেশ লাগে মন্দ নয়।

—অ্যাঁ অ্যাঁ—!

একটা ভাষাহীন চীৎকার শোনা যায়। কেমন তীক্ষ্ণ, মাঠের নীরবতা ভরে তোলে।

ভিকু বিরক্ত হয়ে ওঠে,—মলো কিলা, চেঁচাচ্ছে দেখ না।

হাসে নিতে,—যা রে, মুনিব চেঁচাচ্ছে যি।

ভিকু বেশ নিরাসক্তের মতই জবাব দেয়,

—চেঁচাক, দোমাড়ে চেঁচাক। বিয়েন থেকে একটান তামুক খাবো তার যো নাই। লিজে শাল খাটবেক মান্‌সুরের মত, দেখ না একপোণ ধান কেটেছে। সম্মাই যেন শালার মত কাটবেক লারবো—

ভূষণা বাউরী বলে ওঠে,—বামুন হয় যি রে, গাল দিছিস!

ভিকু গজগজ করে।

—উ আবার বামুন নাকি? পৈতে নিলেই বামুন। বলুক দিকি সতীশ ভটচাযের মত মন্তোর, শালার মুখে শ্যাঁ—আর প্যাঁ হয়ে বেরুবেক। ঠাকুর? —প্যাঁ ঠাকুর।

তবু চীৎকার থামে না ওর। ভিকু বার কতক মরিয়া টান দিয়ে কলকে নামিয়ে রেখে মাঠে নামলো ওর চীৎকারে।

নারাণ ঠাকুর ওর দিকে ইশারা করে দেখায় অর্থাৎ পড়ন ধরতে বলছে তার পাশাপাশি ওই ধানক্ষেতে।

পড়ন অর্থে ধান কাটার এক সারি। এক সারিতে ধান কাটতে কাটতে মাঠের এক আলের মাথায় ঠেকবে, আবার সে আল থেকে শুরু করে ফিরবে অন্য আলের মাথায়।

কিন্তু নারাণ ঠাকুরের সঙ্গে পড়ন ধরতে পারে এমন মুনিষ এ চাকলায় দু-একজন মাত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভিকু জবাব দেয় ইশারা ক'রে,—যেছি।

নারাণ ঠাকুর তা জানে, মনে মনে হাসে।

ভাষা নেই ওর মুখে, বোবা।

তবু তার সংসারের পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

বলিষ্ঠ দুমদ জোয়ান। বড ভাই ফকির ভটচায কয়েক বছর আগেই দেহ রেখেছে। বড় হাসিখুশি রসিক লোক ছিল ফকির।

কাজকর্মের মধ্যে দু'চার ঘর যজমান দেখা—আর মাঝে মাঝে পুজো আশ্রায় ঠেকা দমকা কিছু রোজগার—এই সে করতো। কিন্তু বাকি জমি-জায়গা চাষ-বরাত সবই করতো ওই নারাণ।

ছেলেবেলা থেকে যৌবনে পা দিতেই ভাগচাষ ছাড়িয়ে নারাণ ঠাকুর নিজেই চাষ করতে শুরু করেছে এই কবছর থেকে।

জাতিতে বামুন, লাঙল ধরার কোন বিধান নেই, তাই ওই ভিকুকে কিরষাণ রেখেছে। ও কোন রকমে লাঙল ধরে, বাকি সব কাজ একাই নারাণ ঠাকুর করে। ভিকু সঙ্গে থেকে ঠেকা দেয় মাত্র।

পরবছরই ফকির মারা যায়, সে এক স্মরণীয় ঘটনা। ভুবনপুরের আচাই বাড়িতে বরযাত্রী গেছল গরমের দিনে। আচাইরা আয়োজন করেছে প্রচুর। মস্ত বড় বড় কয়েকটা খাসি কাটলো—যাকে বলে কব্জি ভোর, আর সন্দেশ, রসগোল্লা মিহিদানা—তারও কমতি নেই।

এক হাত দেখিয়ে দিয়েছিল সেদিন ফকির।

খাইয়ে মরদ, ওর পাতের চারিপাশে লোক জুটে যায়। ছুটে আসেন আচাই-কর্তা স্বয়ং। হুকুম করতে থাকেন।

—লে আও মাংস! এ্যাই সন্দেশ বোলাও। ফকির সেদিন যেন রাজ্যজয় করে খেলে।

ফিরছে তারা পরদিন বৈকালে।

গরুর গাড়িগুলো রওনা দিয়েছে দামোদরের বালি পার হয়ে। গ্রীষ্মের খররোদ তখনও ঝিলিক করছে লাল গেরুয়া ডাঙায়।

বেশি খাওয়ার ফলে ফকির বেসামাল হয়ে পড়ে। পর পর কয়েকবার বমি করেছে, সেই সঙ্গে দাস্ত হবার পরই কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে জোয়ান মানুষটা।

গরুর গাড়ি থেকে আর নামবার সামর্থ্য নেই। ওরা গাড়ির উপর পাতা খড় ফাঁক ক শুইয়ে দেয়। অসাড় অবস্থায় ফকির সারা পথ ওই ভাবেই আসে।

—বিড়ি খাবি ফকির! সতীশ ভটচায জিজ্ঞাসা করে।

ফকিরের স্বভাবজাত রসিকতা তখনও যায়নি। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে জবাব দেয়

—লড়িয়ো না চড়িয়ো না, ধরিয়ে দাও।

পড়ে পড়েই বিড়ি টানবার চেষ্টা করে।

কয়েক ক্রোশ পথ, শস্যরিক্ত মাঠের উপর দিয়ে গাড়িগুলো যখন গ্রামে ফিরে এল, ? নেমে এসেছে।

—ফকির!

ফকির তখন বেঁহুশ।

ধরাধরি করে নামায় তাকে।

লোক ছুটলো রমণ ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। রমণ বলে ওঠে,

—ই কি করে এনেছেন ভটচাযমশায়!

দেড়ঠেঙে সতীশ ভটচাযও চমকে উঠেছে। আর্তনাদ করে ওঠে বড়বৌ।

ফকির নেই।

ছোট ছেলে সনাতন তখন বছর কয়েকের। ও ঠিক বুঝতে পারে না কি তার চরম সর্ব হয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সে বাবার প্রাণহীন দেহের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওই নিদারুণ আঘাতে আর একটি মানব। তার কণ্ঠে কোন ভাষা নেই।

ওই মূক নারাণ!

কেমন যেন পাষাণের মত স্থির অপলক দৃষ্টিতে ভাই-এর মৃতদেহের দিকে চেয়ে থা

হঠাৎ অব্যক্ত ভাষাহীন আর্তনাদে ফেটে পড়ে নারাণ।

একটা আহত জানোয়ার যেন মর্মান্তিক যন্ত্রাণায় ঘেঁংড়ে কাঁদছে। অসহায় সেই কান্না

আজও সেই সন্ধ্যার স্মৃতি ভোলেনি নির্বাক ওই মানুষটা। কেমন যেন সব ঘুলিয়ে দাদার সেই মুখখানা মনে পড়ে বারবার। বাইরের জগতে যায় বেদনা-প্রকাশের ভাষা অপরের প্রীতির সাহচর্য যাকে ভুলিয়ে দেয় না সেই বেদনা—সে ওই গুরুভার একাই বয়ে অন্তরের অব্যক্ত গভীরে।

সামান্য আঘাতে তাই সেই জমাট পুঞ্জীভূত বেদনা ঝরে পড়ে ভাষাহীন আর্তনাদে।

কাজ আর কাজ।

ওর কোন সঙ্গী-সাথী নেই—শূন্য জীবন তাতেই পূর্ণ করে রেখেছে বোবা মানুষটি।

রোদ বেড়ে ওঠে। শস্যরিক্ত কার্তিক-কলমা ধানের ক্ষেতে সবুজ ঘাসের ফুলগুলো তুলেছে, দ্রোণপুষ্প—সাদা বেলকুড়ির মত ছোট্ট ফুলগুলো। কেমন একটা চিড়চিড়ে এসেছে রোদে।

মাথা ওলপো নাবাণ ঠাকুব।

বাতাসে খজুব বস থেকে জ্বালানো গুডেব মিষ্টি গন্ধ ওঠে। আলেব মাথায একটা খেজুব গাছেব থেকে তখনও চুইযে পডছে দু এক বিন্দু বস—একটা কাক ঠোকব মাবছে ঠুঙ্গিতে।

ভাইপো সনাতন এসে আলেব মাথায দাডিযেছে। হাতে ন্যাকডাব পুটুলিতে চাট্টি মুডি বাঁধা বাড়ি গিযে মুডি খেযে আসতে দেবি হযে যায। ততক্ষণে নাবাণ দশগণ্ডা ধান কাটবে—মুনিষটাও ফাকি দেবে। তাই পাঠশাল থেকে সনাতন ফিবলে সেই ই মাঠে মুডি আনে।

ইশাবা কবে দেখায নাবাণ।

কলম ধবাব ভঙ্গীতে– প্যাঁ এ্যা এ্যা

ঘাড নাডে ছেলেটা।

নবাণ কাস্তে নামিযে এগিযে যায মুখে ওব কেমন হাসি ফুটে ওঠে।

খাওযা পায না তেমন শীতেব হাওযায ঠোঁটেব দুপাশে গজিযে উঠেছে শালুকিব ঘা।

... নো ধানেব শিযে লেগে ফেটে ফেটে গেছে পা গুলোও। সনাতন ওব দিকে চেযে থাকে।

সন সন হাওযা বইছে ঘোডধাবেব সবুজ আখেব ক্ষেতে। ক্রমনিম্ন মাঠেব মধ্যখানে বযে গেছে ওই মাঠ গডানি জলধাবা নিযে ছোট্ট কাঁদবটা। দুপাশে ওব অর্জুন জাম তিবোল গাছেব নিবিড ছাযা।

বেচিঝোপে উডে বেডায শালিখ পাখিব ঝাঁক বঙ্গীন ফডিং এব আশায। পেঁযাজ আলুব ক্ষেতেব কালো মসৃণ ভিজে মাটিব বুকে মাথা তুলেছে সবুজ চাবাগুলো।

মাথাব উপবে উঠেছে সূর্য—শীতেব আমেজ মাখা দিন। তখনও নাবাণ ঠাকুবেব বিবাম নেই।

ধান কেটে চলেছে। পিছনে সাবি দিযে নামিযে চলেছে সোনাধান শুকুলে এঁটিযে গাডি কবে খামাবে তুলবে।

সাবা বছবেব পবিশ্রম, সম্বৎসবেব অন্ন সংস্থান ওই কটি প্রাণীব। গরুব গাডিতে কবে তাবই শোভাযাত্রা চলেছে।

পাকাধান চলেছে গ্রামেব পথে—চাকায চাকায ঠেকছে ওব বাশিকৃত মঞ্জবী—একটি শিহব তোলা

আব একটা শ্রেণী আছে, তাবা এ দলেব বাইবে, এই ভূমি নির্ভব জীবন থেকে তাবা ক্রমকম বিচ্ছিন্ন।

আমাব পাড়ার লোকেবা দু'একজন শালেব বাইবে দাঁড়িযে দেখে ওদেব ধান বোঝাই গাডিব দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে, এ ধানে যেন ওদের কোন অধিকাব নেই।

বিকালের গেরুযা রোদ পাল্‌তে-মাদাব গাছে স্পর্শ বুলিযেছে, গোদাললতায ঝুলছে ল্যাজ-ঝোলা টুনটুনি পাখি।

কামার পাড়ায় কাজের চাপ লেগেই আছে।

ওদের বেশবাসও আলাদা—পরিবেশও।

এ পাড়ায় ঢোকবার অনেক আগে হতেই গ্রামের বাইরে কাঁকুরে ডাঙ্গা শালবনের কাছ থেকেই শোনা যায় বাতাসে কাঁসা-রাং-এর উপর হাতুড়ির শব্দ।

ঠং ঠাং। ঠং ঠাং।

শান্ত নিথর পাখিডাকা বন্য পরিবেশে ওই শব্দটা কেমন একটা বিজাতীয় ভাব আনে এখানে যেন বেমানান।

কিন্তু এ-গাঁ কেন—আশেপাশের অনেক গ্রামেই এ একটা বেশ স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে বাঁকুড়ার কাংস্য শিল্পীদের এলাকা।

বাটি-থালা, রকমারি জামবাটি, কলসী সবই এরা বানায়।

দিনরাত্রি পরিশ্রমের শেষ নেই।

মহাজনের লোক বাসন খুঁট-ভাঙ্গাকাঁসা-রাং-এর তাল পৌঁছে দিয়ে যায়, আবার সপ্তাহান্তে তাগাদা দিতে আসে তৈরি মালপত্রের।

স্থানীয় দু-একজন মহাজনও আছে—তারা যেন ভাগাড়ে শকুন পড়ার মত এসে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। তারকরত্নের পূর্বপুরুষও এই কারবার করেছিল।

বাঁকুড়া সদর—বিষ্ণুপুর না হয় কলকাতা বাসনপট্টি থেকে তারা নিজেই আমদানী করতে পিতলের চাদর, খুঁট, বাসন ভাঙ্গা, রাং-এর তাল—তাই দিয়ে কারিগর রেখে মাল বানাতে চালান দিত বাইরে।

তারও আগে ওর পিতামহ নাকি নিজের কাঁধে মাল নিয়ে ফিরি করেছে।

সে সব আজ গল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এও প্রচলিত আছে—নাকি তারকরত্নের সে পিতামহ রাং-এর তালের মধ্যে কি করে এক তাল সোনাও পেয়ে যায়, তার পর থেকেই এ বোলবোলাও।

জমিদারী—বাড়ি—বাগবাগিচা—ঠাকুর দালান সব কিছুই হয়েছিল।

ওসব কথা কতদূর সত্যি কে জানে। তবে এখনও কামারগুষ্ঠি সেই দিনরাত পরিশ্রম কা চলেছে—তাদের লভ্যাংশে একশ্রেণী ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

—কইরে কালো! ধরা হাপরটা।

কালো কি ভাবছিল বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে। শীতের টানে হাওয়ায় তবু কেমন ভা লাগে। বেলা দুপুরে শালে ঢুকেছে কালীচরণ।

ছোট্ট নীচু একটা চালাঘর, গনগন করে জ্বলছে কয়লার আগুন, বড় হাপরের বুক থে ভস্ ভস্ করে উঠছে দমকা একটানা আর্তনাদ—যেন একটা বন্দী জানোয়ার অসহ্য যন্ত্র গর্জন করছে থেকে থেকে।

নিশ্বাসে তার বের হয় উষ্ণ অগ্নিস্পর্শ!

রুদ্ধ ঘরের মাঝে ক'টি লোক মাথায় ফেটি জড়ানো; নইলে কয়লা আর আগুনের তাপে চুলগুলো পুড়ে ঝলসে যাবে। আর পরনে এইটুকু একটু কাপড়।

নেউল কামার নেহানের উপর লাল বাটির মত ছাঁচ থেকে গলানো পদার্থটা ঢেলে সজোরে পিটে চলেছে। দুজন পালাপালি করে পিটছে বিরামহীন গতিতে।

কালো বাইরে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছছিল। সারা গায়ে ভুষোকালির দাগ। শাল ঘরের ভিতরটায় যেন আগুন উঠেছে।

অতুল কামারের ডাকে ফিরে চাইল কালীচরণ। বলিষ্ঠ দুর্মদ চেহারা—দেহের পেশীগুলো এতক্ষণ হাতুড়ি চালিয়ে ফুলে উঠেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় দম ফিরে পায়।

ওরা ধানের গাড়ি নিয়ে ফিরছে মাঠ থেকে; মাটিতে—চাকার গায়ে ঠেকছে পুরুষ্টু মঞ্জরীগুলো। একটা মিষ্টি সুবাস ওঠে বাতাসে, গোবিন্দভোগ ধানের সৌরভ।

একটা কেমন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

—এই এমো!

কালীচরণের ডাক নাম ওটা।

এ গাঁয়ে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক কালীচরণ—কালিদাস—কালিপদ ইত্যাদি আছে। তাদের পরস্পরকে চিহ্নিত করবার জন্য ডাকটাও তারা বের করে এবং গ্রামের সকলেই তা জানে।

কান্তকালী—পদোকালী। এই কালীচরণের বাড়িতে দুটো আমগাছ আছে। তাই এমোকালী বললেই সে চিহ্নিত। কাঁঠালে-কালীও আছে আর একজন।

অতুল বুড়োর ডাকে কালীচরণ ভিতরে ঢুকল—আবার সেই গনগনে আগুনে হাপরটানা। হাত দুটো কনকন করে। তবু হাতুড়ি মারার বিরাম নেই।

একফালি জানলা দিয়ে দেখা যায় ক্রমনিম্ন লাল ডাঙ্গার শেষে সোনা ধানের ক্ষেতের পারে সবুজ শালবনে এসেছে আবার পাতা ঝরার হলদে আবেশ। সন্ধ্যা নেমে আসছে। গরু বাছুর ফিরছে বন থেকে—ওদের খুরের ধুলোয় লাল সূর্যকিরণ আর হলদে বনতল আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

ওদের তখনও কাজ চলেছে। পিতল খুঁট আর রাং একত্রে গালিয়ে সারি সারি পোড়ামাটির মুচিতে ঢালছে ওরা।

—অতুল!

ভারী গলার আওয়াজ শোনা যায়। শান দিয়ে বাটি চাঁছছিল অতুল, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা ময়লা চিটকেনি দড়ি দিয়ে মাথার সঙ্গে ঘুরিয়ে বাঁধা। বাইরে থেকে ডাক শুনে হাতের কাজ ফেলে উঠে গেল বুড়ো। কোন রকমে কোমরে গাঁটিয়ে বাঁধা কাপড়খানা খুলে—খুঁটের প্রান্তদেশ গলায় জড়িয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টিনের রিপিট করা মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করে বড়বাবুকে।

ব্যাপারটা নজর এড়ায় না এমোকালীর।

স্বয়ং তারকরত্ন বের হয়েছে বেড়াতে, পিছনে পিছনে রয়েছে দেড় ঠেঙ্গে সতীশ ভটচায, নু মাস্টার, আরও দু একজন। আবছা অন্ধকারে তাদের ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

বসলো না তারকরত্ন। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—মালপত্র কবে উশুল করছিস—অ্যাঁ?

অতুল বলবার চেষ্টা করে,—তৈরি করছি বড়বাবু। তারকরত্ন জবাব দেয়,

—সে তো অনেকদিন থেকেই শুনছি। খবর পেলাম সদরের নোতুন মহাজনও এসেছিল। তাকেও কথা দিইছিস মাল দিবি। আমার ব্যবসা কি থাকবে না?

কথাটা মিথ্যা নয়। এতদিন গ্রামের কারিগরদের সবই কাজ করতে হয়েছে ওদেরই তাঁবে। মজুরী বানি যা দিয়েছে তাতে পেট ভরেনি, দিন চলেছে আধপেটা খেয়ে। আজ সদর থেকে কোন অন্য মহাজন যদি মজুরী বেশি দিতে চায় তাদের রাজি হতে দোষ কি:

অতুল মনে মনে ভাবছে। তারকরত্ন ধমকে ওঠে,

—কই রে, জবাব দিচ্ছিস না যে।

পাড়ার মধ্যে বড়বাবুকে দেখে আশপাশের শাল থেকে আরও দু-চার জন এসে জোটে পাড়াটা একটু ঘন বসতির।

ওদিকে গোবিন্দ ময়রার চা তেলে-ভাজার দোকান, পানু দাসের ধানের আড়ত—গোলদারী দোকান—সেখানেও লোকজনের ভিড় রয়েছে—এদিকে বড়বাবুর চীৎকার শুনে বের হয়ে এসেছে তারাও।

ছানু তড়বড়ে শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে এসে হাজির হয়েছে। অতুল কামারের দিকে চেয়ে আছে কামারপাড়ার অনেকেই। কথাটা তাহলে প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারাও শলাপরামর্শ করছে এ নিয়ে, প্রবীণ অতুল কামারের দিকে চেয়ে আছে তারা।

অতুলও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারের গুরুত্ব।

বলে ওঠে,—আজ্ঞে, এখনও ঠিক করিনি। আপনারা মা-বাপ—কিছু করবার আগে আপনাদিকে বলবো বই কি?

তারকরত্ন যেন খুব খুশি হয় না জবাবে। বলে ওঠে,—তা দেখ ভেবে-চিন্তে। তবে গাঁয়ে বাস করতে হবে তো! সে কথাটাও ভেবে দেখবি।

দাঁড়াল না তারকরত্ন। ওদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে গেল। পিছু পিছু চলছে দেড়ঠেঙ্গে ভটচায—আর দলবল, যেন ওদের শাসিয়ে গেল আজ পাড়া বয়ে এসে ওই তারকরত্নবাবু।

চুপ করে শালের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো অতুল কামার। মুখে চোখে একটা থমথমে জমাট অন্ধকার নেমে এসেছে।

এমোকালী বলে ওঠে,—ছাপ জবাব দিলা না কেনে কাকা যে মাল দিতে লারবো। বানি বাড়াতে হবেক।

অতুল জবাব দিল না। ওদের মুখের উপর জবাব দিতে পারেনি সে।

কালী গজ গজ করে,

—ভালমানুষী কাল নাই গো, ইবার জবাব দিতে হয় আমাদিকে পাঠাবা। শুনিয়ে দিয়ে আসবো ল্যায্য কথা।

অগ্নিগর্ভ হাপরের মত ফুলছে তেজী জোয়ান ছেলেটা। আংরার আগুনের গনগনে আভায় ওর মুখে ফুটে উঠেছে একটা দৃপ্ত আভাস।

ওদের বানি আর মাল জোগানোর ব্যাপারটা সবই দেখেছিল অশোক, শুনেছিলও। তারকরত্ন তাকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি। শুনেছিল, কানেও এসেছিল ওর সম্বন্ধে অনেক কথা। হঠাৎ অশোককে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে তারকরত্ন দাঁড়াল।

—তুমি!

সাইকেলটা হঠাৎ লিক হয়ে যেতে সাইকেলখানা ঠেলে অতুল কামারের ছেলের দোকানে নিয়ে আসছে অশোক। ব্যাপারটা দেখে সেও দাঁড়িয়েছিল। জবাব দেয়,

—সাইকেলটা বিগড়ে গেছে, তাই দিতে এলাম দোকানে।

—ও!

কেমন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে চেয়ে থাকে তারকরত্ন তার দিকে। সম্পর্কে তার ভাগ্নে হয় ওই অশোক।

ওর বাবা সীতাংশুবাবু তারকরত্নের কাকার জামাই। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। তারই ছেলে ওই অশোক।

কেমন যেন বরাত জোরেই অশোক ওই বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়ে তার সরিকান হয়েছে, তারকরত্নকে তার ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে।

সীতাংশুবাবু মস্ত সরকারী ইন্‌জিনিয়ার। দেশ-বিদেশে ঘোরেন, দেশেও বিরাট সম্পত্তি, অশোক এখানেই থাকে। যেন সীতাংশুবাবু ইচ্ছা করেই ওই একটি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এখানে। অশোক জিজ্ঞাসা করে,

—কি বলছিল ওরা?

তারকরত্ন কথা বলে না। ভাগ্নের দিকে চেয়ে থাকে। তারকবাবু হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—এর মাঝে নাই বা এলে অশোক?

অশোকের মুখে ফুটে ওঠে হাসির আভা।

তারকরত্নের চোখ এড়ায় না সেটা—ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওই যুবকটিও যেন আজ তাকে প্রকাশ্য পথে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করতে সাহস করছে!

কথা বলে তারকরত্ন।

—চল ভটচায!

ভটচায দেড়ঠ্যাং নিয়ে টিং টিং করে এগিয়ে চলে। তারও কেমন যেন এসব ভাল লাগছিল না।

অশোক সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলে অতুলের দোকানের দিকে।

মা-লক্ষ্মী অতুল কর্মকারের দিকে মুখ তুলে যে চায়নি তা ওর বাড়ি ঘর—কামার-শালা—আর ওকে দেখলেই বুঝা যায়। দিনান্ত পরিশ্রম করে লোকটার মুখে চোখে কালির দাগ পড়েছে—শরীরও নুয়ে এসেছে ওই হাতুড়ি ঠুকে, আর আগুনের গনগনে তাপে শরীরের মেদটুকু নিঃশেষে দড়ি পাকিয়ে গেছে। এত করেও মা লক্ষ্মীর কৃপা-কণা পায়নি সে।

কিন্তু মা যষ্ঠীর দরদে আর দানে উপছে পড়ছে অতুলের সংসার। অতুলের স্ত্রী রত্নগর্ভা। এক একটি করে সাতটি পুত্ররত্ন সে এই পুণ্য ধরিত্রীর বুকে এনেছে।

অতুল বলে,—মুয়ে আগুন। যতো সব শুয়োর পালের মত কিল্লিবিল্লি।

বৌ বলত,—বালা বাড়ে দারিদ্দি খণ্ডে। তবু তো ওজকার করবেক।

সেদিন অতুল হালে পানি পায়নি।

আজ যাহোক তারা বড় হয়েছে। শালে একমাত্র দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ওই এমোকালী ছাড়া আর বাইরের কেউ নেই। নিজের ছেলেরাই সব কাজ করে।

শুধু তাই-ই নয়, এক ছেলে কার্তিক ওদিকে সাইকেল-ডেলাইট-স্টোভ-টর্চ টুকিটাকি সারায়, বাসনপত্র রাং ঝালাই করে—এটা সেটার দোকানও দিয়েছে।

অন্ধকার পথ একটা হেসাকের আলোয় ঝকমক করছে! কার্তিক পুরুণের আগুরিদের হেসাকটা মেরামত করে জ্বেলে দেখছে। কেরোসিন তেল পোড়ার গন্ধ ওঠে। উজ্জ্বল আলোটা ওপাশের গাছগাছালির মাথা ভরিয়ে তুলেছে।

—কিরে কেতো, বিয়ে বাড়ি নাকি? এত আলো—লোকজন? দেখ, দিকি।

হাতের সাইকেলটা একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে এগিয়ে গেল অশোক। অতুলের তারকবাবুর সঙ্গে ওই আলোচনার পর কেমন মেজাজটা খিচড়ে গেছে। চুপচাপ বসেছিল সে।

কেতোকে আলোটা জ্বালতে দেখে মেজাজ আরও বিগড়ে যায়।

অশোকবাবু কেন, অনেক লোকজনই হঠাৎ আলো দেখে কৌতূহলী হয়েই নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

বুড়ো বলে ওঠে,—জানেন না ছুটবাবু—শালা কেতোর বাপের বিয়ে হছে যি।

কার্তিক কথার জবাব দিল না, চুপ করে থাকে।

অশোকই ওর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়। অনেকদিন থেকেই দেখছে বুড়োকে! বেশ ভদ্র—বিনয়ী। আরও পাঁচজনের কথা ভাবে লোকটা। আজ হঠাৎ ওর ধৈর্যচ্যুতির ব্যাপারে একটু বিস্মিত হয় অশোক।

পাশেই একটা গরুর গাড়ির চাকা ভাঙ্গা পড়েছিল, আরাগুলো ছেড়ে গেছে। মাঝখানের গোল টুকরোটা মোড়ার মত ব্যবহার করে ওরা, তাতেই চেপে বসে অশোক।

গ্রাম সুবাদে অশোক অতুল বুড়োকে মামা বলেই ডাকে। আগেই তারকরত্নের সঙ্গে ওদিকে দেখা হওয়ার পর থেকেই অনুমান করছিল অশোক একটা কিছু ঘটেছে।

অতুল কামার ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেতোর হেসাকের একফালি আলো পড়েছে ওর মুখে; সুন্দর যৌবনপুষ্ট দেহ। কেমন যেন এখানকার জমিদারনন্দন ছগণ্ডা চার আনা তিন কড়ার তরফের বাবুদের থেকে একটু পৃথক একটি যুবক।

তারকরত্নবাবুর সমানই সরিক, বরং বাবার দিক থেকেও অশোকের যা আছে, তা এর থেকেও বেশি। তবু কেমন যেন ওকে বিশ্বাস করা যায়।

চুপচাপ ওর দিকে চেয়ে থাকে অতুল।

খবরটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে কামারপাড়ার বিভিন্ন শালে; চোলাই ঘরের চালায়।

বড়বাবু নিজে শাসিয়ে গেছেন, নোতুন মহাজনকে মাল দিতে পাবে না। এমন কি এ কথাও বেশ জাহির করে বলে গেছেন—গ্রামে তাঁরই তাঁবে বাস করতে হয়, ভবিষ্যতেও হবে, এটা যেন কামারপাড়ার লোক ভুলে না যায়।

অনেক দিন থেকেই ওরা তারকরত্নের মজুরি ফাঁকি দেওয়া, বানি কমানো, খুঁটের ওজনে কারচুপি সবই দেখে আসছিল, আর গুমরে উঠছিল মনে মনে। কোন অন্যপথ ছিল না। কিছুদিন থেকে সদরের মস্ত ব্যবসায়ী কানাই চক্রবর্তী মশায় রাজি হয়েছেন তাদের মাল নিতে; দরকার হলে তিনিই খুঁট বাসনও দেবেন।

দাদনও। ওরা শুধু মাল তৈরি করে দেবে, মহাজনের লোক এসে সে মাল নিয়ে যাবে, হিসাব মিটিয়ে আবার দাদন দিয়ে যাবে দফায় দফায়।

সেই খবরটা জেনে ফেলেছে তারকরত্ন কোন রকমে। হাতছাড়া হয়ে যাবে এরা, তার লাভের ব্যবসা উঠে যাবে তাই রেগে উঠেছে তারকরত্ন।

সদরের কানাইবাবুর গদি-সরকার আজই এসে পড়েছে কামারপাড়ায়, রাত্রে আলোচনা হবে, ফিরবে কাল সকালে এদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলাতেই এই ব্যাপার, হাঁকাহাঁকি দেখে বুড়ো ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে যায়। জানে ওই সব লোক কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে। বনের ধারে গ্রাম, তারপর থেকেই বনের সীমানা শুরু, বড় রাস্তাও দূরে—কোন রকমে নজর এড়িয়ে যদি পালানো যায় তাই ভাবছে সরকার মশায়। এখানে এসে বিপদেই পড়েছে সে!

বের হতে যাবে, বাধা দেয় অতুল কামারের বড় ছেলে।

—আজ্ঞে যাবেন নাই সরকার মশায়।

—কেন! চমকে ওঠে বৃদ্ধ লোকটা। অজানা-অচেনা জায়গা, ভয়ে কেমন কাঠ হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে।

অতুলের বড় ছেলে বলে ওঠে,—এ সময় না বেরুনোই ভালো, কথাটা পাঁচকান হয়ে গেছে যে আপনি এসেছেন।

অতুলও তাতেই সায় দেয়।

—আঁধারে যাবেন না সরকার মশায়। ওসব লোককে বিশ্বাস নাই। রাতটা থেকে যান। কাল সকালি পৌঁছে দিয়ে আসবো আমরা।

বুড়ো ভীত কণ্ঠে বলে,—আমি তো নিমিত্তমাত্র বাবা! আমার উপর ওনাদের এ আক্রোশ কেন?

জবাব দেয় না ভুবন। কালী বলে ওঠে,

—আজ্ঞে তা আর বোঝে কে বলেন। থেকে যান রাতটা—কুন ভয় নাই।

বিবর্ণমুখে লোকটা শালেই আটকে থাকে।

রাত হয়ে আসছে—কেত্তোর জ্বালানো হেসাকটা নিভে গেছে একটু আগেই বিনা নোটিশে। আবার আঁধার নেমে আসে সরু মাটির পথটায়, গাছ-গাছালির মাথায়। একটা মাত্র হ্যারিকেনের ম্লান আলোটাকে কেমন যেন একক অসহায় বলে মনে হয়। কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখি।

একফালি আলোয় জমায়েত কামারপাড়ার লোকেদের কেমন যেন আদিম অন্ধকারে পথহারা একদল ছিন্নবাস ক্লান্ত-পথিক বলে মনে হয়।

চুপ করে বসে ভাবছে অশোক। এত গভীরভাবে ওদের সুখ-দুঃখের কথা আগে কোন দিনই যেন শোনেনি; ওরাও জানায় নি। দূর থেকে পথের উপরই ছোটবাবুকে গড় করেছে তারা।

—কি করবে ভেবেছ তোমরা?

অশোকই তাদের জিজ্ঞাসা করে। কেউই জবাব দেয় না। এমোকালী ওর দিকে চেয়ে থাকে। জবাব দেয় অতুল কামারই।

—ঠিক কিছু করিনি ছুটবাবু। জানেন তো দায়ের ওপর কুমড়ো পড়লেও কুমড়োর বিনেশ, আর কুমড়োর ওপর দা পড়লে তো কথাই নাই। একবার কথাটা যখন রটেছে তখন বড়বাবু কি ছেড়ে কথা কইবে? তাই ভাবছিলাম—

জবাবটা সে নিজেও যেন দিতে পারছে না। মাথা চুলকাতে থাকে অতুল।

এমোকালী প্রশ্ন করে,—আপনি কি বলেন?

অশোক ওর দিকে চাইল। ওরা সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করে। অশোক একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়,

—হ্যাঁ না কিছুই এখুনি এখুনি বলা যায় না কালী, সবদিক ভেবে দেখতে হবে। তবে চিরকাল ঠকেই যাবে এটা কাজের কথা নয়। এর প্রতিবাদ করা দরকার, তার জন্য দরকার হলে আঘাত সইতে হবে।

অতুলও তাই ভাবছিল। ছোটবাবুর কথায় যেন একটু আন্তরিকতার সুর খুঁজে পায়। ওরা কি ভাবছে।

—বোম ভোলানাথ!

হঠাৎ অন্ধকার পথটা কার হাঁকডাকে সরবরম হয়ে ওঠে। ওরা থেকে গেল। লোকগুলোর মুখের কথা, ভাব সবই বদলে যায়।

এগিয়ে আসে মূর্তিটা। লম্বা লিকলিকে বেতের মত পাকানো শক্ত চেহারা, চোখ জ্বল-জ্বল করছে। দ্রব্যগুণে ঈষৎ লাল। গলাটাও ফাটা বাঁশের মত।

হাঁক পেড়ে আসছে গোকুল লায়েক।

—কিরে বাবা, পাতাল-ফোঁড় শিব উঠেছে তুদের পাড়ায় শুনলাম। তা কই পেসাদ-টেসাদ কই? আন দিকি—

লোকগুলো জবাব দেয় না। গোকুল সোজা এসে শালঘরের বারান্দায় উঠতে যাবে—সামনেই আবছা আলোয় অশোককে ওই কাঠের চাকা ভাঙ্গার উপর বসে থাকতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। রীতিমত অবাক হয়েছে সে।

—আপনি দাদা!

স্তব্ধ বিস্মিত আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলো ওকে দেখে আরও ঘাবড়ে গেছে। গোকুলের দুটো চোখ যেন আঁধারে জ্বলছে, শিকারী বিড়ালের মত শালঘরের একোণে ওকোণে এদিকে সেদিকে কাকে যেন খুঁজছে।

ঘরের মধ্যে সদরের সরকার মশাই দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। ওই লোকটাকে এক নজর দেখেই ভয় পেয়ে গেছে সে – আর গলাটাও ওর তেমনি কর্কশ, বাঁশফাটা আওয়াজের মত। রক্ত শুকিয়ে আসে। ভয় পেয়েছে কামারপাড়ার ওরা ওকে এই সময়ে দেখে।

গ্রামের মধ্যে অকাজ-কুকাজে ওর জুড়ি আর নাই। যেমনি ধূর্ত, তেমনি শয়তান আর অকহতব্য নিষ্ঠুর ওই গোকুল। পুলিশের খাতায়ও নাম আছে – দাগী আসামী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বিশেষ কিছু সাজা তার হয়নি, আইনের কোন না কোন ফাঁক দিয়ে বার বার ওই উটরূপী মহাত্মা সূচের ফাঁক গলিয়ে এহেন স্বর্গরাজ্যে ফিরে এসেছে, আসন কায়েম করে রেখেছে।

আজও এই সময় তারকরত্নের ওই বিশেষ অনুচরটিকে শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ মেলে আসতে দেখে তারাও ভয় পেয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী অতিথি ওই সরকার মশায়ের জন্যই তারা চিন্তিত। অশোককে দেখে দাঁড়িয়েছে গোকুল।

ওকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই, অশোকও নেমে আসে।

—চল গোকুল! একটু এগিয়ে দেবে ওপাড়ায়। সাইকেলটা লিক হয়ে গেল।

গোকুল যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

বলে,—এাই কেতো হারামজাদা, একটা লিক সারাতে লাগে কতক্ষণ র‍্যা?

— দোকান বন্ধ করে দিইছি দাদা। কাল সকালেই সেরে দোব।

গোকুল গর্জন করে,—আভি বানাও।

গোকুল চেপে বসে। ওর এখান থেকে নড়তে যেন ইচ্ছে নেই। অশোকও বুঝতে পারে ওকে কৌশলে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। অশোক নেমে যায়। একটু কঠিন স্বরেই বলে,— কাল সকালেই ও দেবে। চল গোকুল।

গোকুল পা পা করে এগিয়ে যায় অগত্যা। যাবার সময় তবু পিছু ফিরে ওদের দিকে চাইতে ছাড়ে না। অতুল কামারের দিকেই একবার চেয়ে গেল। যেন নীরব চাহনিতে শাসাচ্ছে ওই বৃত্তটা—আবার আসবে দরকার হলে।

কথা কইল না অতুল।

গর্জন করছে এমোকালী।

– শালের হাতুড়ি দিয়ে কোন দিন বাসন-পেটা করে দেব শালা মড়ুইপোড়া বামুনকে। কুমোরের ঠুকঠাক—কামারের এক ঘা। শয়তানি বার করে দোব।

—চুপ কর কেলে।

ভুবন ওকে থামাবার চেষ্টা করে। কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে আসে ওদের মধ্যে। রাত নামে। অন্ধকার তমসা ঢাকা রাত্রি।

অতুল বলে ওঠে,—সরকার মশাইকে বাড়িতে নিয়ে যা ভুবন।

সরকার মশাই বের হয়ে আসে শালের ঘর থেকে। এরই মধ্যে বয়স্ক লোকটা যেন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। টের পেয়েছে এদের বিরুদ্ধশক্তির, ওরা সত্যিই শক্তিমান। এদের চেয়ে অনেক ধূর্ত ও কৌশলী তারা।

তারকবাবু নিজে দেখে গিয়েও চর পাঠিয়েছে। শুধু চর নয়, কুখ্যাত একটি মানুষকে, তা সম্বন্ধে আরও তল্লাস নিতে। দরকার হয় সব ব্যবস্থাও করতে পারে সে।

অতুল বলে ওঠে,—ভুবন! একটু সজাগ থাকবি সবাই।

এমোকালী বলে ওঠে,—আম্মোও আজ ইখানেই থাকবো মামা।

বলিষ্ঠ তেজী জোয়ান, ও থাকলে সকলেই যেন সাহস পায়। এমো বলে ওঠে,

—তোরা পথে এদিক-ওদিকে নজর রাখিস। শ্যালা অন্য কিছু যেন না করে।

ওদের ভয় একটাই। কাছাকাছি আসতে সাহস করবে না, চড়াও হতে পারবে না গোকুল অন্ততঃ আজ গোকুলও টের পেয়েছে—সামনাসামনি কিছু হবে না। যদি রাতের অন্ধকারে গ ঢাকা দিয়ে এসে চরম আঘাত হানে, সেইটাই ভয়।

সারা কামারপাড়ার তাই ভয়।

ছোট খানিকটা জায়গা, মাঝখান দিয়ে কয়েকটা সরু পথ, বাড়িরই উপর বাড়ি—ঘিঞ্জি একটার পর একটা খড়ো বাড়ি, চালে চালে ঠেকাঠেকি। খড়ের চাল—রোদে শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। মাটিসই নোয়ানো খড়ের ছাউনি, কোন রকমে একবার একটা দিশলাই কাঠি ঠেকাতে পারলে আর রক্ষা নেই।

এদিক থেকে-ওদিক অবধি ধারাল জিবে সাপটে সব নিয়ে নেবে। ইতিপূর্বে সেই সর্বনাশ ঘটেওছে কামারদের জীবনে। তাই ওটাকেই তারা বেশি ভয় করে।

আজ যেন তারাও একটা সংহত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে নিজেদের মধ্যে। মনে অতলে যা দুর্বার জ্বালা এতদিন অসহায় বিক্ষোভেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা কঠিন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

আকাশের বুকে একটা তারা দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে।

কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখি।

হু হু হাওয়া বইছে—শীতরাতের হিমসিক্ত হাওয়া।

কোথায় বনধারে ডাকছে দু একটা শিয়াল—কেমন বন্য আদিম সুরে।

গোকুল আর অশোক চলেছে।

গ্রাম নিশুতি। শীতের রাতে দরজা কপাট বন্ধ করে ইতিমধ্যে অনেকেই নিদ্রার আশ্রয় নিয়েছে, বাবুপাড়াটা গ্রামের অন্যান্য বসত থেকে একটু দূরে, যেন ঘৃণায় ওই পাড়ার অধিবাসীরা ইতিজাতের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তফাতেই রয়ে গেছে।

তার মাঝখানে তারকবাবুদের দিঘি একটা, তার পাড় দিয়ে কাঁকুরে এতটুকু পথ। তারার আলোয় ওরা দুজন চলেছে।

গোকুল মনে মনে কি ভাবছে।

তারকবাবুরই পোষ্য সে। তার সব ভার নিয়েছে তারকবাবুই। অশোককে শুধু মুখের খাতির করে মাত্র, ছেলেটা যেন গোঁয়ার কাঠখোট্টা—তাই খাতির নয়, ভয়ই করে তাকে গোকুল।

তারকবাবু নিজে কামারপাড়া থেকে ফিরে এসেই গোকুলকে পাঠিয়েছিল ওখানে। কিন্তু সব কেমন ভেস্তে গেল।

আজ যেন হেরে গেছে গোকুল ওই অশোকের কাছে।

হঠাৎ দাঁড়াল গোকুল।

অশোকও যেন তৈরি ছিল। সরু পথটা আটকে দাঁড়িয়েছে। গোকুল বলে ওঠে,

—পথ ছাড়ুন ছুটবাবু।

—কেন?

ছটফট করছে গোকুল। জবাব দেয়,

—একবার যেতে হবে।

—না। চল।

অশোক গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা। আঁধারে চোখ দুটো জ্বলছে কি এক শ্বাপদ লালসায়। বলে ওঠে অশোক পরিষ্কার কণ্ঠে,

—ওদের সঙ্গে পারবি?

ব্যাপারটা সবই ধরা পড়ে গেছে অশোকের কাছে।

যার এক কান কাটা সে ঢেকে ঢুকে পথের একপাশ দিয়ে যায়, আর দুকানই যার কাটা, সে যায় পথেব মধ্যে দিয়ে মাথা উঁচু করে! এতক্ষণে গোকুল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। হাসছে সে। নীরব শ্বাপদ হাসি, তারার আলোয় উপচে ওঠে তার দুচোখ। গোকুল যেন ওব কথার জবাব দিয়ে গেল ওই হাসির মধ্যে।

আঁধারে মিশিয়ে গেল লোকটা চকিতের মধ্যে নিঃশব্দ পায়ে। আর গোকুলকে দেখা যায় না।

একাই দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে, —পাশেই তারকরত্নবাবুর দেউড়িতে আলো জ্বলছে। দোতলার জীবনের ঘর থেকে রেডিওব সুর শোনা যায়।

কিছুদিন হ'ল জীবন একটা রেডিও কিনেছে, তাই বাজছে। কেমন একটা মাদকতা-আনা আধুনিক চাঁদফুলের সংমিশ্রণের গান, তেমনি তার সুর।

ওই অন্ধকার ঢাকা বন—ওই নিদ্রা মগ্ন দরিদ্র পল্লীর জীবনের সঙ্গে এর কোনখানেই কোন মিল নেই।

ঠিক জীবন, তাবকবাবুর মতই ওরা বিভিন্ন শ্রেণীর, পৃথক; একটা আলো এগিয়ে আসতে দেখে অশোক দাঁড়াল ঝুপসি তেঁতুলতলায়।

হিমভবা কুয়াশা ঢাকা রাত্রি। অশোক বলে ওঠে,

—বাহাদুর!

বাহাদুর আলো হাতে তাকে খুঁজতে চলেছিল, মুনিবকে দেখে দাঁড়াল।

—চল, ফিরে চল।

—জী। এত্না রাত হোগিয়া!

কথা কইল না অশোক, কি যেন ভাবছে।

হঠাৎ দেখে ঝোপের পাশে জ্বলন্ত দুটো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা শিয়াল। আলো জ্বলছে ওর দুটো চোখ।

গোকুলের কথা মনে পড়ে, ওর চোখ দুটোও যেন অমনি জ্বলছিল।

অন্ধকারে চলেছে গোকুল গ্রামের প্রান্তে লাল কপিশডাঙ্গা পার হয়ে বনের দিকে। কাঁকু ডাঙ্গা, মাঝে মাঝে বন খেজুর আর আটাড়ি লতার ঝোপ ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে উঠেছে, হে হোথা দাঁড়িয়ে আছে দুএকটা নির্জন সাথীহীন কেঁদগাছ—কালো পাতায় জমেছে রাতের অন্ধকা কোথায় তিতির পাখির ডাক শোনা যায়। কোয়েল আর বনতিতির ডাকছে।

গোকুল এগিয়ে চলেছে, ক্রমশঃ সমতল ছেড়ে একটা বনগড়ানী খুলের ভিতর নামলে দুদিকে উঁচু ডাঙ্গা, ক্রমশঃ আরও উঁচু হয়ে উঠেছে।

সরু খাদটা এগিয়ে চলেছে গভীবতর হয়ে বনের অন্তর প্রদেশের দিকে। খাদের দুপাশে গায়ে জন্মেছে সর আর বিন্নাঘাসের ঘনজঙ্গল, কোথাও মাথার উপর আকাশ দেখা যায় না- মহুয়া কেঁদগাছের নীচে দিয়ে চলে গেছে—ওদের ঘন পত্রাবরণে আকাশটুকুও হারিয়ে গেছে

বনের বৃষ্টির জল নেমে ওর প্রসার বেড়ে গেছে, পায়ের নীচে মসমস করে ভিজে বা কাঁকর—কোথাও জল ঝরণা ঝরছে ঝির-ঝিরিয়ে। গোকুল এবার থামলো।

একটা শিয়াল ডাকছে।

অন্ধকার বনের গাছ-পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরছে রাতের জমাট কুয়াশা—ক্রমশঃ উত্তর আ খুলের ভিতর থেকে। একটা শব্দ ওঠে বনে বনে।

—কু—উ—উ!

গোকুল চলেছে।

গোকুল এপথে কি করে এল কে জানে। নিজেও জানে না সে। এপথে যারা আসে তার প্রথমে বোধহয় টের পায় না। চলতে চলতে হঠাৎ একদিন আনমনে আবিষ্কার করে কেমন সে অনেক দূরে এসে গেছে, আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে গেছে এই জীবনের জালে—যা কাটিয়ে আ বেরুবার উপায় নেই। কেউ সহজে বাধ্য হয়েই মেনে নেয় এর পরিবেশ, কেউ বা মুক্তি চেষ্টায় আরও হাঁকপাঁক করে—মুক্তির পথ আর মেলে না।

জড়িয়ে যায় আরও নিবিড়ভাবে।

গোকুল অবশ্য দ্বিতীয় দলের নয়, সে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে এটাকে।

বাবা বসন্ত নায়েক ছিল গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ—সতীশ ভটচায-এর মতই। কিন্তু সতী যেমন নানা প্রকারে জড়িয়ে থাকে—বসন্ত তেমন ছিল না। নির্বিরোধী নিরীহ গোবেচারা লোক

সামান্য যজমান যাজক নিয়েই থাকতো—আর দেব-সেবার বাঁধি বন্দোবস্ত ছিল বেনেদে শিবমঠে, দত্তদের মায়ের মন্দিরে—আরও দুচার জায়গায়। সকাল থেকে পুজো আশ্রা সে কোন রকমে যা পেতো তাই দিয়েই চলতো। গোকুলকে স্কুলে পাঠিয়েছিল—যদি ছেলে মানুষ হয়।

কিন্তু গোকুলের এসব ভালো লাগতো না।

হাটতলায় ঈশ্বর ডোম বসতো ঝাপ্তির ছক নিয়ে। কেমন ছবি আঁকা ছটা ঘর, আর ওর হাতে একটা কালো চামড়ার কালো কৌটায় কয়েকটা ঘুঁটি।

এঘরে ওঘরে দান আড়ো—সিকি আধুলি টাকা—ঈশ্বরের ঘুঁটি কেমন চকিতের মধ্যে উল্টে পড়েছে।

সকলেই অবাক। কোন ঘরেই দান ওঠেনি—উঠেছে যে ঘরে সেখানে কেউই আড়েনি কোন বাজি। মুঠো করে কুড়িয়ে নেয় ঈশ্বর রূপোর টাকা আধুলি সিকিগুলো। গোকুল অবাক হতো।

পয়সা এত সহজে এইটুকুর মধ্যে পাওয়া যায়! এতগুলো টাকা কুড়িয়ে আঁচলে বেঁধে লোকটা ছক নিয়ে উঠে যেত।

চুপ করে চেয়ে দেখত গোকুল—ও যেন জাদু জানে!

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে বাবা দিনান্ত পরিশ্রম করেও দ'বেলা খাবার জোটাতে পারে না।

ভাত—তাও গিলতে কেমন কষ্ট হয়। আতপচালের পিণ্ড—তার সঙ্গে কচু, না হয় এর ওর বাড়ি থেকে সংগৃহীত সিদে বাবদ কাঁচকলা, বেগুন, আলু দু-একটা।

মনে মনে চটে উঠতো গোকুল, এর বেশি কেন সে পাবে না?

তাও অচল হয়ে উঠলো—বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর থেকে। সবে পিতা গত হয়েছে—মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে বাপের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে গোকুল যেন অকূলে পড়ে।

মা, ছোট ভাই-বোনেদের কি-ই বা খাওয়াবে—বাবা যে শতছিদ্র সংসারের মাথায় কত বড় ছাতা ধরেছিল তা এতদিন টের পায়নি, এইবার পেয়েছে। যজমানরাও এই বিপদে এগিয়ে আসে।

মধু দত্তর বেলেতোড়ে বড় রাখি কারবার। বাড়িতেও দেবসেবা বিগ্রহ আছে। সে বলে,—পুজোটা একটু শিখে নাও গোকুল—আমার বাড়িতেও তো বাঁধা পুরোহিত লাগে।

ইতিমধ্যে গোকুল কোন রকমে লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠীপুজো করতে শিখেছে। সকালেই হি হি তে স্নান করে চাদর গায়ে গ্রামের এমাঠ থেকে ওমাঠের বাথানে পুরোনো শিবমন্দির—এদিক কে কাদের ভিটে পুরীতে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরে সঙ্গীহীন শিবঠাকুরের মাথায় তফাৎ কই ফুল বেলপাতা, দুকণা আতপ চাল ছিটিয়ে বেড়ায়।

তাতেও দুবেলা ভরপেটা আহার জোটে না। সতীশ ভটচাযের কাছেও গিয়েছিল গোকুল। অনুনয় করেই বলেছিল,

—কাকা, দেবপুজো—বিগ্রহ-সেবা, শ্রাদ্ধ-শান্তিটা একটু যদি দেখিয়ে দেন, কাজে লাগি।

সতীশ ভটচায এতদিন যেন মনে মনে এই চেয়েছিল, একবার বসন্ত লায়েক যেতে যা তারপর এ গ্রামে সেই-ই হবে একচ্ছত্র অধিপতি। সব ঘর আসবে তার তাঁবে।

এসেছেও! গোকুলকে আসতে দেখে সতীশ অনামনস্ক ভাবে জবাব দেয়,

—এ সংযমের কাজ বাবা! কুলপুরোহিত মানে তার বংশের মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব সব তোমার হাতে। গুরুদায়িত্ব। এ বয়সে কি তা শোভা পায়! একটু বড় হও। তখন সব শিখিয়ে দিয়ে যাবো।

গোকুল ক্ষুণ্নমনে বের হয়ে আসে।

শীর্ণ বিটলে লোকটা তখনও বিরামহীন গতিতে হুঁকো টানছে দাওয়ায় বসে। মনে হয় হাতের ওই হুঁকোটাই কেড়ে নিয়ে ওর টাক পড়া মাথায় ঠুকে চুর করে দিয়ে আসবে গোকুল।

ও কোন সাহায্যই করেনি।

হঠাৎ একদিন যেন কাজটা করে বসে গোকুল। না করে উপায়ও ছিল না।

মায়ের একজ্বরী ভাব—এক নাগাড়ে বাইশদিন চলেছে। ওষুধও জোটেনি, পথ্য বলতে এক-আধটু সাবু আর মিছরির জল। তাও জোটাতে পারেনা।

বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে মা।

সবদিক চেষ্টা করেও পারে না গোকুল কোন কিছু ব্যবস্থা করতে।

হঠাৎ যেন সেদিন পথ পেয়ে যায় গোকুল। সব জুটবে, মায়ের ওষুধ পথ্যি—সবকিছু। গোকুল ও লোভ সামলাতে পারেনি।

দত্তদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো করতে গেছে।

বৌরা এদিক ওদিকে কাজে ব্যস্ত—গিন্নীও কোথায় গেছে পুজোর ফুল আনতে, হঠাৎ কুলুঙ্গিতে রাখা একছড়া হারের দিকে চোখ পড়ে। বৌরা কেউ তাড়াতাড়িতে খুলে রেখেছে, তারপর আর খেয়াল নেই। এই সুযোগ!

হাত-পা কাঁপছে গোকুলের!

মায়ের মুখখানা মনে পড়ে, দুদিন ধরে বাড়িতে ছোট ভাই-বোনগুলোও একবেলা খেয়ে রয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীরাও কেউ দেবে না এক কণা চাল।

রোজকারের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে সতীশ ভটচায।

কেমন যেন হয়ে যায় সে। চোখ বুজেই তুলে নিল সেটা।

কোমরের কাছে দলামোচা পাকানো গোটা হারটা একটা জ্বালাময় অনুভূতি আনে সারা-অঙ্গে। পুজোয় মন বসে না।

বুড়ীগিন্নী ওর দিকে চেয়ে থাকে। দরদভরা কণ্ঠে বলে,

—মায়ের শরীর ভাল নাই?

কথার জবাব দিল না গোকুল, দিতে পারে না। মাথা নাড়ে।

—আহা!

বুড়ীর কণ্ঠে দরদ দেখা যায়।

কোন রকমে বের হয়ে আসে গোকুল। মনে হয় দুপাশের সবাই যেন ওর দিকে চেয়ে আছে, তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে। হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরছে সে।

—গোকুল নাকি! অ গোকুল।

ছানু ডাকছে। কদিন তেলমশলার দাম বাকি পড়েছে তাদের দোকানে। গোকুলের দাঁড়াতে মন চায় না।

সরেই আসতে চায় সে। তখনও কোমরে রয়েছে সেই হার ছড়াটা। সর্বাঙ্গ যেন জ্বালা করছে।
ছানুও ছাড়বার পাত্র নয়, লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে ন ওঠে.

—বলি কথা কানে যেছে না যে? নিয়ে থুয়ে এখন আর যে চিনতেই পারো না ঠাকুর?

রোদে তেতে পুড়ে ফিরছে গোকুল, মাঝপথে ছানুকে এগিয়ে আসতে দেখে কেমন যেন থায় রক্ত উঠে যায়।

গর্জে ওঠে গোকুল,—গায়ে হাত দিবি না।

ছানু জবাব দেয়,

—আজ্ঞে না, গলায় গামছা দিয়ে শুধু টাকাটা আদায় করবো। বামুনের গায়ে হাত দিতে রি! হেঁই বাবা! পাপে ডুবে যাবো যে গো!

গোকুলের মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

—খবরদার! বৈকালেই তোর টাকা পাবি।

—হ্যাঁ। কথার যেন নড়চড় না হয় ঠাকুর।

গোকুল বৈকালেই নগদ সাত টাকা ওর নাকের উপর ফেলে দিয়ে আসে। পানু দাস একটু াক হয়। বিনীত কণ্ঠে বলে,

—সবই জমা করে লেবো, হ্যাঁ গো দাদা?

—হ্যাঁ।

ছানু দাস পাল্লা ধরে কাকে খোল ওজন করে দিচ্ছিল। একবার চাইল মাত্র। গোকুলের বড় চোখ দুটো জ্বলছে কি এক অসহ্য জ্বালায়। চুপচাপ উঠে বের হয়ে এল সে।

পরদিনই ব্যাপারটা অনেকে জানতে পারে। গোকুলও।

তবু কেমন যেন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার। সবাই খবরটা জেনেছে অথচ মুখফুটে কিছু লতে পারে না। ওদের বাড়ি পুজো করতে যেতেই দত্তগিন্নী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে বলে ওঠে,

—অপরাধ নিও না বাবা, কর্তা সতীশ ভটচাযকে দিয়েই কাজকর্ম করাতে চান।

গোকুল কথার জবাব দিল না।

ওরা জেনে ফেলেছে, ছানু দাসের দোকানে কালই যে বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে াকুল, সে খবরও পেয়েছে ওরা।

তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে ওরা এইখানেই চাপা দিয়ে সাবধান হয়ে গেল।

চুপচাপ বেরিয়ে আসছে গোকুল। বারান্দার এদিক ওদিকে ফিস্‌ফাস্ কথার শব্দ, মেয়েদের ৗতূহলী দৃষ্টি অন্তরাল থেকে এসে যেন গায়ে তীরের ফলার মত বিঁধছে।

এতদিন ওরা সামনে এসে বসেছে, পুজোর মন্তর শুনেছে, শান্তি জলও নিয়েছে পুণ্য মনায়, একদিনের একটা কাজের মধ্যেই সেই দৃঢ় বিশ্বাস ওদের ভেঙ্গে গেল।

বের হয়ে এল অসহায় গোকুল। আজ সে বিতাড়িত।

বেলা হয়ে গেছে। সোনা রোদ গেরুয়া হয়ে উঠেছে। ধূ ধূ কাঁপছে তীব্র রোদ গৈরিক প্রান্তরে। জনহীন পথ দিয়ে আসছে গোকুল।

তখনও কানে ভাসছে দত্তগিন্নীর কথাগুলো। এড়িয়ে গেল তাকে, বৌঝিরাও যেন আড়াল থেকে মন্তব্য করে, আজ ঘৃণা করে তাকে—নোতুন এই গোকুলকে।

—শোন।

কোন্ বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা যাচ্ছিল, একলা পথে ওকে দেখে একটু চমকে ওঠে মেয়েটা।

কেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর সুন্দর মুখ।

গলায় চিকচিক করছে সরু একটা হার—কানে দুল—হাতে দুটো ছোট্ট বালা।

মেয়েটা চকিতের মধ্যে দৌড় মারে, কে যেন ছিনিয়ে নেবে ওর গহনাপত্র।

হাসছিল গোকুল ওর পালানো দেখে—হঠাৎ কেমন হাসি থেমে যায়। ছোট মেয়েটাও তার এই কীর্তির কথা জেনেছে!

পালালো মেয়েটা!

ছোট্ট মেয়েটার চোখে মুখেও কেমন একটা নিবিড় ঘৃণা আর আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে! তাকে সবাই ঘৃণা করে—ভয় করে। ওই দত্ত বাড়ির গিন্নী-বৌ-ঝিরা সবাই—ওই সাধারণ ছোট্ট মেয়েটা অবধি। আজ যেন মানুষের সমাজের বাইরের জীব সে, ঘৃণার বস্তু, আতঙ্কের বস্তু।

থমকে দাঁড়াল গোকুল।

হাতে তখনও রয়েছে পিতলের ছোট্ট রেকাবিতে চাট্টি আতপ চাল—বেলপাতা। পুজোর উপচার! সেগুলো নিমেষের মধ্যে টান মেরে ফেলে দিল—পড়লো পুকুরের জলে।

ভারমুক্ত হল যেন সে—হন হন করে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ হাসির শব্দে চমকে ওঠে।

বিজাতীয় কণ্ঠের হাসির শব্দটা নির্জন ছায়াঘন পুকুরপাড় ভরিয়ে তোলে। ঈশ্বর ডোম হাসছে ঠা ঠা করে।

জুয়াড়ী ঈশ্বর দূর থেকে দাঁড়িয়েই সব ঘটনাটাই দেখেছে। সব শুনেছিল সে। ওর ওই একটা দোষ।

হাসছে বুড়ো। শণ নুড়ির মত পাকা চুল, কিন্তু শরীর এখনও সতেজ, পেটা গড়ন। বয়সের ছাপ তাতে এতটুকুও পড়েনি। দাঁতগুলো দু-একটা খসে পড়েছে অকালে—পুলিশের শাসনের চিহ্ন লেগে আছে ওইখানেই। দেহে আর কোথাও কোন শাসনের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি, মনেও নয়। জিজ্ঞাসা করে ঈশ্বর,

—কি হল ঠাকুর?

জবাব দিল না গোকুল। তেজী জোয়ান দুর্মদ ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে কর্কশ বন্ধুর প্রান্তরের শেষে উঁচু পুকুরের পাড়ের উপর। যতদূর নজর যায় কোথাও কোন ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই, জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে মাঠ—তাম্রাভ প্রান্তর। চাওয়া যায় না। দামোদরের হাজারো বিসর্পিল রেখায় নেচে চলেছে মহাদেবের ধ্বংসদূতের দল।

স্তরে স্তরে ক্রম-উচ্চ শালবনসীমা গিয়ে আকাশে মিশেছে। অসীম শূন্য জ্বালা-ভরা পৃথিবীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে গোকুল। হাসছে ঈশ্বর ডোম। বলে ওঠে,

—সব ফক্কিবাজি ঠাকুর! দুনিয়ার সব ফক্কিবাজি।

কথা বলে না গোকুল, ক্লান্ত পরাজিত অপমানিত গোকুল বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দুপুরের রোদে দু-একটা পাখি কর্কশস্বরে ডাকছে। জলভরা ডোবায় পড়ে আছে রোঁয়াওঠা গুলো—রোদের জ্বালা সইবার ক্ষমতা তাদের নেই, তাই কাদায় পড়ে আছে।

একটা কান্নার সুর ওঠে। বোনটা কাঁদছে।

জীর্ণ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল গোকুল।

মা তার পাপের রোজকার খায়নি—এতদিন রোগভোগ করে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় গেল সে।

তখনও গোকুলের কাছায় বাঁধা রয়েছে চোরাই হার বিক্রি করার বাকি তেত্রিশ টাকা, যেন ঠিন অস্তিত্বের মত জানান দিচ্ছে। পায়ে পায়ে বাড়ি ঢুকলো, শূন্য ধ্বসে-পড়া একটা ধ্বংসস্তূপে ঢলো অর্ধমৃত একটি মানুষ।

রাত হয়ে গেছে।

তারাজ্বালা রাত। বনের বুকে সন্‌সন্‌ বাতাস বইছে। সেই শীতের হিমবাতাসে ভেসে আসে রানো অতীতের কথাগুলো গোকুলের সারা মনে।

সেই গোকুল লায়েক আজ কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শীত শীত করছে।

অন্ধকার খুলের ভিতর রাতের বন্দী বাতাস জলকণাসিক্ত হয়ে শরীরের হাড় অবধি কাঁপিয়ে বলে।

গোকুল বিড়ি ধরাল একটা। সামনেই কাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে,

—কে?

হঠাৎ হাতের আগুনটা দপ্‌ করে নিভিয়ে দেয় গোকুল।

—আমি গো লায়েকমশোয়। আমি পেতো।

গম্ভীর কণ্ঠে গোকুল যেন দলের আর সকলের কৈফিয়ৎ তলব করছে।

—সে সম্বুন্ধীরা কোথায়?

—সব্বাই আসবে বলেছে, তাইতো এইরো আম্মোও এলাম।

গর্জে ওঠে গোকুল,—চুপ মেরে থাক শালা ভীম কোথাকার।

একটা পাথরের পর বসে গোকুল চুপচাপ বিড়ি টানতে থাকে। অধীর আগ্রহে আরও কাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে সে।

সব কেমন প্রথম থেকেই গোলমাল হয়ে গেছে। সব ভেস্তে দিয়েছে ওই অশোকবাবুই। যেন টের পেয়ে গেছে ওর মনের ভাব।

নিজেই খবর নিতে গিয়ে একটু বেকুবি করেছে আজ গোকুল।

হঠাৎ গোবরাকে আসতে দেখে আশা ভরে চাইল গোকুল। কামারপাড়ার গোবর্ধন কামার

তার অন্যতম সাগরেদ। শুধু সাগরেদই নয়, দলের মধ্যে ওর বিশেষ একটা কাজ আছে যা আর কেউ পারে না। যে কোন রকম তালাই হোক না কেন গোবরার হাতের ছোঁয়ায় তা যেন খুলে পড়ে। তালা যদি তেমন বেগড়বাই করে, দরজার সুড়শো শেকল উপড়ে ফেলতে তার মোটেই সময় লাগে না। তাছাড়া আজকের ব্যাপারে গোবরাকে তার বিশেষ দরকার।

তবু কণ্ঠস্বর কঠিন করে বলে ওঠে গোকুল,

—এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—খপর সপর সব লিতে হবে তো!

—পেয়েছিস? চিনে রেখেছিস লোকটাকে? সেই শালা সরকার ব্যাটাকে?

গোকুলের দুচোখ জ্বলছে। তারকরত্নবাবুর বিশেষ কাজ এটা,—এমন ওষুধ তাকে দিতে হবে এরপর যেন কোন মহাজন কারবারী এদিকে না ভেড়ে।

গোকুল অভয় দিয়েছিল তাকে,—নিশ্চিন্ত থাকুন বড়বাবু, তিনি মহাজন তো আমরাই ব কমতি নাকি। মহাযম।

চুপচাপ বাড়ির সামনের বাগানমত একটু ঠাঁই-এ পায়চারি করছে অশোক। রাত কত জানে না।

আকাশের বুকে হাজারো তারার রোশনী, শালবন সীমার উপর দিয়ে তারার আভাল ছায়াপথ উর্দ্ধাকাশ থেকে নেমে গেছে ওদিকে।

তারকবাবুর বাড়ির আলো নিভে গেছে। সুপ্তিমগ্ন সারা গ্রাম। কেন জানে না অশোকের ঘুম আসেনি।

কেমন একটা উত্তেজনায় মাথাটা দপ্ দপ্ করছে।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাদের আসতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি ক'টা।

—কে?

—আমরা—ছুটবাবু!

সামনে এসে দাঁড়াল অতুল কামার, পিছনে আরও ক'জন। কে একজন নোতুন লোক সঙ্গে রয়েছে, ভয়ে কাঁপছে সে।

—কি ব্যাপার?

বয়স্ক লোকটা ভীত কণ্ঠে বলে,—রাতের মত একটু আশ্রয় দেন বাবু, কাল সকালেই চলে যাবো। এমন জানলে এখানে কে আসতো?

অশোক ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

অতুল বলে ওঠে,—সরকার মশাই। সদরের কানাই চক্রবর্তী মশায়ের লোক। বড়বাবুর ভয়ে এখানে রেখে গেলাম বাবু, উনিও ওপাড়ায় থাকতে চান না।

—বেশ তো। থাকুন। কোন ভয় নেই।

অশোক তাকে বাড়ির ভিতর নিয়ে এল। লোকটা তখনও যেন ভয়ে কাঁপছে। বলে ওঠে অশোক,

—বসুন।

—একটু জল দেবেন? খাবার জল।

নিজের হাতে অশোকই জল গড়িয়ে দেয়।

লোকটা জল খেয়ে এখানে নিরাপদ বোধ করে। অশোক বলে ওঠে,—আপনি অকারণেই ভয় পেয়েছেন।

—হয়তো তাই-ই, তবে কি জানেন, নোতুন জায়গা—আর এ জায়গার ঢের বদনাম আগেই শুনেছি।

—ওসব ভুল শুনেছেন। মানুষ এখানেও বাস করে।

—তা সত্যিই।

লোকটা ওর দিকে চেয়ে থাকে। চাকর কিছু দুধ আর কয়েকখানা রুটি গুড়—একটু ছানা নিয়ে আসে।

—কিছু খেয়ে নিন, পাড়াগাঁ—এত রাত্রে কিই বা পাওয়া যায়।

—না, না। এই ঢের।

কথাটা অশোকই বলে,

—যদি এরা মত দেয়, কারবার করতে পারেন। আর নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তাছাড়া আপনাকে তো আসতে হবে না। এরাই নিজেরা যাবে।

কর্কশ শব্দে শিয়ালটা সরঝোপের কাছেই ডাকছিল—হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে সরঝোপ ভেদ করে দৌড় মারে। সেদিকে নজর নেই গোকুলের।

গোবরার মুখে কথাটা শুনে অতর্কিতে এক লাথি মেরেছে, ছিটকে পড়ে গোবরা খুলের জলের উপরই। ভিজে যায় পিঠ-গা। শীত রাতে আরও ঠাণ্ডা লাগে। গর্জাচ্ছে গোকুল।

—জলজ্যান্ত লোকটাকে নিয়ে গেল ছোটবাবুর বাড়িতে, আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখলি!

অসহায় কণ্ঠে বলে গোবরা—কি করবো? সঙ্গে এতগুলো লোক ছিল। এমোকালীর হাতে আবার একটা পাঁঠাবলি দেওয়া খাঁড়া!

বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠে গোকুল,—কালীর হাতে খাঁড়া! ইতো তালপাতার খাঁড়া—

কথার জবাব দিল না গোবরা, পিঠের জল-কাদা মুছতে মুছতে উঠে বসে। মনে মনে গোকুলও ওই এমোকালীকে ভয় করে, দারুণ জোয়ান ছেলেটা—ও সব পারে।

আজকের সব চেষ্টা ওরা বরবাদ করে দিল। শুধু তাই নয়—এমন একটি প্রতিপক্ষকে আজ কামারপাড়া দলে এনেছে যে তারকরত্নের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—বরং বেশি জোরালো। তাকে চটানোও গোকুলের পক্ষে নিরাপদ হবে না।

সে ওই অশোকবাবু।

গোকুল কি ভাবছে।

বনে বনে বেড়ে ওঠে গহিন আরণ্যক রাত্রি।

চুপচাপ বসে থকে। আঁধারে লোকগুলাও যেন আদিম বন্য জীবনের একটি বিভীষিকাম ছন্দে মিলিয়ে গেছে।

নীলাম্বরবাবু সেই সন্ধ্যার পর থেকে কেমন যেন একটু হতাশ হয়েছেন। মিটিং তিনি করাে পারেননি। এতদিন বিদেশেই কাটিয়েছেন চাকরির ব্যাপারে, সামান্য কেরানি থেকে ক্রমশঃ ধাে ধাপে উঠেছিলেন উপরের দিকে। কোনদিন কাজে ফাঁকি দেননি, আর কেউ কাজে ফাঁকি দে সেটাও তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

তাই ধাপে ধাপে সুপারইনটেনডেন্ট পর্যন্ত উঠেছিলেন। সৎ ভাল মানুষ, তাই ওই প থেকে রিটায়ার করেছেন শুধু পেন্‌সন আর গ্রাচুইটি নিয়েই। সদরে ছোট একটা বাড়ি করেছেন-- ওই মাত্র।

পেন্‌সন—আর সামান্য ধানীজমি নিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন। প্রীতি সদর থেকেই পড়ে, ছুটি-ছাটা গ্রামে আসে। সে-ও এসব কথা শুনেছে, বাবাকে এবার এসে একটু মনমরা দেখে বলে ওঠে,

—দিনকতক সদরে গিয়েই থাকো বাবা, সারাজীবন শহরে শিক্ষিত সমাজে কাটিয়ে শে জীবন এই এঁদো পাড়াগাঁয়ে কি কাটাতে পারো?

হাসেন নীলাম্বরবাবু,—এইখানেই যে জন্মেছি মা!

—তাই এখানকার যত বাজে ঝামেলায় জড়াতে হবে, এমন কি কথা আছে?

—বাজে ঝামেলা?

প্রীতি একটু জোরের সঙ্গেই জবাব দেয়,

—নয়তো কি? কোথায় কোন্ বাবা ভৈরবনাথের সম্পত্তি কে খাচ্ছে—তোমার তাতে মা' ব্যথার কি আছে? এতদিন যে ভাবে চলেছিল—সেই ভাবেই চলুক না।

—অন্যায়ের প্রতিবাদও করা যাবে না? —অন্যায় বলেছে কে? মাটি বাপেরও নয়—দাপের তারকরত্নবাবুর দাপট আছে, তিনিই ভোগ করবেন।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল প্রীতি। অশোক সাইকেলটা রেখে উঠে আসছে। প্রীতি কথাগুলো খানিকটা শুনেছিল তারই যেন জবাব দিচ্ছে অশোক।

—চিরকাল ও দাপট চলে না, একদিন তা শেষ হয়ে যায়। সেই ফুরিয়ে যাবার দিনও এসেছে

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। অশোকের সারা দেহে একটা ঋজু কঠিন রুক্ষতার ছাপ। শহরে কমনীয়তা অনেক ঝরে গেছে। এম-এ পাশ করে গ্রামেই এসে বসেছে। ওর এই নিষ্ক্রিয়তা প্রীতি যেন ভাল লাগে না।

প্রীতি বলে ওঠে,—তাই তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ সেই হারানো দাপট নিজেদের হাে তুলে নিতে?

হাসে অশোক,—ব্যক্তি বিশেষের হাতে কোন ক্ষমতা থাকবে না প্রীতি।

—তবে?

—গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন মানুষই তা সহ্য করবে না। সেইদিনই এসেছে।

প্রীতি কথার জবাব দিল না। ওর দিকে চেয়ে থাকে। নীলাম্বরবাবুই প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে ওঠেন,

—অশোক, ভাবছি ভৈরবনাথের কাগজপত্র নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করে সদরেই মামলা রুজু করি।

প্রীতি বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ঝামেলায় যেতে দিতে তার মন চায় না। অশোকের জবাবের উপরেই যেন খানিকটা নির্ভর করছে।

চুপ করে ভাবছে অশোক।

দিন বদলাচ্ছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখেছে সবকিছু বদলে যাচ্ছে। যুদ্ধের ভাঙ্গন দেখেছে, দেখেছে মন্বন্তরের করালরূপ, তারই মাঝে স্কুল-কলেজ থেকে তারা দল বেঁধে এগিয়ে গেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামে—মুক্তি-সংগ্রামে।

মানুষের জন্য—দেশের জন্য এমনি সংগ্রামও করেছে মানুষ চরম বিপদ আর দুঃখের মাঝে। আজ দেশ স্বাধীন হবার পর তারা উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে কোথায় কখন কিভাবে ঘটবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ।

বেঁচে থাকার একটা পরম সান্ত্বনা খুঁজেছে তারা, বাঁচার কথাটাই বড় মানুষের কাছে।

এর মাঝে ওই মৃত পাষাণ ঠাকুরের অস্তিত্ব—তার বেঁচে থাকার প্রশ্নটা মনেও জাগেনি।

অশোক গতরাত্রেও দেখেছে একটি প্রবল প্রতাপ মানুষের অত্যাচারের বিভীষিকায় রাতের অন্ধকারেও তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। অসহায় সেই সরকার মশায়ের কথা মনে পড়ে।

আজও ওই সাধারণ মানুষের দল মাঠের মাঝে— কোন অসহ্য উত্তাপময় অগ্নিকুণ্ডের সামনে গতউদ্যম অবস্থায় দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

তার মাঝে ওই পাষাণ দেবতার বাঁচার প্রশ্নও ওঠেনি। বেঁচে থাকেন, থাকুন তিনি—তার জন্য এত চিন্তা করার কারণ খুঁজে পায়নি অশোকের আজকের মন।

—চুপ করে রইলে যে?

নীলাম্বরবাবুর প্রশ্নে মুখ তুলে চাইল অশোক। প্রীতি ওর দিকে চেয়ে আছে স্তব্ধ দৃষ্টিতে। সারা বাড়িতে একটা স্তব্ধতা।

মাঝে মাঝে খাঁচায় বদ্ধ পাখিটার কাকলি শোনা যায়।

বলে ওঠে অশোক,—আপনার বাবা ভৈরবনাথের চেয়ে অনেক বড় সমস্যা আজ চারিদিকে রয়েছে।

একটু চমকে ওঠেন নীলাম্বরবাবু।

—মানে!

—ভুল বুঝবেন না আমাকে। এমন দিন আসছে যেদিন এ একটা সমস্যাই থাকবে না।

—অর্থাৎ?

—জমিদারী যেদিন যাবে এসব কোন প্রশ্নই উঠবে না। সেই দিনই আসছে কাকাবাবু। তাই বলছিলাম আপনার ভৈরবনাথের সমস্যার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা চারিদিকে ছড়ানো আছে।

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখে ওর একটা যেন স্বস্তির চিহ্ন। এত বড় কথাটা নীলাম্বরবাবু যেন বিশ্বাস করতে চান না—পারেন না। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকেন। উঠে পড়ে অশোক, —এবেলা চলি, একটু বেরুতে হবে।

নীলাম্বরবাবু আনমনে ফুরসিতে টান দিতে থাকেন।

কেমন সব মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়, অশোক কি যেন বলে গেল। সব চলে যাবে। এত বিষয় সম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি—সবকিছু।

যে মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল এতকালের গ্রামীণ জীবন, তার সংস্কৃতি, সমাজ,—সেই সমাজ-ব্যবস্থা আমূল বদলে যাবে ! ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারেন না তিনি।

তারপরই বা কি হবে ?

কেমন যেন একটা অন্ধকার যবনিকা তাঁর এতদিনের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

—বাবা !

প্রীতির ডাকে মুখ তুলে চাইলেন নীলাম্বরবাবু। প্রীতি ওঁর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—একি, তামাক যে পড়ে গেছে কখন ! এখনও টানছ ওই ফুরসি ! ওঠো, স্নান করবে না?

—হ্যাঁ ! উঠছি।

ডুম্। ডুমা ডুমা ডুম্ ডুম্ ।

হঠাৎ ঢোলের শব্দ কানে আসে। ঢোল বাজছে। শব্দটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, কি একটা কঠিন ঘোষণার মত। যেন বাসাবাড়ি দখল করছে কে এতদিনের সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর।

নিঃশব্দ গ্রামসীমায় ঢোলের শব্দটা উঠছে।

আচমকা ওই শব্দে পাখ-পাখালিগুলোও শান্তিনীড় ছেড়ে আকাশে ডানা ঝাপটে কলরব ওঠে।

নীলাম্বরবাবু উদাস ওই আকাশের অন্তহীন মহাশূন্যের দিকে চেয়ে আছেন কোন্ ঝড়ের প্রতীক্ষায়।

ঢোল বাজছে লোহার পাড়ায়।

ঢোল আর সানাইও রয়েছে সেই সঙ্গে। যে সে সানাইদার নয়, পাতাজোড়া থেকে এনেছে স্বয়ং অবিনাশকে—পঞ্চাশ টাকার কমে যে সানাই-এ ফুঁ দেয় না।

সেই অবিনাশের দলকেও এনেছে, আর এনেছে পাঁচাল থেকে গোবিন্দ ডোমের ঢোল। মিষ্টি লোহার আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেনি।

এ গ্রামে একটি মাত্র কার্তিকই আসতো রমণ ডাক্তারের বাড়িতে, এবার মিষ্টি লোহার কার্তিক এনেছে এবং রবরবা করেই এনেছে।

দেখবার মত প্রতিমাও গড়েছে জলটোপ। লোকটার হাতের কাজ যেমনি সুন্দর, তেমনি পরিষ্কার।

রমণ ডাক্তারের কার্তিক গড়েছে ভূষণ ছুতোর। রমণ এই উপলক্ষ্যে গ্রামের মুখধরা কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করে অর্থাৎ রসাল এবং শাঁসাল রোগী এবং গ্রামের মাতব্বরদের হাতে রাখে, একদিন তোড়জোড় করে খাওয়ায়।

অবনী মুখুয্যেও গ্রামের গুনতির মধ্যে একজন। লেখাপড়া অনেক কষ্টে অর্থাৎ বাবার চেষ্টা এবং অটুট অধ্যবসায়ের ফলে শিখেছিল, তাও পলাশডাঙ্গার হাইস্কুল অবধি এবং শেষ বেড়া ডিঙ্গোবার আগেই অবনীর পরমারাধ্য পিতৃদেব সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করার ফলে অবনী নিশ্চিন্ত মনে স্বগ্রামে ফিরে আসে।

কিছু ধানীজমি এবং মধ্যস্বত্ব ধান আদায় এবং চালসাজা আদায় আছে, তাতেই সংসার চলে এবং অবনীর দিন কাটে গ্রামের সাতপাঁচ নানা ব্যাপারে মাথা গলিয়ে, বিশেষ করে মামলা-মোকদ্দমার তদারক করে এবং গঙ্গাজলঘাটি রেজেস্ট্রি অফিসে এ এলাকার জমির কওলাদার এবং গ্রহীতাকে জানি-চিনি দিয়ে।

সকালেই একবার পোস্টাপিসে যাবে চিঠির খোঁজে।

অবশ্য কোনদিনই ওর চিঠি এযাবৎ বড় একটা এসেছে বলে কারোই জানা নেই। আসে একখানা করে তারকরত্নবাবুর নামে হিতবাদী কাগজ, অবনী তাই বগলদাবা করে চটি পায়ে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, মদনের চায়ের দোকানে বসে কাঁচা শালপাতায় গরম চপ—পিঁয়াজবড়া দু-একটা খায় আর চা গেলে, তারপরই এগোয় তারকরত্নবাবুর বৈঠকখানার দিকে। হাটবারের দিন তার কর্মব্যস্ততা বাড়ে।

একজন কিষাণকে নিয়ে অবনী নিজে যায় হাটে ; চার আনার বখরাদার সে, হাটের জমিদারই বলা যেতে পারে। সেই জমিদারীতে দখল জানান দিতে যায়। আর তরকারিওয়ালাদের সঙ্গে মুলো, কচুশাক, কুমড়োর তোলা নিয়ে বচসা শুরু করে, তারপরই বের হয়ে পড়ে পৈত্রিক প্রচেষ্টার পলাশডাঙ্গায় অর্জিত সেই মহামূল্য বিদ্যার ধ্বংসাবশেষ।

—ননসেন্স, স্টুপিড—ব্লাডি ।

এ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, তার থেকেই কমবয়সী তরকারিওয়ালী কোন মোড়লবৌ ওর নাম দিয়েছিল—বেলাডিবাবু।

ওই জোয়ান মেয়েটার হাসিভরা সুরে বেলাডিবাবু ডাকটা অবনী মুখুয্যের মন্দ লাগেনি। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ছায়াঘন মন্দিরের পাশেই ঘাসঢাকা একফালি সবুজ ঠাঁই। ওপাশে মহিষা দিঘির টলটলে জলের মতই একটা নিটোল পূর্ণতা ওর দেহে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে কিশোরী মেয়েটার মুখে গালে এক ফালি রোদ।

ঝগড়া বচসা থামিয়ে অবনী মুখুয্যে মেয়েটার দিকে চাইল ।

—আমাকে ডাকছিস ?

হাসছে খিলখিলিয়ে মেয়েটা—হ্যাঁগো বেলাডিবাবু! বেলাতি লেবে না ?

ঝুড়িতে এনেছে ও গাছপাকা বিলাতি বেগুন, কেমন লাল নিটোল সিঁদুর রং-এর ফলগুলো। অবনী মুখুয্যে এগিয়ে এসে ওর বাজরা থেকে তোলা নেয়—বেশি নয় কয়েকটি মাত্র।

কি যেন একটি দুর্বলতম মুহূর্তেই তাই নামটা বহাল হয়ে গেছে অবনীর—বেলাডিবাবু।

অবশ্য তাতে মুখুয্যের কিছু আসে যায় না ।

তরকারিওয়ালা চাষীদের সঙ্গে তার বচসা আজও বাধে। ওরা জানে এর পরেই বাবু হাঁক পাড়বে,—ননসেন্স, ইস্টুপিড—ব্লাডি।

এহেন অবনী মুখুয্যে অনেক যত্নে রাখা একখানি কাঁচি ধুতি আজ কুঁচিয়ে পরে পদ্মফুলের মত ইঞ্চিপাড় ধুতির কোঁচটিকে মেলে ধরে পাঞ্জাবি আর ছড়িহাতে বের হয়েছে নেমন্তন্ন খেতে।

নেমন্তন্ন অবশ্য দু-জায়গাতেই হয়েছে ; মিষ্টি লোহারও এসেছিল সকালে। বিনীতভাবে প্রণাম করে হাতজোড় করে মিষ্টি।

অবনী ওর দিকে চেয়ে অতীতের দিনগুলো মনে করতে থাকে। আজও যেন তা একেবারে হারায়নি। ঝরে পড়ার আগেও শুকনো ফুলের মিষ্টি এতটুকু সৌরভের মত তা রয়েছে ওর অঙ্গে অঙ্গে। মানিয়েছে চমৎকার একটা ডুরে নোতুন শাড়িতে। মিষ্টি বলে,

—একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে বিলাডিবাবু।

হাসে অবনী, গলা নামিয়ে অবনী আজও রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারে না।

—ও তোর ঘরের একোণ ওকোণ ঝাঁট দিলেই অনেক পায়ের ধুলো পাবি মিষ্টি।

মিষ্টি ওদিকেই গেল না। একটু সংযত কণ্ঠে বলে,

—ঠাকুরের মানসিক করেছি। পঞ্চজনের আশীর্বাদও চাই কিনা। কার্তিক ঠাকুর আনছি।

অবনী ওর দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সেই স্বৈরিণীর কণ্ঠস্বর যেন এ নয়। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে অবনী,

—তা যাবোই বই কি ! নিশ্চয়ই যাবো।

প্রণাম করে বের হয়ে গেল মিষ্টি।

অবনী হাসতে গিয়ে চুপ করলো। মিষ্টি লোহারও মানসিক করছে আজকাল। কেমন যেন হাসি আসে। উর্বশীর আবার বিয়ে—রম্ভার আবার সংসার। হাসি আসে। হেসেছিলও।

একবার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে। অবনীর পুরোনো কাসুন্দি-ঘাঁটার অভ্যেস চিরকালেরই।

তাই আরও উৎসাহ নিয়ে চলেছে অবনী মুখুয্যে সাজগোজ করে। ওখান থেকে ফিরবে রমণের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া হতে রাত্রি হবে—আরো অনেকেই জুটবে সেখানে। তাই শেষ আড্ডা সেখানেই জমিয়ে রাতে ফিরবে।

শীতের আমেজ এরই মধ্যে চেপে বসেছে। বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যা নামে। ধান বোঝাই গাড়িগুলো আসছে ধুলো উড়িয়ে খামারের দিকে, সবে তো শুরু এই উৎপাত—এইবার চলবে সারা অগ্রহায়ণ মাস পুরো—পৌষের মাঝ অবধি।

ধোঁয়াটে আকাশ—কুয়াশার ঘন আবরণ আর ধুলো যেন একত্রে মিশে রয়েছে বাতাসে।

অবনীবাবু পুরোনো আমলের শালখানা যত্নে পাট করে কাঁধে পেলে ছড়ি হাতে চলেছে। দামী কাজ করা শাল—ওই পাট করেই কাজ চালিয়ে আসছে—পাট খুলে ফেললেই বিপদ, শাল বোধ হয় কয়েক ফালি মাফলারে পরিণত হয়ে খুলে পড়বে।

বেনেদের দোকানের সামনে আশ-পাশের গ্রামের খদ্দের রয়েছে অনেক। এখন সবারই অবস্থা ভালো, বিশেষ এই কয়েক মাস। শিমুল ফুল ফোটার আগে পর্যন্ত—অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের সঙ্গেই আবার ভাত ঘুচবে, ঘরে গরে উঠবে সেই হা হা অবস্থা। কথায় বলে —

শিমূলের ফুল ফুটলো।
ঘরের ভাত উঠলো।।

এখন ক' মাস দোকানে ঢোকা যাবে না। দু-হাতে পয়সা কুড়োবে পানু দাস। শাঁখারীর করাতের চ চালাবে। ধান কেন এক দামে, ঢলতা কয়ালি বস্তা শুকনো বাদ, সেখানে তো লাভ রইলই। র পর আছে জিনিস বিক্রির পড়তা। গমগম করছে ব্যবসা। লক্ষ্মীর আটন।

দোকানের সামনে দিয়ে চলেছে অবনীবাবুর মশমশ শব্দেপেটেন্ট লেদারের তোলা জুতো কিয়ে, হাতে হরিণমুখো ছড়ি। ছানু দাস কেরোসিনের টিন কাটছিল বাইরে, হঠাৎ ওকে দেখেই কটু অবাক হয়ে যায়।

ছানুর মুখের লাগাম নেই, যা তা কথা আর রসিকতা করা তার সহজাত ধর্ম। ওকে দেখেই কে ওঠে,

—পেন্নাম হই অবনীবাবু। তা ইদিকে ? এই মু আঁধারি বেলায় এত সেজে-গুজে ?

অবনীবাবু আপ্যায়িতই বোধ করে, দু-পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে এই বেশ-বাস খাতিরও কলকে দেখাতে চায় সে। জবাবটা কি দেবে ভাবছে।

ছানু দাসই বলে ওঠে—তা ময়ূরটোকে কুথা ছেড়ে এলেন আজ্ঞা ?

—মানে ?

অবনীবাবু যেন অন্য কিছুর সন্ধান পায় ওর কথায়। একটু মেজাজেই বলে ওঠে—কি ছিস তুই ?

সহজাত বিনয়ের সঙ্গে ছানু জবাব দেয়,

—বলছিলাম মিষ্টি দিদির কার্তিকের মতই লাগছে কিনা, তা ফারাক শুধু ওই মোউন ড়াতেই; আপনার আজ্ঞা গোটাটাই ছেড়ে গেইচে।

অবনীবাবুর সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেছে।

—ছেনো ! অবনী মুখুয্যে চটে উঠেই ধমক দেয়।

হাসছে লোকগুলো মুখ টিপে, ছানু দাস বেশ গম্ভীর ভাবেই কেরাসিন-এর টিন কেটে চলেছে। সময় কথা বাড়ানো ভালো নয়।

বলছে অবনী মুখুয্যে,—বড় বেড়েছিস না ?

চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ নিভু নিভু প্রদীপ উসকে দেয় ছানু।

—ও আজ্ঞা, ফুলল তেলের টিন তো কাটলাম, জামায় কাপড়ে একটুন বাস ছিটিয়ে লিয়ে ন কেন্নে। মো মো করবেক।

ঘুরে দাঁড়াল অবনী মুখুয্যে। আবছা অন্ধকারে বোঝা যায়, মোমমাজা সূঁচলো গোঁফ দুটো ড়া হয়ে উঠেছে রাগী বিড়ালের মত, নাগালের মধ্যে থাকলে হাতের ওই হরিণমুখো ছড়ি নির্ঘাৎ নুর পিঠেই পড়তো।

একটু থেমেই সরে গেল অবনী মুখুয্যে। জুতোর শব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

হাসিতে ফেটে পড়ে ছানু। কে বলে ওঠে,

—ভালো কার্তিক পুজো করেছে মিষ্টি লোহার, গুটা গাঁয়ের লুক হুমড়ে পড়েছে। বাবু ভায়েদের বাইকে তো দেখলাম যেতে। বড়বাবু এখনও যায়নি, না রে ?

ছানু জবাব দেয়,—যাবে বৈকি. তবে গভীর জলের মাছ তো. একটু রাত করে যাবে।

বাঁশির সুর শোনা যায়। কেমন যেন ব্যাকুল একটি শূন্য কান্নার মত সুর।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে—বেজে গেছে তুলসীতলায় মঙ্গল শঙ্খ। গোধূলির শেষ আ মিশিয়ে গেছে আকাশ কোলে, নেমেছে সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনবতী তমসাময়ী রাত্রি।

ঠাঁইটা ভরে উঠেছে হেসাক-এর আলোয়। সামিয়ানা টাঙ্গিয়েছে মিষ্টি—বড়বাবুর বাড়ি থে এনেছে বড় সতরঞ্জি, ফরাস পেতেছে।

সাজিয়েছে ঠাঁইটাকে দেবদারু পাতা দিয়ে। অবনীবাবু বলে,

—বাঃ, grand ঠাকুর এনেছিস মিষ্টি ! finc !

অবনীবাবু ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে তারিফ না করে পারে না, ছানু ঠিকই বলেছিল দেখবার মত কার্তিক করেছে মিষ্টি, কেমন টানা টানা চোখ সরু গোঁফ, বিরাট এক ময়ূরের উপ বসা মূর্তি, মায় ধুতিটিও কোঁচানো—হাতে ধরে রয়েছে ফুলটা। জিজ্ঞাসা করে অবনী,

—কে করেছে রে ঠাকুর ? ভূষণার হাতের তো এ কাজ নয় ?

মিষ্টির মুখে ফুটে ওঠে সলজ্জ হাসির আভা। সামনেই লোকটাকে দেখায়।

—ও করেছে।

--তোর জলটোপ ।

মিষ্টি লোহার কথা বলে না, লোকটার দিকে চাইল।

নিরাসক্ত বিচিত্র ওই লোকটা। পাল পরবের দিন বাড়িতে লোকজন মানী ব্যক্তিরা। পা ধুলো দিয়েছে, একটু ছিমছাম থাকবে তা নয়, সেই মুনিয মান্দেরের মত একটা আধময়লা হাফশার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তার পাশে মিষ্টি লোহারের এই দামী শাড়ি, দু একখান গয়না কেমন যেন বেমানান যে বলে কয়েও পারেনি ওকে মিষ্টি।

হাসে লোকটা ওর কথায়।

--বেশ রইছি। আবার ভদ্দর লোক সাজা কেনে বাপু!

—লোকে কি বলবে? বলে ওঠে মিষ্টি লোহার। কথা কইল না লোকটা; লোকের দেখা দেখায় তার যেন কিছুই আসে যায় না।

অবনীবাবু লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

সত্যি জলটোপই বটে, কি যেন নেইপুঁজির লোক। মিষ্টির মন পেলে কি করে ভাবা যায় অবনী মুখুয্যে জানে, মিষ্টির মনের তল নেই। এককালে সে, শুধু সে কেন, তারকবাবু অবধি বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছে, কিন্তু তবু মিষ্টিকে বাঁধতে কেউ পারেন নি।

সে উধাও হয়েছিল। ফিরে এসেছে, সঙ্গে ওই লোকটা। সেই-ই আজ মিষ্টির মনের সব জুড়ে বসেছে। কি যেন ভাবছে অবনীবাবু।

আবছা অন্ধকারে সুরটা উঠছে। সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশ বায়েন।

ছোকরা—কালো কুচকুচে গড়ন। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। দু-চোখ বুজে বাঁশি

দিচ্ছে—পিছনে বসেছে পোঁদার ; মাঝে মাঝে ওপাশের তলের সানাইদারকে ছাড়িয়ে উঠছে র নিপুণ ফুঁয়ে জয়জয়ন্তীর বিস্তার। ফরাসে বসে পড়েছে বাবুরা।

একাবর দাঁড়িয়েই চলে যাবে মনে করে এসেছিল অনেকে, তাদের আটকে ফেলেছে অবিনাশ র সুরের মায়ায়।

বিষ্ণুপুরের ঘরে রেওয়াজ করেছে দীর্ঘ দিন। অবিনাশের জ্ঞান আর রেওয়াজ এ এলাকার র সানাইদারকে ছাড়িয়ে গেছে।

রমণ ডাক্তারের সেই এক ঢাক এক কাঁসি।

পিটিং পিটিং বাজছে বাঁশবাগানের এক কোণের বাড়িতে। রমণ ডাক্তার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মন্ত্রিতদের অনেকেরই এখনও দেখা নেই।

নীলাম্বরবাবু সকাল সকাল এসে দেখা করে গেছেন, রাত্রে তাঁর বাইরে খাওয়া নিষেধ। এসে ৗকিকতা রক্ষা করেছেন।

হঠাৎ অবনীর হাঁকডাকে বাঁশবাগান মুখর হয়ে ওঠে!

--দেখে আয় ভূষণা, কাকে ঠাকুর বলে। একেবারে Living কার্তিক।

রমণ ডাক্তার এগিয়ে আসে।

—এসো মুখুয্যে!

--হ্যাঁ এলাম। তা বুঝলা ডাক্তার, তোমার ভূষণের ঠাকুর গড়া আর হিতবাদীর ছবি ছাপা যই এক ব্যাপার।

—মানে? ডাক্তার ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ভূষণও বাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ল চলেছে অবনী,

—মানে, সব ছবিই সেই কালো খানিকটা ছাপ। নীচে লেখা সুরেন্দ্রনাথ, না হয় বিপিন পাল, হয় দেশবন্ধু, তেমনি ভূষণের ঠাকুর গড়াও সেই হাত সেই সব কিছু, only নীচে সিংহ দেখে বে দুর্গা, নীচে মহাদেব দেখলে কালী, আর ময়ূর দেখ তো কার্তিক! ঠাকুর গড়েছে বটে মিষ্টির ই জলটোপ হে!

—সেখান থেকেই আসছো তাহলে?

রমণ ডাক্তার হিসাব করে।

অবনী মুখুয্যের এত শীতেও কেমন গরম করছে। মিষ্টি লোহার বাঘের চোখও তুলে আনতে পারে, রকবাবুর খামারের তৈরি চোরাভাটির সরেস মাল দিয়ে বামন-সজ্জনকে আজ তৃপ্ত করেছে মিষ্টি।

দুচোখে কেমন গোলাপী আমেজ।

স্বয়ং বড়বাবু এলেন ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ে। তিনিও যেন মেজাজেই রয়েছেন। তারকবাবুর তে ঝকমক করছে হীরের আংটি, কোঁচাটা হাতে রাখবার সামর্থ্য আর যেন নেই, সারা পথ টিয়ে এসেছে।

লালধুলোয় রঞ্জিত হয়েছিল কোঁচার আগের দিক। কোন রকমে চেয়ারে বসে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, মেয়েটার নজর আছে হে ডাক্তার। একেবারে ইন্দভুবন বানিয়েছে। আর সানাইটাও শ বাজায় ভালো ছোঁড়াটা! কি বল মুখুয্যে?

অবনী মুখুয্যে বেশ মাথা নেড়েই যেন সোমের মাথায় তেহাই দিচ্ছে।

—যা বলেছেন।

রমণ ডাক্তারের উৎসব এবার জমলো না। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয় ডাক্তার। খাবার জায়গ হয়েছে। সকলেই প্রায় এসেছে, না হয় লোক পাঠিয়েছে। আসেনি কেবল একজন। সে ওই অশোক

এদিকে রাত হচ্ছে, এদের শরীর মেজাজও ভাল নেই।

তারকবাবু বলে,—না আসে তা কি আর করবে ? হ্যাঁ, সে আবারও ওই পুজোতে জমেনি তো

কেমন একটু অর্থপূর্ণ হাসি খেলে যায় ওর মুখে। অবনী মুখুয্যে এতক্ষণ উসখুস করছিল বগলে খবরের কাগজ নিয়ে সারা গ্রাম চষে বেড়ায় খবর সংগ্রহের আশাতেই।

এমন সরস খবরটা খানিকটা চেপে রাখবার চেষ্টাই করেছে! দেখছিল সবে এগোচ্ছে, এগোচ —তারপর ছাড়বে। কিন্তু এই ফাঁকে সেই মহামূল্য সংবাদটি ছাড়বার লোভ সামলাতে পারে ন অবনী মুখুয্যে।

বেশ তাক বুঝেই খবরটা ছাড়ে।

—আজ্ঞে তিনি তো কার্তিক-ফার্তিকের ব্যাপারে নাই।

—সে কি সে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি সরস্বতীর ভক্ত—সেইখানেই আছেন বোধ হয়।

—সরস্বতী ! তারকরত্ন একটু বিস্মিত হয়। রমণ ডাক্তারই বলে ওঠে,

এখন সরস্বতী কোথায় পেলে হে ?

অবনী জবাব দেয়—আজ্ঞে মাটির নয়, জ্যান্ত সরস্বতী। ওই যে এসেছে সদর থেকে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে—

বাকি কথাটা বলতে হয় না। ওরা হাসিতে ফেটে পড়ে। কেমন একটা বিচিত্র মুখরোচক সংবাদ

—নীলাম্বরবাবুর মেয়ে প্রীতির কথা বলছ ?

—ঠিক ধরেছেন আজ্ঞে। অশোকবাবু সেখানেই যান কিনা!

—তাই নাকি!

কি ভাবছে তারকরত্ন। ওদের হাসির ধারাল শব্দ তখনও মিলোয়নি।

হঠাৎ দরজার কাছে অশোক ঢুকছিল, কথাটা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল।

এটা সে মোটেই ভাবেনি, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা—সামান্য এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ওর যে ঘোঁট পাকাবে, তা কল্পনাও করেনি অশোক।

সারা গা জ্বলছে অসহায় রাগে।

নেমতন্ন খেতে যাওয়া আর হল না, আবছা অন্ধকারেই ফিরে এসে পথে নামল।

গাছ-গাছালির বুকে আলো পড়েছে। নিশুতি গাঁ, জনহীন পথ। একাই চলেছে অশোক।

রাতের হিম বাতাসে শীত লাগে !

প্রীতির কথা মনে পড়ে, তাকে জড়িয়ে এইসব বিশ্রী কথা কোনদিনই কল্পনা করেনি অশোক অবনী মুখুয্যের চিমসে মুখে সূঁচলো গোঁফের ডগায় কি এক তীক্ষ্ণ গরলজ্বালা লুকিয়ে আছে আজ তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছে অশোক।

নিস্তব্ধ পল্লীর অন্ধকারে জেগে আছে অবিনাশের সুরটা। কি এক মায়াময় সেই সুর, রাতের স্তব্ধ অন্ধকারে কি এক নিবিড় দুঃসহ ব্যথায় কেঁদে উঠেছে আকাশ বনানী।

রাতের হিমেল আকাশে স্বচ্ছ, ম্লান বেদনার আভায় কাঁপছে দু'একটা তারা।

কি যেন জাদু আছে ওই সুরে।

একক সুরটা উঠেছে—সঙ্গে রয়েছে টিকারাব মৃদু ঠেকা। জাতবাজিয়ের মত বেহাগের রূপ আলাপ করে চলেছে অবিনাশ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

ওই সুরে মিশিয়ে আছে কোন্ হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা, তার হারানো মায়ের দুচোখের সুস্নিগ্ধ চাহনি; আজও যেন দূর আকাশে তারার আলো বেয়ে ওই সুরের ঝরণা ধারায় নেমে আসে তাঁর আশিস ধারা—কল্যাণস্পর্শ।

দু'চোখ বুজে আসে।

- হেঁই মা গো—

হঠাৎ কার আর্তনাদ আর বিস্মিত কণ্ঠের কথা শুনে চমকে ওঠে অশোক—চোখ মেলে চায়। মিষ্টি লোহার দেখেছে অশোকবাবুকে পথে দাঁড়িয়ে সানাই শুনছে, প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি। এই হিমের মধ্যে শীতরাতে কে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে !

অবিনাশ এতটা খেয়াল করেনি তাকে।

মিষ্টির আর্তনাদ শুনে চোখ মেলে চাইল অশোক, নিজেই অপ্রতিভ বোধ করে, দুচোখ যেন জলে ভরে এসেছে। মিষ্টি বলে চলেছে,

—পথে কেনে আজ্ঞে—ওরে বাবা রে—ইকি হয়!

অশোক ওকে নিরস্ত করে,—না, এমনি শুনছিলাম ওর বাজনা পথে যেতে যেতে । রাত হয়ে গেছে, চলি।

চলে গেল অশোক—নিজের অন্তরের কি এক নিবিড় বেদনার সঙ্গে আজ মুখোমুখি পরিচিত হয়। আজকের অপমান, ওই অপবাদ খানিকটা সইবার শক্তি যেন সে অর্জন করেছে।

এগিয়ে চলে।

নিশুতি আঁধার নেমেছে গ্রামে, আবছা অন্ধকারে খড়োঘরগুলো মনে হয় যেন এক-একটা হারানো আদিম কালের ঢিপি. কোনরকমে ওর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একশ্রেণীর জীব। চারদিকে তার অন্তহীন বিভীষিকা আর হিংস্র পশুর রাজ্য।

ভয়ে জমাট আতঙ্কে পরাজিত মানুষ আত্মগোপন করেছে ওই বল্মীক স্তূপের অতলে।

—কে যায়?

কঠিন কণ্ঠস্বরে কে এগিয়ে আসে। থমকে দাঁড়াল অশোক। মুখে এসে পড়ে এক ঝলক টর্চের আলো।

—ছুটবাবু!

এমোকালী আর ভুবন কামার এগিয়ে আসে।

অশোকও বিস্মিত হয়,—তোমরা!

বলে কালীচরণ।— চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি, রাত-বিরেতে ফাঁকা মাঠ পার হয়ে একা যাতায়াত করবেন না।

—কেন রে ?

—দিন সময় ভাল লয় ছোটবাবু। চলুন।

এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া: মাঝখানে পুকুরের পাড়। একদিকে মজে গেছে ; তার পরই শুরু হয়েছে বন। নেড়াড়ে বন, ওদিকে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে এদিকে দামোদরের ওপারে দুর্গাপুর মামড়ার জঙ্গলে গিয়ে লেগেছে। গ্রামের বসতির মাঝখানে ওইটুকু পথ যেন বনের যোগসূত্র বিপজ্জনক সেই পথ, জন্তু-জানোয়ার বদ মানুষের পথটা।

শীতের হাওয়া মুক্ত প্রান্তর থেকে এসে লাগে। হু হু হাওয়া। ধানক্ষেত থেকে শিশির ঝরার টুপটাপ ক্ষীণ শব্দ কানে আসে।

স্তব্ধ উদার দিগন্ত সীমা, লাল কাঁকুরে ডাঙ্গার প্রান্তে বনের আবছা কালো সীমারেখা। এদিকে লাল প্রান্তে আর কাজলাদিঘির পরই আবার বন। কয়েকটা ধানক্ষেতে তখনও পাকা ধান পড়ে আছে

হঠাৎ একটা খস্ খস্ শব্দ ওঠে।

জোরালো টর্চের আলোয় কেমন ঝলসে ওঠে দুটো নীল চকচকে চোখ, বাতাসে একটা বোটকা বিশ্রী গন্ধ।

—ছুটবাবু!

এমোকালী কিছু বলবার আগেই চিতে বাঘটা জল খাওয়া বাকি রেখে লাফ দিয়ে সরে গেল বনের দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

স্তব্ধ দিগন্তসীমা, তারাজ্বলা রাত্রির নিবিড় রূপ—সুপ্তিমগ্ন গ্রাম, সবকিছুর ঊর্ধ্বে যেন কোন হিংস্র আদিম জীবন এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

তারই ভয়ে সব কিছু নির্বাক—স্তব্ধ।

—চল কালী।

ওরা এগিয়ে চলে, আঁধারে টর্চটা জ্বলছে মাঝে মাঝে।

তারকবাবু ক'দিন একটু চিন্তায় পড়েছিল, নীলাম্বরবাবুকে গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় সকলেই মানে গনে। লোকটা সৎ এবং বলতে কইতে পারে। বিশেষ করে সদরে কোর্ট-কাছারি আমলা মহলে এখনও পুরানো দিনের খাতিরটুকুর কিছু অবশিষ্ট আছে।

তাই নীলাম্বরবাবু উঠে পড়ে লাগলে ভৈরবের মরা মামলা—সেই পুরানো আমলের তালিমারা শোলেনামা খুঁজে আবার জিইয়ে তুলতে পারেন।

তাই একটু চিন্তায় পড়েছিল।

আর কিছুর জন্য নয়। টাকা পয়সা খাজনা দিতে হবে—এমন কি তামাদী চার সন অবধি. তাছাড়া হালসন সমেত বকেয়া মিটাতে হবে। আর সম্মান এবং জেদ-এর প্রশ্ন।

ওরা যদি যেচে আসে, কিছু দান খয়রাত চায়, তারকবাবু বিবেচনা করতে পারে ; হাজার |ক দেবোত্তর ব্যাপার, একেবারে হক মারতে চায় না।

কিন্তু মামলার মুখে তখন পয়সার চেয়ে মান-অপমান আর জেদের কথাই বড় হয়ে ওঠে।

অবনী মুখুয্যে, সতীশ ভট্টচায—আরও দু একজন আসে সকালেই। শীতের দিন, চা-এর পারটা একটু রাখে বড়বাবু। ছোট ভাই শিবরত্ন এটা ঠিক পছন্দ করে না। ব্যবসাদার লোক —হাড়কেপ্পন, একটি পয়সাও বাজে খরচ করা তার পোষায় না। আড়ালে গজ গজ করে।

—পেছকাস্তার হাকিম হয়েছেন কিনা! তাই ঠাট বেড়েছে।

অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে তারকবাবু, সুতরাং নিজস্ব একটা আড্ডা—|ও গড়ে উঠেছে। তাদের হাতে রাখতে হয়, তার উপর আছে সার্কল-অফিসার, হাকিম, রোগাবাবুদের আনাগোনা। হোক খরচ তবু তারকরত্ন যেন একটা তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে। জমিদারী চালিয়েও এত খাতির সম্মান পায়নি।

শীতের সকাল।

মিষ্টি রোদ বার-বাড়ির প্রশস্ত আঙ্গিনায় এসে পড়েছে। ও দিকে চক-মেলানো প্রাচীর-ঘেরা ।ার বাড়ির ফটক দিয়ে ধানবোঝাই গাড়ি মাঠ থেকে আসছে—গোটা কতক মুনিষ পাত। পাঁজা ।পালুই দিচ্ছে গাড়ি খালাস করে। আবার শূন্য গাড়িগুলো ফিরছে মাঠের দিকে। উত্তুরে বড়বড় াদের গলায় ঘণ্টা বজে টং টাং। শীতের সকাল বন থেকে হাওয়া আসে—শুকনো হাওয়া। তে ভেসে যায় ওই উদাস শব্দটুকু।

সোনা ধানের পালুই উঠছে। নিজের খাস হালেই প্রায় শ'দেড়েক বিঘে জমি রেখেছে বড়বাবু; র উপর এক চকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বিঘা ওই ভৈরবনাথের দেবোত্তর জমি।

মস্ত গোটা চারেক পালুই উঠেছে খামারের পুকুরের চার পাড়ে।

পুকুরেও প্রয়োজন, অনেকই তার আছে। তবে গ্রামের বাইরে এদিকে ওদিকে, না হয় এ গাঁ গাঁয়ে। বড় বড় দিঘি পুকুর সে সব। তাতে দরকার-অদরকারে সহসা রাতের বেলাতেও মাছ লে না। তাই খামারের পুকুরেই শখ করে মাছ পুষেছে তারকবাবু।

জলে মাছে সমান। হাততালি দিলে মাছ লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়বে। রাত বিরেতে অতিথি, রেওয়ালা সাহেব, অন্য কেউ এলে মাছের অভাব হয় না।

অবনী মুখুয্যে তাই বলে,

—একেই বলে পুরুষ। দিগ্বিজয়ী পুরুষ।

হাসে তারকবাবু। বড় পৈত্রিক বাড়ির কার্নিসে রোদ লেগেছে, বের হয়ে এসেছে পায়রাগুলো। নাসংখ্যাহীন পায়রা—বাপুতি আমল থেকেই তারা বাস করছে আর বংশবৃদ্ধি করে চলেছে না বাধায়।

সতীশ ভটচায গরম চা খাওয়া কিছু দিন হ'ল রপ্ত করেছে। নিজেই কোথা থেকে বিধান র করেছে ইতিমধ্যে।

—পানীয়ে দোষ নেই, ও খেয়ে সব পূজা-অর্চনা চলে।

অবনী বলে ওঠে,—শুনেছি, জলযোগ করেই বের হও ভটচায?

ভটচায কথা বলে না। আপন মনে চায়ের কাপে ফুঁ দিতে থাকে।

ওদের মুখেই কথাটা শুনেছে তারকবাবু।

—তা হলে মামলা আপাততঃ মুলতুবি রইল ?

মাথা নাড়ে সতীশ ভটচায।

—আরে, বাপ মারেনি টিকটিকি তার বেটা গুলন্দাজ। তুই চাকরিই না হয় করতিস কোর্টে তাই বলে মামলার কি বুঝিস? মশা যাবে হাতির সঙ্গে লড়তে! অবনী মুখুয্যে পুরোনো খবরের কাগজখানা পড়ছিল। মুখ তুলে বলে ওঠে,

—যা বলেছ। লোকের নাচনে নেচে নীলাম্বর খুড়ো হাঁকছিল ভৈরবের মামলা করবো, এখন চুপসে গেছে।

মনে মনে একটু খুশিই হয়েছে তারকবাবু।

সকালের রোদ তখনও কুয়াশার আভায় লাল প্রান্তরের বুকে ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে। চড়াই এর নীচে শালবনের বুকে এসেছে পাতা ঝরার হলদে আভা।

গলা খাটো করে বলে অবনী,

—মেয়েটাই বেশ কড়কে দিয়েছে বাপকে। ব্যস, নাচন-কোঁদন সব বন্ধ।

হাসছে তারকবাবু,—বল কিহে ?

—মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। হাজার হোক লেখাপড়া শিখছে তো, আর বাপের ওই একটি মেয়ে—বেশ গুছনো। বাপ মামলায় টাকা উড়াবে—তা উড়োবে কার টাকা? এই জন্যই তো মেয়ে সদব থেকে এসে হাজির হয়েছে।

তারকরত্নবাবু ওই মেয়েকে দেখেছে এক নজর।

বেশ বুদ্ধিমতী আর সুন্দরীও বলা যায়, এইবার নাকি বি-এ পরীক্ষা দেবে।

বাতাসে ভেসে আসে বাড়ির দিক থেকে রেডিওর সুর। জীবন রেডিও খুলেছে।

নীরব নিস্তব্ধ এই পরিবেশে ওই কর্মহীন সুর ভাল লাগে না তার। জীবনও কাজকর্ম কিছুই করবে না, পড়াশোনাও করলো না। এত কষ্ট করেও খরচ-খরচা করে , হেলু মাস্টারকে পিছনে লাগিয়েও জীবনকে হাইস্কুলের দরজা আর পার করান গেল না। যত দূর ঠেলা যায় ঠেলেছে—একেবারে হাইস্কুলের শেষ ঘরের সীমানা অবধি—তারপর আর চৌকাঠ ডিঙ্গোতে পারেনি জীবন।

হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে বাড়িতে পড়ায় ইস্তফা দিয়ে।

—করিব কি ? তারকবাবু প্রশ্ন করেছিলেন।

বাপের কথায় জীবন জবাব দেয়,—ব্যবসা করবো।

সে চেষ্টাও করছে আজ পর্যন্ত তারকবাবু। কিছু মূলধন মালপত্র দিয়ে বাসন তৈরির ব্যবসাতে নোতুন করে নামিয়েছে। কাঁচা পয়সা রোজকারও বেশ হয়।

কিন্তু জীবন যেন অন্য ধাতের।

শালের আগুন-তাতে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন বিশ্রী লাগে, কাপড় জামায় কয়লার কয লাগে কারিগরদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও পারে না। অকারণেই ধমক গালাগাল দিয়ে বসে।

কোন রকমে সামলে চলছে তারকবাবু, সেখানেও যেন সমস্যা দেখা দিয়েছে এইবার। জোর করে দাবানো চলবে না।

এ সময় মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেও কাজ হয়। এতবড় জমিদারীখানা, হালের চাষ। তাই দেখতে পারে।

কিন্তু জীবনের তাও কেমন লাগে, শীতের বাতাসে গা হাত পা চড় চড় করে। ধানের শিষে কেটে যায় হাত পা।

মুনিষ মান্দেরদের সঙ্গে একপায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন অসহ্য মনে হয়।

চুপ করে ভাবছে তারকবাবু।

বাতাসে রেডিওর সুর ভেসে ওঠে। দিনের বেলায় এই খাঁ খাঁ লাল কপিশ প্রান্তরে ওই চাঁদ, ফুল আর ভালবাসার গান কেমন বিশ্রী লাগে । ও অন্য জগতের সুর। কড়া স্বরেই হুকুম করে,

—রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বাবুকে একবার আসতে বল। ডেকে দে ওকে।

জীবন সবে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা জমিয়েছিল দোতলার ঘরে।

গোকুলও এসে জুটেছে আড্ডায়।

এখানেও তার কাজ কারবার আছে।

এদেরই বয়সী সে—দু'চার বছর হয়তো বড় হবে। কিন্তু গোকুলের মধ্যে এমন একটা কিছু সহজ ভাব আছে, যাতে তার মিশতে কোন বাধা হয় না। তাছাড়া একটা কাজও চলে এখানে।

জুয়ার আড্ডা বসায়। বাঘের বাসা। কেউ সন্দেহ করবে না যে বড়বাবুর চকমিলানো দালানের কোন নিভৃত কোঠায় তারা জুয়ার আড্ডা বসায়।

জীবনও ক্রমশঃ রপ্ত হয়ে উঠেছে এই নেশায়, দুর্বার এক নেশা। গোকুল তার দীক্ষাগুরু, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিকও জুটেছে।

আরও কয়েকজন এসে জোটে। গোকুল বলে চলে,—মিষ্টির দিন গেছে, এখন আর ওর আছে কি বল ?

ওরা গোকুলের দিকে চেয়ে থাকে। গোকুলের দুচোখে কি এক শয়তানী নেশা। দেখেছে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কেমন করে জীবনের সদ্য তরুণ মুখের নিষ্পাপ নিষ্কলুষ ছাপ-এর উপর নবজাগ্রত কোন উদগ্র নেশায় মাদকতা ফুটে বের হচ্ছে। ধীরে ধীরে বঁড়শিতে গেঁথে যেমন করে জলের উধাও মাছকে নিপুণ শিকারী তীরের প্রান্তে টেনে আনে তেমনি যেন কোন নির্মম খেলা খেলছে গোকুল ওকে নিয়ে।

—তবে ? জীবনের মনে একটা বিচিত্র উন্মাদনা। কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করে অন্য কোন সত্তার নোতুন আবির্ভাব ঘটছে।

গোকুল হাসছে,—যেতে দে! কইরে?

অর্থাৎ ওটাকে—ওই নবজাগ্রত কোন বেদনায় চেতনাকে আরও প্রবল করে তুলতে চায় সে আপাতত ওটা চাপা দিয়ে।

আরও কজন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে।

ঘরের মধ্যেই চা-এর কাপ আর বিড়ি-সিগারেট এসে পড়ে। তাসগুলো নিপুণ হাতে নাড়াচাড়া করছে গোকুল। এ বিদ্যাটা শিখেছে ঈশ্বর জুয়াড়ীর কাছ থেকে। সেই তার শিক্ষাগুরু।

সেই তাতাপোড়া রোদে পড়েল পুকরের ধারে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেই দিনই পূজারী গোকুল হাতের পূজার ফুল আর রেকাবির সেই মুষ্টিভিক্ষার চাল জলে বিসর্জন দিয়ে ধরেছিল এই তাস—তিন তাসের খেলা।

ঈশ্বরই তার হাতে তুলে দিয়েছিল এই তাস।

—এতেই কাজ হবে ঠাকুর। আর তোমাকে ওসব কাজ করতে হবে না।

সেই থেকে এ বিদ্যাটাও চালিয়ে আসছে গোকুল।

দান পড়ছে।

টাকা সিকি দু'আনি। জীবন জিতছে প্রথমে।

হঠাৎ এমনি সময় চাকর ঋষি ডোম উঠে এসে খবর দেয় জীবনকে,—বড়বাবু ডাকছেন যি গো।

বিরক্ত হয়ে ওঠে জীবন। সবে এই দানে কিছু আমদানী হয়েছে তার। খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে। এমনি সময় ওই মূর্তিমান রসভঙ্গের মত এসে হাজির হয়েছে ঋষি। জীবন তাস থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করে,—কেন রে ?

ঋষি আড়চোখে এদের কারবার দেখছিল। গোকুল আর তার হাতে ওই তাস — সামনে পয়সা দেখেই অনুমান করে নেয় ব্যাপারটা। বিরক্তই হয়েছে বুড়ো, এ বাড়ির অনেক দিনের চাকর সে।

জীবনের প্রশ্নের জবাব দেয় ঋষি,

—কি করে জানবো ? বলেন কেনে, এগে-মেগে বাবু আগুন হয়ে উঠেছে, চলেন যেন শিগগির।

—ধ্যুত্তোর !

হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল জীবন।

এবেলার মত এমন জমাটি আড্ডা ভেঙ্গে গেল।

—চল যাচ্ছি।

ঋষি নেমে গেল।

ওরাও যাচ্ছে। গোকুল অল্পসময়ের মধ্যেই মন্দ রোজকার করেনি।

দানের পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ পিছন থেকে জীবনের ডাকে থমকে দাঁড়ায়

পুরোনো আমলের বাড়ি। সিঁড়িও এইটুকু সরু—আলো বাতাসের ঢোকার পথ নেই। আবা একফালি আলো মাথার উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে এসে পড়েছে গোকুলের মুখে।

দুটো বড় বড় চোখে তার কি এক প্রলোভনের নেশা ; চারচৌকো হাড়-ওঠা মুখ— যেন এক বুনো হেড়োল অন্ধকার রাতে হঠাৎ ঝোপের পাশে কোন শিকার দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।

আঁধারে চক্ চক্ করছে দুটো চোখ বন্য কোন্ আদিম লালসায়। জীবনের দিকে চাইল সে জীবনের কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

গোকুল মনে মনে খুশিই হয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসা করে,

—হ্যাঁরে, সেই যে বলছিলি ? ওই যে ইয়ের কথা—

ঠিক পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারছে না জীবন, ভয় আর লজ্জা লাগছে। প্রথম অন্যায় করার লজ্জা।

হাসে গোকুল, এসব তার খুব জানা। এরাই তার শিকার— বেঁচে থাকবার অবলম্বন।

কাছে এসে গলা নামিয়ে গোকুল বলে,—ঠিক আছে। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু কিছু—। ডানহাতের দুটো আঙ্গুল এক করে টাকা বাজাবার ইশারা করে দেখায়।

—বেশ! নিয়ে যাবি ওবেলা।

জীবন সায় দেয়।

হাসছে গোকুল। শেষ বারের মত সাবধান করে জীবন।

—খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।

ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর সিঁড়ির ওই বদ্ধ গুমোট রহস্যান্ধকারে কেঁপে ওঠে। এ বাড়ির প্রতিটি ইট যেন চাপা কোন বিদ্রূপে হাসছে।

নীরব এই ইট কাঠগুলো এদের দেখে এসেছে কয়েক পুরুষ ধরেই। এমনি করে সিঁড়ির ধাপে ধাপে তারা নেমে গেছে কোন্ অন্ধকার অতলে, সেই অধঃপতনের নির্ম্মম সাক্ষী ওরা। আজও যেন তাই হাসছে—নীরব নির্ম্মম সেই হাসি।

বেলা বেড়ে উঠেছে।

লালডাঙ্গার বুকে মিঠে রোদ কেমন স্বপ্নময় স্পর্শ আনে। কাঁঠাল গাছের মসৃণ পাতায় রোদের নিবিড় স্পর্শ—ওদিকে শুরু হয়েছে শালবন সীমা, ক্রমশঃ উৎরাই এর বুক দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠেছে—উঠে গেছে আকাশ-কোলের দিকে। সবুজ আর হলুদে মেশামেশি।

পাখি ডাকছে। ধান বোঝাই গাড়িগুলো আসছে মাঠ থেকে। বাতাসে উঠেছে পিতল পেটার টং টং শব্দ। বাঁশবাগানের ওদিকে দিঘির কালো জল পার হয়েই কামারপাড়ায় লেগেছে কর্ম্ম-ব্যস্ততা, এই সময় তাদেরও কাজের মরশুম। সারা বছর চাষী-বাষীরা—তারও নীচের শ্রেণীর যারা দিন-মজুর—তারা দিন গোনে—কবে আসবে সোনা ফসলের এই দিনগুলো। পেট ভরে খেতে পাবে—কাজ পাবে ; সঞ্চয় করতে পারবে দু-চারটে বাসন-কোসন, সারা বছরের নিদারুণ অভাবের দিনে ন-কড়া ছ-কড়ায় তাই বন্ধক দিয়ে ফ্যান-ভাত জোটাবে দু-একটা দিন।

কামারপাড়ার খদ্দেরও তাই এ সময় বেশি। অতুল কামারের ছেলেরা পাশাপাশি দুটো শালে কাজ করছে, দিনরাত কামাই নেই। আরও কয়েকটা শালেও পিতল-কাঁসার কাজ চলেছে। এমনি সময় বড়বাবুর সেই হুমকি তাদের মাথায় যেন টনক নড়িয়েছে। ভয়ও পেয়েছে তারা, চিন্তায় পড়েছে ; কি করা যায়।

সরকার মশাই যাবার সময় অতুল কামারকেই বলে যায়,

—আপনারা ভেবে-চিন্তে দেখুন।

—তাই দেখি।

—তবে একটু শিগ্ গির জানাবেন। বোঝেন তো, মরশুমেই মাল না তুলতে পারলে আমারাই বা পাবো কি !

অতুল কামার সায় না দিয়ে পারেনি।

—তা তো বটেই আজ্ঞা! আমরা শলা করেই জানাচ্ছি।

—বেশ!

ভব্যিযুক্ত হয়ে বুড়ো প্রণাম করে সরকার মশাইকে। জোড়হাত করে বলে ওঠে,—বেরাহ্মণ দেবতা। তাঁকেও ঠাঁই দিতি পারিনি।

হাসে বুড়ো,—না, না। রাতে ছোটবাবুর ওখানে বেশ ভালোই ছিলাম। মহাশয় লোক।

গলা নামিয়ে বলে ওঠে বুড়ো অতুলকে,

—ওঁকে হাতে রাখুন কর্মকারমশাই, কাজ দেবে।

ওরা কি ভাবছে। অতুলও ভেবেছে ওই কথাটা। আরও সকলেই। একজনের আশ্রয় ভরসা না পেলে ওই দুর্দান্ত তারকরত্নবাবুর হাত থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই।

মহাজনের সরকারকে আজ সকালেই এমোকালী নিয়ে গিয়ে বন পার করে বড় রাস্তায় বাসে তুলে দিয়ে এসেছে।

অতুল আজ শালে বসেনি। কেমন যেন গা-হাত-পা বেদনা করছে অনবরত হাতুড়ি পিটে। তাই আজ জিরেন নিচ্ছে।

খড়ো বাড়ির উঠানে একটা চারপাই-এ বসে আছে বুড়ো। এক পাশে পুঁই লতাটা শীতের হাওয়ায় কচি পাতা মেলে লকলক করে উঠছে।

বুড়ো কাকে দেখে একটু অবাক হয়। এ সময় ছোটবাবুকে এখানে দেখবে ঠিক ভাবতে পারেনি।

—আপনি! ওরে একটা মোড়া-টোড়া কিছু দিয়ে যা।

অশোক তার আগে নিজেই ওদিকে একটা লোহার হাল দিয়ে তৈরি ছোট মোড়া তুলে এনে নিজেই বসেছে।

বুড়োর কাছে কথাটা আজ পাড়বে। অশোক কাল রাত্রে সদরের ওই সরকার মশায়ের কাছে কথাটা আলোচনা করেছিল। যদি দাদন না নেয়, মহাজনের ঘরে এরা এমনিই মাল যোগান দিলে মহাজন বেশ ভাল দাম দিয়েই কিনবে।

তাতে বানি থাকবে গড়পড়তা একটা লোকের প্রায় ছ-সাত টাকা, আর এখন পায় মাত্র দেড় টাকা, এক টাকা বারো আনা বড়জোর।

হাসে বুড়ো, জীর্ণ দেহে কেমন একটা অসহায় ভাব। ওর কথায় হাসছে।

—সবই তো জানি ছুটবাবু। কিন্তুক মাথা যে না বিকোলে কামারের প্যাট চলে না। ঘরে আমার ছটো খাটিয়ে মরদ—তাতেও নুন আনতে পান্তা থাকে না, সবই বরাত আজ্ঞা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন বরাত আর অদৃশ্য দেবতার অপার মহিমার উপর অচলা ভক্তি স্থাপন করে অসহায়ের মত বসে আছে ও। সকালের রোদ বেড়ে উঠেছে।

বুড়ো বলে ওঠে,—যা দিনকাল চলেছে ছুটবাবু, তাতে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা ঠিক হবেক নাই।—শ্যাযম্যায যা থাকে কপালে—

হঠাৎ ভুবনের বৌকে চা আনতে দেখে মুখ তলে চাইল বুড়ো। কলাইকরা দুটো কাপে করে বৌটা চা এনেছে। খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি চা—রংটা কালো। ওর সুন্দর হাতে কেমন যেন একটু বেমানান।

বড় বৌ কদমের বয়স হয়েছে একটু—তবু এখনও রূপ যায়নি। ছেলেপুলে নেই। দুর্গাপুরের মেয়ে—অশোকদের পৈত্রিক বাড়ির গাঁয়েই, সেই সুবাদেই বের হয় ওর সামনে।

—চা এনেছ দেখছি।

অতুল চা-টা হাতে নিতে নিতে বলে,—বৌমা আমাকে আবার নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছে বটে।

হাসে কদম। মিষ্টি সলাজ একটু হাসি।

বুড়ো বলে,—সত্যিই ছুটবাবু, নেন চা জুড়িয়ে গেল।

সলাজকণ্ঠে কদম বলে ওঠে,

— মুড়ি ভাজছি, গরম মুড়ি, কুসুম বীজ ভাজা দিয়ে আনবো চাট্টি ?

বাড়ির বড় বৌ। সংসারের চাকাটা সবই কদমকে সচল রাখতে হয়। মুড়ি ভাজছিল। আগুনের তাপে সুন্দর রংটা আরও টকটকে হয়ে উঠেছে। অশোককে মুড়ি খাবার কথাটা বলে যেন লজ্জায় মরছে সে।

বুড়ো অতুল হাসছে—আর কি কুসুম বীজ চিবোবার দাঁত আছে মা?

—তা এনে দেবো চাট্টি ছুটবাবুকে ?

—না না, বাড়ি থেকে খেয়েই বের হয়েছি।

কদম একটু হতাশই হয়।—তা তো হবেনই ঠাকুপো। গলা নামিয়ে বলে,

—তা তো হবেনই ঠাকুরপো। গরীবের ঘরের চাল-ভাজা—

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মাথার ছোট কাপড়টা তুলে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করে সরে গেল।।

লোকটা যেন চুপি চুপি অন্দর-মহলে ওদের দেখতেই ঢুকেছে, এক নজর দেখার পরই হঠাৎ এদের থাকতে দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে বৌ-ঝিদের সাবধান করার কথা মনে পড়ে যায় লোকটার! গলা খাঁকারি দিতে থাকে।

গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসে হরিনারায়ণ মুখুজ্যে। ইউনিয়নবোর্ডের আদায়কারী। বগলে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো দপ্তর—হাতে দড়ি-বাঁধা একটা দোয়াত ঝুলছে। পিছনে পাইক ঋষি ডোম। ওর হাতে একটা কম্বল গাট করে জড়ানো।

হরিনারায়ণ এক খরচায় ডবল কাজ করে, একদিকে বোর্ডের আদায়কারী, অন্য দিকে তারকরত্নের গদারগাঁ মৌজার তহশীলদার। পিছনে ঋষি ডোম সেই চলমান কাছারির প্রতিভূ। কম্বলখানা সঙ্গেই নিয়ে যায়। যত্রতত্র পেতে বসেই কাছারির কাজ শুরু করে দেয়। সেই সঙ্গে একটি ছোট্ট হুঁকোও থাকে—তাতে কাছারির ইজ্জৎও বাড়ে, আর হরিনারায়ণের তামাকের তেষ্টাও মেটে। হরিনারায়ণ বেশ মাতব্বরি ঢং-এ বলে,

--এই যে অতুল!

অশোকবাবুকে এখানে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছে হরিনারায়ণ, বড়-বৌ চা দিয়ে গেল তা দেখেছে। সমস্ত মনোভাব চেপে যাওয়া হরিনারায়ণের সহজাত ধর্ম, নইলে তারকবাবুর এস্টেটের কাজে লাগতে পারতো না। সহজভাবেই অশোককে নমস্কার জানায়।

—নমস্কার ছোটবাবু ! তা সকাল বেলাতেই বেড়াতে বার হয়েছেন?

হরিনারায়ণ জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ইতিমধ্যে মোবাইল অপিসের কাজ শুরু করেছে। বসে পড়েই লাল মোড়কের খাতা খুলে উল্টাচ্ছে পাতা। বই হাতে করলেই আর ওই কম্বলের আসনে বসলেই বোধ হয় হরিনারায়ণ বদলে যায়। হাঁড়ির মত মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, চাদরের ফাঁক দিয়ে ফতুয়ার বাইরে হাতে দোদুল্যমান ঢোলের মত ইষ্ট-কবচটা দেখা যায়। বলে চলেছে,

— কই হে অতুল, দাও দিকি গত তিন সনের খাজনাটা, আর হাল সনের চৌকিদারী টাক্সো — সব শুদ্ধ ধরো চৌদ্দ টাকা তিন আনা।

—চৌদ্দ টাকা।

হরিনারায়ণ ব্যাঙ-এর মত মুখখানা করে বলে ওঠে,

—হাঁ করছ হে ? এত করে ফেলে রাখলে জমবে না ?

অতুল আমতা আমতা করে জবাব দেয়,—তা তো বটেই আজ্ঞে, দিনকতক সময় দান। মালপত্র চালান দিই সদরে, ই ক্ষেপেই দিয়ে দোব ফিরে এলে।

অশোক উঠে গেল। এ সময় তার না থাকাই ভালো। যাবার সময় বলে ওঠে,

—একদিন বাড়িতে যেও অতুলখুড়ো।

—যাবো আজ্ঞে। অতুলও উঠে দাঁড়িয়ে অশোককে এগিয়ে দেয়। হরিনারায়ণ ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ঋষি কোত্থেকে তামাক সেজে এনেছে। এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

—সেবা করুন আজ্ঞে।

হরিনারায়ণ জলবিহীন হুঁকোটা টেনে চলেছে। শীতের সকালে মন্দ লাগে না, ওটা টানতেই যেন কলজেয় ভরসা পায়। এবার গলা চড়িয়েই জানান দেয় হরিনারায়ণ।

—এ সন বাকি পড়লে আর আমার দ্বারা হবে না অতুল। সোজা বাঁক্ড়োর বটতলায় গিয়ে জমা দিয়ে আসবে। ওই দশ টাকাই তোমার খরচ-খরচা নিয়ে ধরো পঁচিশ টাকায় দাঁড়াবে। তখন বাবু দোষ দিও না।

কথাগুলো চুপ করে শুনে যায় অতুল। টাকা নেই, থাকলে আজই দিয়ে দিত। ওদিকের দাওয়া থেকে বড়-বৌ মুড়ি ভাজা বন্ধ করে অসহায় দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে চেয়ে থাকে। হরিনারায়ণের চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল কদম।

মুড়ি ভাজতে থাকে।

লোকটা বিড়ালের মত কেমন কপিশ নীল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে। বিশ্রী মোটা ওই কদাকার লোকটা।

হরিনারায়ণ গলা বেশ তুলেই যেন কদম-বৌকে শুনিয়েই অতুলকে বলে ওঠে,

—তালে চৌকিদারী টাক্সো ? ওটা বাকি পড়লে ধরো তোমার ঘর-দরজার কপাট—গরু বাছুর, থালা ক্রোক করে আদায় করা হবে।

হরিনারায়ণ ওদিকে তখনও কদমবৌ-এর দিকে বিশ্রী ভাবে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ জীর্ণ দরজাটা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে হরিনারায়ণ থামল। ঢুকেছে এমোকালী।

পরনে শালের সেই কালিঝুলি মাখা ছোট কাপড়খানা, কাঁধে একটা বড় হাতুড়ি, বলিষ্ঠ দুর্মদ দেহের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

স্থির দৃষ্টিতে সে হরিনারায়ণের দিকে চেয়ে দেখে। চমকে উঠেছে হরিনারায়ণ। বেশ ভয়ই পেয়ে গেছে সে কালীর ওই চাহনিতে।

ঘটনাটা নিমেষের মধ্যে ঘটে যায়। ঋষি ডোমও এসব ইশারা বোঝে। চকিতের মধ্যে কম্বলটা গুটিয়ে নেয়, হরিনারায়ণও দপ্তর বগলে নিয়ে ওদিকে খোলা দরজা দিয়েই স্যাৎ করে গলে গেল।

অতুল ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ডাকছে,

—ও আজ্ঞা!

কে কার কথা শোনে। হরিনারায়ণ আর ঋষি দুজনেই তখন বোধ হয় ওপাশের খুলের দিকে এগিয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারে না অতুল।

হঠাৎ কালীর দিকে নজর পড়তেই থেমে গেল বুড়ো।

কালী ঘুঁটের বস্তা নিতে এসেছিল বাড়িতে—শালে যাবার পথে, হঠাৎ ওকে দেখে চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে জানে না। কালীও আশা করেনি হরিনারায়ণ এমনি করে পালাবে।

—কি হল গো মামা!

হঠাৎ হাসির শব্দে মুখ তুলে চাইল কালী।

কদম-বৌ হাসছে।

—ভাজবৌ!

কালী এগিয়ে যায় ওই দিকে। অতুলও বিব্রত বোধ করে বাইরের দিকে গেল মুহুরি মশায়কে দেখতে। হাসছে তখনও কদম।

—গেলা, হেসেই যে গেলা, ও ভাজবৌ!

কদমের এমনিতেই হাসি আসে। মোটা লোকটার স্বভাব, ওর হিংস্র চাহনির অর্থ বুঝতে কদমের বাকি নেই। তারপরই কালীকে ঢুকতে দেখে — চমকে উঠেছিল হরিনারায়ণ। কামারপাড়ার সম্বন্ধে অহেতুক আতঙ্ক অনেক-কিছুই জাগে এদের মনে।

সুতরাং হরিনারায়ণ চকিতের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। ভিতু শয়তান ওই লোকটা। কালী গজগজ করে।

—আ মরণ, হেসেই কুটিকাটি হলা গো!

কদম কথা বলে না—তপ্ত খোলায় একমুঠো চাল দিয়ে নিপুণ হাতে মুড়িগুলো নেড়ে চলেছে। চালগুলো সাদা ধপধপে মুড়িতে পরিণত হচ্ছে। শব্দ উঠছে—বিচিত্র একটা শব্দ।

—ধ্যুত্তোর।

কালীচরণ ওসব বোঝে না, দাওয়া থেকে ঘুঁটের বস্তাটা কাঁধে ফেলে বের হয়ে গেল শালের দিকে।

অতুল ফিরে এসেছে। মুহুরিমশায় তখন পড়েল পুকুরের পাড় দিয়ে হনহনিয়ে চলেছে। ডাকাডাকি করেও সাড়া মেলে না। অতুল অবাক হয়ে বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—কি হল দিদি বড়-বৌ ?

শ্বশুরের কথায় জবাব দিল না কদম। মুড়ি ভেজে চলেছে। পট পট শব্দ উঠছে, হু হু জ্বলছে কাঠের আগুন। গরমে তাতে ঘেমে উঠেছে কদম।

তখনও হাসি হাসে। ছোটবাবু থাকলে মন্দ হ'ত না ব্যাপারটা।

অশোক মনে মনে কথাটা অনেক ভেবেছে। একটা কিছু করা দরকার, স্থায়ী কোন কাজ। রাত্রে সরকারমশাই-এর মুখ থেকেও সব খবর নিয়েছে। কাঁসা পিতল এবং আশপাশের গ্রামের তাঁতিদের ব্যাপারও জানে। বাঁকুড়ার তাঁতিদের নামও বাইরে প্রচুর। তারাও কারিগর হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু সেই সেকেলে তাঁত আর সেই মোটা সুতো দিয়েই তারা কাজ করে। বানায় শুধু গামছা আর মোটা ধুতি, কেউ কেউ বানায় চাদর।

বনমালী তাঁতিও সেদিন বলেছিল অশোককে,—একবার একশো বিশের সুতো কিছু দ্যান —হাতের কাজই দেখাই বাবু।

অশোককে সত্যি বনমালী তাদের এলেম দেখিয়েছিল। তাদের অবস্থাও দেখেছে অশোক — দেনার দায়ে আর দাদনের চাপে মাথা মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে।

অন্ততঃ বানানোর ব্যপারে একটা সমবায় গড়বার চেষ্টা করেছে অশোক। কিন্তু ওদের কথাটা নিজে জানায় নি। ওরা অভাব আর দুঃখটা বুঝে যেদিন নিজেরাই উৎসাহী হবে সেদিন পথের সন্ধান দেবে অশোক। অন্ততঃ চেষ্টা করবে।

তার জন্য ওদের নিজেদেরই তৈরি হতে হবে। সেই মনোবৃত্তি জন্মাবে এমনি দুঃখ আর অভাবের মধ্যেই।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার, পরামর্শ দেবার কেউ নেই। বরং উল্টে অনেকে কথাই শোনাবে।

নীলাম্বরবাবু রোদপিঠ করে কাগজখানা পড়ছিলেন, কালকের সান্ধ্য কাগজ। এখানে অনেক কষ্টে তিনি আনাবার ব্যবস্থা করেছেন ওটা। শহর—দূর কোন গতিশীল মহাজীবনের সঙ্গে ওই একটু ক্ষীণ যোগসূত্র। মাঝে মাঝে আগেকার সেই কর্মব্যস্ত জীবনের কথা মনে পড়ে।

আজ পল্লীর এই স্তিমিত বয়োজীর্ণ সমাজের বিকৃত ধারার মাঝে এসেছে নীচতা আর আলস্যের পঙ্কিল শৈবালদাম, গতিরুদ্ধ হয়ে গেছে।

তারই মাঝে আটকে পড়েছেন তিনি। যেন অসহায় বন্দী একটি জীব। হঠাৎ অশোককে আসতে দেখে কাগজখানা ফেলে ওর দিকে চাইলেন।

—এসো।

অশোক এগিয়ে এল।

সেদিনের সেই কথাগুলো মনে পড়ে। ভৈরবের মামলার ব্যাপারে অশোক সেদিন পরিষ্কার অসম্মতিই জানিয়ে দিয়েছিল। হয়তো নীলাম্বরবাবু মনে কোথায় আঘাতই দিয়েছে সে, কথাটা তাই এখনও আর তুললো না অশোক।

নীলাম্বরবাবুই বলেন,—সেদিন ঠিকই বলেছিলে অশোক। ওসবের সার্থকতা আছে কিনা এ নিয়ে আমিও ভেবেছিলাম, ওই ঠাকুর নাখেরাজ দেবোত্তর ইত্যাদির—

প্রীতি বাবাকে চা দিতে এসেছিল, অশোকের সঙ্গে দেখা হতেই একটু হাসির আভা দেখা দেয় মুখে। অশোক বলে ওঠে,—চা এখুনিই খেয়ে আসছি।

প্রীতি যাবার সময় বলে ওঠে, বাবা হাটে যেতে হবে কিন্তু। নীলাম্বরবাবু ওর কথা বোধহয় শুনতেই পাননি। নিজের মনেই কি ভেবে চলেছেন। বলে ওঠেন,

—দেবতার অভাব-অবহেলার চেয়ে আজ মানুষের অভাব, মানুষের প্রতি অবহেলাটাই যেন বড় হয়ে ঠেকছে চোখে।

অশোক কথা বলে না।

কথাটা সেও ভাবে, কিন্তু এমনি তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখেনি।

তারও মনে হয় কথাটা সত্যিই। চোখের উপর দেখছে, শুধু অতুল কামার কেন—আরও কত লোকের উপর ওদের অবিচার। কিন্তু কতটুকু তার সামর্থ যে সে-সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। যতদিন না তারা নিজেরা সেই প্রতিবাদের ভরসা পায়—ততদিন তাদের হয়ে আর কেউ প্রতিবাদ করে তাদের আগলে রাখবে এটাও সম্ভব এবং সঙ্গত নয়।

অশোক বলে ওঠে,—একটা সমবায় সমিতির কথা ভাবছিলাম।

নীলাম্বরবাবু ওপর দিকে মুখ তুলে চাইলেন,—অর্থাৎ?

—এই কর্মকারদের বাসন—তাঁতিদের কাপড়চোপড় নিয়ে প্রথম—তার পর সম্ভব হয় এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ।

অশোকের তরুণ স্বপ্ন দেখা মনে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি একটার পর একটা ফুটে ওঠে। অশোকও দেখেছে এতদিন ধরে এই প্রচলিত নিয়ম। বাসন কাপড়-চোপড় নিয়ে কি মুনাফাই করে ঊর্ধ্বতন একটা শ্রেণী—এইখানে ওদের চোখের উপরেই। দেখেছে বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার গলদ।

বলে ওঠে,—ধরুন আমাদের গ্রামেই মোট হয়তো হাজার বিঘে আবাদি জমি আছে। তাতে চাষ-আবাদ করতে হয়তো একশো জন মুনিষ—পঞ্চাশজোড়া বলদ লাগে। কিন্তু হিসেব করে দেখুন গে—ঘরে ঘরে মরা-আধমরা বাছুর ছায়ের মত বলদ—তাও প্রায় একশো জোড়া আছে, আর চাষ-আবাদে পড়ে আছে প্রতি চাষীর ঘরে দু-তিনজন করে প্রায় চারশো জন মুনিষ-মাহিন্দার। সব যদি কো-অপারেটিভে করা যায় তাহলে প্রথমেই বিরাট একটা অপচয় আর পরিশ্রম বাঁচানো যায়।

প্রীতিই কথাটা বলে ওঠে,—যে লোকগুলো বেকার হবে তাদের উপায়?

অশোক প্রীতির দিকে চাইল। প্রশ্নটা তার মনেও উঠেছিল। প্রীতিই বলে ওঠে,

—বিকল্প কোন ব্যবস্থা, যেমন কোন ফ্যাক্টরি বা অন্য কিছু থাকলে তবেই এই আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। জেনো এই তোমাদের এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ—

অশোক জবাব দেয়,—তার আগে এ সম্বন্ধে কিছু করা যায় না?

নীলাম্বরবাবু ভাবছেন। অনেকদিন থেকেই তিনি এই সর্বনাশটা দেখে আসছেন। ঘরে দশ বিঘে পনেরো বিঘে জমি নিয়ে এরা আয় করবার কিছু না পেয়ে চাষ করার নামে খরচই করে এসেছে হাল বলদ মুনিষ রেখে, দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছে। ধুকে ধুকে কোনরকমে অস্তিত্ব-টুকু টিকিয়ে রেখেছে—'চাষী গেরস্থ' এই ভুয়ো সম্মানের মোহে।

লেখাপড়া শেখবার সুযোগও পায়নি। পেয়েছিল যারা, তারা ধেনো-জমিদারীর গর্বে বুক ফুলিয়ে বাইরে গিয়ে জাহির করে এসেছে—গোলামী করব না, কাদাঘেঁটে খাবো।

এই করে অক্ষম আলস্য আর নীচস্বার্থান্ধ পরিবেশের দেশজোড়া দুঃখ-অভাবের অন্ধকারে শিয়ালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজও তারা টিকে আছে সর্বত্র।

বাধা দেবে তারাই। মরবে তবু বাঁচবার পথ খুঁজবে না। চোখবাঁধা বলদের মতই ঘুরপাক দেবে সেকেলে সেই ঘানিঘরের চারপাশে—তবু চোখ খুলে উদার আকাশের দিকে চাইবার সাহস তাদের নাই। আলোকে ভয় করে, চোখ ধাঁধিয়ে আসে।

বলে ওঠেন নীলাম্বরবাবু,—সেদিন এখনও আসেনি অশোক।

—তবে?

—দুঃখ দুর্দিন আরও আসুক, নয় তো কোন বিরাট ধাক্কা আসুক; যেদিন এরা চাষ করবার, লাঙল দেবার মুনিষ পাবে না; তারা অন্য কোন জীবিকার সন্ধান পাবে। ফলে অজন্মা হয়ে পড়ে থাকবে ক্ষেত, সেদিন এরা এগিয়ে আসবে—ভাববে ওই যৌথ চাষের কথা। সর্বনাশ সামনে এলে, সব হারাবার কথাটা সত্য হলে তখনই ভাববে অর্ধেক নিয়েই তৃপ্ত থাকি। সেইদিনই এরা ওই যৌথের কথা ভাববে। ভায়ে ভায়েই যেখানে ফৌজদারী, সেখানে যৌথের কথা ভাবাও স্বপ্ন। বাধা দেবে ওই বামুন কায়েত চাষীরাই। নীলাম্বরবাবু যেন বেদনাভরা কণ্ঠে কথাগুলো বলেন।

অশোক কি ভাবছে। ও দেখেছে সমাজের মাথায় ওই জাতি আর সংস্কারের দোহাই দিয়ে যারা বসে আছে তারাই এই অনর্থের মূল।

—চাকা কি তবু ঘুরবে না ?

—ঘুরবে।

প্রীতি অশোকের দিকে চেয়ে থাকে। অশোক বলে ওঠে,

—ঘুরবে, তবে উপর থেকে নীচের দিকে সহজে চাকা নামে না, নামে তখনই যখন নীচের থেকে ঠেলে উপরে উঠতে যায়। নীচু আর ওপর, দুদিকের টানের পাল্লায় যার ভার বেশি, সেই জেতে। চাক নীচু দিক থেকে চাপ দেয় উপরের দিকে । ঠেলে ওঠে—তবেই চাকা ঘোরে।

কথাটা অশোক যেন বিশ্বাস করছে।

দেখেছে উপরের সমাজে ঘূণ ধরেছে—নানা ব্যাধি, আলস্য আর অকর্মণ্যতার ঘূণ।

এক শ্রেণী তাই অন্তরে অন্তরে নোতুন করে বাঁচবার পথ দেখছে।

—বাবা! বেলা হয়ে গেল।

নীলাম্বরবাবু প্রীতির ডাকে মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ হাটের কথাটা মনে পড়ে তাঁর।

উঠে পড়েন তিনি,—এই যে যাচ্ছি।

প্রীতিও পাকা গিন্নীর মত আউড়ে চলে,—উচ্ছে বেগুন, সঙ্গে কাঁচকলা নেবে, তারপর কপি —হ্যাঁ, আলু কিনো না, বাড়িতেই আছে।

অশোক হেসে ফেলে,—যজ্ঞি বাড়ির ব্যাপার যে—

প্রীতি ছোট্ট জবাব দেয়,—ওসব তো ভাবতে হয় না?

হাসে অশোক।

—না। পাত পাড়ি ভাত খাই। একটু শান্তিতে আছি।

নীলাম্বরবাবুর সঙ্গে বের হয়ে আসছে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি, ওর দিকে যেন চেয়ে রয়েছে সে।

সকালের সোনারোদ সবে গেরুয়া রং ধরেছে, শীতের শিরশিরে হাওয়া বাঁশবনের পাতায় হলুদ আভা এনেছে—ঝরে পড়ছে ওরা দমকা বাতাসে। পত্রহীন তিরোল গাছের হিজিবিজি ডালগুলো আকাশে কি যেন অদৃশ্য আঁখরে এক মহাকাব্য রচনা করেছে।

ধানের গাড়ি ঢুকছে মাঠ থেকে গ্রামে। পুরোদমে ধান কাটা চলেছে। শীতের বাতাসে খেজুর গুড়ের মিষ্টি গন্ধ ওঠে।

খামারে খামারে এখন ধান। ছোট ছোট কয়েক বিঘে জমির চাষী এরা, এদের মধ্যে দু-একজন একটু সঙ্গতিপন্ন, বাকি সকলেরই অবস্থা—অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণঃ গোছের। কোনরকমে বন থেকে কিছু কাঁটাগাছ এনে ছোট্ট একটু জায়গা ঘিরে মন্দিরের মত ছোট ছোট কয়েকটা ধানের পালুই করেছে।

অনেকের অবস্থা আরও শোচনীয়। মা-লক্ষ্মী ঘরে ঢোকবার আগেই দোকানদার ছানু দাস লোকজন বস্তা নিয়ে এসেছে। এতদিন সেই ভাদ্র-আশ্বিন থেকে তাদের দোকানে বাকিতে খেয়েছে —সেই বাকি টাকা সুদ সমেত আদায় করে নিয়ে যাবে ওই ধানে। তাই একদিকে পাটা পেতে ধান পিটান হচ্ছে—সারা বছরের সঞ্চয় পরিশ্রমে অর্জিত ওই সোনাধান তুলে দিতে হবে ওদের হাতে।

ধরণী মুখুয্যের খামারেও ধান পিটোনো হচ্ছে। হঠাৎ ধরণী মুখুয্যে লাফ দিয়ে ওঠে মুনিষটাকে ধান কয়েক পণ সরাতে দেখে।

নিতে বাউরী ওর বাড়ির মুনিষ, রেওয়াজ হিসাবে সারা বছর যে মুনিষ তার বাড়িতে খাটবে তাকে দৈনিক মজুরি ছাড়া পাঁচকাঠা জমির ধান দেওয়া হয়, উপরি পাওনা হিসাবে। তাকে বলা হয় বোঁটাড়ে। বোঁটাড়ের ধান মুনিষেরই প্রাপ্য।

নিতে বাউরী মুনিবের হালচাল দেখে একটু সন্দিহান হয়েই ধান ক'পণ আগে থেকে সরিয়ে রাখছে। পরে পাবে কিনা কে জানে। ধরণীর নজর এড়ায় না।

গর্জে আসে ধরণী,—এ্যাঁও। ওটা ওদিকে রাখছিস যে?

—আজ্ঞে বোঁটাড়ের ধান। নিতে জবাব দেয়।

ফেটে পড়ে ধরণী,—মাদাড়ি কোথাকার বোঁটাড়ে খেতে আইচে ? সারা বছর চায করেছিস?

অবাক হয় নিতে বাউরী। জবাবটা দেয় নিতের সিট্‌কে বৌটা।

সি কি কথা, হেই মা গো!

লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে সোনাধানের দিকে। নিতে বাউরীর পাঁচ-সাত দিনের মজুরির ধান বাকি। খবর পেয়ে বৌটা ঝুড়ি নিয়ে এসেছিল।

ধরণী গর্জন করে চলেছে,—বোঁটাড়ে দেবে ওকে! কভি নেহি।

নিতে বাউরির মাথা থেকে টানাটানিতে ধানের আঁটিগুলো পড়েছে ধরণীর গায়ে; ছিটকে পড়ে ধরণী মুখুয্যে কাঁটাবেড়ার উপর। হাত-পা ছড়ে গেছে। উঠে পড়েই দুমদাম লাথি চড় চালাতে থাকে সে।

নিতে থমকে দাঁড়িয়েছে। মার খেতে খেতেই বলে ওঠে,

—ঠাকুর; মারবা নাই কিন্তু।

—অ্যাও। থানা পুলিশ করেগা। খামার থেকে ধান লুট করবি শালা বাউরী!

—সে কি আজ্ঞে !

বৌটা চেঁচাচ্ছে,—হেই মা গো ! ও ঠাকুর !

ছানু দাস এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, গোলমাল দেখে সেও এগিয়ে যায়।

ধরণী যেন মোকা পেয়ে যায়,— তুই সাক্ষী ছেনো। এই দেখে যা, বেহ্মরক্তপাত করে কিনা ব্যাটা বাউরী ধান লুট করছে।

—ঠাকুর পাঁচদিনের খোরাকি ধান ? নিতে বলে ওঠে।

ধরণী লাফ দিচ্ছে,—একটি দানা নেহি দেঙ্গা—থানা কোটে যা !

অশোক এসে পড়েছে সেই সময়। নীলাম্বরবাবুও রয়েছেন সঙ্গে নিতের বৌটা চেঁচাচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নিতে, ধরণীর মারে বলিষ্ঠ দুর্মদ জোয়ানটার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, দাঁত দিয়েও। কেমন যেন অসহায় একটি মানুষ। পায়ে পায়ে সরে গেল সে।

বৌটা চীৎকার করছে,—ধরম দেখবেক ! ছারেখারে যাবা ঠাকুর। হলহল গরীবরে ভাত মারা ! হেঁই ঠাকুর, এখন দিন আত করছো—ইয়া দেখবা নাই ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা।

ধরণী মুখুয্যে তখনও চেঁচাচ্ছে।

—আজই ষোল আনা ডাক করিয়ে এর বিচার করবো। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি? জমিদারীতে বাস করবি—আবার বাড়! জুতিয়ে লম্বা করে দোব।

বাউরীপাড়ার মাঠ ওই চকের এক কড়া এক ক্রান্তির হিস্যাদাব ওই ধরণী মুখুয্যে। সেই এক কড়ার জমিদারের মেজাজটা ক্রমশঃ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

নীলাম্বরবাবু অশোকের দিকে চাইলেন।

কথা কইল না অশোক।

শান্ত পল্লীর আকাশে তখনও একটি করুণ নালিশের ব্যথা সুর শোনা যায়। নিতের বউটা কাঁদছে।

—হেঁই ঠাকুর ! তুমি ইয়ার বিচের সকরো ঠাকুর !

একটা চিল উড়ছে আকাশে—দূর আকাশে।

তারকবাবু বিচারে বসেছেন।

প্রেসিডেন্ট হাকিম এই পদাধিকারে তিনি এ অঞ্চলের অলিখিত কোন দলিল বলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাড়ির বাইরেই খানিকটা ফাঁকা ডাঙ্গা—ধীরে ধীরে উঠে গেছে জঙ্গলের দিকে।

ফাঁকা মাঠে ছড়ানো দু-একটা অশ্বত্থ কেঁদ আমগাছ ; বাঁশ বাগানে শীতের হাওয়া লেগেছে —হাওয়া বইছে শস্যরিক্ত প্রান্তর থেকে।

অবনী মুখুয্যে ইউনিয়নবোর্ডের রকে বসে কাগজ পড়ছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটে। না হয়, ফাঁক খোঁজে, কেউ কোন নালিশ ফরিয়াদ করতে এলেই এগিয়ে যায়। তাকে বলে।

—মুসাবিদা করে দিই দাঁড়া। বেশি লাগবে না, আট আনা।

—আজ্ঞে ! লোকটা ইতস্ততঃ করে।

এদিকে অবনী ইতিমধ্যে কাগজ-কলম বের করে বসে গেছে।

—বল! দেখ মুসাবিদার চোটেই রায় উলটে দিচ্ছি।

এইভাবেই সে কিছু কামাই করে।

অবনী মুখুযোর অবশ্য সে ক্ষমতা আছে। সেই মুসাবিদার মামলা গড়াতে গড়াতে সদর পর্যন্ত যাবার পথই করে রেখে দেয় সে।

ওরাও তা বুঝতেপেরেছে। তাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে তাকে।

—আজ্ঞা! রবিখন্দ চুরির মামলা। যোল আনাই দণ্ড দিয়েছি।

এদিকে তারকবাবু ঘুর ঘুর করছে গোকুল, সে এই সব ক্ষেত্রেই থাকে। নানা খবর জোগায় তারকবাবুকে।

কাউকে না দেখে বলে ওঠে গোকুল,

—আজ্ঞে গোপগাঁয়ে কুসুমবাবুর আজকাল বোল-বোলাও, শুনছি ধানকল বসাবে।

—তাই নাকি ! তারকবাবু খরবটা শুনে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাকে কেউ ছাড়িয়ে যাক। সে চায় না। অন্ততঃ তাই কল বসাবার আগে ট্যাক্সটা পাকাপাকি বসাবার ব্যবস্থাই করবে সে।

—ঠিক জানিস ?

গোকুল হাসে,—আজ্ঞে এ চাকলার হাঁড়ির খপর জানি।

হাসছে তারকবাবু । তা সে জানে।

তাই বোধহয় ওকে হাত রাখে। তাছাড়া গোকুলকে ভয় করে, এড়িয়ে চলে এ চাকলার সকলেই। সই গোকুলেরও দরকার একটা আশ্রয়।

সেও বুঝে শুনে বড় গাছেই ভেলা বেঁধেছে।

কাজ চলেছে, এমনি সময় এসে হাজির হয় হরিনারায়ণ। বানের আগে খড়কুটো ভেসে আসার মত আগেই এসে হাজির হয়েছে ঋষি ডোম।

শীর্ণ পাটকাঠির মত চেহারা। চোখদুটো গাঁজার ধোঁয়ায় লালই থাকে সবসময়।

এসে একেবারে তারকবাবুর পায়ের কাছেই ধপাস করে বসে পড়ে ঋষি।

—কি হল রে ? অবনী মুখুয্যেও এসে পড়েছে।

ঋষি হাঁপাচ্ছে ,—এজ্ঞে এমোকালী, কাঁধে ইয়া লোহাপেটা হাতুড়ি নিয়ে হরিনারায়ণবাবুকে—

গোকুল চুপ করে থাকে।

চমকে ওঠে তারকবাবু—সে কি রে !

তারপরই হরিনারায়ণ মোটা থলথলে শরীর নিয়ে এসে যেন কোন রকমে এলিয়ে পড়ে রকে।

—জল ! একটু জল দে বাবা!

গোকুলই টিনের গেলাসে জল গড়িয়ে এনে দেয়। এক নিঃশ্বাসে সব জলটা কোঁক কোঁক করে গিলে হাপরের মত ফোঁস ফোঁস শব্দে দম নিতে থাকে সে।

—কি হয়েছে ?

জাবেদাখাতা রোকড় ছাতা চারিদিকে ছত্রাকার করে ছড়ানো। একটু সামলে আর্তনাদ করে ওঠে হরিনারায়ণ।

—আজ্ঞে ক্ষ্যামা দিন বড়বাবু। কুন্দিন অপঘাতে এই কামারপাড়ার গুণ্ডোরাই খাম করে দেবে

ঋষি তড়পাচ্ছে—একেবারে ওর বাড়ির উঠোন কিনা, তাই জবাবটা দিতে লারলাম আজ্ঞে

—থাম তুই।

তারকবাবু ঋষি ডোমকে থামিয়ে দেয়।

—কেউ সাক্ষী ছিল ? অবনী পাকা উকিলের মত জেরা করে।

—আজ্ঞে বাড়ির ভেতর, মেয়েছেলেরা।

মনে মনে কি ভাবতে থাকে তারকবাবু। গজগজ করে।

—কামারপাড়ার ওরা বড্ড বেড়েছে, ওই অতুলের গুষ্ঠি।

—ইয়েস, ভেরি ট্রু। অবনীবাবুও সায় দেয়।

হরিনারায়ণ খাতা জাবেদা কুড়িয়ে নিয়ে ওধারে গিয়ে সেরেস্তা পেতে বসলো। জানে তারকবাবু, হরিনারায়ণই এর জবাব দিতে পারে। আর কাজ ছেড়ে দেওয়া ওদের ভয়-- হরিনারায়ণের কাছে ওটা একটা অবাস্তব কল্পনা!

তবু আজ তারকবাবুর কাছে মনে হয় এমোকালী আর কামারপাড়ার লোকদের ওই প্রতিবাদ ক্রমশঃ ধুঁইয়ে উঠছে। একদিন জ্বলে উঠতে দেরি হবে না। চুপ করে কি ভাবছে তারকবাবু।

নিতে বাউরীকে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে তারকবাবু। নিতে এসেছে নালিশ জানাতে মাথা নীচু করে গড় করে।

ধরণী মুখুয্যের নামে নালিশ ছিল আরো।

—আজ্ঞে বোঁটাড়ের ধান, তিন দিনের মজুরী ধান—রসদ হাঁকিয়ে দিইছে, হেঁই বড়বাবু।

অবনীই বলে ওঠে—আর্জি করে এনেছিস ?

—আর্জি! অবাক হয়ে চাইল নিতে ওর দিকে।

তারকবাবুর যেন ক্লান্তি এসে গেছে এ সবে। জবাব দেয়,—হ্যাঁ হ্যাঁ,—লিখে আনগে। কাল রবিবার, পরদিন আসবি।

ব্যাপার দেখেই মিইয়ে গেছে নিতে। বলে ওঠে,

—আজ্ঞে নিখে দিলে কিছুই হবে না বড়বাবু ? আইছি, ডাকান এখুনি, এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরিনারায়ণ যেন গ্রামের এদের সকলের উপরই হাড়ে হাড়ে চটে উঠেছে কালীর এই ব্যাপারের পর থেকেই। ব্যাটারা সবাই নিমকহারাম বেইমান। ওর কোন মায়া দয়া নেই ওদের ওপর।

কড়া স্বরে বলে ওঠে,

—ব্যাটা বাউরী কোথায় মদ মেরে পড়েছিলি, খাটতে যাসনি ভরা চাযে না হয় ধুরমার ধান কাটায়। গড়ের হদ্দ! গিয়েছ বোঁটাড়ে খেতে ? অমি জানি না তোকে?

নিতে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে।

—আজ্ঞে মিছে কথা।

হরিনারায়ণ বলে ওঠে,

—চোপ, জিব টেনে সলতে পাকিয়ে দোব।

চুপ করে যায় নিতে । সে অবাক হয়ে গেছে, হরচকিয়ে গেছে। এদের এখানে লিখে-পড়ে এনে নালিশ করে কি ফল হবে তা অনুমান করতে পেরেছে সে।

অন্য সকলের মত কান্নাকাটি করে হুমড়ি খেয়ে পা ধরতে পারে না নিতে। নিজের হক্ জানাবার দাবিও নেই, শুধু ভিখেরির মত ভিক্ষে করা আর কাঁদা, এটা যেন কেমন অসহ্য ঠেকে তার কাছে।

চুপ করে বের হয়ে গেল নিতে। তার ফরিয়াদ জানাবার কোন ঠাঁই-ই নেই।

কেউ ওর দিকে ফিরেও চাইল না, শুনতেও চাইল না তার অভিযোগ—তার জন্য সমবেদনা সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা।

বেলা বেড়ে ওঠে। লালডাঙ্গায় অভ্ররোদ ঝকমক করে—জনহীন প্রান্তর আর বনসীমা কেমন উদাস রৌদ্রমাখা একটি নীরব বেদনায় গুমরে কাঁদে। তারই মাঝে চলছে নিতে বাউরী—ওর বুকেও নীরব দুঃসহ কোন জ্বালা।

তারকবাবুর রাজ্যি জোড়া বিরাট খামার। রাজ্যের ধান পর্বতের মত পালুই করে রাখা হয়েছে—ওরই দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে বাউরী।

খামারের ইঁটের প্রাচীর এক জায়গায় খানিকটা ধ্বসে পড়েছে, ডাঙ্গার গড়ানি জলস্রোতের মুখেই পাঁচিলটা; বালি-কাঁকর ঢাকা একফালি শুকনো নালা বর্ষার সময় জলের তোড়ে মেতে ওঠে—তারই ধাক্কায় ওইখানকার পাঁচিলটা মাঝে মাঝে ধ্বসে পড়ে। হঠাৎ সেই ভাঙ্গার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে নিতে বাউরী।

নির্জন মধ্যাহ্ন। অশ্বত্থ গাছে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে—হাওয়ায় কাঁপে কেঁদ গাছের পাতাগুলো।

কি ভাবছে নিতে বাউরী।

ধান! হেলাফেলা ধান চারিদিকে।

মাঠের বুকে ওরা সারা বছর জলে ভিজে রোদে পুড়ে ধান ফলিয়েছে—সেই ধান ঢুকেছে অবনী মুখুয্যে, ধরণী—আর তারকবাবু—ওদের সবার খামারে। তার ঘরে ছেলে বৌ উপোসী। নালিশ ফরিয়াদ করবার উপায়ও নেই।

বৌটার শুকনো মুখ আর কান্না মনে পড়ে। আসবার সময় দেখেছে শূন্য ঝুড়িটা উঠোনে ফেলে দিয়ে বৌটা মাথা ঠুকছে। ছেলেমেয়েগুলো কাঁদছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নিতে।

বেশি না—এত ধানের পাহাড় থেকে কগণ্ডা কয়েক ধান নিলে কিছু যাবে আসবে না তারকবাবু। দুটো দিন তার ছেলে বৌ ভাত পাবে।

পাপ!

হাসে নিতে। তার প্রতি অন্যায়ের যদি বিচার না হয়, তার অন্যায়ের বিচারও করবার অধিকার কোন বিচারকের নেই।

চুপি চুপি এগিয়ে যায় পালুই-এর দিকে। চারিদিকে ছড়ানো ধান থেকে তুলছে কয়েক আঁটি দান, পুরুষ্টু সতেজ সোনা ধানের মঞ্জরী, দেখলে চোখ জুড়োয়।

আঁটি বাঁধতে যাবে, হঠাৎ খড়পালুই-এর ওদিকে নির্জন জায়গায়টায় কাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। কে যেন নিতে বাউরীর মুখে কসে চাবুক মেরেছে। লজ্জায় ঘৃণায় সরে এল নিতে।

দিনের রোদও কেমন ম্লান হয়ে গেছে। বাতাসে কিসের হাহাকার। সব যেন কেমন ধ্বসে পড়বে।

নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারে না। বেজা বাউরীর বউ লবঙ্গ—আর বড়বাবুর ছেলে জীবনবাবু। দুজনকে ওখানে দেখবে কল্পনাও করেনি—উন্মাদ হয়ে গেছে ওই বিচারক-এর পুত্র, ওদের অন্তরে অন্তরে পচন ধরেছে—থিকথিক করছে পোকা।

বেজা বাউরীর বউ-এর হাসির শব্দর তখনও কানে অসে—হাসছে নির্লজ্জ মেয়েটা। সরে এল নিতে।

ওরা ওর চেয়েও যেন অনেকখানি নীচে নেমে গেছে, ওই তারক—জীবনবাবুর দল। ওরাও চোর—নইলে গোপনে তাদের ঘরের বৌ-ঝি-এর ইজ্জৎ চুরি করতে যেতো না। তারা এদের ঘরে সিঁদ দিয়েছে।

কাঁপছে ওই খড়গুলো—হাসির শব্দ ওঠে। কি যেন একটা জড়িত কণ্ঠের কথা শোনা যায়। ওদের কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না।

হুড়মুড়িয়ে আলগা কতকগুলো খড় পড়ে গেল। তখনও হাসছে মেয়েটা।

পায়ে পায়ে সরে এল নিতে বাউরী। সারা মন তার ঘৃণায় ভরে ওঠে।

ওদের ওই ধান ক'আঁটিও তুলে নিতে পারল না। কেমন একটা দুর্বার ধাক্কা সে পেয়েছে ওদের ধান ছুঁতেও ঘেন্না হয়—পাপের বীজ থিকথিক করছে সর্বত্র।

এগিয়ে আসছে নিতে বাউরীপাড়ার দিকে। এ সময় খাটিয়ে মরদ কেউ থাকে না, মেয়েছেলেগুলো গেছে গরুর পাল নিয়ে, কেউ বা এখন মাঠের আলে এদিক - ওদিক ছড়ানো ধানের শিষ কুড়োতে বের হয়—তবু এক আধ সের ধান আসে ঘরে।

বটতলায় দেখে, বেজা বসে আছে ঝিম মেরে।

খড়পালুই-এর আড়ালে সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে নিতে বাউরীর। রাগ হয়।

—বেজা! এ্যাই বেজা ?

নিতের ডাকে সাড়াই দেয় না সে। কাছে এগিয়ে যায় নিতে,—এ্যাই শালা। বলি কানে রা যেছে না ?—আঁ্যা ! চোখ তুলে চাইল বেজা, কেমন করমচার মত লাল দুটো চোখ, একটা মলিন ধুকুড়ি কাঁথা গায়ে দিয়ে রোদে থর থর করে কাঁপছে। বলে ওঠে বেজা,

—জ্বর আইছে যি গো। ধুরমার জ্বর !

ওর দিকে বেদনাহত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে। অসহায় একটা মানুষ। ও জানে না ওর ঘরে আগুন লেগেছে। একেবারে সেই আগুন সেঁধিয়েছে ওর জীর্ণ চালা ঘরের সারা ছাদনে।

—কি বলছো ?

কথার জবাব দিল না নিতে, এগিয়ে গেল ওর ঝুপড়িটার দিকে। এতক্ষণে মনে পড়ে—উনুনে আগুন পড়েনি।

কালিমাখা মাটির হাঁড়িটাও আজ উনুনে চাপেনি—মা লক্ষ্মী ঘরে বাড়ন্ত।

ছেলেগুলো বোধ হয় গরুপালে গেছে—না হয় ধানের শিষ সংগ্রহে। বৌটা ওর দিকে চাইল। তোশা আর বেদনাভরা সেই চাহনি মেলে বৌটা জিজ্ঞাসা করে,

—পেলা কিছু ?

কি জবাবা দেবে ! চুপ করে বসল নিতে। বলে ওঠে,

— একটু জল দে দিনি ? খাই, পিয়াস লেগেছে।

তেষ্টা লেগেছে নিতে বাউরীর, বুক জোড়া কেমন অসহায় একটা জ্বালা ; মাটির ভাঁড়ের জলে তা যেন যাবার নয়।

মিষ্টির মনে একটা গুনগুনানি সুর। লোহার পাড়ার একধারে ছোট্ট বাড়িটাও তার যেন ওই পরিবেশ থেকে আলাদা। থাকেও একটু ছিমছাম।

জলটোপ লোকটা কেমন একটু বিচিত্র ধরনের, মাঝে মাঝে মিষ্টির ওকে কেমন বিচিত্র ঠেকে। কথা বলে কম। দিন রাতই কাজ নিয়ে আছে। মাটিরর পুতুল থেকে অন্য কাজে হাত দিয়েছে। মাটি দিয়ে গড়ছে সেই মূর্তিটা—গদাই কুমোরের শালে পুড়িয়ে তবে জৌলুস আনবে।

বিচিত্র হাতি-ঘোড়া সব কিছু।

একটা নারীমূর্তি! সরস্বতী গড়ছে—তন্ময় হয়ে।

মিষ্টি স্নান সেরে ফিরছে তালবনা তেকে। যৌবন এখনও যাই যাই করেও যায় নি, দেহে মনের কোণে এখনও তার অবশিষ্ট কিছু রয়ে গেছে। মনের গোপনে আজ ধীরে ধীরে বাসা বেঁধেছে কি এক দুর্বার কামনা।

জলটোপই বলেছিল,—কার্তিক পূজো করবি কি রে ?

হাসে মিষ্টি, সেই উদ্দাম লাস্যময়ী নারী কোথায় মিলিয়ে গেছে। জেগে উঠেছে পল্লী প্রান্তরে ম্লান গোধূলির আলোয় কোন সলজ্জ নারী—যে ঘর চায়, সারা মন দিয়ে কামনা করে পূর্ণ হোক তার ঘর।

বলে,—হ্যাঁ । মানসিক করেছি।

—কার্তিকের কাছে মানসিক !

অবাক হয় জলটোপ, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ এই কার্তিকের পূজা।

মাথা নীচু করে মিষ্টি, কোথায় যেন তার মনের গোপনতম দুর্বলতার সংবাদও ধরা পড়ে গেছে ওই নির্বিকার লোকটার কাছে।

জলটোপ কথা বলে না সন্ধ্যা নেমে আসে, সাঁজ প্রদীপ জ্বলে ওঠে, বেজে ওঠে শীতের উদাস সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনির সুর। আকাশে সবুজ আঁধার ঢাকা। বেণু-বন সীমায় জ্বলে ওঠে জোনাকির আলো।

মিষ্টির মনে কেমন একটা সুর জাগে। এই নিয়েই দিন কাটে।

আজও তার রেশ জেগে আছে মনে। মাঝে মাঝে আগেকার সেই উন্মাদ জীবনযাত্রার কথা মনে আসে। আজ সেই স্রোতমুখর ক্লেদাক্ত জীবন থেকে দূরে সরে এসেছে সে—হারিয়ে গেছে, ভুলে যেতে চায় সেই মানুষরূপী পশু আর দানবদের সেই কুৎসিত বীভৎস চেহারা।

স্নান সেরে ফিরছে। উঠোনে লকলকিয়ে উঠেছে একটা লাউ গাছ । সবুজ আবেষ্টনীতে চালটা ঢেকে ফেলেছে—ফুটেছে সাদা সাদা ফুল—ফলের আশা নিয়ে।

লোকটা তন্ময় হয়ে মাটির সেই মূর্তির গায়ে বাঁশের শিক দিয়ে চেঁছে চলেছে।

—কি করছিস ?

কথা কইল না জলটোপ। মিষ্টি কাপড় বদলে এসে দাঁড়াল। সুন্দর একটি মূর্তি—সুঠাম তার দেহ - সুষমা ; মৃত মাটি যেন ধীরে ধীরে প্রাণ পাচ্ছে ওর হাতের আঁচড়ে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিষ্টি।

হঠাৎ কার অস্তিত্ব অনুভব করে জলটোপ ।

—তুই ! কি দেখছিস ?

হাসে মিষ্টি —দেখছি তুই কেমন কারিগর।

—কেনে ?

—মরা মাটিকেও জীয়ন্ত লাগছে !

জিব কাটে জলটোপ ,—এ-কথা বলতে নাই রে । দেবতা—

কজ্জলপূরিত লোচনভারে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তাহারে।

মা সরস্বতীর কিছুই শেখলাম না মিষ্টি, মুখ্যু হয়েই এলাম, তাই হয়েই রইলাম।

মিষ্টি কথা বলে না, লোকটার দিকে চেয়ে থাকে সে।

দুপুরের মিষ্টি রোদ কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে—ছায়া নামে উঠোনে। কোথায় ঘুঘু ডাকছে উদাস সুরে—দমকা বাতাসে কাঁপছে তালপাতাগুলো ; হলদে ফুলের মত ঝরছে দমকা বাতাসে বাঁশ গাছের বিবর্ণ পাতাগুলো। তারই মাঝে মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—ওঠ্। বেলা গড়িয়ে এল। সিনান ভাত করবি না ?

—হ্যাঁ। উঠছি।

জলটোপ মাটিমাখা হাত ধুতে থাকে।

হঠাৎ মিষ্টিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে জলটোপ। ওর নিশ্বাস লাগে গালে—মিষ্টির দুচোখে কি এক দুর্বার নেশার আঘ্রাণ।

ওকে যেন দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নেয়। হাসছে লোকটা।

—দেখ মুখময় মাটি লেগে গেল তোর।

—লাগুক। সর্বাঙ্গে লাগুক ওই মাটির ছোঁয়া।

হাসছে মিষ্টি, কেমন দুচোখে ওর টলটলো অশ্রু। কাঁদছে।

জলটোপ অবাক হয়।

—ই কি রে !

কান্নাভেজা স্বরে বলে ওঠে মিষ্টি,

—ওই কাদামাটি দিয়ে আমাকে নোতুন করে গড়তে পারো না কারিগর ? আমার সব কিছু বদলে ?

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জলটোপ মিষ্টির দিকে। কাঁদছে মেয়েটা। হয়তো অতীতের বেদনায় সে কাঁদছে—আজকের নোতুন মিষ্টি—নোতুন নারী। নোতুন জীবনের স্বপ্নবিভোর একটি মন নিয়ে।

কোথায় পাখি ডাকছে। নিদারুণ তৃষ্ণায় ওর সুরটা নীল অসীম আকাশে উধাও হয়ে যায়।

—ফটিক জল ! ফ—টি—ক—জল—

অতৃপ্ত একটি সুর পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে উঠে চলেছে দুঃসহ কি বেদনায়।

কেমন যেন ভাল লাগে এমনি নির্জন দুপুরগুলো। নিজেকে ফিরে পায় মিষ্টি।

কারিগর স্নান করতে গেছে পুকুরে—মিষ্টি জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলছে। হঠাৎ কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

মনে মনে বিরক্তই হয় সে।

বাঁচতে চাইলেও ওরা যেন এখনও মাঝে মাঝে পথের কাঁটার মত এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে ঘেয়ো কুকুরের দল এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে—এঁটো পাতের চারিদিকে যেমন তারা ভিড় জমায়, তেমনি কুৎসিত লালসা নিয়ে তারা এখানেও যেন ঘুর ঘুর করে।

গোকুল এসেছে। কথাবার্তা নেই দাওয়ায় এসে চেপে বসে ফুস ফুস করে বিড়ি টানছে। চোয়াড়ে চোয়ালের হাড়গুলো ঠেলে উঠেছে—ভাঁটার মত দুটো চোখে কদর্য বীভৎস চাহনি।

হাসছে গোকুল। বলে ওঠে,

—একা একা লাগছে ?

মিষ্টি জবাব দেয়,—তাই তুই এলি নাকি ? হ্যাঁরে ?

ওর কথাটাকে কেমন আপ্যায়নই মনে করে গোকুল। এখানে তার দাবি যেন খানিকটা আছে। এ চাকলার লোকের উপর কর্তৃত্ব করবার, দাবি জানাবার জোর সে অর্জন করেছে।

মিষ্টির সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

গোকুল বলে ওঠে,—শোনালম খুব ধুম করে কার্তিক পুজো করলি। তা হ্যাঁরে , আমাদিগকে নেমন্তন্নও করতে নাই ?

মিষ্টি জবাব দেয়,—কি করে করি বল ?

—কেনে? গোকুল প্রশ্ন করে ।

—তোর বাপ যে ইখানে ঘুর ঘুর করে, তা ছেলেকে বাপের আসলীলা দেখতে ডাকি কি করে বল?

—বাবা ! সে তো কবে মড়াগড়ের শ্মশানে আংরা হয়ে গেছে !

গোকুল সহজভাবেই কথাটা বলে।

মিষ্টি হাসছে, স্বৈরিণী সেই নারী, জিবের আগায় খুরের ধার এনে জবাব দেয়,

—তুর বাপ কি একটো ? ওই যে তারকবাবু । সে মিনষে যে নাক সটরান দিছে এখানে — আবার তুইও এয়েছিস ?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে গোকুল। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠছে। জ্বলছে দুটো চোখ।

—খুব বেড়েছিস, লয় ? গজরাচ্ছে গোকুল ।

হাসছে মিষ্টি, ছোবলটা ঠিক বেজেছে যথাস্থানেই । উঠে পড়েছে গোকুল।

মিষ্টি হাসছে। বলে ওঠে।

—উঠলা যি গো ? ওই!

গোকুল দাঁড়াল না; উঠে বের হয়ে গেল হনহন করে। কথাটা তখনও কানে বাজছে। মিষ্টির ছুরির ফলার মত কথাগুলো। হাসছে তখনও মেয়েটা খিলখিলিয়ে।

—কি হল রে ?

কারিগির উঠানে ঢুকছে স্নান সেরে। ওকে দেখে চুপ করে গেল মিষ্টি। বলে ওঠে।

—এমনিই হাসছিলাম। লাও ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলাও দিন।

মিষ্টি দাওয়াটা সাফ করে জায়গা করতে থাকে। চকিতের মধ্যে কেমন বদলে গেছে বিচিত্র একটি নারী।

কারিগর ওর দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক যেন চিনতে পারে না ওকে। আলো আর ছায়ার আঁধার ঘেরা একটি কোন মনোরম স্থান।

তার মত যাযাবর হাঁসও যেন তাই বাসা বেঁধেছে সেই নিরালায়ে

এমনি চোট খেয়েই গর্তের ভিতরের সাপও মাথা তোলে।

যেখানে যখনই চোট থাক না কেন—বেদনাটা বাজে মনের গভীরে, তার সেই চরম পরিচয়টা লক্ষ্য করেই যেন লোকে তাকে ব্যথা দেয়—অপমান করে।

গোকুলও জানে, সারা অঞ্চলের লোক তাকে ভয়ও করে, আর ঘৃণাও করে তেমনি মনে মনে—দুঃসহ বিজাতীয় কোন ঘৃণা।

ওই স্বৈরিণী মেয়েটাও তাকে অপমান করতে সাহস করে ! তাড়িয়ে দিতে পারে বাড়ি থেকে! অর্থ-সামর্থ্য তার নেই। তাই বোধহয় গোকুল তাড়া খেয়েই ফিরছে।

কিছুদিন কোথাও কোন রোজগারও হয়নি, তারকবাবুর দয়ার দানেই চলেছে। কোন মতে দুবেলা দুমুঠো জোটে ওখানেই। আর পড়ে থাকে নিজের ভাঙ্গা ঘরে—না হয় বোর্ড অপিসের রকে। শীতে ঠাণ্ডায় হু হু করে কাঁপে। জেগে থাকে সারা রাত শীতের দমকে।

তার নিজের ঘরের ছাউনি দেবার সামর্থ্য তার নেই, খড় জোটেনি—বাঁশ বাখারি, দড়ি, ছাউনি দেবার বারুই-এর মজুরি কোত্থেকে জোটাবে জানে না। এই সময় ছাইতে না পারলে সারা বছর আর খড়-কুটাও জুটবে না। বৃষ্টির জলে ধ্বসে পড়বে।

যেটুকু ঘরের বাঁধন বলে ছিল—তাও থাকবে না। চুপ করে ভাবছে গোকুল।

এ কথা এতদিন ভাবেনি। ওই মেয়েটার মুখে ওই সব কথা শুনে মনটা কেমন খিঁচড়ে যায় তার।

তারকবাবুকেও কথাটা জানিয়েছিল,—কিছু খড় দেন কেনে, ঘরটা ছাওয়াবো?

তারকবাবুর মনে তখন অন্য চিন্তা। ওর কথায় তবু জবাব দেয়,

—তা নিয়ে যাস ! এবার তো তেমন খড়ও হয়নি। নিবি পণ কয়েক !

গোকুল বলে ওঠে,

—কিছু টাকাও যে চাই, ঘরটা সারাবো।

—ওসব হবে না এখন। সাফ জবাব দেয় তারকবাবু। কোন ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই। চুপে চুপে বের হয়ে এল গোকুল।

কেমন যেন মেজাজটা বিগড়ে যায়। কদিন জুয়া থেকে যা রোজগার করেছিল তাও নেশা ভাং-এর খরচে গেছে। হাতে পয়সাকড়িও নেই। এ জায়গাটায় থাকতে তার মন টেঁকে না। এদের অনেক পা চেটেছে সে, এইবার ঘৃণা আর রাগ হয়।

চলেছে এই দালান কোঠার পাড় ছেড়ে নিজের জীর্ণ ঘরের দিকে। মনে মনে ফুঁসছে গোকুল।

দুদিকে নীচু পথ—বনগড়ানি জল এসে গ্রামে ঢোকে ; পথটা তাই বালিতে ভর্তি, হাঁটবার পথ, জল যাবার পথ এ পাড়ায় একই। মানুষ যেন কোন রকমে হাঁটবার অধিকার পেয়েছে—এই ক'মাস।

দুদিকে গুমড়ি খাওয়া জীর্ণ খড়ের চালা থেকে ধোঁয়া উঠছে, শালের ধোঁয়া ; বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে কালো ধোঁয়ায় আর বাটিপেটার ঠং ঠং শব্দে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

গাড়ি বোঝাই বাসনখুঁট নামছে অতুল কামারের শালের সামনে। ভুবন আর এমোকালীর কাঁধে করে নামাচ্ছে মালগুলো, ওদিকে কার্তিকের দোকানে নোতুন মাল ওজন করে মহাজনের সরকার হিসাব কষছে। একটু দাঁড়াল গোকুল।

এ পাড়ায় সে যেন অবাঞ্ছিত কোন লোক। ওরা যে যার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ওর দিকে ফিরেও চাইল না।

যায় তারকবাবুর ঠাকুর-বাড়িতে, দুবেলায় কলাপাতায় যেন দয়া করে ওরা ছিটিয়ে দেয় চাট্টি ভাত। আজ তাও জোটেনি। খিদেও পেয়েছে। কোথায় যাবে তাও জানে না। উপোসই দিতে হবে আজ।

এত করেও খাবার সংস্থান তার হয় নি। একমুঠো ভাতের জন্য আজও সে কাঙ্গালই রয়ে গেল।

চুপ করে চলেছে গোকুল। মনে একটা ঝড় বইছে। বেশ মনে হয় পেট জ্বলছে। কেমন চুঁই চুঁই করছে পেটের ভিতর তীব্র একটা অনুভূতি।

অনেক দিন পর অনুভব করে গোকুল এই যন্ত্রণা—ক্ষুধার জ্বালা। বেলা বেড়ে চলেছে।

দুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসে। দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামে। তেষ্টাও পেয়েছে।

সামনের টিউবওয়েলের থেকে জল পাম্প কররে তাই কোঁক কোঁক করে গিলে চলেছে। কেমন অসাড় হয়ে আসে পেটের সেই জ্বালা।

তারকবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসবার সময় দেখেছিল ঠাকুর-বাড়িতে অন্নভোগ কেমন ঘি-এর গন্ধ উঠছে আকাশ বাতাসে। গোবিন্দভোগ চালের সুগন্ধি পায়সান্ন!

পেটের জ্বালাটা কেমন যেন বেড়ে ওঠে। ঝিম- ঝিম করছে দৃষ্টি। আজ দুপুরে ঘরেও দানাটি নেই। এগিয়ে যাবে—হঠাৎ কার ডাক শুনে দাঁড়াল গোকুল।

—ঠাকুর ! অ ঠাকুরমশাই !

ঠাকুর ! গোকুলকে অনেকদিন ও নামে কেউ আর ডাকেনি। এককালে ডাকত অনেকে, নিমাই ঠাকুরের ছেলে—কারণ অকারণে অনেকে প্রণামও করত পথে ঘাটে। সে আজ অনেক দিনের কথা। তাই ওই ডাক শুনে একটু চমকে ওঠে আজ।

গোকুল একটু অবাক হয়ে গেল।

—আমাকে ডাকছো ?

অতুল কামার এগিয়ে আসে। বুড়োর চোখে দড়িবাঁধা নিকেলের চশমা ; পরনে একটা কালিমাখা কাপড়। শাল থেকে উঠে বাড়ি যাচ্ছিল, পথে ওকে দেখে দাঁড়িয়েছে। কি যেন খানিকটা অনুমান করে নেয়।

—হ্যাঁ, একচটু আসবেন আমার সঙ্গে ?

—চল !

বুড়োর সঙ্গে চলেছে গোকুল। বাড়ি ঢুকেই বুড়ো আদর করে বসায় আজ। বুড়ো গোকুলেব শুকনো মুখ দেখে ব্যাপারটা বুঝেছে।

—বসো ! অগো—ও বৌমা !

ভুবনের বৌ হেঁসেল থেকে সেই অবস্থাতেই বের হয়ে আসে।

ভুবন বলে ওঠে, বেরাহ্মণ। একটু জলসেবার ব্যবস্থা করো দিকি।

গোকুল আমতা আমতা করে।

—আবার খাবো?

—জল খেতে দোয কি! খাওয়া তো হয় নি এখনো।

গোকুলের দুচোখ অকারণে জলে ভরে আসে।

বড় বৌ কদম তখুনি আসন করে জল গড়িয়ে মস্ত বাটিতে চিঁড়ে দুধ মুড়কি আর খেজুর গুড়ের নবাত এনে দেয় গোটা কতক গোকুলের সামনে।

গোকুল একটু অবাক হয়েছে এই অভ্যর্থনায়। অতুল বলে ওঠে,—একটু জল সেবা কর ঠাকুর।

আগেকার দিনগুলো মনে পড়ে।

গোকুল মাথা নীচু করে খেয়ে চলেছে। হ্যাঁ—সারা সকাল থেকেই আজ জোটেনি কিছু।

মনে হয়, মিষ্টির ওই কথাগুলোর কোন জবাব দিতেও পারেনি সে। সব ব্যক্তিত্ব আজ হারিয়ে গেছে, আজ আবার সেই হারানো বামুনের পরিচয়ে যেন নোতুন স্বীকৃতি পেয়েছে সে।

—আর চাট্টি চিড়ে দিই?

কদমের কথায় মাথা নাড়ে গোকুল।

—না, না। একটু আগেই খেয়ে বের হয়েছি।

অতুল কামার বলে ওঠে,—দুটো পয়সা পেয়ে গেলাম আজকের কারবারে, বেরিয়েই পথে দেখলাম বেরাম্মণকে।

ব্রাম্মণ! আজও ওরা ব্রাম্মণকে ভক্তি করে।

গোকুল কথা বলে না।

বেলা পড়ে আসছে। পথে বের হয়ে এল। গোকুলের বেশ ভর পেট খাওয়া হয়েছে।

জীর্ণ ঘরটার দিকে যেতে চায় না। কেমন যেন হু হু করে মনটা। একটু নির্ভর—একটু আশ্রয় —একমুঠো অন্ন সব কিছুই আজ গোকুলের কাছে স্বপ্ন। অতুল এক নিমেষে গোকুলের মনে অতীতের হারানো দিনের কথা এনে দিয়েছে আজ।

বৈকাল হয়ে আসছে। চট্টরাজ পুকুরের কাঁকুরে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ওই দূরের দিকে চেয়ে থাকে গোকুল।

ঈশ্বব ডোমকে দেখে একটু অবাক হয় সে।

—ওস্তাদ! কি ব্যাপার? এখানে?

ঈশ্বর এগিয়ে আসে,—তোমাকেই খুঁজছিলাম!

একটা চিল কর্কশ স্বরে ডাকছে আকাশকোলে; মুক্ত উদার ডাঙ্গা—শস্যরিক্ত প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে।

ঈশ্বর গলা নামিয়ে বলে ওঠে,

—একটা কথা ছিল।

গোকুল আনমনে জবাব দেয়,

— শরীরটা যুৎ নাই।

কিন্তু ঈশ্বর ওর মনের এই দুর্বলতাকে চেনে। তাই ও সঙ্গ ছাড়েনি।

দুজনে পুকুরের পাড় থেকে চলেছে দুদিকে ; যেন কেউ কাউকে চেনে না। কুচিলা ঝোপের ওদিকে গিয়ে বনে ঢুকল ঈশ্বর ডোম, কামার পাড়ার ওপাশ দিয়ে বনের ওদিকে এগিয়ে চলেছে আর একটি প্রাণী—সে গোকুল।

হঠাৎ যেন তার গতি থেমে যায় বনের কাছাকাছি এসে। আর দেখা যায় না তাকে, বনের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল। গোকুল যেতে চায় নি, কিন্তু ঈশ্বর যেন তাকে কি কথায় ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মুখ আঁধারি রাত। পাখির কাকলি থেমে গেছে, মুছে গেছে সারা আকাশে শেষ সূর্যের আলোকধারা। সারা গ্রাম যেন ওই শীত আঁধারে হারিয়ে গেছে, জেগে আছে শুধু দু-একটি তারার আলো।

গোকুল প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারে নি, আবার যেতে বাধ্য হয়েছে ওর সঙ্গে।

প্রীতি বইগুলো নিয়ে বসেছে। কেমন মনে হয় একান্ত অসীম গহনে সে যেন হারিয়ে গেছে। সভ্য জগতে শহুরে আলোকোজ্জ্বল জীবনযাত্রার মাঝে যাকে ভেবেছিল কোন ঠাঁই দেবে না, বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও মনে তার কথাই আসে।

অশোকের অস্তিত্ব তার কাছে একটা কঠিন প্রশ্নের মত জেগে রয়েছে। তাকে স্বীকৃতি দিতেও পারে নি—একেবারে অবহেলা করার মত ক্ষমতাও নেই। ওর কঠিন ব্যক্তিত্ব আর ঋজুতার সামনে নিজেকে অনেক দুর্বল বোধ করে, তাই প্রীতি দূরেই সরিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

অশোকের কথাও ভেবেছে অনেক। একটা সুস্থ, সবল, শিক্ষিত লোক বেকার থাকবে— বসে বসে শুধু গ্রাম্য কুটিল দলাদলির আবর্তে জড়িয়ে দিন কাটাবে সভ্য জগতের থেকে বহুদূরে অন্ধকার গ্রামে, এটা যেন তার কাছে অপমৃত্যু বলেই মনে হয়।

না হয় পলায়নী মনোবৃত্তি।

শহরের প্রচণ্ড বিবর্তন আর বিরাট রাজনীতির উত্তাপ থেকে পালিয়ে এসেছে অশোক।

এই শ্রমবিমুখতাকেই সহ্য করতে পারেনি প্রীতি, কোথায় যেন বেধেছে তার মনে।

প্রীতির আজকের তরুণ মন কি এক উন্মাদনার ঘোরে ছুটে যেতে চায় ; জীবনে সে দেখেছে শহরের বিলাসপ্রাচুর্য ভোগসম্পদ, তার থেকে কোথায় একটা নিবিড় তৃষ্ণা সঙ্গোপনে প্রীতির মনের অতলেও জড়িয়ে গেছে তার অজ্ঞাতেই।

এ কথাটা নীলাম্বরবাবুর কাছেও যেন কোথায় প্রকাশ হয়ে গেছে।

প্রীতিই প্রতিবাদ করেছিল সেদিন।

—এটাকে স্বীকার করতে পারি না বাবা, তোমার ওই অশোকবাবুর এই কুয়োর ব্যাঙ হয়ে পড়ে থাকাটা।

নীলাম্বরবাবুও দেখেছেন প্রীতির তরুণ মনের এই বৃহত্তর জীবনের প্রতি সংবেদনশীলতা। মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। ওর পোশাক- আশাক—চালচলন কথাবার্তায় সেই আগামী জীবন আর শহরের মোহ যেন অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়েছে।

নীলাম্বরবাবুর এটা ভালো লাগেনি। তিনি বলেন,

—তাই বলে গ্রামে কারো কিছু করবার নেই ?

প্রীতি জবাব দেয়,

—শহর থেকেই, বৃহত্তর জীবনের গণ্ডি থেকেই নির্দেশ আসবে ; সমাজের ওপরের যারা, রা গ্রামের কেউ নয়।

নীলাম্বরবাবু অবাক হন।

—গ্রামের দিকে চেয়ে গ্রামের সমস্যা মিটবে না, মহানগরের নির্দেশে গ্রামের সব সমস্যা আর অভাব মিটবে ?

নীলাম্বরবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। প্রীতিও বাবার কথায় সুরে বেদনার অভাষ টের পেয়েছে। জবাব দেয়,

—এছাড়া পথ নেই বাবা।

নীলাম্বরবাবু কথাটা মানতে চান না। বলে ওঠেন,

—গ্রামে এতদিন লোক হয়তো ছিল না—যারা তাদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, এখন গ্রামের জীবনেও ধারাপথ বদলেছে মা, আরও বদলাবে।

বাবার কথার জবাব দিলে না প্রীতি। দিলে কটা কথা স্পষ্ট করেই বলতে হয় , তাই বোধ হয় এড়িয়ে গেল সে। কিন্তু দুজনের পথ এবং মতের মূলে যে কোথায় একটা নীতিগত বিরোধ দেখা দিয়েছে তা ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হলেও সেটা যে মুছে ফেলবার মত সামান্য নয়, তা বুঝতে পেরেছে দুজনেই।

নীলাম্বরবাবু চুপ করে ফুরসি টানতে থাকেন।

প্রীতিও পড়ায় মন দেয়।

হারিকেনটা জ্বলছে। লাল ম্লান আলোয় কেমন একটা অসহায় ভাব ; আঁধারের মধ্যেই তা হারিয়ে গেছে।

অশোকবাবুর কথাটা মনে পড়ে।

একটা লোক কেন কি যেন মোহের ঘোরে এই অন্ধকূপে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে তা সে জানে না। কে জানে, হয় তো কোন গোপন ইতিহাস একটা রয়ে গেছে, নিবিড় কোন ব্যথা থাকতে পারে, যার জন্যই শহরের জীবনে আজ ফিরে যেতে চায় না অশোক।

প্রীতি আনমনে বই-এর পাতগুলো উলটে চলে। হঠাৎ জাগে সুরটা—শান্ত স্তব্ধ গ্রাম-সীমায় নিষ্প্রভ তারাজ্বলা আকাশে উঠছে মিষ্টি একটা সুর।

প্রীতির বই-এ মন বসে না, উঠে এসে জানলায় দাঁড়াল। বিনিদ্র গ্রাম্য স্তব্ধতার মাঝে জাগর কোন বন্দী মন নিবিড় বেদনায় গুমরে উঠছে।

হু হু বাতাস বয়, রাতের হিম হাওয়া। তারাগুলো ঢেকে গেছে জমাট কুয়াশায়—অন্তহীন তমসার অতলে কোন সুপ্ত মন নিবিড় বেদনায় শুধু কাঁদছে।

শহরের আলো আর কলরবের মাঝে জাগর কোন অতন্দ্র মনের এই কান্নার সার্থক সুর কোনদিনই শোনেনি প্রীতি।

সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশ ডোম।

একক সুরটা আলাপ করে চলেছে।

অশোক স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

প্রথম যেদিন ছেলেটার বাজনা শোনে ওই মিষ্টি লোহারের বাড়িতে, সেদিনও এমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অশোক। শেষ না হওয়া অবধি বের হয়ে আসতে পারেনি।

অবিনাশের সঙ্গে সেইখানেই পরিচয়। আজ অবিনাশ বৈকালে এসেছে নিজেই ওর কাছে। বলে ওঠে,

—বাজনা শোনাব ছুটবাবু!

অশোক একটু যেন অবাক হয়,—সে কি রে, কাজের বাড়ি হয়—সানাই বসে। তা শুধু শুধুই?

হাসে অবিনাশ।

— বিয়ে-পৈতে বাড়িতে কি বন্দেজী জিনিস বাজাই বাবু , ওই রং বাজাই। এতদিন বিষ্টুপুরে থাকলাম, এক-আধটু শিখিছি—সমঝদার আপনারা না শুনলে ?

কি যেন আশা নিয়ে শোনাতে এসেছে অবিনাশ। মুখ-টুখ শুকনো—কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে আসছে বোধ হয়।

—তা খেয়ে এসেছিস ?

চুপ করে থাকে অবিনাশ।

মাঝে মাঝে ওর এমনিই হয়। সারা মন হু হু করে জ্বলে ওঠে। বাড়িতে মন টেকে না অবিনাশের।

বাবাকে অবিনাশ সহ্য করতে পারে না মোটেই। লোকে কথায় বলে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ।

ঈশ্বর ডোমের নাম এ চাকলার সবাই জানে। শিউরে ওঠে ওকে পথে দেখলে সময় অসময়! পাকা কাঁচা চুলগুলোয় কদম ছাঁট ছাঁটা! জুয়োর হাতও যেমন চলে, তেমনি এ অঞ্চলের গৃহস্থের নিশ্চিন্ত জীবনেও সে এনেছে কি এক আতঙ্কের কালো ছায়া।

দল বল নিয়েই এ এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গোকুল তারই অন্যতম সাকরেদ। ঈশ্বর ডোম মানে মূর্তিমান একটি অভিশাপ।

কেউ জানে না কার ঘরে কোনদিন চড়াও হবে।

সেই ঈশ্বর ডোমের ছেলে ওই অবিনাশ ডোম।

ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন অন্য জাতের এই ছেলেটা, ভদ্রলোক ঘেঁসা।

মদ মেরে মত্তাবস্থায় এই নিয়ে ঈশ্বর অনেক মারধোরও করেছে ওকে। বৌটাকে গালাগালও দিয়েছে।

—ডোমের বাচ্চা কভি নয় উটো, ভদ্রলোকের বাচ্চা—সব সাচ কথা বলবি কস্‌বী মাগী।

বৌটা শুধু কেঁদেছেই। আর শিশু অবিনাশ দেখেছে মদ্যপ বাপের সেই তাণ্ডব নৃত্য। শিউরে উঠেছে। কিশের মনে জন্মেছে ঘৃণা আর আতঙ্ক।

তাই বোধহয় একদিন ডানাপালক গজাতেই পালিয়ে যায় অবিনাশ। সে আজ বছর দশেক আগেকার কথা।

কিছুদিন হল ফিরেছে অবিনাশ ।

দু-চার জায়গায় সবে বাজিয়ে কিছু পয়সা কড়ি আনছে। ক্রমশঃ নাম-ডাকও হচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরের সেই এক কথা, সে এসব পছন্দ করে না।

—ডোমের ব্যবসায় প্যাটে ভাত কুন কালে হয় ? হ্যাঁরে শালা ?

অবিনাশ বাবার কথায় জবাব দেয়নি।

আজও তাই নিয়েই বেঁধেছিল বাবার সঙ্গে অবিনাশের। বেশ চরমেই উঠেছিল ঝগড়াটা।

সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ে। অতীতের একটি শিশু কেঁদেছিলো বাবার মারে। গরু চরাতেও যেতো না, বলেছিল সে পাঠশালে যাবে।

মাও তার সে সাধ পূর্ণ করতে পারেনি সেদিন।

দীর্ঘ দশ বছরে বদলেছে অনেক কিছু।

জোয়ান স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে অবিনাশ ; কিন্তু মাও আজ বেঁচে নেই। শুনেছে কোন বছর নাকি অবিনাশের অনাগত কোন্ সহোদরকে পেটে নিয়েই হতভাগ্য নারী স্বামীর পুণ্যপাদস্পর্শ লাভ করে শেষ হয়ে গেছে।

ঈশ্বর ডোম সেবার ডাকাতির দায়ে জেলে যাবার আগেই বৌটাকে সামান্য একটা নিষেধের প্রতিবাদে লাথি মেরে থেঁৎলে শেষ করে গিয়েছিল।

অবিনাশ সবই শুনেছে। চুপ করে সয়েই গেছে।

আজ দুপুরেও বাবা সেই কথাই তোলে।

—তোকে যেতে হবে। এক রাতের মামলা তো, ইতে দোষ কি ?

অবিনাশ জবাব দেয়,

—ওসবে আমি যাবো নাই।

—তা কেনে যাবি ; মাদী কুথাকার ?

অবিনাশ কি জবাব দিতে গিয়ে থামলো।

দুপুরের চিনচিনে রোদ চারিদিকে ছিটিয়ে রয়েছে।

সারা পাড়ায় কেমন যেন একটা নগ্ন দারিদ্র্য আর বীভৎসতা ফুটে রয়েছে এদের অঙ্গের ভূষণের মত।

বাতাসে ধেনোমদ -এর গন্ধ কোথায় মাটির বড় জালায় ভাতে বাখর দিয়ে পচিয়ে রেখেছে।

ঘরে টেকা দায়, যেন নরক ।

ঈশ্বর ডোম এই বয়সেও ওই উন্মাদনা ছাড়ে নি। চোখদুটো করমচার মত লাল, সাকরেদদের ডাক দিয়ে নিজেই গিয়েছিল গোকুলকে খুঁজতে—সে নাকি বড় বাবুদের গাঁয়ে গেছে।

তাই ঘরে এসে খেয়ে দেয়েই বেরুবে তার খোঁজে। অবিনাশকে বলে ওঠে বেশ রাগত ভাবেই,

—উসব পুঁ প্যাঁ ছাড়ান দে, বুউলি।

—তবে করবো কি ?

হাসছে ঈশ্বর ডোম। হা হা করে হাসছে দুর্দান্ত ওই লোকটা একটু গলা নামিয়ে ইশারা করে দেখায়।

—ওই তো বল্লাম, এতের বেলায় বেরো—একহাত মেরে আনবি, চোপ্পমাস খা কেয়ে, পায়ে পা দিয়ে।

শিউরে ওঠে অবিনাশ বাবার কথা শুনে। ঈশ্বর ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মনে হয় ও বোধ হয় রাজি হবে। বলে চলেছে ঈশ্বর,

—সোমত্ত বয়েস। শখ গেল বাজালি—এক আধকলি। তবে ওতে প্যাট ভরবে নাই। বলছি ওসব ছাড়ান দে।

অবিনাশ কথা বলে না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। তীব্র ঘৃণা আর অসহ্য অবজ্ঞা ফুটে ওঠে ওর চাহনিতে।

সারা বাড়িটার বাতাস বিষিয়ে উঠেছে, মদের তীব্র গন্ধে মাছি উড়ছে ভন ভন করে। পাশেই পটলার বৌটা চেঁচাচ্ছে, পটলা বোধ হয় পিটছে মদের ঘোরে।

বের হয়ে এসে দাঁড়াল অবিনাশ, হাতে ওই সানাই-এর ছোট্ট বাক্স। ওর দিকে চেয়ে থাকে ঈশ্বর।

—কুথা যাবি ? এ্যা ?

রেগে উঠেছে ঈশ্বর।

কথার জবাব দিল না অবিনাশ, এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে গুলবাঘের মত লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল ঈশ্বর ডোম।

—রা কাড়ছিস না যি ? কথাটো খুব খারাপ লাগছে না ?

অবিনাশ জবাব দেয়,

—উসব করিনি কোনদিন, করবো ও না। না খেতে পেলেও করবো না। আমি চোর লই—

গর্জন করে ওঠে ঈশ্বর,—চোর ! এ কি বললি ?

অবিনাশ বাপের মুখের উপর জবাব দেয়,

—বলছি তো, আমি চোর লই। চোরের ভাতও খাই না। তাই ইখান থেকে চলে যেছি।

—বটে ! ঈশ্বর অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বলিষ্ঠ জোয়ান ছেলে। তার ভাতও এতদিন খায়নি। আজ মুখের উপর ওই জবাব দিয়ে গেল !

গর্জন করে ওঠে ঈশ্বর ডোম।

—তবে শুনে রাখো শালো, ই মাটিতে পা দিলে ছাপ্ দু-আধখান করে ফেলবো। তখুনিই বলেছিলাম কসবী বৌটাকে, উ শালা বাপের বাচ্ছা লয়, ডোমের অক্ত ওর গায়ে নাই। শালে বিজাত।

চুপ করে বের হয়ে এসেছে অবিনাশ।

সামান্য যেটুকু আশ্রয় ছিল আজ তাও হারিয়ে গেল—পরিচয়ও। একাই পথে বের হয়েছে একটি পথহারা কোন অপরিচিত অবিনাশ।

সুরের পরশ ওর মনে কোন্ অদেখা পথে কোন্ আকস্মিক মুহূর্তে প্রবেশ করেছিল, অনুরণন তুলেছিল জানে না। কিন্তু তার প্রভাবেই বোহয় আজ সে ওই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে আপোশ করতে পারেনি।

বিশাল গেরুয়া প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে পথটা ; সবুজ বনসীমায় এসেছে ঝরাপাতার স্পর্শ ; পাখি ডাকছে। কোথায় সন্ সন্ হাওয়ার সুরে উদাস এক মহান সুরের আলাপন।

মূলতানী সুরের মতই রঙ্গীন বেদনাময় একটি অদেখা আমেজ ওই দিকচক্রবালে বিধুরতা এনেছে।

শালফুলের সুবাস মিশেছে বাতাসে।

অবিনাশ কেমন যেন অসীম ওই ধরণীর কোলে তার নিজের সব দুঃখ ব্যর্থতার কথা ভুলে যায়।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—খাসনি দুপুরে ?

—আজ্ঞে !

অশোকের কথায় যেন হুঁশ ফেরে। সলজ্জভাবে মাথা নাড়ে অবিনাশ।

—উ হবে পরে ।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন একটা নিবিড় বেদনা ওর মনে। মেঝের ওপর বসে আছে। কালো পেটা গড়ন। মুখে হাসির আভাষ একটু লেগেই আছে।

অবাক হয়ে সে দেখছে ঘরের চারিদিক—মুক্ত জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দিনের শেষ আলোয় বনসীমা রঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

পাখিরা দলবেঁধে ফিরছে কুলায়—সন্ধ্যা নামছে।

সুরটা উঠছে আকাশে।

জমাট বেদনা ঝরে পড়ে আকাশ থেকে হিম ধারায়, আর কুয়াশার গুঁড়ি গুঁড়ি চন্দন কণায়।

টুপটাপ শিশির পড়ছে স্থলপদ্ম আর গন্ধরাজ গাছের পাতায়. গোলাপ গাছে কতকগুলো লাল । ফুটেছে।

অবিনাশ কোন অসীম সুর-রাজ্যের মাঝে হারিয়ে গেছে। অবাক হয়ে শোনে অশোক ওই সুর। সারা গ্রামের লোক শোনে।

একটা বাঁশির কোন নিবিড় বেদনাময় সুর সারা গ্রামসীমা ছেয়ে ফেলেছে সুরের মায়ায়।

রাত নেমেছে।

কুয়াশা ঢাকা রাত্রি। চাঁদের আলোটা ছড়িয়ে পড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামসীমায়—ছায়া আঁধারঘেরা বেণুবনে।

অবিনাশ যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

ওই ক্লেদাক্ত পরিবেশ, দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য বাবার সেই কদর্য জীবনযাত্রা—ছায়া এতটুক আশ্রয়, সব কিছুর ঊর্ধ্বে সুরটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

মারু বেহাগ বাজাচ্ছে অবিনাশ ।

বিষ্ণুপুরের গোঁসাই প্রভুর প্রিয় সুর। ওঁদের ঘরের মাধুর্যে ভরপুর—প্রাণবন্ত।

এত মশগুল হয়ে সেও অনেকদিন বাজায়নি।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ ওঠে। কলরব।

নিস্তব্ধ সুরময় সেই পরিবেশের মাধুর্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

—চোর ! চোর !

আর্তনাদ ওঠে কামারপাড়ার দিক থেকে। ভীত ত্রস্ত কাদের আর্তনাদ। থেমে গেল অবিনাশ

এত চেষ্টায় যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছিল অবিনাশ, নিমেষের মধ্যে তা কোন্‌খানে হারিয়ে গেল। জেগে উঠেছে সারা গ্রাম—কারা হৈ চৈ করছে।

আবছা অন্ধকারে কাদের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—হুঁশিয়ার!

—এইদিকেই পালিয়েছে।

অশোক বন্দুক নিয়েই বের হয়ে গেল চকিতের মধ্যে। আবছা কুয়াশা ঢাকা অন্ধকারে দেখে—গ্রাম থেকে কাজলাদিঘির মরা হাজা খাতের ওদিকে কোন্ ছায়ামূর্তির দল বেগে বের হয়ে গেল।

মিশে গেল তারা অরণ্যের কুহেলি-ঢাকা অন্ধকারে।

তখনও কলবর শোনা যায়। কারা যেন দল বেঁধে এ দিকেই আসছে। লণ্ঠনের আলোয় পথ ভরে উঠেছে।

কামারপাড়া-বামুনপাড়ার ওরা সকলেই জেগে উঠেছে।

চোর পড়েছিল অতুল কর্মকারের বাড়িতে। আজই অতুল কর্মকার সদরে প্রথম চালান দিয়েছে অনেক মাল। খুঁট বাসনও এসেছে অনেক। কি করে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল জানে না—যারা খবর পাবার তারা ঠিকই পেয়ে গেছল। ছানু দাসও বলে ওঠে বীরদর্পে,

—আজ বৈকালেই শালা ঈশ্বরকে দেখেছিলাম কাকা।

অতুল কামার চুপ করে বসে আছে। কোন কথা বলে না। সকলেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা আজ ওকে সর্বস্বান্ত করতে এসেছিল ওরা। কিন্তু পারেনি।

সাবধান হয়েছিল আগে থেকেই কামারপাড়ার লোক। আকাশ-বাতাসে ওরা টের পেয়েছিল আসন্ন সর্বনাশের কালো ছায়া।

ওরা সজাগই ছিল।

বাতাসে সুরটা উঠেছিল। মিষ্টি সানাই-এর সুর।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কারা যেন নেমেছে পাঁচিল টপকে। একটা শব্দ। জেগে সকলেই। চীৎকার করছে মেয়ে-বৌরা—পাড়ার অনেকেই।

বেগতিক দেখে ওরা পালাচ্ছে।

এমোকালী চালা থেকে লোকটাকে উঠানে নামতে দেখেই পিছন থেকে পায়ে সজো বসিয়েছে লাঠিটা।

অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে যায় সে।

দলের বাকি ওরা পালাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে আহত লোকটা উঠে দাঁড়াতে যায়—পারে না। আর সবাই কোনদিকে আঁধারে মিশিয়ে গেছে।

ধরেছি এক শালাকে। আলোটা আন।

এমোকালী গজরাচ্ছে। ভুবন—কার্তিক ছুটে যায়।

হারিকেনের আলোয় ওরা উঠোনে পড়ে থাকা মানুষটাকে দেখে চিনতে পারে।

চমকে ওঠে অতুল কামার।

—আরে! এ যে ঠাকুর!

ওরা এগিয়ে আসে। অতুল আজ বৈকালেই ক্ষুধার্ত এই লোকটাকে ডেকে এনেছিল—ভক্তিভরে ব্রাহ্মণ-সেবা করিয়েছে। আর সেই-ই কিনা রাতের অন্ধকারে এসেছে তার সর্বনাশ করতে !

গজরাচ্ছে কালীচরণ,—ঠাকুর না কুকুর ! দে শালোর মুখে দুই লাথি।

তবু অতুল বুড়ো বাধা দেয়।

—কেলে !

অতুল থামাল তাকে। কি করা যায় ভাবছে। চুরির ব্যাপারে কি ভাবছে সে। বেদনায় কাতরাচ্ছে গোকুল।

হঠাৎ অশোককে দেখে ওরা যেন অকুলে কুল পায়।

—ছুটবাবু !

এগিয়ে এসে দাঁড়াল অশোক। অবাক হয়ে আহত গোকুলের দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে,

—থানায় খবর দিতে হবে কালী।

কি যেন ভাবনায় পড়েছে তারা। আশ্বাস দেয় অশোক।

—কোন ভয় নেই। যাও, আমি দিখে দিচ্ছি। আর রমণ ডাক্তারকে ডেকে আনুক একবার। দেখাও ওর পা-টা।

গোকুল উঠে বসেছে ইতিমধ্যে—কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

সুরের স্পর্শ যেন ওদের আক্রমণে নিঃশেষে মুছে গেছে গ্রামসীমা হতে। অবিনাশের সব চেষ্টা—সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঈশ্বর ডোম বার বার তার নিষ্ঠুর পাশবিকতায়।

চুপ করে বসে আছে অবিনাশ, সেও শুনেছে ওই চুরির কথা। তার কানেও গেছে আজকের রাত্রের এই চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাবার নাম।

অবনী মুখুয্যে সবজান্তা। সে নকি পরিষ্কার বলেছে,—এ সব চুরি ওই ঈশ্বর ডোমেরই কাজ। হানুও বলেছে,

—উসব জানি না আজ্ঞে। উকে আজ বৈকালেই দেখেছিলাম পড়েল পুকুরের ধারে ওই গোকুলের সঙ্গে।

অশোক কোন কথাই বলে না।

থানায় খবর পাঠিয়েছে ওরা। রমণ ডাক্তার গোকুলের পা-খানা দেখে বলে ওঠে,

যে কামারের মার বাবা ! গেছে, একেবারে পা-খানা গেছে মনে হয়।

কালী গজরাচ্ছে।

—আর চুরি যেন না করতে পারে আজ্ঞে। তাই ঠ্যাংটাই নিলাম। বেম্মহত্যা করে কি হবেক

আশ্চর্য ধৈর্য গোকুলের, এত কথাবার্তা—মন্তব্য—গালাগাল নির্বিকারচিত্তে হজম করে যায়

অবিনাশও গিয়েছিল দেখতে। চুপ করে সরে এসেছে দেখেশুনে। তার মনে কেমন একটা বিক্ষোভের সুর—হতাশার অন্ধকারে সব যেন ডুবে যায়।

ভোর হয়ে আসছে।

জেগে উঠেছে সুপ্তিমগ্ন গ্রাম। বনসীমার বুকে ছড়িয়ে পড়ছে সকালের প্রথম সোনা রোদ

গরুগুলো এসে বনধারের মাঠে জমেছে।

হাঁসের দল কলরব তুলেছে পড়েল পুকুরের ঘন নীল জলের বুকে। শান্ত জীবনযাত্রা। কোথা কোন ছন্দহীনতা চোখে পড়ে না। কাজে বের হচ্ছে মুনিয-মাহিন্দারের দল। এরই মাঝে কেম যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে অবিনাশের সুর।

—ছুটবাবু !

অশোক ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। হাতে ওর সানাই-এর ছোট বাক্স। বেরুবার জন্য তৈরি হয়েছে সে। প্রণাম করে অশোককে।

—কোথা যাবি ?

হাসে অবিনাশ, জানে না সেও তার গন্তব্যস্থল। তবু যেতে হবে তাই জানে। এখানে থাকলে সে বাঁচবে না। ওদের মতই কোন রকমে শুধু মাত্র বেঁচে থাকবার জন্যই এই পথেই হয় তো নামতে হবে। এর চেয়ে তার এই অনিশ্চিত জীবনই কাম্য—তবু বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে অন্ততঃ চেষ্টা করবে।

অশোক ওর হাতে তুলে দেয় দশ টাকার নোট।

—রাখ।

যেন যেন ইতস্ততঃ করে অবিনাশ। অশোক বলে,

—মাঝে মাঝে দেখা করিস এদিকে এলে।

প্রণাম করে অবিনাশ। দেখা সে করবে। এমন একটি মানুষকে সে খুঁজে পেয়েছে এখানে যে তাকে বুঝতে পেরেছে—অন্ততঃ ভালবাসে। এই ভালবাসার কোন সংজ্ঞা নেই, চিনতেও দেরি হয় না। অদৃশ্য কোন বন্ধনে মানুষকে বেঁধে রেখেছে—বাঁচতে শিখিয়েছে।

শত দুঃখের মধ্যেও তাই সান্তনা পায় অবিনাশ। সকালের আলো-ঝলমল ধরিত্রী, পাখি ডাকা বনভূমির মাঝ দিয়ে চলে গেছে ছায়াঘন পথটা, মাথার উপর অসীম নীল আকাশ বাতাসে বিচিত্র এক অধরা সুর জাগে। এমনি উদার পৃথিবীতে সে জন্মেছে। কত বর্ষামুখর দিনে শুনেছে মেঘগর্জনে আর বৃষ্টির ধারাপাতে একটা মহান সুর, দেখেছে দিক থেকে দিগন্তজোড়া সেই সুরের বিশাল অপরূপ রূপ—আবার সেই বর্ষার মেঘরাগের আলাপন শেষে দেখেছে শরতের শ্যাম-স্নিগ্ধ ছায়া-ঢাকা মাধুর্য—বাতাসে পূর্ণতার আশ্বাস।

বসন্তে তাই সেজে উঠেছে আজকের বনভূমি—সবুজ হলুদ আর নানা রং-এর পত্রপুটের নৈবেদ্য সাজায়, বাতাসে মহুয়া কুর্চিফুলের মদিরা সুবাস জাগে।

বিশাল মহান এ কোন্ পৃথিবী ! মৌমাছিরা আর প্রজাপতিরা বাতাসে ছিটোন রঙীন ফুলের মত উড়ে চলেছে বনে বনে। এ কি এক সুন্দর রাজ্য।

বাইরে মানুষের হানাহানি—শুধু বেঁচে থাকার জন্য এই হীনতা—নীচতা। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে এই অপরূপ কোন্ সুন্দরের রাজ্য।

থমকে দাঁড়িয়েছে পথ-চলতি অবিনাশ।

কে যেন অজ্ঞাতেই তাকে এই শান্ত নিবিড় প্রকৃতির সভাঙ্গনে হাত ধরে এনে পৌঁছে দিয়েছে অধরা কোন স্বপ্ন রাজ্যের মহফিলে!

কি ভেবে বসে পড়েছে অবিনাশ।

সবুজ হরিতকি গাছের নীচে বসে আপন মনে সে বাজিয়ে চলেছে। এর সুরটা ওই বনভূমির ঐক্যতানে মিশে গেছে। রাগ বসন্ত !

বসন্ত রাগ আলাপ করছে অবিনাশ তন্ময় হয়ে। এ সুরের রেশ কোন মানুষের আসরে পৌঁছেবে না—কোন অধরা সুন্দরের রাজ্যে হারিয়ে যাবে।

নির্জন বনভূমিতে রোদ উঠেছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে হিজিবিজি-কাটা রৌদ্র-ছায়ার মায়াজাল। একজোড়া ময়ুর ঘুরে বেড়াছিল ; কি একটা বিচিত্র সুরে তারাও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

শান্ত পুকুরের মাঝে কে যেন একটা ঢিল ছুঁড়েছে। চারিদিকে উঠেছে তরঙ্গ। তীরে গিয়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। কামারপাড়ার অনেকেই এতদিন ঠিক ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেনি। ক্রমশঃ করেছে এবং বেশ বুঝেছে এই ঘটনার পর থেকেই। তারা আর তারকবাবু, অবনী মুখুয্যে, ধরণী মুখুয্যে কাউকেই মাল দেবে না; সমস্ত মাল-পত্র যাবে সদরের মহাজনের ঘরে । ক্রমশঃ শালের গনগনে আগুনে তাতা লোকগুলোর মনে একটা কঠিন শপথে যেন জেগে উঠেছে এই কথাটাই ।

অতুল কামার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। এতদিন বামুন এবং জমিদারবাবুদের গুষ্ঠি, মায় পাঁচ পাড়ার সরিকান ধরণী মুখুয্যেকেও সম্মান দিয়ে এসেছে। একটা সম্পর্ক ও গড়ে উঠেছিল। তাই এত সহজে এক কথায় সে সব-কিছু মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু তার করার কিছু নেই।

সতীশ ভট্টাচায-এর কাজ বেড়েছে। কামারপাড়ার ন্যাড়া শিব পূজো—এটা সেটা পূজো আশ্রায় সেই যায়। ওইটুকুই যেন ধর্ম এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে ওরা তাদের।

দেড়-ঠেঙ্গে ভট্টচায সেদিন কথাটা পাড়ে।

—এটা কি ঠিক হচ্ছে অতুল ?

অতুল তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, ভটচায মশায়ের কথায় মুখ তুলে চাইল। সতীশ বলে উঠল,

—এই গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে এটা করা? গাঁয়ের পয়সা গাঁয়েই থাকতো—না হয়। যেছে বাইরের মহাজনের ঘরে—

অতুল প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ছেলে-ভাইপো, অন্যদের।

এমোকালী বলে ওঠে,—না। ওরা দর বাড়ালে তবে কথা। আর নগদ দাম দিতে হবে

অতুল আপোশের সেই মন নিয়েই বলে,

—আজ্ঞে বাবুদের দর বাড়াতে বলেন, তবেই ছেলেরা কথা বলবে। জানেন তো আমর হলাম বুড়ো হাবড়া, আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার কিনা !

বুড়োও যেন নিজেকে অসহায় বোধ করে। সতীশ ভটচাযও। তারও মুস্কিল বেড়েছে এ পরস্পর ঝগড়ায়। তারকবাবু সতীশকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—শ্যাম আর কুল দু-ই রাখ চলবে না। দরকার হয় একটাকে ছাড়তে হবে।

তা এই বামুনপাড়াই হোক—আর কামারপাড়া এবং অন্যান্য পাড়াই হোক—দুটোর একটাকে তার ছাড়তে হবে।

সতীশ ভটচায অবশ্য অনেক চেষ্টাই করছে যাতে একটা মীমাংসা হয়ে যায়—কিন্তু দেখছে দুপক্ষই যেন শালকাঠ, ভাঙ্গবে তবু নুইবে না।

অতুল বলে চলেছে,

—এটা দেখতেও খারাপ লাগে ভটচায মশায়—এই আকচা-আকৃচি। আমরা তো পিঁপড়ের জাত—এই আছি, টিপে দিলেই নাই। আপনিও বুঝিয়ে বলেন বড়বাবুকে।

ভুবন বাড়িতে ঢুকেই ওদের কথাবার্তা শুনে একটু চটে ওঠে। বাবাকে যেন বুঝিয়েও পারেনি এতকাল। বুড়ো হলে বোধ হয় এমনি নিস্তেজ হয়ে আসে মানুষ। সকলের কাছেই কাঁদুনি গাওয়াটা স্বভাবেই দাঁড়ায়।

এগিয়ে আসে ভুবন। একটু কঠিন স্বরেই বলে ওঠে,—থামো দিকি তুমি।

অতুল চুপ করে গেল। ছেলের অতর্কিত ধমকানিতে ভয় পেয়ে গেছে সত্যিই।

একটু থেমে বলে ওঠে অতুল,—হ্যাঁরে, মীমাংসার কথাও কইবি না ? হাজার হোক গাঁয়ের বাবু ওরা।

গজরাচ্ছে ভুবন,—মীমাংসা ! ওই উদের সঙ্গে ! তেলে জলে মিশ খায় না। ই আবার নোতুন কথা কি ? উ লিয়ে আর কুন কথা তুমি বলবা না, শুনবো নাই।

সতীশ ভটচাযও চুপ করে যায়।

ভুবনই বলে ওঠে সতীশ ভটচাযকে—

—আপনি এ নিয়ে আর কথা বলবেন না ভটচাযমশায় ; শেষ কথা হয়ে গেইছে আর লয়।

সতীশ ভটচায সাপের মুখে চুমু দেয়—ব্যাঙের মুখেও। সুতরাং বলে ওঠে সে-ও,—তা তো বটেই বাবা !

গজরাচ্ছে তখনও ভুবন,—হ্যাঁ, ছাপ কথা বলে দিইছি।

গুটি গুটি বের হয়ে গেল সতীশ ভটচায, অতুলও পিছনে পিছনে গেল। ছেলের ওই কড়া কড়া কথাগুলো কেমন তার ভাল লাগে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

—মেতে উঠলা নাকি, হ্যাঁ গো !

কদম-বৌ সব ব্যাপারেটাই শুনেছে। ভটচায মশায়কে ধমকানো, বুড়ো শ্বশুরকে ওই সব বলা—সবই দেখেছে সে।

কেমন ভাল লাগে না তার এ সব।

কদম এমনিতেই শান্ত প্রকৃতির। চুপচাপ ঘর সংসারের কাজ নিয়েই থাকে। ভগবান তার বুকে একটা অসীম শূন্যতা ব্যর্থতা দিয়েছেন—তাও সে টের পেয়েছে।

মা হয়নি আজও।

মনে হয় কোন্ পাপে, অপরাধে তার এই ব্যর্থতা। তাই সহজেই বোধহয় মন কাঁদে তার।

ভুবন এতশত ভাবে না। সে কাজ নিয়েই থাকে—এত তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই। চায়ও না।

তাই আবার বলে ওঠে,

—ঠিক কথা বলবো তাও দোষ !

কদম বলে,

—ঘরের ভেতর ঠিক কথা বলতে বলেনি কেউ—ওই সব বক্তিমে দেবা শালে বসে—ইখানে লয়। মানী লোককে যা লয় তাই বলবা।

—ওই! ইকি হল তুর !

অবাক হয়ে যায় ভুবন। কদমের অন্তরে কোথায় সেই সুপ্ত ব্যর্থতা জেগে উঠেছে। কাঁদছে সে।

ভুবনও কেমন অপ্রতিভ বোধ করে।

—ধ্যাৎ ! খালি খালি কাঁদিস কেনে বল দিকি ?

চোখ মুছে সরে গেল কদম-বৌ। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বাটনা বাটতে থাকে।

ধরণী মুখুয্যে কেপ্পনের হাড়। পিঁপড়ের পশ্চাদ্দেশ টিপেও নাকি সে চায়ের কাপে মেশায়—যদি তাতে গুড়ের সাশ্রয় হয়। ধরণীর ঝপুতি আমলের ব্যবসা ওই খুঁট বাসনের। অনেকেই তাতে দালান কোটা দিয়েছে, কিন্তু ধরণী মুখুয্যে সেই তেমনিই রয়ে গেছে। চেহারাটাও দড়ি পাকাচ্ছে, আর মাথার বাকি চুল ক'গাছিও উঠে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

নাকে কাঁদে,—ধনে-প্রাণে ডুবে গেলাম। যা দিনকাল পড়েছে !

এ কান্না নাকি তার চিরকালের।

দোকান-ঘরের বাইরে বসেছিল। কিছুদিন থেকেই দেখছে তার কারবারেও মন্দা এসেছে। অবশ্য বন্ধকী কারবার চলে ভালো গ্রীষ্মের সময় থেকেই পূজা অবধি। মুনিষ-মাহিন্দার নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে যেন একটা টাকার জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

শেষ অবধি কোনদিক দিয়েই সে টান মেটাবার পথ না পেয়ে আসে ধরণী মুখুয্যের কাছে।

শুধু হাতে টাকা পয়সা দেবার লোক সে নয়, দর্শনী আনতে হয়। তাই দু-এক টাকার বিনিময়ে তার অন্ধকার গুদাম-ঘর ভরে ওঠে পিতলের হাঁড়ি কলসী বাটি থালায় ; এবং অধিকাংশই আর ছাড়াতে আসে না ওরা।

একদিন অজ্ঞাতপথে তারা আবার পালিশ হয়ে নোতুন মালের সঙ্গে সদরে চলে যায় ; এক টাকার মুনাফা দাঁড়ায় দশ টাকা, অবশ্য বছরখানেক পর।

আর যারা আসে রাতের অন্ধকারে তারা আনে হার বালা—হয় দুধবালা, নিদেন রুপোর পৈঁছি মল পাঁইজোর।

ধরণী মুখুয্যে কারবার এমনি করে সাত-পাঁচে ভালই চলেছিল। কিন্তু ইদানীং যেন একেবারে ঠোস্ পড়ে গেছে।

বসে বসে ঢুলছে। হঠাৎ বেজা বাউরীকে আসতে দেখে চোখ খুলে চাইল। ঠিক চাওয়া বলা যায়না একে, নিরীক্ষণ করাই বলা যায়। বেজার হাতে একটা পিতলের চাদরের কলসী। সেটাকে সামনে নামিয়ে দেয়।

ধরণীও নিরীক্ষণ করে এবার সেইটাকে—বেজাকে নয়। গম্ভীর ভাবে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দিয়ে কলসীটা ঘরে ঢোকাতে যাবে, বাধা দেয় বেজা।

—আজ্ঞে তিনটাকা লাগবেক।

—তিন টাকা ! অ্যাঁ ! ধরণী চমকে ওঠে।

বেজা জবাব দেয়,—আজ্ঞে ! ধরণী ইতিপূর্বে এ রকম অনেক করেছে। আজও তাই করে। পা দিয়ে কলসীটা ঠেলে দেয় ওর দিকে ।

—হঠ্ ! তিন টাকা ! ঘাসের বীজ নাকি রে টাকা !

বেজাও কলসীটা উঠিয়ে নিয়ে নেমে গেল চুপ করে। অবাক হয় ধরণী। প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। ধমকে ওঠে,

—এ্যাঁই !

বেজা দাঁড়াল মাত্র। একটু আগেই দেখে এসেছে কামারপাড়ার লোকই তিন টাকা দেবে বলেছে। এখানে এসেছিল পুরোনো বাবু বলে। তা নমুনা দেখেই যেন মন মেজাজ বিগড়ে গেছে বেজার।

বেজা বলে ওঠে,—আজ্ঞে তিন টাকা দেবে বলেছে গুপী কামার।

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ধরণী।—তিন টাকা দেবে তুর বাবা ! তা যা না কেনে সেইখানেই।

একবার ফিরে দাঁড়াল বেজা। কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়,—গাল দেবা না ঠাকুর।

কথাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে চলে গেল সে হন-হনিয়ে। গুম হয়ে বসে থাকে ধরণী মুখুয্যে। কেমন যেন কড়া জবাব দিয়ে চলে গেল ওই লোকটাও।

বুঝতে পারে কেন তার কারবার মন্দা পড়েছে। এইবার যেন একটা শক্ত বাধা আসছে। চুপ করে বসে থাকে ধরণী।

একা ধরণী নয়, এ পাড়ার অনেকেই তাই টের পেয়েছে, ভাবছে।

ভাবছে তারকবাবুও।

সতীশ ভটচায শেষ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। ওই কামারপাড়ায় এখান ওখানে পেটো ঠুকরে চাল কলা যা সংগ্রহ হয় তাতে মানুষের নয়, কাক চিলের পেট ভরে। তার চেয়ে এই বাবুপাড়াই ভাল, নিত্য সেবা হচ্ছে। এটা-সেটা তো লেগেই রয়েছে পাল-পার্বণ।

--কি রে এলি ? তারকবাবু গোকুলকে আপ্যায়ন করে। একটা তার মতলব মাথায় এসেছে, পাটোয়ারী বুদ্ধি যাবে কোথায় ?

—এলাম আজ্ঞে।

প্রণাম করে পরম ভব্যিযুক্তের মত দাঁড়াল গোকুল, যেন সাধু মহাপুরুষ বিনয়ের অবতার। আগ্রহ ভরে কুশল সংবাদ নেয় সে।

—ভাল আছেন বড়বাবু ? জ্যাঠামশায়—মেজকাকা—

সারা গ্রাম শুদ্ধ যেন তার মধুর সম্পর্ক লতায় পাতায় জড়ানো, মুখে মধু বর্ষিত হচ্ছে। গোকুল বলে ওঠে,

—মিছিমিছি টেনে নিয়ে গেল কাকা আপনারা থাকতে। ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, খপ করে ধরে বেদম পিটিয়ে দিলে, দ্যাখেন কিনা পাটা—এখনও জখম সারেনি।

বেলা বেড়ে চলেছে।

কি জবাব দেবে ওরা, আর কি-ই বা বলবে।

একে একে আড্ডাধারীরা উঠে যায়; ঘর খালি হয়ে গেল।

চুপ করে বসে আছে তারকবাবু, ওদিকে গোকুল যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। বের হতে যাবে, হঠাৎ তারকবাবুর ডাকে দাঁড়াল।

—শোন।

গোকুল ওর দিকে চাইল। তারকবাবুর মুখে কেমন একটা বিচিত্রভাব, এতক্ষণ ভেবে ভেবে একটা পথ বের করেছে।

গোকুল জানে, টের পেয়েছে কিছুটা।

তাকে কোন কাজে লাগাবে বড়বাবু। গোকুল সব পারে, পারতেই হবে তাকে।

গোকুল ওর কথাটা যেন আনমনে শুনছে। কোন দূর থেকে ভেসে আসছে ওই কথাগুলো গোকুলের কানে। শীতের আমেজ গিয়ে রোদ আসছে—বনভূমি কেমন ছায়াচ্ছন্ন উদাস হয়ে ওঠে।

কেমন একটা সুন্দর ছবি, গোকুলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—একটা শান্ত মধুর তৃপ্তির স্বাদ আনা ছবি।

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত একটি লোক—এখানে ওখানে কোথাও তার ঠাঁই নেই। পেটের ভিতর কেমন অসহ্য একটা জ্বালা—সারা শরীরে তার ব্যাপ্তি।

তারই মাঝে একটু শীতল পানীয় আর আহার্যের স্নিগ্ধতা নিয়ে এসে, দাঁড়িয়েছিল একটি নারী। কেমন সুন্দর একটা পূর্ণতা তার মনে।

গোকুল একেবারে অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না, মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে ওর মধ্যে সুপ্ত একটা মানুষ, সে যেন আজও মরেনি।

আদর আর স্নেহভরা উপকরণে সেদিন ক্ষুধার্ত গোকুলের মুখে জুগিয়েছিল ক্ষুধার অন্ন পানীয় সেই নারী।

একটা সুন্দর অনুভূতি !

বড়বাবুর কথাগুলো শুনছে সে। কেমন যেন চমকে ওঠে গোকুল। বলে ওঠে অস্ফুট কণ্ঠে,

—বড়বাবু ! না—না ! ও আমি বলতে পারবো না বড়বাবু! মাপ করুন আমাকে ।

তারকরত্ন ওর দিকে চাইল তীব্র সন্ধানী কঠিন দৃষ্টি মেলে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে তারকবাবু,

—পারবি না বলতে ?

গোকুলকে যেন নীরব শাসন আর কঠিন তিরস্কার করে সে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে তারকবাবু,

—বলতে হবে তোকে। এই কথাই বলবি।

গোকুল আমতা আমতা করে।

—এতবড় মিছে কথা বলতে হবে ?

হাসছে তারকবাবু ।

—তুইও দেখছি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলি ? শোন । ঘরখানা পড়ে যাবে তোর এইবার; ছাওয়াগে যা—খড় পয়সা লাগে নিয়ে যা। আর খাবারও তো নেই, কি ?

গোকুল ওর দিকে চেয়ে থাকে, তারকবাবু তাকে লোভ দেখাচ্ছে। খাবার—আশ্রয়—তার ঘর সব কিছু তুলে দেবে, জুগিয়ে দেবে, বিনিময়ে তাকে বলতে হবে ওই সব মিথ্যা কথাগুলো ! যা ভাবতে শিউরে ওঠে গোকুলের মত একটা নৃশংস মানুষও।

কোথায় যেন অসহায়ের মত বন্দী হয়েছে সে। জড়িয়ে পড়েছে নিজেরই জালে। তারকবাবু বলে,

—নে !

গোটাকতক টাকাও নগদ বের করে দেয় তারকবাবু।

স্তব্ধ হয়ে আসে গোকুল । শয়তানেরর কাছে অদৃশ্য দাসখৎ-নামায় সব কিছু লিখে দিল সে ; তার মনুষ্যত্ব, বিবেক, শুভবুদ্ধি—যার সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট ছিল—সেইটুকুও।

কেমন যেন মনের অতলে একটা কি বেদনা কাঁটার মত বাজে খচ খচ করে। হাসছে তারকবাবু।

—কথাটা বলে দেখ—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় টের পাবি তখন।

নিজেই হাসতে থাকে তারকবাবু খিক্ খিক্ শব্দে।

এতদিন পর যেন কামার পাড়ায় একটা সমবেত আশা রূপ নিয়ে চলেছে। কাজ-কর্ম শুরু করেছে তারা। এগিয়েও গেছে অনেকখানি। অশোকই সেই পথ দেখিয়েছে। কামারপাড়া—তাঁতিপাড়ার সকলেই প্রায় কথাটা বুঝেছে ; এবার আর ঠকবে না তারা। অশোককে বলে, —আপনিও থাকুন সমবায়ে।

অশোক জবাব দেয়,—তোমাদের ব্যাপারে আমি ঢুকলে দুদিন পর তোমরা না ভাব, তারকবাবুর দল শোনাবে আমার নিজের লাভের জন্যই আমি এসব করেছি।

—আমরা তা মানবো না। এমোকালী জবাব দেয়।

—তুমি না মানো, অন্য অনেকেই ক্রমশঃ সন্দেহ করবে। তার চেয়ে তোমাদের কাজ তোমারাই করো, আমি একজন মেম্বরই রইলাম মাত্র।

অতুল অশোকের কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না ।—তবে খামোকাই থাকবেন আপনি?

বিনা শর্তে—বিনা স্বার্থে এতবড় দায়িত্ব, এই ঝামেলা কেউ নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে এটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না তারা।

বাবুদের অনেকেই এসেছিল, অবনী মুখুয্যেও এসেছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে এদের দলে ভিড়তে, যদি লাভ কিছু হয়।

অতুল কামার অবাক হয়ে শোনে ওদের কথা ; মানুষ যে এত বিচিত্র হতে পারে তা কল্পনাও করেনি অতুল। এরা সব পারে।

সেই সন্ধ্যায় অবনী মুখুয্যেই বলেছিল,

—যেমন তারকবাবু তেমনি ওই অশোক। কাউকে বিশ্বাস করিস না ভুবন,অলরট্! দুজনে মামা-ভাগ্নে—তলে তলে একবোরে ক্লোজ কনটাক্ট, মানে এই সড় আছে, বুঝলি? তা কই—দেখি কি দরখাস্ত করলি তোরা ?

অশোকের সম্বন্ধে কথাটা ওরা ঠিক যেন সহ্য করতে পারেনি।

এমোকালীই জবাব দেয়,—আজ্ঞে কাগজ-পত্র সব ছুটবাবুর কাছেই রইছে।

রমণ ডাক্তার, অবনী মুখুয্যের উপরপড়া হয়ে এই সব কথা বলতে আসার উদ্দেশ্যটা বুঝে নিয়েছে কামারপাড়ার ওরা। তবু চুপ করে থাকে।

রমণ ডাক্তার সাবধান করে দেয়।

—অবনীবাবুর কথা শোন কেলে, ঘাঁৎ ঘোঁৎ সব জানে। আর গ্রামের পঞ্চজনকে নিতে হবে তবে তো সমবায়।

অবনী ধুয়ো ধরে,

—হাজার হোক ডাক্তার মানুষ, উনি থাকুন; হেলু মাস্টার—ধর আমি—সবাইকে মুখ বাছাবাছি মেম্বর কর। কোন গোলমাল হবে না।

অতুল অবাক হয়ে যায় । তাঁদের এতদিন দেখা মেলে নি। হঠাৎ যেচে এসে এত উপদেশ দেওয়াটা কেমন বিচিত্র ঠেকে এই সমবায়ের ব্যাপারে।

জবাব দেয়,—ভেবে দেখি, আমরা মুখ্যু লোক, আপনাদের ছাড়া তো গতি নাই।

অবনী মুখুয্যে ওদের কথাটার কেমন উৎসাহ খুঁজে পায় না। বলে ওঠে,

—তাই দেখ ভেবে চিন্তে কি করবি।

অবনী মুখুয্যে, রমণ ডাক্তার সেদিন চুপে চুপে বের হয়ে এসেছিল।

তারা আর কিছু না করতে পারুক, অশোক আর তারকবাবুর মধ্যে যে মামা-ভাগ্নে সম্পর্কটা আছে, তাদের মধ্যে কোন যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়, এই প্রশ্নটা এদের অনেকের মনে তুলে দিয়ে এসেছিল।

ওদের দু-একজন যে এটা ভাবেনি তা নয়।

গদা কামার তাই বলে ওঠে,

—খুড়ো শেষকালে যেন এক খাল থেকে অন্য ডোবায় না পড়ি কিন্তু। সেই যে বলে না, 'ভূতের ভেয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে'। তাই যেন না হয় অতুলখুড়ো ? অশোকবাবুর কথাটা—

কালীই ধমকে ওঠে—থামো দিকিনি।

কিন্তু এসবের মধ্যেই অশোক গেল না। অবাক হয় তারা অনেকেই অশোকের এই ব্যাপারে। সে কোন পদ তো নিলই না, এমন কি সভ্যও হোল না।

অতুল কামারের বারান্দায় আবছা আঁধার নেমেছে। বৈঠকের লোকগুলোর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তাদের মাঝে অশোক স্পষ্ট কথায় শুনিয়ে দেয় ওর মতটা। বলে ওঠে ভুবন,

—তালে আমাদিগকে কি পথে বসাবেন ছুটবাবু ?

—কেন ?

ভুবন বলে ওঠে,

—আপনি থাকছেন না, শেষকালে মুখ্যু মানুষ, এত টাকা দেনা দায়িক লিয়ে পথে বসবো।

হাসে অশোক,—ছেড়ে যাবো না কামার কাকা ; পাশেই রইলাম। কাজ তো এখন সবই বাকি, এখন যাবো কোথায় ?

রাত হয়ে আসছে। বের হয়ে আসে অশোক। উঠোনের পাশে বড়-বৌকে দেখে দাঁড়াল।

কদম অশোকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,

—চলে যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ !

মেয়েটা সব কথাই শুনেছে। দেখেছে গ্রামে ওদের বিরাট প্রতাপ। শ্বশুরবাড়ির গাঁয়েও অশোক তার নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে, অর্জন করেছে ওদের প্রীতি শ্রদ্ধা বহু মূল্য দিয়ে। আজও তা দেখেছে কদম-বৌ।

বলে ওঠে—ওদের যেন গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ো না।

—না, না।

অশোক ওর কথার প্রতিবাদ করে।

কদম বৌ হাসছে। ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় অশোক।

কেমন যেন অর্থপূর্ণ সে হাসি।

কদম বলে ওঠে—চা করেছিলাম যি।

জবাব দেয় অশোক,

—থাক। রাত হয়েছে।

কদম পরিহাস-তরল কণ্ঠেই বলে ওঠে,

—বাবাঃ, ঘরে কেউ নাই, তবু ঘরে ফেরার টান তো দিব্যি রয়েছে দেখছি।

অশোক দাঁড়াল না। সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে গেল পথে।

আবছা অন্ধকার নেমেছে। গ্রামপথ প্রায় জনহীন। শীতের আমেজ তখনও যায়নি। কুয়াশা আর চাঁদের আলো দূরের উৎরাই ডাঙ্গার বুকে শালবন সীমা আচ্ছন্ন করে তুলেছে। কোথায় ডাকছে একটা রাতজাগা পাখি কেমন করুণ বিষাদমাখা সুরে।

পথের ধারে বাড়িগুলো কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে তখনও আলো জ্বলছে। কি ভেবে থামল অশোক। জানলার বাইরে দেখা যায় একফালি ম্লান আলোয় প্রীতিকে, পড়ছিল বোধ হয় সে।

থমকে দাঁড়াল অশোক। প্রীতিকে এমনি রাতনির্জনে কোন মায়াময় একটি সুন্দর পরিবেশে ইতিপূর্বে সে দেখেনি। কেমন যেন নির্বাসিতা একাকিনী একটি সত্তা, রাতনির্জনে কোন বিচিত্র জগতের লোক সে—পথ হারিয়ে এখানে আটকে পড়েছে।

—আপনি !

হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছে অশোক কি একটা অপরাধ করতে গিয়ে। মনে মনে লজ্জিতই হয়। আমতা আমতা করতে থাকে।

—যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে কাকাবাবু আছেন ?

সেই লজ্জা এড়াবার জন্যই যেন সহজভাবে ওদের বৈঠকখানাতে ঢুকলো। এগিয়ে আসে প্রীতি,—বাবা সদরে গেছেন।

—একটা জরুরি পরামর্শ ছিল।

—কাল ফিরবেন।

কথা বলল না অশোক। রাত হয়ে আসছে—কি যেন একটা স্তব্ধরাত্রি। সব হারিয়ে গেছে সবাই। জেগে আছে মাত্র তারা।

—আচ্ছা গ্রামে আপনার মন টেঁকে?

প্রীতির প্রশ্নে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল অশোক।

সোজা একটা প্রশ্ন। তবু তার উত্তর দিতে পারে না অশোক।

প্রীতির চোখ মুখে একটা চাপা বিরক্তি। আলোয় দেখা যায় ওর সুন্দর সুঠাম দেহের ভাঁজে ভাঁজে কেমন একটা রূপবতীর সত্তা, একটু ফর্সা সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বুদ্ধির সতেজ একটা দীপ্তি।

শান্ত নিথর কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে একটা ম্লান তারার দীপ্তির মত ওই চোখদুটো তার দিকে কোন দূর থেকে চেয়ে আছে। প্রীতিও অনেকদিন থেকে কথাটা ভেবেছে। বলে ওঠে প্রীতি,

—এমনি করে গ্রামেই কি কাটাবেন সারাটা জীবন ?

—এখানেও তো কাউকে থাকতে হবে। অশোক ওর কথার জবাব দেয়।

—এই অন্ধকার পাড়াগাঁয়ে ! অবাক হয়ে গেছে প্রীতি।

অশোক ওঠে,

—অন্ধকার একদিন আলো হবেই। নোতুন মানুষের দল আসবে—তাদের পথ দেখাতে আমরা অন্ততঃ মশালচি হতেও তো পারি।

কেমন যেন কথাটা মনঃপূত হয় না প্রীতির।

—ওসব আদর্শের কথা। আসলে কি ওর দাম !

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে অশোক। ওর দুচোখে কোন এক ঘরের নেশা। অনির্দিষ্ট পথে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে যারা ছোট্ট ঘরের মাঝে আনন্দ আর শান্তির সন্ধান করতে চায়, প্রীতি তাদেরই দলে। কোন আদর্শ-স্বপ্ন ওর জগতে নেই। কঠিন বাস্তবটাকেই চেনে ওরা।

ওর কথার জের টেনে বলে ওঠে অশোক—কি ওর দাম ! আসলে কোন দাম আছে কিনা তাও জানি না। শুধু এইটুকুই বলবো, অন্ততঃ এই বিশ্বাসটুকু আমার আছে যে দিন বদলাবেই আর তার জন্যই এখানে রয়ে গেছি।

প্রীতির কথাটা ভাল লাগে না।

—কোন ভবিষ্যতের পথ না খুঁজেও ? লেখাপড়া শিখেছেন—আজকের দিনে যেমন করে হোক বাঁচতে পারেন একটা বাল কাজ কর্ম গুছিয়ে নিয়ে।

হাসছে অশোক। থেমে গেল প্রীতি ওর অতর্কিত এই হাসিতে। নিজের মনের একটা চাপা ব্যাকুলতাই কোথায় ধরা পড়ে গেছে।

অশোকের জন্য অনর্থক সে অনেকখানি বেশি ভেবে ফেলেছে, তাই হয় তো ওকে জীবনপথ দেখাবার এই অহেতুক ব্যাকুলতা !

প্রীতির মনে অশোকের জন্য নয়, নিজের কল্পনার সার্থকতার জন্যই বোধ হয় অশোককে বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

তার এই দুর্বলতাটা যেন অশোকের চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা আসে।

কুয়াশা ঢাকা আঁধারে জ্বলছে জোনাকির আলো, বাঁশবনে বাতাসের হু হু আনাগোনার সুর জাগে। কেমন যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলে প্রীতি।

—আপনার মা-ও তো বেঁচে নেই ?

অশোক মাথা নাড়ে।

—না। মাকে আমার মনে পড়ে না। বাবাও বিদেশে। তবে শিগগির নাকি রিটায়ার করবেন।

—এইখানে আসবেন তিনি ?

—না, কলকাতায় বাড়িতে, না হয় বাঁকুড়ায় থাকবেন।

—আর আপনি ?

অশোক হাসে।

—এই পাড়াগাঁয়েই। কলকাতায় আমার মন টেঁকে না। মনে হয় কেমন যেন হারিয়ে গেছি। ।জের সব কিছু হারিয়ে ওই মহানগরের বিরাট চাকার গতিবেগে আমিও যেন অবিশ্রান্ত রছি। পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। আমার যেন নিজের কোন সত্তাও নেই।

ওই মহানগরীকে সে অতীতে দেখেছিল ।

দেখেছিল তার কঠিন কঠোর রূপ।

অনেক দুঃখ-বেদনাময় দিনগুলো মনে পড়ে অশোকের।

অনেক স্মৃতিই রয়ে গেছে তার মনে, বেদনাদায়ক সেই স্মৃতি।

মা-কে মনে পড়ে।

মনের আকাশে একটি রঙ্গীন হালকা মেঘের মত সেই সাড়া জাগে। শিশু মনের সেই াকুলতাকে আজও সে ভোলেনি।

মা !

কবে কোন অতীতে তা হারিয়ে গেছে ; অশোক তখন শহরে, ঠাকুমার কাছেই থাকে।

হঠাৎ কেমন যেন সে-বাড়ির সব আলো নিভে যায়।

ঠাকুমার চোখে জল নামে, কিশোর অশোক তখন ঠিক বোঝেনি কি যেন হারিয়ে ।ল তার।

মা মারা যাবার পর আবার সে-বাড়িতে তাঁর সব স্মৃতিটুকু মুছে ফেলার আয়োজন চলেছে।

নোতুন মা এল সেইখানে।

অশোকের সেদিন মনে হয়, মা তার সত্যি মারা গেছে, এ বাড়িতে তার কোন ঠাঁই নেই।

বাবাও বলেন,

—ওকে হোস্টেলেই পাঠাবো, সেইখানেই থেকে পড়বে।

বাড়ির সেই পরিবেশ, ঠাকুমায়ের স্নেহ—সব ফেলে তাকে কোন অপরিচিতের ভিড়ে য়ে দাঁড়াতে হবে।

নোতুন মা-ও মত দেন।

—সেই-ই ভালো।

মহানগর আর তার মানুষগুলো সেদিন অশোকের কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছিল।

মাকে তবু ভোলেনি, বার বার যেন তাঁর কথাই মনে পড়েছে। একটি শিশুর দুচোখ ছেয়ে ল নেমেছিল সেদিন।

অশোক খানিকটা আঘাত পেয়েছিল সত্যিই, কিন্তু চিনেছিল এই পৃথিবীকে অনেকখানি।

এখানকার মানুষদের সম্বন্ধে তার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল। এতটুকুই মাত্র পাওয়া বে তাদের কাছ থেকে, তার বেশি আশা করা উচিত নয়।

সে মাত্রাধিক কিছু আশাও করেনি।

অনেক বেদনায় সব স্বপ্নকে সে সংযত করে চলেছে।

অশোকের মুখে একটা বেদনার ছায়া নামে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে পড়ে সে।

—চলি রাত হয়েছে।

জবাব দিল না প্রীতি। অশোক বের হয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি।

কেমন অত্যন্ত একা অসহায় মনে হয় নিজেকে। অন্তহীন তমসার রাজ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে একটি একাকিনী সত্তা।

এই মাটি—এই জীবনযাত্রা অন্তহীন দিগন্তসীমা আর নীল আকাশের অসীমে অশোক যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজছে একা একটি মেয়ে।

প্রীতি চুপ করে বসে থাকে।

—শুতে যাবা নাই কো ?

বুড়ী ঝিয়ের ডাকে প্রীতি ওর দিকে চাইল।

— হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।

ঝিটাও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এত বয়স হল এসব সে দেখেনি যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে।

নীলাম্বরবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল বুড়ী, আজ তার মেয়েকেও দেখছে প্রীতির দুচোখ যেন কোন স্তব্ধ শান্তিনীড়ের আহ্বান। তবু কেমন যেন ভয় পায় ওকে অশোক।

সুপ্তিমগ্ন গ্রামসীমা। আজ জীবনের অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বাবার সংস্পর্শে বড় একটা আসেনি অশোক। তিনি চাকরি নিয়ে সারা ভারতে ঘুরে বেড়ান—মাকেও মনে পড়ে না তার।

ছেলেবেলা হতেই অশোক স্কুলবোর্ডিং, কলেজ-হোস্টেলেই মানুষ। ঘরের বাঁধন সে জানে না, তাই বোধহয় এমনি শান্ত রাত্রির গহনে কার দুচোখের চাহনিতে একটা অন্য জগতের ইশারায় চমকে উঠছে সে।

কিন্তু প্রীতি এ মাটির যেন কেউ নয়।

হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বনের দারের রাস্তায় দু-একটা গরুর গাড়ি চলেছে দুর্গাপুরের দিকে। ওদের লিগের সঙ্গে ঝোলানো লণ্ঠনের এক ফালি আলো—দুলছে আর ছিটকে পড়ছে পথে। তার টুকরো টুকরো শব্দ ভেসে আসে। বোধ হয় ধান বিক্রি করতে চলেছে দুর্গাপুর বাজারে। ভোর নাগাদ দামোদরের ধারে পৌঁছবে। তারপরই ভোরের আলোয় পার হবে তিন মাইল বালিয়াড়ি। শিশির-জমা বালিতে পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—কন কন করে। গরু বাছুর এই ঠাণ্ডায় হাঁপিয়ে ওঠে। লালা ঝরে মুখ দিয়ে। অশোকের চোখের সামনে ছবিটা ভেসে ওঠে।

সভ্যজগৎ, রেল লাইন আর এই প্রায়ান্ধকার বনঘেরা অঞ্চলের মাঝে ওই দামোদরই একটা সীমারেখা সীমাপ্রাচীর রচনা করে আছে আদিকাল থেকে। সভ্যতার সব আলো, সব গতি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে খরস্রোতা ধ্বংসরূপী মহাকাল ওই দামোদর নদ।

অশোকের প্রীতির কথা মনে পড়ে । এই অন্ধকার গ্রামে তাই বোধহয় মন টেকে না

াতির দুচোখ কি একটা বেদনার করুণ ছায়া, হঠাৎ পথ-চলতি একটি মন তাই আবিষ্কার করে মকে উঠেছে।

একদিকে জীবন গড়ে—অন্য দিকে ভাঙ্গার সূচনা। শুধু ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। অন্তহীন এই াঙ্গা-গড়ার খেলায় রাত্রি দিনের পরিসরে মহাকালের চাকা ঘোরে দুর্নিবার গতিতে।

তারা জ্বলে—হাওয়া কাঁপে।

বেজা বাউরী বসে আছে। বিনিদ্র রজনীর প্রহর ঘোষণা করে ডাঙ্গার দিক থেকে কটা বন পালনো শিয়াল। দুটো নীল চোখ জ্বলছে কি এক শ্বাপদ লালসায় ! কাশছে বেজা রী।

জীর্ণ শরীরে কেমন একটা ক্লান্তি আসে। তবু ঘুম আসে না। অবশিষ্ট বিষাক্ত রক্তটুকু যেন াথায় উঠেছে।

বৌটা নেই ! এক ঘুমের পর উঠে তামাক খাবার খেয়াল হয়েছে। বেজা ঘুমোয় ওই একটুকু দিনান্তে একবারই খেতে পায়। ওই সন্ধে বেলাতে চাট্টি ভাত আর শামুক-গুগলির ঝাল পুঁই াকপাতা দিয়ে জোটে ; সারাদিনের অসহ্য জ্বালার পর দুমুঠো ভাত যেন সারা শরীরে একটা বসাদ আনে।

শান্তি ছেয়ে আসে। ঘুমোয় একটুকু ভাত-ঘুম। তারপরেই আবার যা কে তাই। রাত কাটে —জেগে থাকে সুপ্তিময় বাউরীপাড়ায় একটা অর্ধমৃত প্রেতাত্মার মত ওই বেজা বাউরী।

আজ ঘুম ভেঙ্গে যেতে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে তামাকের ভাঁড়টা, যদি একছিলিম বশিষ্ট থাকে।

তালাইটা ফাঁকা—চালের বাতার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বৌটা নই।

—এ্যাই !

বুড়ীমা একদিকে পড়েছিল ছেঁড়া কাঁথা চাপা দিয়ে আধমরা ভালুকের মত। ওর চীৎকারে রক্ত হয়ে ওঠে—এ্যাই চুপ করে থাক।

—বৌটা কুথায় ?

মা বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে,—শুধোবি সিটোকে আত দুপুরে কুথা যায় !

বেজা চুপ করে এসে বাইরে বসল। কেমন হু হু হাওয়া বইছে। রাতের কনকনে হাওয়া।

নিঝঝুম বাউরী পাড়ায় কোথায় কে যেন ককিয়ে কাঁদছে। নিতে বাউরীর আধমরা ছেলেটা াদছে ককিয়ে—বোধহয় পেটের জ্বালায়। পেটের জ্বালায় ওরা শুধু কাঁদে।

আর বুক জ্বলছে বেজার।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চমকে ওঠে। আঁধারে পেত্নির মত দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। ছেঁড়া য়লা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তখনও পেত্নির মত কুৎসিত মেয়েটা হাসছে কদর্য শ্রী সুরে।

ধমকে ওঠে বেজা,—এ্যাই!

এগিয়ে আসে টেরি বাউরী। বলে ওঠে

—বৌটাকে খুঁজছিস ? দেখগো বড়বাবুদের খামারে—হিঃ হিঃ।

হাসিতে ফেটে পড়ে বাউরী পাড়ার প্রেতাত্মা। হাসছে ওদের ঘরের সর্বনাশা আগুন দে ওই টেরি মেয়েটা খিলখিলিয়ে।

বেজার অক্ষম দেহের কোষে কোষে যেন আগুনের ধারা বইছে। জ্বলছে সারা গা।

—ভাগ্ !

বেজার হাতের কাছে পড়েছিল একটা আধপোড়া জুমড়ো কাঠ, তাই তুলে নিয়ে উ দাঁড়াল সরে যায় মেয়েটা।

হঠাৎ আবছা অন্ধকার ভেদ করে কাকে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল বেজা।

লবঙ্গ রাত-দুপুরে অভিসার সেরে ফিরছে, মনে তখনও রঙ্গীন নেশা। নোতুন ডুরে শাড়ি খুঁটে বাঁধা কয়েকটা করকরে রুপোর টাকা, কপালের কাঁচপোকার টিপটা কোথায় খুলে পড়েছে

কি যেন একটা উন্মাদ দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আসছে—তবু মনে মাদক-সুরে রেশ মুছে যায়নি।

সামনেই বেজাকে জুমড়ো কাঠ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় লবঙ্গ, যে ভয় পেয়েছে। পরক্ষণেই সামলে নেয়।

বেজাও ওর দিকে চেয়ে থাকে ; বৌটাকে দেখছে সে।

নোতুন শাড়ি পরনে—দেহে কেমন উতরোল ঢেউ। বাউরী পাড়য় ওকে মানায় না। লব বলে ওঠে,

—হাঁ করে অমন উদোস মেরে দেখছিস কি জুমড়ো কাঠ হাতে ?

বেজা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়,—তুকে !

হাসছে মেয়েটা,—রাস্তার সব্বাইতো ওমনি হাঁ করে চেয়ে থাকে। তুইও !

কথা বলে না বেজা। এগিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে দপ্ দপ্ জ্বলছে ওর শীর্ণ কোটরাগ দুটো চোখ ; ধুঁকছে লোকটা। হঠাৎ সব শক্তি একত্রিত করে শীর্ণ শাঁড়াসির মত হাত দুটো দিয়ে টিপে ধরে ওকে। কাপছে বেজার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে।

—এ্যাই !

বৌটাও চকিতের মধ্যে এক ঝটকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল—আচমক ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে বেজা।

গজরাচ্ছে লবঙ্গ ।

—ভাত দিবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোঁসাই আইছেন। মরেও না যম। গায়ে হা দিতে আসিস—খাইয়ে দাইয়ে তুর গায়ে জোর করছি কিনা ?

অসহায় বেজা উঠে বসেছে ততক্ষণে , ওই ধাক্কাটা তার দেহেই শুধু নয়, বিকৃত মনে কোনখানে নিবিড় বেদনা এনেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘরের ভিতর ঢুকে গেল বিজয়িনীর মত লবঙ্গ ।

তার মনে তখনও জীবনবাবুর খামারবাড়ির এক প্রান্তে সুন্দর ঘরটার স্বপ্ন, কেম

সখানকার বাতাসটুকু অবধি সুগন্ধময়, মনোরম। ঝকঝকে তকতকে। এখানে যেন কেবল দুঃখ ার আঁধার, এতটুকু আলোর নিশানা নেই। আঁধারেই ছোঁড়া কাঁথাখানা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বেজা তখনও বাইরে বসে আছে। কাঁপছে শীতে আর হাড়-কাঁপানো জাড়ে।

খাটতে সে আর পারবে না কোন দিনই। সারা শরীরটা যেন ঘুণধরা বাঁশের মত পঙ্গু আর ীর্ণ হয়ে গেছে । কুৎসিত রোগে জারিয়ে দিয়েছে তার দেহ।

না হলে বৌটাও আজ তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করে !

খিক্ খিক্ খিক্।

হাসছে খেঁকশিয়ালের মত সেই কুৎসিত টেরি বাউরী।

একটা চোখ কানা—তবু যৌবন তাকে বঞ্চিত করেনি। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় ানোয়ারের মত ঘুরে বেড়ায়। যদি কিছু রোজগার হয়।

বেজার বৌকে তাই হিংসা করে সে আনন্দ পায়, বেজার ওই হেনস্থায়।

—বউটো ফিরে আইচে হ্যাগো ? দেখলম যেন।

জবাবা দেয় না বেজা।

টেরি বলে ওঠে—কুন্দিন যাবেক আর ফিরে আসবেক নাই। ভাল করে ছাঁদন দড়ি করো।

টেরি বোধ হয় কোথাও ধেনো মদ গিলেছে, কেউ দিয়েছে। বিশ্রী গলায় তাই বোধহয় ান গাইতে থাকে—

বেজাই দাদা কলাই খেয়ো না
জানলা দিয়ে বউ পালাবে
দেখতে পাবে না।

বেজা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসে থাকে, কেমন হতাশ হয়ে টেরি থেমে গেল।

সারাদিন খাওয়া জোটেনি মেয়েটার। তাই তারও দম যেন ফুরিয়ে আসছে।

তাই চুপ করে সরে গেল টেরি বাউরী। হঠাৎ কাঁদতে থাকে খিদের জ্বালাতেই বোধহয়। মেয়েটা ঘেংড়ে ঘেংড়ে একটা জানোয়ারের মত কাঁদছে।

নিতে বাউরী জেগে আছে।

ওর মনে একটা সুপ্ত জ্বালা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে সারাদিনে ওর পেটে একটু ফ্যান মাত্র দিতে পেরেছে।

কাজ কেউ তাকে দেয়নি।

এখন আর কাজ দেবে কে ? চাষ আবাদ চুকে গেছে। ধান উঠে গেছে। দুচার কানি আখ, আলু যাদের আছে তারাও নিজেরাই চাষীবাসী। বামুন চাষী নয়—নিজেরাই গায়ে গতরে খাটতে পারে।

বাধ্য হয়েই এরা এখন বেকার থাকবে ক'মাস ।

তাছাড়া ধরণী মুখুয্যে সেই ঘটনার পর থেকে কেমন যেন সারা গ্রামে বামুনপাড়ায় রটিয়ে

বেড়িয়েছে নিতের বদমেজাজের কথা। তাকে কাজ দিলেই নিদেন ফৌজদারী বাধাবে মুনিবের সঙ্গে। সেই কথাটা যেন অনেকেই শুনেছে।

ডাকতে এসেছিল ছানু দাস।

—দোকানে কাজ করবি নিতে ?

ছানু দাস আর পানু দাস-এর দোকানে কাজ করতে কেউ চায় না। খাটুনির শেষ নেই। রাতবিরেতে গাড়ি আর মালপত্র নিয়ে আস যাও বাঁকুড়া আর দুর্গাপুর। বনপাহাড় আর দামোদরের দিগন্তপ্রসারী বালিয়াড়ি গাড়ি নিয়ে পার হওয়া—আর নিজেই গরুর মত জোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে গাড়ি টানা একই কথা।

সে তো নিত্যকার ঘটনা—তাছাড়া ধানের মরসুম এখন দোকানে। দেশের লোক এখন শুধু ধানই চিবে, ধান থেকেই ওদের সব। কাপড়-চোপড়—সম্বৎসরের বলদ গরুর খোল, সংসারের যাবতীয় সব কিনতে হবে।

ধান তাই দেখতে দেখতে গ্রাম থেকে উবে যায়—আশপাশের সব গ্রাম থেকেও।

কোমরে করে বস্তা বস্তা ধান তোল গাড়িতে, আবার মহাজনের গদিতে নামিয়ে কাঁটায় তুলে ওজন দাও।

গতর ছিঁচে যায়।

তারপর আছে রাতবিরেতে দামোদরের আঘাটায় চালের বস্তা পাচার করা।

থানা পুলিশের নজর এড়িয়ে এসব কাজ করতে হবে। ধরা পড়লেই জেল, না হয় পুলিশের গুঁতো।

বেজা বাউরীকে দেখেছে—দেখেছে মদনা কালীকে।

এখানে কবছর কাজ করে আজ সবাই কেমন আখের ছিবড়ের মত পড়ে আছে। নিতে বাউরী তাকে জবাব দেয়—

—উহুঁ লারবো উ কাজ করতে।

ছানু দাস আশা করেই এসেছিল নিতের মত জোয়ান পেলে কাজে লাগে, তাছাড়া বলিয়ে কইয়ে আছে সে। মহাজনের ঘরে ও কাজ সেরে আসতে পারবে।

ছানু দাস লোভ দেখায়।

—বেশি রোজ দুব। রাতবিরেতে গাড়ি লিয়ে গেলেও রাত বেরুন পাবি।

—আতবেরুনে দরকার নাই গো। বলছি তো লারবো।

নিতে জবাব দেয় সোজা।

দুকানি জমি কোনরকমে আলু করছে, তাই এখন সম্বল। পরে কি করবে জানে না সে।

দুপুরের নির্জ্জনতা জাগে কাঁইজোড়ের ধারে। ওদিকে কাঁকুরে ডাঙ্গা—বনসীমা শেষ হয়ে এসে শুরু হয়েছে মাঠের পরিক্রমা।

নেমে এসেছে চড়াই—নীচের দিকে।

ফালি ফালি বেতের বেড়া দিয়ে নেমে এসেছে জমিগুলো। উৎরাই -এর কোলে কাঁই-জাড়ের ধারে।

ছায়াঘন ঠাঁইটায় নির্জনতা নেমেছে।

বাঁধ দেওয়া ছোট খাতে জমেছে মাঠের ঘোলা জল। শস্যরিক্ত প্রান্তর, এইখানেই এখনও বুজের একটু আভা টিকে আছে। দুচারটে আখ-ক্ষেত, মাঝে মাঝে আলু গাছের সবুজ সীমানা —কোথায় ফুটেছে কুসুমফুলের ঘন লাল ফুলগুলো।

নিতে জল সিয়াত করছিল আলুর ক্ষেতে, আখ-ক্ষেতে সন সন বইছে হাওয়া। ফুলকোগুলো দা বেগুনী মেশা-রং-এ কেমন ময়ূরকণ্ঠী আভায় আকাশ ভরে তুলেছে।

হঠাৎ কার আর্ত চীৎকারে চমকে ওঠে নিতে।

জলের ওধারে কেয়া ঝোপের আড়ালে একটা বড় বউড়ি গাছের ডালে কে যেন ঝুলছে। নড়ছে দেহটা। হাত-পাগুলো তার অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেমন যেন একটা চাপা ার্তনাদ ভেসে ওঠে। গোঙানির অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসতেই চমকে উঠে কোদাল ফেলেই দিকে ছুটল নিতে বাউরী।

তার হাঁক ডাকে আখ-ক্ষেতের ওদিক থেকে ছুটে আসে হারু ঘোষও। গাছের কাছে গিয়েই বাক হয়! চীৎকার করে নিতে।

—বেজা ! এই শালো করছিস কি ?

বেজা বাউরী ডালে ঝুলছে গলায় দড়ি দিয়ে।

অসহ্য যন্ত্রণায় দুচোখ ঠেলে বের হয়ে আসে। হাত-পাগুলো তখনও দাপাচ্ছে, আর মুখ য়ে ঠেলে বের হয়ে আসছে জিবটা।

হারু ঘোষ চীৎকার করছে—দড়িটা কাট নিতে।

নিতে গাছে উঠে যায় তরতরিয়ে।

হারু ঘোষ ওর জ্ঞানহীন দেহটা ধরে ফেলে শুইয়ে দিল। নিতে ততক্ষণ ডাঙ্গা মাটির একটা থালায় কাঁইজোড় থেকে জল এনে মুখে চোখে ঝাপটা দিচ্ছে আর চীৎকার করে চলেছে।

—শালো মরতে আইছিস ইখানে! হ্যাঁ শালো ?

কেমন যেন চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে বেজা। বিড় বিড় করে কি বলছে।

নিতে বাউরী গজগজ করে।

—মরলেই ভাল ছিল উটোর গো।

উঠে বসেছে বেজা, কেমন যেন হাঁপাচ্ছে!

হারু ঘোষ জবাব দেয়,—তালে তো সম্মাইকে মরতে হয় নিতে। বেঁচে থেকে আর লাভটা ি বল ? কিন্তুক তবু মরে কেউ ?

বেজার দুচোখে তখনও কেমন শূন্য অর্থহীন চাহনি !

বাঁচার কি সার্থকতা তা সে টের পায়নি—ওরা কেউই টের পায়নি। তবু বাঁচার তাগিদেই যন বাঁচতে চায়।

শুধু এই মাত্র।

শূন্য অসীম দিগন্তে কোথায় আকাশ মিশেছে—একটা পাখি সেই দিক থেকে উড়ে আসছে—এদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

—ঘরকে যেতে পারবি বেজা ?

বেজা নিতের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। জবাব দেয় না।

—চল!

গাঁয়ের দিকে ফিরছে তারা।

নিতে দেখেছে, জানে বেজার দুঃখটা কোনখানে। আরও বেজেছে দুঃখটা—কারণ গতরও ভেঙ্গে পড়েছে। বৌটার কথা জানে সবাই।

বড়বাবুর খামারবাড়ির সেই পাঁচিলভাঙ্গা ঠাঁইটা দিয়ে ঢুকে ছিল একদিন নিতে—বাঁচবার শেষ পথ হিসেবে চেয়েছিল চাট্টি ধান।

দরকার হয় চুরিই করবে।

কিন্তু চমকে উঠেছিল সেদিন—হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে প্রকৃত চোর কে ? তার জানবার আগেই বড়বাবুরা কবে তাদের সংসারের শান্তি, শুধু বেঁচে থাকার নির্ভরতাটুকু সিঁদ কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে। বড়বাবুর ওই ধানে সেদিন হাত দিতেও ঘৃণাবোধ হয়েছিল তার। ফিরে এসেছিল নিতে। বেজাও আজ তাই বোধহয় মরতে গিয়েছিল নিদারুণ ঘৃ আর হতাশায় !

শান্ত ঝিমিয়ে পড়া গাঁয়ে ঝড় ওঠে—ঝড়ের সূচনা আগে হতেই দেখা দিয়েছিল, হঠাৎ আজ প্রকাশ পেয়েছে।

সেই সঙ্গে নেমেছে বজ্রাঘাত ; আকাশ কোল থেকে মাটি অবধি নেমে এসেছে মৃত্যুমুখী আগুনের ঝলক, ঝলসে দিয়েছে সবুজ বনভূমি—বাড়ি ঘর সব কিছু। জ্বলে উঠেছে ঘরবাড়ি সর্বনাশা সেই আগুনের শিখায়।

স্তব্ধ হয়ে যায় সারা কামাপাড়া অতর্কিত সেই বজ্রাঘাতে !

সেই আঘাত হেনেছে তারকবাবুই।

তারকবাবু শেষ অবধি রাজি করিয়েছিল, গোকুলেরও রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। চুরির কেসে পড়েছে—হাতে হাতে ধরে ফেলেছে তাকে। মালপত্র কিছু সঙ্গে ছিল না; না থাক, রাত দুপুরে গৃহস্থের বাড়িতে গোকুলের মত একটা দাগী লোকের প্রবেশ করাটাই চুরির চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ।

সাজাও হয়ে যাবে। নিদেন কয়েকমাস জেল।

এ কথা গোকুলও জানে। তবু তার বিনিময়ে যদি বাড়িঘরটা মেরামত হয়ে যায়, দুচার মাসের খোরাকী ধান পাওয়া যায়—তাই-ই লাভ। সাতপাঁচ ভেবে তাই মত দিয়েছিল গোকুল

সেই রাত্রের চুরির কেস উঠেছে কোর্টে।

হাজির হয়েছে এমোকালী ভুবন—বুড়ো অতুল কামারও সাক্ষী হিসাবে ।

তারকবাবু সেদিন অন্য মামালর কাজে সদরে গেছে ; মালি-মামলা তার লেগেই আছে। প্রায়ই যেতে হয়।

বাঁধানো বটগাছঘেরা মিষ্টির দোকানে বসে চা খাচ্ছে, ওদিকে গোকুলও বসে আছে চেয়ারে। তাকেও চা-মিষ্টি খাওয়াচ্ছে তারকবাবু ; বেশ হেসেই কথা বলছে গোকুল।

হঠাৎ কালীচরণের নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে। একটু অবাক হয়ে বলে ওঠে,

—মামা ! খুব যে পিরিত গো উদের ?

কেমন যেন একটা সন্দেহ করছে কালী। ভুবন, অতুলও দাঁড়াল।

ব্যাপারটা তাদের ও নজরে পড়েছে। তাদের আসামী গোকুলের তারকবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করাটা বেশ ভালো চোখে দেখে না তারা।

গোকুলের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—অমন মামলা তার কাছে চিন্তার বস্তুই নয়। যা হবার ঠিকই হবে, ভেবে লাভ কি !

হঠাৎ তারকবাবুর নজর পড়তেই, তারকবাবুই ডাকে তাদের।

—আরে কম্মোকার যে ! এসো—চা খাও ।

অতুল সেইখানেই নমস্কার করে,—আজ্ঞে, উতো খাই না। আপনি সেবা করুন।

তারকবাবু দেখল, কালী, ভুবন মাথা নোয়াল না তাকে দেখে। ওরা এগিয়ে গেল।

কোর্টে তখন উকিল মোক্তাররা ঘোরাঘুরি করছে, হাঁক-ডাকও শুরু হয়েছে।

সেই প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে সেদিন গোকুল কথাটা প্রকাশ করে জজের সামনে।

—চুরি করতে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে না । যথাধম্মো বলছি ।

গোকুল হাতজোড় করে গদগদ কণ্ঠে জবাব দেয় যেন বিনয় এবং সত্যের মূর্তিমান অবতার।

—তবে ?

মাথা চুলকাতে থাকে গোকুল। এদিক ওদিক চাইছে। তারকবাবুও দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন। তার দিকে চোখ পড়তে গোকুল যেন কেমন কাঁচুমাচু করে ওঠে। উকিল জেরা করে।

—জবাব দাও, কেন গিইছিলে রাত দুপুরে ?

এ জবাব দিতে গোকুলের মনুষ্যত্বে—অবশিষ্ট সম্মানের মূলে যেন বাধে। তবু তারকবাবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। অনেক দিয়েছে ওকে, তারই মূল্য যেন কড়াক্রান্তিতে আদায় করে নিতে এসেছে আজ তারকরত্ন ওর কাছ হতে এই প্রকাশ্য কোর্ট-এর মধ্যে।

জানে তারকবাবু এ জবাবের আঘাত কোনখানে গিয়ে কতখানি নিবিড় নিষ্ঠুর ভাবে আগাত হানবে।

হানুক । সেও তাই চায়। ওদের সব আশা সঞ্চয় এমনি করেই তার নিষ্ঠুর আঘাতে সে ভেঙ্গে দেবে বার বার। সবদিক থেকেই সেই আঘাত হানতে চেষ্টা করবে সে।

—জবাব দাও কেন গিয়েছিলে?

নিস্তব্ধ কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে গোকুল, তার কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরেছে।

তারকবাবুর দিকে চোখ পড়তেই গোকুল কেমন চমকে ওঠে।

নিজেকে তৈরি করে নেয়। সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে জবাব দিল সে।

—আজ্ঞে প্রায়ই যেতাম রাত-বিরেতে ওদিকে।

—কেন ?

গোকুল নিম্ন কণ্ঠে কথাগুলো ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে বলে চলছে, গর্জন করে ওঠে ভুবন।

—মিছে কথা।

তারকবাবু হাসছে, শিয়ালের মত সেই হাসি।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না এমোকালী।

—না না, হুজুর, এ মিছে কথা। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এই সব অকথা-কুকথা বলছে হুজুর।

গোকুল আজ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে কদম বৌ নাকি তাকে ভালবাসে, সেই সুবাদেই রাত-বিরেতে মাঝে মাঝে গোকুল ইতিপূর্বেই গেছে ওদের বাড়িতে। সে রাত্রেও তার কথাতেই গিয়েছিল, ধরা পড়ে যেতে ওরা মার-ধোর তো করেছেই, উল্‌টে চুরির দায়ে ফেলে পুলিশে দিয়েছে। গোকুল অমায়িক ভাবে বলে চলেছে,

—হুজুর, আমার কোন দোষ নাই । চোর আমি লই।

গর্জন করে ওঠে এমোকালী,

—চোপ! শালার কল্লা মটকে জেলেই যাবো।

লাফ দিয়ে উঠতে যাবে, তাকে ওরা বাধা দিল। গজরাচ্ছে কালীচরণ।

চমকে উঠেছে ভুবন। কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায় না কিন্তু তবু তার সারা মনে ঝড় উঠেছে।

তারকবাবু ইতিমধ্যে কখন চুপিসাড়ে কোর্টের বাইরে চলে গেছে, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে পুরোপুরি। গোকুলের এবার জেল হোক তার ক্ষতি নেই । আঘাত ঠিকই হেনেছে সে।

ভুবন স্তব্ধ হয়ে গেছে । তার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। কদম বৌ!

এতদিন যাকে নিঃশেষে ভালবেসে এসেছে, ঘর বেঁধেছে, সেই কদম-বৌ কিনা শেষকালে ওই ঘৃণ্য শয়তান চোরটাকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়েছে ! এতবড় পাপকে সমর্থন করেছে এতদিন ভুবন !

—ভুবনদা !

এমোকালী ইস্পাতে গড়া একটি মানুষ ! মুহূর্তের মধ্যে তার তির্যক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে, গেছে ওদের চক্রান্ত। তারকবাবুকে এখানে দেখে এমনি একটা কিছুরই কল্পনা করেছিল সে। তাই এ কথাটা তার কাছে নোতুন ঠেকেনি। তবে লোকটা যে একজন এতবড় শয়তান তা সে ভাবেনি।

ভুবন ওর ডাকে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে।

অতুল কামারের জীর্ণ শরীর যে চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্ত স্রোতে ; সাধারণ সোজা মানুষটি আজ সব ভয় ঠেলে সরিয়ে এই এজলাসেই প্রতিবাদ করে ওঠে।

—মিছে কথা। ঘরের বৌ-এর নামে এই মিছে অপবাদ দিছে উ এই দরবারে। তুমারও তো মা ছিল ঠাকুর—মায়ের নামে দিব্যি করে বল দিকিনি—যা বলছ তা অজবল সত্যি ! বলো—

জজসাহেব বৃদ্ধের উত্তেজিত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন। কথাটা তিনিও সন্দেহ করেছেন। অপর পক্ষের উকিল বাধা দিয়ে ওঠে,

—ইওর অনার ! আসামীকে জেরা করতে পারে উকিলই, ফরিয়াদী নয়।

ওরা থামিয়ে দিল অতুলকে। অসহায় বৃদ্ধ জলভরা চোখে বের হয়ে এল।

কালীচরণ মামাকে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বুড়োর জীর্ণ চোখে জল এসে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

দিনের সব আলো, ওই বটগাছের ছায়াঘেরা জায়গাটা, কোর্টের বাইরে মটর স্ট্যান্ডের কর্মমুখর পরিবেশ, সব কেমন হারিয়ে গেছে তার চোখের সামনে হতে। আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারিদিক।

ওরা এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে।

—শুনছেন ! ও মশাই !

উকিলের মুহুরি তক্কে তক্কে ছিল। এগিয়ে এসে পথ আটকাল।

—আজ্ঞে আমার ফি-টা।

কালীই জবাব দেয়, আপনার ফি ? আমরা তো সাক্ষী !

ফস্ করে জবাব দেয় লোকটা,

—তালে কোর্ট শেষ না হওয়াতে চলে যাচ্ছেন কেন ? ফিরে চলুন। পাঁচটায় কাছারি ভাঙ্গবে তবে ছুটি পাবেন।

অতুল কামারের একদণ্ড যেন এখানে মন টিকছে না । ফতুয়ার পকেটে হাত ভরে একটা আধুলি বের করে দিতেই লোকটা বিনা বাক্য ব্যয়ে চুপ করে সরে গেল। ওরা বের হয়ে আসে।

মনে মনে ফুঁসছে ভুবন। স্তব্ধ হয়ে গেছে অতুল কামার।

বুড়ো বয়সে মানুষের এ কি কদর্য রূপ সে দেখছে ! তারকবাবু ব্যস্ত হয়ে কোন মুহুরির সঙ্গে চলেছে। ওদের দিকে চাইবার সাহসটুকুও নেই।

মনে মনে হাসছে ধূর্ত লোকটা। ভুবন, অতুল কামারের অন্তরের এমন একটি জায়গায় আঘাত দিয়েছে তারকরত্ন—সে আঘাত সহ্য করে ওদের সমাজে মাথা তোলা অত্যন্ত সুকঠিন।

এমোকালী ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, চোখ দুটো ও তেমনি বড় বড়। ওর নীরব হিংস্র চাহনির সামনে থেকে সরে গেল তারকরত্ন।

—মামা ! একটু জলখাবা না ?

বুড়ো অতুল কামার কালীর ডাকে মুখ তুলে চাইল। কি ভেবে জবাব দেয়,—লরিতে উঠে ঘর চল, ইখানে থাকতে মন চায় না।

—একবার মহাজনের গদিতে যাবো নি ? এলাম যখন সদরে। মালপত্তর কিছু বায়না দিয়ে যাবো।

—তুরা যা। আমাকে লরিতে উঠিয়ে দে । ঘর যাবো ।

ভুবন আর বুড়োকে তুলে দিয়ে কালী শহরের দিকে চলে গেল—কাজ সেরে পরের বাসে ফিরবে সে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে ভুবন আর অতুল।

দুজনেই নির্বাক। কি এক কঠিন আঘাতে মুষড়ে পড়েছে তারা। কথা বলে না, যাত্রী বোঝাই বাসটা এগিয়ে চলেছে সদর থেকে দামোদর ঘাটের দিকে।

সবুজ শালবন ঢাকা চড়াই উৎরাই পার হয়ে চলেছে গাড়িটা। মুখ বুজে তাতে বসে আছে দুটি প্রাণী।

বড় রাস্তার ধারে নেমে মাইল খানেক পথ আসতে হবে—ছোটবনের পরেই তাদের গ্রাম। বাসস্টপে নামছে ভুবন আর অতুল কামার। বনের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ, আর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে খোয়াঢাকা একটা সরু রাস্তা তাদের গ্রামের দিকে।

বেলা পড়ে আসছে, শালবনে এসেছে নোতুন পাতার সমারোহ—কোথায় ফুটেছে পলাশ ফুলের ঘন লাল আস্তরণ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অতুল কামার।

ভুবন নেমেই এগিয়ে গেছে, বুড়ো ধীরে ধীরে চলছিল।

পিছনে আসছে তারকরত্ন আর পাইক ঋষি ডোম।

ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল তারকবাবু।

বুড়ো চেয়ে আছে তার দিকে, দুচোখে কেমন নীরব ঘৃণাভরা চাহনি।

আজ সকালের মত দেঁতো-হাসি হেসে আপ্যায়ন করে না বড়বাবু, কেমন স্বস্তি বোধ করে সে ওকে দেখে।

অতুল কামার ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

না । কিছুই বলল না সে। সরে দাঁড়াল পথের ধারে। ওরা দুজনে মুখ বন্ধ করে বের হয়ে গেল।

হাওয়া হাঁকছে বনে বনে।

শীত গিয়ে আসছে বসন্ত আর গ্রীষ্মের আগমনী। বাতাসে রোদে সেই উত্তপ্ততার আমেজ।

বুড়ো যেন হাঁফিয়ে উঠেছে।

বন পার হয়ে ডাঙ্গার ধারে মহুয়া গাছের নীচে ছায়ায় বসলো।

রোদের আঁচ যেন ডাঙ্গায় লি লি করছে হাজারো বিসর্পিল রেখায়। উৎরায়ের শেষে মাঠের বুক ছাড়িয়ে আবার শালবনের সীমানা উঠে গেছে দূরদিগন্তের দিকে। কেমন অসাড় শূন্যতা জাগে এর চারিদিকে।

মাঝে মাঝে সেঁয়াকুলের ঝুপি দু-একটা, ছোট ছোট বনফুলের লাল গোলাবী আভায় পাতা অবধি ঢাকা পড়ে গেছে। দূর বনের সবুজে জেগে উঠেছে মাঝে মাঝে লাল পলাশ ফুলের স্তবক। পুঞ্জ পুঞ্জ গেরুয়া ডাঙ্গার সঙ্গে মিশে কেমন একটা বেদনা রঙ্গীন আমেজ আনে। ওরই মাঝে বুড়ো যেন স্তব্ধ শান্ত কোন জগতে হারিয়ে গেছে।

—মামা ! এখনও বসে রইছ !

ডাক শুনে ওর দিকে চাইল অতুল, কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে।

পরের বাসে ফিরছে কালী।

—তুই !

অতুল কোনকরকমে জীর্ণ দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ডাঙ্গার মুখেই তারকবাবুর বড় বাড়িটা চোখে পড়ে—রাজ্যি জোড়া প্রাচীর। ডাঙ্গার নীরস বন্ধুর মাটিতে বাগান গড়ে তুলেছে।

—চল।

এগিয়ে আসছে ওরা। জীর্ণ অতুল গদারগাঁয়ের মুমূর্ষু অতীত ; আর নীরব শপথের মত ঋজু কঠিন আগামী ভবিষ্যৎ এই কালীচরণ।

বেলা পড়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে দিনের শেষ সূর্য কি এক অসহ্য নীরব বেদনায় ফেটে পড়েছে সারা ধরণীর আকাশ বাতাসে।

বাতাসের অগেই কথা ছোটে।

সারা গ্রামে আজ কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। হাটতলার বাইরে, মদনার চায়ের দোকানে —এ বাড়ির বৈঠকখানায়—কার বা দাওয়ায় সংবাদটা বেশ রসাল অলোচনায় ফেটে পড়ে।

অবনী মুখুয্যেই এ আড্ডার মধ্যমণি।

বেশ জোর গলাতেই আজ ঘোষণা করে,

—সিঙ্কিং সিঙ্কিং ওয়াটার ড্রিঙ্কিং, শিবস্ ফাদার নেবার থিঙ্কিং ! হুঁ হুঁ বাবা। তাই বলি মেয়েটা এত ফুসফাস করে কেন ?

সতীশ ভটচায অনেক দিন পর যেন বলবার একটা কিছু পেয়েছে। তারকরত্নবাবুর বৈঠকখানার আসরে আজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে সে,

—আগেই আমি ধরেছিলাম বড়বাবু ; মেয়েটা কেমন ! চাউনি কেমন যেন গায়ে বেঁধে ।

ফোড়ন কাটে অবনী,—তোমার দিকেও নজর দিয়েছিল নাকি গো ?

সতীশ ভটচায সবে গরম চা-টা হাপুস করে গলায় ঢেলেছিল, অবনীর রসিকতায় একটু অপ্রতিভ বোধ করে তাড়াতাড়ি করে কোন রকমে গিলে একটা জবাব দিতে যাবে, গলায় আটকে গিয়ে ছটফট করতে থাকে। কাসতে থাকে বেদম।

অবনী বলে ওঠে,

—আহা নাম করছে গো খুড়ো!

সতীশ আরও একটু গোপন খবর দেয়।

—দেখ, ওই অশোকবাবুও যেন কেমন ঢলেছে ওইখানে।

তারকরত্ন আর অবনীর মধ্যে কেমন একটা মুখ চাওয়াচায়ি হয়ে যায়।

এককোণে চুপ করে বসে আছে গোকুল।

তার মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। দিন পড়েছে আবার ।

গোকুলের মনে হয় আজ চরম অন্যায় সে করেছে, এতবড় মিথ্যা কথা বলে মুক্তি সে চায়নি।

তার চেয়ে সত্য কথা স্বীকার করে তার জেল হওয়াই ছিল ভালো, নিজের কাছে নিজেকে এত অপমানিত বোধ করতে হত না।

রাস্তার একটা কুকুর উঠে এসে বসেছে তারকবাবুর বৈঠকখানায় বারান্দায়, লেজ মাথায় এক হয়ে জড়সড় মেরে পড়ে আছে।

ওই কুকুরের চেয়েও অনেক ঘৃণ্য মনে হয় নিজেকে।

গোকুল ওদের কথাগুলো শুনে চলেছে।

কদম-বৌ এর মুখখানা মনে পড়ে।

শান্ত সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী মাখানো একটি মুখ। একদিন এক ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্তকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার মুখে জুগিয়েছিল ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়।

তার চরম জবাব দিয়েছে গোকুল। প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে হলপ করে সে ঘোষণা করেছে চরম মিথ্যা লজ্জাজনক একটা কলঙ্কের কাহিনী। তার সুন্দর মুখে একপোঁচ দুরপনেয় কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে সে।

অনেক চুরি ডাকাতি খুন জখম করেছে গোকুল, এতখানি অনুশোচনা বোধ করেনি।

ওদের হাসির শব্দ কানে আসে।

হাসছে তারকবাবু, অবনী, আরও অনেকে।

ওই হাসির তীক্ষ্ণ উত্তাপে গোকুলের সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে ।

তারকবাবু বলে ওঠে,

—কি রে গোকুল! তা সাহস তোর বলতে হবে।

অবনী জবাব দেয়,—সাহস থাকবে না ?

সতীশ ভটচায চা-এ চুমুক দিতে দিতে বলে ওঠে,

—সত্য—সত্যই। দিনের আলোর মত তা প্রোজ্জ্বল। শাস্ত্রেই বলেছে সত্যের জয় সর্বত্র। বেশ বলেছিস বাবা গোকুল! দীর্ঘজীবী হ ।

গোকুল চুপ করে খামারের দিকে আঁধারে সরে এল, তারও মনে হয় জীবনে এতবড় অন্যায় সে আর করেনি।

বজ্রাহতের মত বাড়ি ফিরেছে সে।

ভুবন কিছু বলতে পারেনি। সদর থেকে ফিরে এসে গুম হয়ে বসেছে দাওয়ায়। রোদে তেতে পুড়ে এসেছে, অশোকও এসেছে মামলার খবর নিতে। ওর দিকে চেয়ে থাকে ভুবন, আর্ত অসহায় চাহনিতে।

—কি হল ভুবন ?

ওর বিবর্ণ মুখ দেখে চমকে ওঠে অশোক।

কদম-বৌ হাত-পা ধোবার জল এনেছে ব্যস্ত হয়ে ; গেলাসে তৈরি করেছে গুড়ের সরবৎ

হঠাৎ ভুবন উঠে পড়ল, মনে ওর একটা চাপা ঘৃণা আর অসহায় সন্দেহের প্রকাশ ; অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। মনে তখনও জ্বালা করা অনুভূতি আনে গোকুলের কথাগুলো।

—সরবৎটা নাও।

কদম স্বামীকে অনুনয় করছে। হঠাৎ ফেটে পড়ে ভুবন। গর্জন করে ওঠে,

—গোক্‌লো এ সব কথা কেন বলেছে ? লষ্টা ?

অবাক হয়ে যায় কদম! মুখ-চোখের সব রক্ত নিমেষের মধ্যে মুছে যায়!

আর্তনাদ করে ওঠে সে,—ইসব কি বলছ !

ভুবন গজরাচ্ছে।

—নালে উ শালা কোটের মাঝে দাঁড়িয়ে ই কথা বলে কেনে ? ঠিক করে বল—উয়োর মাথা পেড়ে দিয়ে ফাঁসি যাবো। বল ?

—কোর্টে গোকুল এই সব বলেছে! সে কি !

অশোক অবাক হয়ে ভুবনের দিকে চেয়ে থাকে। বিশ্বাস করতে পারে না এতবড় অপবাদ দিতে সাহস করবে সে। কি ভেবে প্রশ্ন করে অশোক,

—তারকবাবুদের কেউ ওর সঙ্গে ছিল ?

ভুবন জবাব দেয়,—হ্যাঁ। বড়বাবু নিজেই ছিল দেখলাম কোর্টে।

ভুবনের সারা মনে আগুন জ্বলছে। শালের গনগনে আগুনের মত মাঝে মাঝে দমকে দমকে বুক ঠেলে উঠতে চায় নিষ্ফল আক্রোশ। বের হয়ে এসে বাইরে বসল সে।

—মিছে কথা। সব মিছে কথা !

অসহায় কান্নায় ফেটে পড়ে কদম-বৌ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক । অসহায় কোন নারী নির্মম অপমানে আর নিবিড় বেদনায় মাথা ঠুকছে।

—আমাকে মেরে ফেলাও। এ জীবন আর রাখতে পারি না। এও শুনতে হ'ল আমাকে! চুপ করে থাকে সে।

রাবণ সীতারে হরণ করেছিল, আজও সেই রাবণের দল সশরীরে বেঁচে আছে। আজও তারা নারীর সবচেয়ে মূল্যবান পবিত্র যে একটি সত্তা—তাকেই কলঙ্কিত করে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

বলে ওঠে অশোক,

—চুপ কর কদম। কাঁদিস না। ওসব বাজে কথা।

সারা গ্রামেই কথাটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু সত্যি না থাকলে গোকুল একেবারে কোর্টে দাঁড়িয়ে কেনই বা বলবে এতবড় কথা !

মানুষের বিশ্বাস নামক পদার্থটি এতই ঠুনকো যে একটু আঘাতেই তাতে চিড় ধরে। মানুষের মনের কালোটাই অতি বড়, তার উপর চেষ্টা করে মানুষ একটু পালিশ লাগিয়েছে মাত্র।

যে কোন মুহূর্তে তাও নিঃশেষে মুছে গিয়ে আদিম সেই নগ্নরূপই প্রকট হয়ে পড়ে।

তাই ওরাও কদম-বৌ-এর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বেশ একটু সন্দেহের সূত্রই খুঁজে পায়।

ছানু দাসই এ নিয়ে কথা বলে চলেছে দোকানের চালায়।

—তখনই বলেছিলাম হে, ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নাচ ঠিক চলেছে।

মিষ্টিও দোকানে এসেছিল কি জিনিসপত্র নিতে, হঠাৎ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে সে। জিজ্ঞাসা করে,—কোথায় খ্যামটা নাচ হচ্ছে গো দাসমশায় ?

ছানু দাস যেন ভরসা পায়, বলে চলে,

—তাই দেখ গো তোরা। কথায় বলে না ? মাছ খায় সব পাখিতে, নাম হয় মাছ-রাঙ্গার। ওই কামার-বৌ-এর কথা বলছিলাম। ওই যে গোক্‌লো—

উড়ো কথাটা শুনেছে মিষ্টি। কিন্তু তাই নিয়ে এত রসাল আলোচনা হবে ভাবেনি।

সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে মিষ্টির।

কদম-বৌকে সে জানে চেনে।

এ যে কতবড় নিষ্ঠুর মিথ্যা এবং এর কি সাংঘাতিক ফল তা কল্পনা করে শিউরে ওঠে মিষ্টি।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয় সে,

—দেখ গো দাসমশাই, একজন সতীলক্ষ্মীর সম্বন্ধে এসব অকথা কুকথা তোমরা আর নাই বা বললে। গোক্‌লো বলেছে—সে বলতে পারে। নর্দমার পোকা সে। তাই বলে গন্ধেশ্বরীর টাটে দাঁড়িয়ে এতবড় অন্যায্য কথা তুমি নাই বা বললে।

পানু দাস কথাটা শুনেছে, ধমক দিয়ে ওঠে ছানুকে ।

—এ্যাই ছেনো ?

পানু বাজে কথায় থাকতে চায় না। ছানুকে তাই সাবধান করে দেয়। মিষ্টি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদিকেই কয়েকখানা ঘরের ওপাশে অতুল কামারের বাড়ি। ভুবনের গর্জন শোনা যায়, আবছা অন্ধকারে একটা ক্ষীণ চাপা আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসে।

কি এক বেদনায় মিষ্টির মন ভরে ওঠে।

সে জানে একজন ঘরের বৌ-এর নামে এতবড় কি নির্মম আঘাত হানতে পারে, একটি কথা একটি ঘরের শান্তি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। এর চেয়ে যদি ওই গোকুল ওর ঘরে আগুন দিত, সে ঘর বোধহয় আবার গড়ে উঠতো।

মিষ্টি হঠাৎ গিয়ে তাদের উঠোনে দাঁড়ায়, কথাটা শুনেই সে ছুটে এসেছে। সে জানে এর সবটাই মিথ্যা কাহিনী। তাই প্রতিবাদ জানাবার জন্যই এসেছিল। ঢুকেই অবাক হয়ে যায়—অসহায় বেদনায় মুচড়ে ওঠে সারাটা অন্তর।

সতীত্ব—তার পবিত্রতা, এ সম্পদ তার আর অবশেষ নেই; কিন্তু অনুক্ষণ সে নিদারুণ মর্মবেদনায় অন্তরে অন্তরে বুঝেছে কি তার মূল্য। আজ একজন নিরপরাধ বৌকে চরমতম অপবাদ দিয়ে, লাঞ্ছনা করে যারা দূরে সরে গিয়ে মজা দেখছে—তাদেরও হাড়ে হাড়ে চেনে মিষ্টি।

এই বেদনার অপরসীম জ্বালায় কাঁদছে কদম-বৌ।

মিষ্টির দুচোখ জলে ভরে আসে। সামনে সে আর গেল না। চুপে চুপে সরে এল বাইরে।

ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা মিষ্টির জানা নেই।

সন্ধ্যা নেমেছে। আজ আর উঠোনের তুলসীতলায় কল্যাণীর বেশে প্রদীপ জ্বলে না কদম-বৌ। শঙ্খধ্বনির সুরে সুরে ওঠে না উলুধ্বনির সমারোহ।

বাঁশবনে জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যা নামে—বেদনার আঁধারে ছেয়ে যায় চারিদিক। সারা বাড়িটা থমথম করছে—তার মাঝে কদম-বৌ-এর কান্নার সুর ওঠে।

এমোকালী চুপ করে বসেছিল—আজ সে প্রত্যক্ষ করেছে জীবনের পরম বেদনার মধ্যে একটি কঠিন সত্যকে। শপথের মত কঠিন হয়ে উঠেছে তার অন্তর।

সে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—চুপ করো ভাজবৌ ! কেঁদো না—সব মিছে কথা !

কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে অশ্রুভেজা চোখে. বলিষ্ঠ দুর্মদ কালীচরণ বলে চলেছে কঠিন কণ্ঠে,—এর শোধ লোবই ভাজবৌ। জন্মে ইস্তক মাকে দেখিনি—মনে পড়ে না। তুমাকেই দেখেছি—মায়ের মতনই তুমি। তুমি দেখো—কালী এর শোধ লেবেই। গোকলো—তারকবাবু সবাইকে একে একে ইয়ার জবাব দেবো। ঘর ভাঙ্গার শোধ আমি লোবই।

দুটে চোখ ওর জলছে ধকধকে কি এক জ্বালায়।

কালী কি করে জানবে—কদম-বৌ-এর অন্তরের ক্ষতির পরিমাণ ! যা তার হারিয়েছে তা কেউ ওরা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

আবছা অন্ধকারের শেষে আলো জ্বলছে। ঝকঝকে চৌদ্দ বাতির বড় আলোটা সদ্য-চুণকাম-করা ঘরে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। তারই মাঝে হাসির শব্দ শোনা যায়।

তারকবাবু হাসছে, হাসছে অবনী মুখুয্যে।

এগিয়ে চলেছে ছায়ামূর্তিটা আঁধার থেকে ওই আলোর দিকে। বড় উঠানটা ছেয়ে গেছে ধানের স্তূপে। ছোট পুকুরের চারপাশে তারকবাবুর ধানের আকাশ প্রমাণ পালুই, গ্রামের বাইরে যেন লক্ষ্মীর রাজ্য গড়ে তুলেছে। এখনও ধান পিটোন হয়নি, এত ধান পিটুতে মাড়াতে সেই মাঘ-ফাগুন পার হয়ে যাবে, তারপর উঠবে গোলায়।

বাতাসে গোলাপ ফুলের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে বন থেকে ভেসে আসা সদ্য-ফোটা মহুয়া ফুলের সৌরভ! মৌ মৌ করছে বাতাস। মিষ্টি আজ রেগে উঠেছে। তারকবাবু যে এমনি সর্বনাশ করতে পারবে তা ভাবেনি। গোকুলের খোঁজেই এসেছে সে।

তারকবাবু একটু রাত্রি গভীরে আজ স্ফূর্তির আসর জমিয়েছে। সদর থেকে আনন্দের দমকে কিনে এনেছে বিলাতি মদ। মিষ্টি সাহসে ভর করেই আজ এগিয়ে এসেছে।

অবনী মুখুয্যে, সতীশ ভটচায তাকে কেন্দ্র করে আজ কারণে বসেছে। একদিকে বসে আছে গোকুল। এই আসরে সে যেন নেহাৎ অবাঞ্ছিত ; অন্ধকারে একা বের হয়ে নিজের বাড়িতে যেতেও ভয় লাগে তার।

আজ সে জানে যে দলের লোকজন কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। পায়ে পায়ে ঘুরছে

কামারপাড়ার মদ্দ জোয়ানরা ; আঁধারে শিকারী কুকুরের মত ঝোপে-ঝাড়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একবার সুযোগ পেলেই ধারাল নখদাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেবে। তাড়াখাওয়া কুকুরের মত গৃহস্থের ঘরের কোণে যেন আজ আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে গোকুল।

হঠাৎ জমজমাট আসরে মিষ্টিকে ঢুকতে ধেখে অবনীবাবু যেন আনন্দে ফেটে পড়ে।

—আরে তুই যে, অনেকদিন পর, পথ ভুলে নাকি রে ?

মিষ্টি আজ তারকবাবু আর ওদের ঘৃণা করে।

সতীশ ভটাচায খুশিতে ডগমগ করছে। শীর্ণ মুখে কেমন একটা লোলুপ হাসি ফুটে ওঠে। মিষ্টি ওসবের দিকে নজর দেয় না—কাকে যেন খুঁজছে। হঠাৎ গোকুলকে দেখে এগিয়ে যায় মিষ্টি। দুচোখ তার জ্বলে ওঠে।

—এই যে ইখানে এঁটো পাত চাটছিস ? বলি ইয়ার বিচার করেন বড়বাবু, দরবার করতে এয়েছি।

গোকুল মুখরা মেয়েটাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে গোকুল,—কি বলছিস?

মিষ্টি বলে ওঠে ঠিকই বলছি রে ত্যাঁসলা। এদ্দিন আমার সঙ্গে ঘটনার জন্যে ঘুর ঘুর করছিলি, তা আজ আবার কোর্টে শুনিয়েছিস অন্য কার সঙ্গে ঘটনা। তাই একটা কথা ভাবছিলাম। তুর মাটো মরে গিয়ে ভালই হয়েছে।

অবনী মুখুয্যে তারকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হালকা রসিকতা করতে গিয়ে থেমে গেল। গুম হয়ে গেছে তারকবাবু। তার মুখেও কে যেন একরাশ কালি লেপে দিয়েছে।

মুখরা মেয়েটার কথায় গোকুল তখনও কোণ-ঠাসা হয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

— কেনে ?

হাসছে মিষ্টি খিলখিলিয়ে। ওর সারা দেহে কি এক নিটোল স্বপ্ন আবেশ! জিবের ডগায় ঝরে পড়ে গরল জ্বালা।

— কেনে আবার ! কুনদিন শুনতাম — লোকের উস্কানিতে —

কথাটা যেন মিষ্টি ওদের উদ্দেশ করেই বলছে।

তারকবাবু গর্জে ওঠে এইবার, — চুপ কর মিষ্টি !

মেয়েটাকে থামান যায় না, ঝরণার গতিবেগের মতই সে দুর্বার হাসিতে মেতে ওঠে।

—ওই দেখ, ভাল কথা বুলতে এলাম ? রাগ করো বলবো নাই। তা বড়বাবু ওই গোক্‌লোকে বাড়ি মাড়াতে দিও না—কুনদিন দেখবা তুমার বাড়িতেই —

বোমা ফাটার মত ফেটে তারকবাবু,—মিষ্টি, জিভ টেনে ছিঁড়ে দোব তোর।

মিষ্টি এইবার নিজমূর্তি ধরেছে। বলে ওঠে,

—তা টানবা বৈকি। খেঁকি কুকুরের জাত। জিবটাও আছে, তাও টানবা বৈকি বড়বাবু—তুমার এলাকায় বাস করি কিনা ? তাই গাঁয়ের সম্মাই-এর বাসই তুলবা। তাই লয় ?

মুখরা স্বৈরিণী মেয়েটি জানে ওদের চরম দুর্বলতম স্থান অন্তরের কোনখানে, সেইখানেই আজ চরম আঘাত হানতে এসেছে। আজ সে এদের সবাইকে চরম ঘৃণা করে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই।

যাবার সময় বলে ওঠে মিষ্টি,

—পারো তাই করো—উটোই বাকি থাকে কেন ? অনেকের অনেক সব্বোনাশ করেছ, খনও করছ, লাজ লাগে না?

চুপ করে গেছে তারকবাবু। অবনী তবু বলে ওঠে গোকুলকে দেখিয়ে,

—কই রে, নিয়ে যেতে এসেছিলি মনের মানুষকে—নিয়ে যা।

ঘুরে দাঁড়াল মিষ্টি। দুচোখে ওর ঘৃণা-ভরা চাহনি।

—মানুষ ! কুকুর উটো। ঘেয়ো কুকুর ! থুঃ !

তারকবাবু ওর দিকে চাইল, মেয়েটাকে সেও ভয় করে। বেহায়া বেসরম। জিবের াড় নেই।

গোকুল অসহায়ের মত চেয়ে থাকে।

চমকে ওঠে গোকুল—আবছা আঁধারে ওরা শেষের চরম অপমানটুকু প্রত্যক্ষ করেনি। াসছে অবনী। গোকুলের মুখেই ছিটকে এসে পড়েছে স্বৈরিণী সমাজপরিত্যক্তা ওই নারীর ষ্ঠীবন !

সেও তাকে আজ ঘৃণা করে, এদের সকলকে। গোকুল বের হয়ে এল।

মুখ ফিরিয়ে থুথুটা মুছছে গোকুল রকে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আবিষ্কার করে চোখ দিয়ে যেন লও বের হচ্ছে তার।

কাঁদছে একটি ব্যর্থ মানুষ—ওরা তার সব কেড়ে নিয়েছে, তাকে কিনে নিয়েছে। মানুষ বিচয়ের শেষ কণিকাটুকুও !

মিষ্টি লোহার তাই ঘোষণা করে গেল আজ প্রকাশ্যে।

রাত্রি বেড়ে ওঠে।

নিশুতি স্তব্ধ রাত্রি। সন সন হাওয়া হাঁকে শালবনে।

খামারের বড় বড় খড় পালুইগুলো আবছা অন্ধকারে বিরাট ঢিবির মত দাঁড়িয়ে আছে। যাশামুক্ত আকাশকোলে জেগে উঠেছে দু-একটা তারা।

বন থেকে শিয়ালের ডাক শোনা যায় ; ওরা বের হয়েছে মানুষের আবাসের দিকে। কলক করছে জিব—দুটো চোখ শ্বাপদ ক্ষুধায় জ্বলছে এদিক ওদিক।

হঠাৎ গোকুলের যেন চমক ভাঙ্গে। কার পায়ের শব্দ শোনা যায়। আবছা অন্ধকারে মারের এককোণে পড়েছিল গোকুল। ঘুম আসে না।

হঠাৎ দেখে ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

ঠিক ঠাওর করতে পারে না। খড় পালুই-এর আশেপাশে কি করছে লোকটা। অন্ধকারে দপ্ রে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে।

একমুহূর্ত।

লোকটাকে চিনতে পারে গোকুল। বলিষ্ঠ দুর্মদ একটা জোয়ান। কঠিন হয়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ।

আগুনটা ধরিয়ে দিল খড় পালুই-এর নীচে। ধিকি-ধিকি জ্বলছে নীলাভ শিখাটা—কেমন বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের ওই জ্বলন্ত রেখাটা, বেড়ে ওঠে। লোকটা সরে গেল চকিতের মধ্যে। গোকুল নড়ে না, ঠায় বসে থাকে। বাধা দিতেও গেল না। আজ এই প্রতিশোধ সে নিজেই নিতে চেয়েছিল।

তারকবাবু তাকে এমনি সর্বহারা করে অপমানিত করবে তা সে ভাবেনি। আজ বুঝেছে তার সবচেয়ে বড় শত্রু ওই তারকবাবুরাই। কামারপাড়াকে অপমানিত করবার জন্যই তাকে হাতিয়ার করে তুলেছিল।

কিনে নিয়েছে তাকে তারকবাবু সামান্য টাকার বিনিময়ে।

এমোকালী !

কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি গোকুল। কালীচরণ সেই প্রতিবাদ করে গেল। মনে হ ঠিকই করেছে।

ঝড় উঠেছে।

হু হু ঝড়। রাতের বাতাস আগুনের স্পর্শে ফেঁপে উঠেছে। বারুদের মত জ্বলছে ধানের স্তূপ! সারা পালুইটা আগুনের গ্রাসে পড়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

—আগুন !

কারা চীৎকার করে ওঠে। রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে জ্বলছে পর্বতপ্রমাণ খড়ের স্তূপ লেলিহান শিখায় বৈশ্বানর তখন একটা পালুই থেকে লাফ দিয়ে অন্য পালুই ধরেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠচে খড়ের জ্বলন্ত বুঁদলাগুলো। চারিদিকে আগুন ছিটুচ্ছে। আর ধূ ধূ জ্বলছে আগু পালুই-এর মাথায় মাথায়।

গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু নিষ্ফল সেই চেষ্টা।

বেড়া আগুনে ঘিরে ফেলেছে পুকুরের চারিদিকের চার চারটে পালুই। বাতাসে হু হু শব্দ ওঠে।

জল তেতে ফাল হয়ে উঠেছে।

দাপাচ্ছে শখ করে পোষা আট-দশ সের রুই কাতলা মাছগুলো, লাল আভাময় জলের উপর দেখা যায় তাদের ভাসমান মৃতদেহগুলো।

মাঝে মাঝে আগুনের নীল শিখার সীমানা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে আঁটি-বাঁধা দুচারটা জ্বলন্ত খড় ফুলঝুরির মত আগুনের কণাগুলো ছিটিয়ে পড়ছে নীল আকাশে।

লোকজনের ভিরে এসে জুটেছে কামারপাড়ার দাশু। খিল খিল করে হাসছে দাশু পাগলা।

—বাহবা কি বাহবা ! ই যি জগন্নাথপুরের মালকারের হাউই বাজির চেয়ে সরেশ গো লে-লে বাবু দো আনা।

—এ্যাই! শালাকে দুর আগুনে ছুঁড়ে।

ছানু দাস গর্জন করে ওঠে। সেও এসে পড়েছে। ওর ধমকে তখনও দাশু পাগলার হাসি থামে না।

একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে ছড়া কাটছে,

—আমাদের মেড়া পোড়া,
কালকে হবেক দোল।

বাহবা কি বাহবা ! দোলের চাঁচর হচ্ছে যি গো ! ইবার বড়বাবুর দোলের চাঁচর সব থেকে সরেশ।

হাসতে থাকে দাশু।

সন সন শব্দ ওঠে। ধূ ধূ জ্বলছে আগুন। আকাশ বহু দূর অবধি লাল হয়ে উঠেছে।

দু-পাঁচখানা গ্রামের লোক ব্যর্থ চেষ্টা করছে আগুন নেভাবার। বড়বাবু গর্জে উঠেছে। গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আঁধার আলোর কেমন লাল আভায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে ঠাঁইটা। তারকবাবু চীৎকার করে,—বল্ গোকুল, কে করেছে এ কাজ। তুই তো ছিলি খামারবাড়িতে ?

গোকুল জবাব দেয় না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

—বল্।

কোন জবাব নেই।

হঠাৎ তারকবাবু এক চড়ে ছিটকে পড়তে পড়তে থেমে যায় গোকুল। ভিড় করে রয়েছে লোকজন। গোকুল উঠে দাঁড়াল, তবু কোন কথা বলে না।

ভিড়ের মধ্যে দেখে এমোকালীও এসেছে। একবার চোখাচোখি হয়ে যায়। কঠিন কণ্ঠে গোকুল জবাব দেয়,

—আমি দিয়েছি আগুন।

—তুই ! ধমকে ওঠে তারকবাবু। বলে চলেছে গোকুল,

—হ্যাঁ। একদিন সারা গাঁয়ের লোকের ঘরে আগুন লাগাতে বলেছিলেন বড়বাবু। ওদের ঘর জ্বলছে—সেই সঙ্গে আপনার খড়পালুইও জ্বলুক। কেমন লাগে দেখুন।

বড়বাবুর মুখে কে যেন একরাশ কালি মেড়ে দেয়। এমোকালী চেয়ে থাকে গোকুলের দিকে।

তারকবাবু ফোঁস করে ওঠে,

—শয়তান কোথাকার। জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো ব্যাটাকে।

প্রচণ্ড বেগেই লাথিটা মেরেছে তারকবাবু।

তারকরত্নের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়েছে গোকুল। আবার মারতে যাবে, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে কালীচরণ ; বাধা দেয় সে।

—মারবেন না ওকে।

বড়বাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে,—তুই !

রুখে দাঁড়িয়েছে ওরা, সামনে ধূ ধূ সর্বনাশা আগুন, যেন ওতেই ওকে ফেলে দেবার জন্যও ওরা তৈরি। চুপ করে তারকবাবু।

অশোকও এসে পড়েছে মাঝখানে। উঠে বসল গোকুল।

নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ছেঁড়া জামাটা দিয়ে মুছতে থাকে। মাঝে মাঝে বড়বাবুর দিবে চাইছে, অসহায় রাগে আর চাপা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে সে।

জীবন কি বলতে যাবে, বাধা দেয় তারকবাবু।

—ওকে এখন আটকে রাখ, পুলিশে দোব।

আগুন তখনও জ্বলছে।

নীল আকাশকোলে উঠেছে ধ্বংসের ধূ ধূ লেলিহান শিখা। সব পুড়ছে। ধান খড়—অতীতের সব সঞ্চয় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ; তাই দেখছে তারকরত্ন আর জীবনরত্ন অসহায় দর্শকের মত।

জীবন লাফাচ্ছে,—সব বেটাকে দেখে নোব।

দু'শো বছরের কঠিন ভিত্তি মূলে আজ ফাটল ধরেছে। নোতুন মানুষ আজ নোতুন পথে চলতে চায়।

জমিদারী প্রথা উঠে যাচ্ছে।

দু'শো বছরের দীর্ঘ প্রোথিত বনস্পতি আজ মহাকালের উদ্দাম ঝড়ের এক ঝাপটায় উপড়ে পড়েছে।

এই ভয়ই এরা করছিল।

সারা দেশের এক শ্রেণীর মানুষ যে অলিখিত ফার্মানের বলে এতদিন শাসন আর শোষণ চালিয়েছিল তারা আজ শিউরে উঠেছে।

তাদের সমাধি রচিত হবার দিন এসেছে।

সব রোশনী নিভে যাবে, সব উৎসব শেষে অতিথিরা ভঙ্গুর মৃৎ পাত্রের মত ফেলে যাবে তাদের। তাদের হীন শবদেহের কবরের উপর রচিত হবে নোতুন মানুষের নোতুন সমাজ।

অশোক চুপ করে তাই ভাবছে।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,

—কিন্তু এ ব্যবস্থাটা মেনে নিতে পরছি না অশোক।

অশোক হাসে।

—একে মেনে নিয়েই তবু নোতুন সমাজব্যবস্থায় বাঁচতে হবে কাকাবাবু । তাছাড়া সমাজের যে প্রথাটা জীর্ণ হয়ে গেছে, নোতুন মানুষ তাকে বদলাবেই।

নীলাম্বরবাবু বলেন,

—দুশো বছর ধরে এটা চলে আসছে।

—তাই এটাই যে ঠিক তা বলি কি করে ?

প্রীতি খুশিই হয়েছে, সে বলে চলেছে,

—এ ভালই হল, তবু কিছু লোক মাটির মায়ায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, তারা অন্য পথ দেখতে পারবে। কাজে লাগবে।

কথাটা যেন অশোকের উদ্দেশ্যেই বলা। অশোক জবাব দেয়,—হয়তো তাই, তবু হয়তো আবার নোতুন করে যদি সব গড়তে হয় তাতেও লোক দরকার।

নীলাম্ববাবু ওদিকে ব্যস্ত। অশোক চুপ করে কি ভাবছে। প্রীতি বলে ওঠে,

—কোনরকমেই গ্রাম ছেড়ে যাবে না ?

অশোক ওর দিকে চাইল। বলে ওঠে,

—কোনমতেই ভালবাসতে পারো না গ্রামকে ? এখানের মানুষকে?

প্রীতি চুপ করে থাকে।

কথাটা সেও ভেবেছে কিন্তু কোন উত্তর পায় নি সে। এখানের এই জনহীন প্রান্তর, ওই ধান ক্ষেতের নিশানাকে, এখানের মানুষদের সে আপন করে নিতে পারেনি।

অশোককেও মনে হয় কোন দূরের মানুষ; এখানের অসীম ওই দিগন্ত সীমার মত তাকেও কেমন যেন স্পর্শ করা যায় না। বার বার প্রীতি তাকে এই কথাটা বলতে গিয়েও পারেনি।

অভিমানে মন ভরে ওঠে তার।

সারা গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। সাদা নিশান উড়ছে মাঠের মধ্যে। ধূ ধূ শস্যরিক্ত মাঠ, চড়াই উৎরাই-এর মত নেমে গেছে সিঁড়ি সিঁড়ি ক্ষেত। আবার উঠে গেছে ওদিকে আসুড়ের দিকে চড়াই উৎরাই ক্ষেতের মাঝখানে তিরতিরে কাঁইজোড়। ডাক নাম শুভঙ্করের জোড়।

গ্রাম্য অঙ্কশাস্ত্রবিদের নাম শুধু মানসাঙ্ক বই-এর ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বোধহয় তার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল অতীতের মানুষ। আজও ক্ষীরধারার মত এই ক্ষুদ্র জলধারা তাঁর কথাই স্মরণ করায়, কোন স্মরণাতীত কালের কথা মানুষ ভাবতে পারে।

কত দিন মাস বৎসর কেটেছে—ওই ক্ষীণজলধারার জীবনেও এসেছে রূপান্তর। সাতজোড়ার বনগড়ানী জলধারা—পাহাড়ী টিলার কোন অন্ধ অতল থেকে বের হয়ে এসেছে ওই বালুরেখা, গ্রীষ্মের নিদাঘতাপসন্তপ্ত দিনেও ওর বুকে জলরেখার স্পর্শটুকু কোন রকমে ধরে রেখেছিল ; দুপাশের রুক্ষ ঊষর কাঁকুরে প্রান্তরে বিশুষ্ক পত্রহীন গাছগুলা দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। বর্ষার সমারোহ নামে প্রান্তর বনসীমায়—দূর ছায়াচ্ছন্ন শুশুনিয়া পাহাড়ের সীমারেখা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বৃষ্টি নামে।

সেদিন যৌবনবতী হয়ে ওঠে শুভঙ্করের জোড়। গেরুয়া জলস্রোত ছুটে চলে দূর ছায়াচ্ছন্ন গ্রামসীমা পার হয়ে বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে।

কঠিন রুক্ষ দেশ।

বৃষ্টিও এখানে হয় অপেক্ষাকৃত কম, তারপর ওই পাহাড়ী বুনোমাটি আর উঁচুনীচু জমি। এই টই-টম্বুর তো ওবেলাতেই সব জমা জল জমি থেকে কোন্ ফাটল দিয়ে নেমে যায়।

অজন্মা তাই ওদের প্রতি বৎসরের সঙ্গী, দুর্ভিক্ষ হাহাকার বাঁকুড়া জেলার অপরিহার্য সমস্যা।

ওই এলাকাটুকু তবু চেয়ে থাকে শুভঙ্করের জোড়ের দিকে। ওই জলধারাটুকুই তাদের চায-আবদের মূল সম্বল।

তাই নিয়ে ফাটাফাটি দাঙ্গাও বাধতো।

সেবার নিজে এসেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্বয়ং। তাঁরই এলাকা, মূল জমিদার তিনিই, আর সব পত্তনীদার।

তিনিই এসে হুকুম দিলেন জোড়ের মধ্যখানে বাঁধ উঠবে, জলধারা দুভাগ হয়ে যাক।

ছ আনা আর দশ আনা হিসাবে জলধারা বইবে। নামকরণ হল ছ আনি আর দশ আনির দাঁড়া।

সেই জমিদারী বিচারের নির্দেশ আজও মেনে চলেছে তারা, ক্রমশঃ সেই বিভাগের চিহ্নটাকে শক্ত ইটের স্তূপ করে কায়েম করা হয়েছে। পাশে রাস্তার ধারে মাথা গজিয়েছিল একটা বটগাছ, ক্রমশঃ সেটা অনেক বড় হয়ে ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে ঠাঁইটা।

মাঠের মধ্যে এই এতটুকু ছায়ার নিশানা। পাখ-পাখালি ডাকে—রোদের তাপে মানুষ দুদণ্ড জিরোয়; চাষীরাও হালফাল ছেড়ে এসে একটু গড়িয়ে নেয়—তামাক খায়।

এতদিন শান্তি বিশ্রাম আর পূর্ণতার স্বপ্নই মনে জাগিয়েছিল ওই জলধারা, ওই ছায়াময় বটগাছটা।

আজ ওখানে পতাকা উড়ছে, বাঁশের মাথায় একটা সাদা পতাকা হাওয়ায় পত পত করছে। একটা নোতুন ফোল্ডিং টেবিল পাতা হয়েছে—তাতে পিন দিয়ে আটকানো একটা ম্যাপ —পাশেই পড়চার খাতা বগলে দাঁড়িয়ে আছে আমিনবাবু ; সঙ্গে চেনম্যান দুজন, মাঝে মাঝে লোহার শিকল ফেলে—কখনও বা বাঁশ-এর দাঁড় দিয়ে মাপজোপ করছে।

মাঠের আলে হেথা হোথা বসে আছে উৎসুক ব্যগ্র দুচোখ মেলে লোকজন চাষীরা দু'একজন বয়স্থ মহিলাও দূরে ঘোমটা দিয়ে বসে সাগ্রহে চেয়ে রয়েছে এই দিকে।

কেউ যেন জোর করে তাদের বন্দী করে রেখে—নিজেরা লুট করছে ওদের এতকালের সম্পত্তি।

নোতুন জরিপ হচ্ছে। নয়া কানুন বন্দোবস্ত হবে।

সারা দেশে চালু হচ্ছে নোতুন কায়েমী ব্যবস্থা। জমির মালিক আর সরকার দুজনেই বহাল থাকবে, মধ্যে জমিদার—মধ্যস্বত্বাধিকারী—দরপত্তনিদার—কেউ মুনাফালোভী থাকবে না।

ফৌত হয়ে যাবে সব। ঝরাপাতার মত উড়ে যাবে তারা।

তারকরত্ন কথাটা শুনেছিল আগেই। সোনামুখীর দত্তরা—হোদল নারায়ণপুরের রায়চৌধুরীবাবু, মালিয়াড়ার সিংহরায়—আরও অনেকের কাছেই শুনেছিল।

সেই আগুন লাগার পরই সদরে গিয়েছিল তারকরত্ন মামলা দায়ের করতে—সেইখানেই শোনে কথাটা। ওরাও বাকি কর নীলাম নালিশ করতে এসে ইতিউতি করছে। খামোকাই আর কেন এসব করা।

জমিদারীই ফৌত হতে চলেছে। তারকবাবু আশা করেনি এতশীঘ্রই এই সর্বনাশ ঘটবে।

দত্তবাবু পরামর্শ দেন,

—তার চেয়ে পিছনের তারিখ দিয়ে জমি বন্দোবস্ত করে দেন গে—যা সেলামী আসে তাই লাভ। ওইটুকুই শেষ পাওয়া।

ওরা মামলা দায়ের করেনি।

ফিরে এসেছিল তারকরত্নও চিন্তিত মনে।

দিন বদলাচ্ছে । বনে বনে ঝরাপাতার দিন এসেছে। শালগাছগুলোর ডাল থেকে বাতাস ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে জীর্ণ পাতাগুলোকে,—ঝরে গেছে মহুয়া গাছের সবুজ পাতার আবরণ, রিক্ত নিঃস্ব বনভূমি শুধু পলাশের পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার আভায় রক্তাক্ত, বেদনাময়।

বাসটা ফিরছে শহর থেকে, তারকবাবু চেয়ে থাকে।

মনে হয় অমনি যেন ঝরে যাবার দিনই আসছে তার জীবনেও।

আজ মনে হয় তাদের ফুরিয়ে যাবার বেলার সঙ্কেত এনেছে ওই বনভূমি—শেষ সুর্যের রঙিন আভায়।

অবনী মুখুয্যে তৈরি ছিল, ঢাকের আগের কাঠির বাদ্যির মত দু পায়ে লাফাতে লাফাতে আসে কাগজ বগলে । চীৎকার করে ওঠে,

—এই যে তারকদা, শুনছো—all gone, সত্যি?

কথাটা সেও বিশ্বাস করতে পারে না।

ধরণী মুখুয্যেও এসে জুটেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে—কেশ-বিরল মাথায় এদিক ওদিকে দু'একগাছি চুল তখনও লেগে আছে, তাতেই হাত বোলাতে থাকে।

আবছা আলোয় দেখা যায় তারকবাবুর মুখে চিন্তার রেখা। গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়,— হ্যাঁ। সবই সত্যি।

—ধানসাজা, দেবোত্তর—মধ্যস্বত্ব ! সব নিয়ে নেবে? ধরণী মুখুয্যের গলা কাঁপছে।

এতকাল নানা ফিকিরে রোজকার করেছে সব কিছু। ঠকিয়ে আর মামলার হুমকি দেখিয়ে সব বেহাত করে নিয়েছে লোকের কাছ থেকে দেনার দায়ে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ফড়িং-এর মত লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে পঞ্চাশ থেকে একশো—দুশো তক্।

অবনী মুখুয্যে তখনও কোট ছাড়েনি। গজরাচ্ছে।

—বাবা কর্নওয়লিশ-এর আমলের পত্তনি, খোদ বিষ্ণুপুর মল্লরাজার তাম্রপট্টোলী, এক কথায় ভক্কা হয়ে যাবে?

তারকবাবু চুপসে গেছে। বলে ওঠে,

—তাই যাচ্ছে ! অবশ্য শুনছি কম্পেনসেশন দেবে।

—ড্যাম ইওর কম্পেনসেশন। জুতো মেরে গরু দান।

ধরণী ভীতকণ্ঠে বলে,—তাও শুনছি জরিপ করার পর দখল সাব্যস্ত করে নোতুন রোকড় পড়চা হলে তবে তখন। এদিকে যে বাবা সব গড়বড় হয়ে আছে।

তারকবাবু বলে,—মেরামত করে নাও, নইলে থাকবে না।

অবনী, ধরণী মুখুয্য, তারকবাবু—সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাইরে রাত্রির অন্ধকার নামছে। ওদের জীবনেও সেই আঁধারের জমাট আবরণ নামছে, ভয় পেয়ে গেছে তারা।

রাত বাড়ে।

হু হু হাওয়া বয়, বন থেকে ভেসে আসে মহুয়া ফুলের সৌরভ। আজ কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ মনে হয় সব কিছু। ওরা চলে গেছে।

একাই বসে আছে তারকবাবু ; ওদের নামে মামলা করতে পারেনি। নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হয়। যে মাটির উপর এতকাল দাঁড়িয়েছিল, পায়ের নীচে থেকে সেই মাটি সরে যাচ্ছে।

পুরোনো বাড়িটা আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির-মত থমথমে মনে হয়। কোথায় একটা শিয়াল ডেকে থেমে গেল—আঁধারে চীৎকার করে ওঠে অনেকগুলো শিয়াল, বাড়ির আশপাশেই।

কি যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্ন।

উঠে যাচ্ছে ভিতর বাড়ির দিকে তারকবাবু।

সারি সারি গোলা, মাত্র কয়েকটা তার ভর্তি, বাকি সবই ফাঁকা। ভর্তি হয়ে উঠতো বোরোর ফসলে। কিন্তু সব ছাই হয়ে গেছে—সামান্য ধান যা বাঁচাতে পেরেছে তাও আগুনের তাপে কালো হয়ে গেছে—কতক আবার খই ফুটে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

হঠাৎ গোলার পাশে কার হাসির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। তারার আলোয় দেখা যায়, একটা মেয়ে—আবছা চিনতে পারে, বেজা বাউরীর বউ লবঙ্গ।

চমকে ওঠে তারকরত্ন। কানে এসেছে অনেক কথাই জীবনের সম্বন্ধে। আজ ওকে দেখে দাঁড়াল তারকবাবু।

রাগ হয় ছেলের উপর। ওরা এততেও বুঝলো না।

মেয়েটার হাসি মুছে যায়।

তারকবাবু ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। অল্প বয়স, যৌবনের উন্মাদস্রোতধারা ওই অসংযত বেশবাসের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মেয়েটা সরে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আঁধারে তারকরত্ন। বাড়িটা ধুঁকছে—যেন দীর্ঘশ্বাস উঠেছে ওর বুকের গভীর অতলে। কাঁপছে ইট কাঠ। প্রচণ্ড ধাক্কায় এইবার নুইয়ে পড়বে চুর চুর হয়ে। সব পাপ চক্রান্তে গড়া এতদিনের প্রাসাদ ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। অন্ধকার থমথমে বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন কাঁদছে। গুমরে ওঠে কান্নায় ক্ষীণ শব্দ।

এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক দীর্ঘশ্বাস—অনেক কান্না জমে আছে। তারকবাবুর মনে হয় কান্না নয়, ভুলই শুনেছে সে।

অশোক জানতো এমনি একটা কিছু হবে।

এতদিন চাকাটা এক জায়গায় থেমে গিয়েছিল, জগদ্দল পাথরের মত প্রচণ্ড ধাক্কায় আজ গতিবেগে সচল হয়ে উঠেছে। সেকালের পুরোনো প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত এসে বেজেছে। প্রচণ্ড সেই আঘাত। দুশো বছরের জীর্ণ প্রথা আজ বাতিল হতে চলেছে।

—একে মেনে নেওয়া ছাড়া—মানিয়ে নিয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই ।

নীলুবাবু সেদিন কথাটা বলেন।

—এবারে অনেকেই তো বেকার হল দেখছি।

—কেন ?

অশোকের কথায় নীলুবাবু বলে ওঠেন,

—জমিদারী অর্থাৎ তেজারতি, ধানমহাজনী, ওই তম্বিহাম্বি বন্ধ হয়ে যাবে। বছরকী ধান সাঝাও নেই, তখন আর চলবে কি করে ?

অশোকও জবাব দেয়,

—অন্য একটা পথ ঠিক বের করবে মানুষ।

প্রীতি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছে।

কিছুদিন ধরে সেও দেখছে গ্রামে সাজসাজ রব। সদরে দৌড়াচ্ছে সবাই রোকড়-পড়চার নকল আনতে। নীলুবাবুও ইতিমধ্যে বালি কাগজে দাগ এঁকে ঘর কেটে ফরম এ, বি ইত্যাদি নানা ছক পূরণ করতে ব্যস্ত।

এক সিকির তিন আনার ষোলভাগের ভাগ। যেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মত বলেন নীলাম্বরবাবু,

—মিলল না অশোক, এই কড়া ক্রান্তি তিল দন্তী হিসাব করা আমার কম্মো নয়। দেখ দিকি প্রীতি—প্রীতি জবাব দেয়,—ওই গণ্ডা কড়া ক্রান্তি করে যা পাবে—তাতে মজুরি পোযাবে না, তার চেয়ে ইস্তফা দিও—শান্তি পাবে।

নীলাম্বরবাবুর মন মানে না।

—না রে। এরই দাম কি কম ?

হাসতে থাকে অশোক।

তবু নীলাম্বরবাবু যেন পৈত্রিক ওই তিল কাক দন্তীর হিসাব মেলাবার জন্যই রোকড়-পড়চা বগলে উঠে পড়েন।

ওদিকে আমিন আসছে—জমি জরিপ হবে। এতদিন মাঠদিকেও যাননি, এইবার যেন জমিগুলো একবার চেনাজানাও দরকার, নাহলে জবাব দেবেন কি ? আজ সব জানবার দরকার হয়েছে। নইলে মাঠের দিকে তো অনেককাল যাননি। জমির আলও চেনেন না।

মুনিষটাকে বলেন,

—বৈকালে একবার মাঠদিকে যাবো, আসিস। বাকুড়িগুলো একটু চিনে রাখি।

গরুর ছানি কাটছিল ফকির, জাবাব দেয়,

—আজ্ঞে এখুনই চলেন কেনে ?

—উঁহু, এখন ধরণীর কাছে যেতে হবে, হিসাবটা বুঝে আসি। তারপর ও বেলায় যাবো জমি বুঝতে।

নীলাম্বরবাবু হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন।

পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া ওই তিনকড়া দুক্রান্তি অংশ জমিদারীর—একেবারে বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেবার নয়।

হাসতে থাকে প্রীতি বাবার এই দুর্বলতায়। হঠাৎ অশোকের দিকে চেয়ে থাকে—কেমন যেন স্থির হয়ে আছেও। প্রীতি বলে ওঠে,

—তোমার মনে কিছু রেখাপাত করেনি এটা ?

অশোক কি ভাবছে। জবাব দেয়,

—করেনি তা নয়! তবে স্রোতের বেগকে আটকাবার চেষ্টা করা বৃথা—এইটাই মেনে নিয়েছি।

সকালের রোদ বেড়ে চলেছে।

সোনা রোদ গেরুয়া হয়ে ওঠে। বাতাসে মাদার ফুলের তীব্র সুবাস। বাঁশবনে কোথায় একটা পাখি ডাকছে। শান্ত স্থির পল্লী-পরিবেশের অতল অন্তরে কোন দুর্বার আত্মা দীর্ঘ শতাব্দীর বন্দী দশা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাতাসে বাতাসে তারই স্পন্দনধ্বনি।

প্রীতি বলে ওঠে,—এইবার কি করবেন ? একটা চাকরি তো গেল।

অশোক জবাব দেয় না।

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে দেখেছে প্রীতি যেন তাকে সুযোগ পেলেই এই প্রশ্ন করেছে। অশোক যেন বেকার—তার দিন কাটানোর, জীবনধারণের একটা পথ চাই; তাকেও পাঁচজনের মাঝে একজন হয়ে বাঁচতে হবে এই কথাটাই তাগিদ দিয়ে এসেছে বার বার।

কেন তা জানে না। ভেবেছে সে-ও।

প্রীতিও ভেবেছে। ওর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই কেমন যেন খানিকটা ঠাঁই ওর মনেও করে নিয়েছে অশোক।

—জবাব দিচ্ছো না যে ?

এ নিয়ে অশোকও ভেবেছে। সব যখন উলটে যাচ্ছে তখন এর থেকে নোতুন কিছু নিশ্চয়ই জন্ম নেবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নবরূপায়ণে সে-ও আজ খুশি হয়েছে। বলে ওঠে,

—জবাব দেবার কিছুই নেই। আপাততঃ সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে শুনেছি। সমূহ লোকসান হবে না।

প্রীতি একটু চটে ওঠে।

—তাতেই দিন চলবে ?

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে প্রীতি, ওর মনের এই নীরব নিষ্ক্রিয়তাকে পছন্দ করে না সে।

অশোক জবাব দেয়,

—তা হয়তো চলবে কিছুদিন। তার মধ্যেই একটা পথ ভেবে নেব। চাকরি করে—ব্যবসা করে যারা পয়সা রোজগার করছে—দিন চালাচ্ছে, তাদের মতো হয়তো সবাই নয়; সংসারে অকাজ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত লোকও কিছু চাই।

—অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দলে ? ধন্যি লোক যা হোক তুমি !

জবাব দিল না অশোক, কেমন যেন বেদনাহত চাহনিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

প্রীতি এতটা কঠিন হতে পারে কি করে জানে না। শহরজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে যতই শুরু করেছে ততই যেন পল্লীর এই অলস জীবনযাত্রাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

প্রশান্তের কথা মনে পড়ে প্রীতির।

তার চেয়ে তিন বৎসরের সিনিয়র। প্রীতির মনে সেই যেন খানিকটা আবর্তের সৃষ্টি করেছে। শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর ছেলে—কিন্তু তার মনে স্বপ্ন রয়েছে—সে এখানে সুতোর কল চালাবে। সমস্ত জেলার তাঁত ব্যবসায়ীদের প্রচুর সুতোর চাহিদা। সুতো—চাই কি ক্রমশঃ কাপড়ের কলও বসাবে।

ওর মনের গভীর কর্মপ্রেরণার উত্তাপ দেখেছে প্রীতি—তাই বোধহয় অশোকের এই নিবিড় স্থৈর্যকে আজ কেমন নীরব নিষ্ক্রিয়তা বলেই মনে হয়।

অশোক উঠে পড়ে।

—যাচ্ছো ? ছোট্ট প্রশ্ন করে প্রীতি ওই দূর কোন সবুজ চিন্তার অবসরে।

—হ্যাঁ। বেলা হয়ে গেছে।

চলে গেল অশোক।

নির্জন পথটা দিয়ে চলেছে। একদিকে তারকবাবুর উঁচু পুকুর—নীচে গ্রামের সেই রাস্তাটা; চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে, গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে জলের ঝরণা ধারা—বাঁশবনের ছায়া কাঁপছে পথে।

প্রীতির মনের কথা সেও জানে। যে জীবনকে প্রীতি ভালবাসে সে জীবনকে অশোক এড়িয়ে যায়। করণীয় তার কিছু আছে। তবে সেটা আর পাঁচজনের মতের সঙ্গে মেলেনি।

চাকরি-ব্যবসা-অর্থ-সম্পদের মোহ তারও মনে আছে। কিন্তু সেটাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি।

বাতাসে কানে আসে বাসন পেটার হাতুড়ির শব্দ।

হঠাৎ তালগাছের ছায়ায় কাকে দিঘি থেকে স্নান সেরে উঠে আসতে দেখে দাঁড়াল।

কদম-বৌ উঠে আসছে। ভিজে কাপড়—কলসীর জল চল্‌কে উঠছে ওর নধর দেহের গতিবেগে।

—ছুটবাবু !

অশোক ওর দিকে চাইল। কদম-বৌ বলে ওঠে,

—আর যাও না কেনে বাড়ির দিকে ?

কথা বলে না অশোক। বলে ওঠে কদম,

—কেনে যাও না তা জানি।

—কেন রে ?

একটু ভারী হয়ে আসে কদমের গলা।

—তুমিও সত্যি ভেবেছ ওই গোকুলের কথাটা।

ওর দিকে চাইল অশোক। গোকুলের সেই কথাটা আজও ভোলেনি কদম, ওর মনের একটা নীরব নিভৃত স্থানে সেই বেদনাটা মিশিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনের কোণে ঝড় তোলে। অশোক একটু বিবর্ণ হয়ে উঠে জবাব দেয়,

—না, না। সময় পাইনি।

সহজ হবার চেষ্টা করে কদম,—তবু ভাল।

চলে গেল সে। ছায়ায়-আলোয় ঢাকা পথটা দিয় হারিয়ে গেল কদম ওপাশে। চলছে অশোক।

তারকবাবুর বৈঠখানার সামনে কয়েকজনকে দেখে চলে যাবার চেষ্টা করে অশোক।

এমোকালীও ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে, বলা কওয়া নেই একটা প্রণাম ঠুকে বসে।

—কি রে?

ভব্যিযুক্ত হয়ে ওকে প্রণাম করতে দেখে একটু অবাক হয়েছে অশোক।

কালীই জবাব দেয়,—এজ্ঞে জমি লিলম আমরা কয়েক বিঘে ধান সোলের সোতে।

—জমি বন্দোবস্ত নিলি ?

হাসছে কালীচরণ, খুশির হাসি। এসে দাঁড়িয়েছে অতুল কামার, দয়াময়—আরও ক'জন। কালীচরণ বলে ওঠে,

—কামারপাড়ার ক'জন মিলে লিলম বিঘে বিশেক জমি। তারকবাবু সব জমি ছেড়ে দিয়েছেন কিনা?

অশোক মনে মনে হাসে। খুশিই হয়েছে সে,—বেশ, বেশ।

দেখেছে নোতুন ব্যবস্থায় অনেক বাড়তি জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা। সেই জমি এসে পড়েছে এদের হাতে, ভূমিহীন একটি শ্রেণীর হাতে। কালী বলে,

—আজ্ঞে ইবার আর বলতে পারবেক নাই—শালোর তিলক কাটতে মিস্ত্রিকে নাই, কথাটা পেরায় বলতো ওই অবনীবাবু কিনা।

অতুল কথাটা বলে।

—সাঁঝ বেলায় একবার আসুন কেনে ছুটবাবু।

—আচ্ছা !

এরা চলে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

দুপুরের রোদ ঠেলে উঠেছে আকাশের মধ্যসীমায়। শীতের আমেজ চলে গিয়ে আসছে গ্রীষ্মের দাবদাহের আভাস, লাল কপিশ প্রান্তরে রোদ উঠেছে—ঝাঁ ঝাঁ রোদ ; বনখেজুর ঝোপের পাশে দমকা হাওয়ায় উঠছে ছোট ছোট ঘূর্ণি। পথের ধুলো উঠছে আকাশে।

চাকাটা ঘুরছে।

নীরব নিস্পন্দ জীবনযাত্রায় এসেছে গতিবেগের ছন্দ।

অতুল, কালীচরণ, ভুবন কর্মকার আর কারা আজ সমাজের বুকে নোতুন পরিচয়ে স্বীকৃত হলো।

ভূমিহীন পরগাছা আর নয়, তাদেরও অস্তিত্ব আছে, মাটিতে আছে তাদের দাবি। এই কঠিন অধিকার তারা ছিনিয়ে নিয়েছে ওই তারকবাবুদের হাত থেকে।

বড় বাড়িখানার কলরব-সমারোহ কেমন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। চারিদেকে একটা বিবর্ণতা।

শুকিয়ে গেছে বাগানের মাঝের গোলাপগুলো, আগুনের তাপে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা আধপোড়া নারকেল গাছ।

পথের ধুলোতে এখনও ছড়ানো কালো ছাই আর ছাই।

অশোক এগিয়ে চলে। প্রীতির কথাটা তখনও মনে পড়ে। কেমন যেন বদলে গেছে প্রীতি।

ওর চোখের সামনে কোন স্বপ্নই নেই—আছে শুধু বেঁচে থাকার, বিলাসব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার কথাটাই। ওইটাই সবচেয়ে বড়। আগামী যুগের কেমন একটা ব্যর্থ রূপ —অশোক যেন চিন্তায় পড়েছে।

কাটা ছাগলের মাংস ভাগ ভাগ করে বিক্রি হচ্ছে। এতদিন ছাগলটা ঘুরে বেড়াত— চরত, জীবনটাকে উপভোগ করছিল। এক নিমেষেই সব চেতনা হারিয়ে সে পণ্যে পরিণত হয়েছে। ফুসফুস—দাবনা—বুকো—সব বিভিন্ন দামের পশরায় পরিণত হয়েছে বাজারে।

তারকবাবুর জমিদারীর অবস্থাও তেমনি। ভাগা দরুনে বিক্রি হচ্ছে, পচে যাবার আগেই হাটে বেচে দিয়ে যা পাওয়া যায় গোছের অবস্থা।

পিছনের তারিখ দিয়ে বন্দোবস্ত হচ্ছে জমিদারী। যে যা চায় নিয়ে যাক।

কামারপাড়ার লোকেরাও এসেছিল। দিতে চায় নি প্রথম।

অবনীবাবু আড়ালে বলে,—Drive them. হঠাও ! বাঁশরোপণ সিংহ—আর্সুলা হবে পাখি?

কিন্তু অন্য খদ্দের আর আসতে পারে না, এমোকালীর দলবলই নাকি পথ আগলায় তাদের। কথাটা শোনে ওরা—কিন্তু করবার কিছুই নেই।

শেষ অবধি মত না দিয়ে পারেনি তারকবাবু।

সবচেয়ে অবাক হয় তারকবাবু মিষ্টিকে দেখে। ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছে। ধরণী মুখুয্যে খাতা থেকে মুখ তুলে সব দেখে বলে ওঠে,

—তুই ! তুই ইখানে কেন রে ?

হাসে মিষ্টি,—ভয় নাই, বাকি টাকার তাগাদ দুব নাই গো।

—বাকি টাকা ! কুন শালা বলবেক—ধরণী মুখুয্যে কারোও আধলা ধারে ! মরা হাতি আভি সওয়া লাখ।

মিষ্টি হাসছে, হাওয়ায় উড়ছে শাড়ির অঞ্চল। বেহায়া মেয়েটা বলে ওঠে,

—আদার ব্যাপারি লাখ বিলাখের খপর জানি না—তা সেদিন কাত্তিক পুজোর এতে বলেছিল—

ধরণী মুখুয্যে টাকে হাত বুলোচ্ছে। থেমে গেল মিষ্টি। খুঁট থেকে দলাপাকানো নোটগুলো বের করে নামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে মিষ্টি,—যাক্ উ কথা। আমাকে টুকচেন জমি দাও কেনে ?

অবনী মুখুয্যে উঠে গেল। ধরণী চুপ করে কি ভাবছে। জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। জমির জন্য এসেছে মিষ্টি লোহার ।

কারা তাগাদা দেয়।

—চটক করো ঠাকুর। তিনকোশ পথ যেতে হবেক যি গো। দাও, রোকড় হাতচিঠায় সই করে।

মিষ্টিও জমিদার বাড়ির দাওয়ায় চেপে বসেছে।

রাতের অন্ধকারে যারা আসতো, চোরের মত তাদের অত্যাচারের নীরব সম্মতি দিতে যে বাধ্য হয়েছে, সেই মিষ্টিও আজ ঘরের স্বপ্ন দেখে। একটু ঘর, জমিজারাত—তাই নিয়ে আবার ভাঙ্গাজীবন নোতুন করে যাপন করবে।

দিন বদল—পালা বদলের দিনে তাই তারা নোতুন আশায় বুক বেঁধে এসেছে—সেই দাবি ছিনিয়ে নিতে।

ধরণী মুখুয্যে টাকের উপর ভিজে গামছাটা চাপিয়ে পড়চা দেখতে থাকে।

খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, তৌজি নম্বর—সব লিখে মৌজাজারি বন্দোবস্ত করছে। মিষ্টিরও নীম পত্তন হয়ে গেল আজ জমি মালিকের খাতায়।

ঘর ছাইছিল মুনিযগুলো—জলটোপ দাঁড়িয়ে তদারক করছে। সামনের দিকে একটা মন্দিরের মত আদল এনেছে। রাশিরাশি খড় গড়ের জলে চুবিয়ে এনে মুনিষগুলো সাঁ সাঁ শব্দে চালের উপর বসা বারুই-এর হাতে তুলে দিচ্ছে।

বারুইগুলো আশমানে নিপুণ অভ্যস্ত হাতে খড়ের আঁটিগুলো ধরে ধরে চালে লাগাচ্ছে। গ্রীষ্ম আসছে—কালবৈশাখীর ঝড়ের আগেই মজবুত করে ঘর বানিয়ে নিতে চায়, ঝড়ে আর বৃষ্টিতে যাতে না কষ্ট পায়।

সামনের ঠাঁইটুকুতে কয়েকটা বেগুনগাছ—সযত্ন পরিচর্যায় তারা নধর সবুজ হয়ে উঠেছে, ঝুলছে কতকগুলো বেগুন; গাঢ় ভেলভেট রং-এর ফলগুলো পাতার আড়ালে কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে নিটোল পূর্ণতায়।

মিষ্টিকে বাড়ি ফিরতে দেখে চাইল জলটোপ।

হাতের জমি বন্দোবস্তের কাগজখানা বের করে দেয় মিষ্টি।

—নে !

— ই কিরে ? অবাক হয় জলটোপ।

মিষ্টি হসি মুখে বলে ওঠে,

—জমি লিলম। গয়না পরে আর কি হবেক বল ? সব বিচে দিয়ে জমি লিলম। ধান হবেক —আখ আলু ধান কেমন ঘর মানাবে বল দিকি ? মা লক্ষীর আটন।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লাস্যময়ী উচ্ছল ভাব মুছে গিয়ে একটি সবুজ শ্রী ফুটে উঠেছে। ঘরের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে তার।

নিরাভরণা একটি নারী, শাড়ি গহনা সব ছেড়ে আজ মাটির স্বপ্ন আর সার্থকতার আনন্দে বিভোর। বলে ওঠে মিষ্টি,

—তুই খুশি হোস নি লাগছে ?

—না। না। বেশ তো ভাল করেছিস।

সায় দেয় জলটোপ।

মিষ্টির আজ গুনগুনানি সুর আসে—মনে।

জলটোপ আজ গুনগুনানি সুরটা শুনেছে। মিষ্টির মনে আজ সুরের পরশ—ঘরবাঁধার সার্থক স্বপ্ন।

ও সুখী হোক। অনেক ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছে আবর্জনার সঙ্গে ; তবু থিতু হোক—কোন উর্বর পলিচরে ও সবুজ তরুশাখায় বিকশিত হোক।

লোকটা কি ভাবছে।

ঘরের নেশা—ও যেন বদ নেশা ! সাংঘাতিক নেশা। মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়।

একটু চিন্তায় পড়েছে আজ জলটোপ। জমি-জারাত মানেই ঝামেলা, নানান বখেরা। হেপা সামলাতে প্রাণান্ত—একটা করে ঝামেলায় যেন জড়িয়ে পড়ছে বিবাগী মেয়েটা।

জলটোপের কাছে এ সবই বিস্বাদ লাগে।

এত আবর্তন-বিবর্তনের মাঝে একটি লোক নিরাসক্ত নির্বাক দৃষ্টিতে গোপগাঁয়ের অতীতকে দেখেছে—বর্তমানকেও দেখেছে—কল্পনা করে ভবিষ্যৎ-এর । তার সেই মতামত প্রকাশের ভাষা নেই।

একপক্ষে বোধ হয় ভালই হয়েছে নারাণ ঠাকুরের। ভাষাহীন লোকটি গ্রামের এতবড় ঘটনা, স্রোত-অন্তস্রোত-এর কিছুই খবর রাখে না।

তার কল্পনা সীমিত হয়েছে ওই মাঠের কাজের মধ্যে, আর গরু বাছুরের তদারকিতে। সেই তার জগৎ।

ছানু দাস, পানু দাস-এর দোকান অবধি বড়জোর তার দৌড়।

ভাইপো সনাতন বড় হয়ে উঠছে। ছোট্ট ছেলেটাকে বড় ভাজবৌ গঙ্গাঠাকুরণ ধার-কর্জ করে পড়াচ্ছে, গাঁয়েরই স্কুল ছেড়ে পাশের গ্রামের বড় ইস্কুলে পডতে যাচ্ছে ; হিসাব কিতাবও শিখেছে।

নারাণ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে তার ভাইপো সনাতন ইস্কুলে যাচ্ছে বই পত্র নিয়ে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে।

বড় ভাই-এর কথা মনে পড়ে। অকারণেই যেন মনটা কেমন হু হু করে। কত নিশ্চিন্ত ভাললাগা দিনগুলো ! ওদিকে মরাই-এর ধানও ফুরিয়ে আসে। বই-জামা -জুতো কিনতে কত খরচ লাগে !

তবু নারাণ বুক বাঁধে আশায়।

ছেঁড়া কাপড়খানা ভাল করে গুটিয়ে-সুটিয়ে পরে নারাণ ঠাকুর গোয়ালের আড়াল থেকে খড় নামিয়ে কাটতে থাকে। মুনিষটাকেও জবাব দিয়েছে এখন।

হাল-ফালের কাজ নাই ; নিজেই সব দেখতে পারবে। তবু বাঁচবে একজনের মজুরি—দৈনিক চার সের ধান আর মুড়ি—সেই সঙ্গে তেল তামাক। এটাও কম সাশ্রয় নয় তার কাছে।

গঙ্গাঠাকুরণ অবশ্য অন্য স্বপ্ন দেখে।

জমি-জারাত যা আছে তাতে যজমানি করে আর পেট চলে না। তাই ছেলেকে পড়াচ্ছে সে। হেলু মাস্টার, তারকবাবুর হাতে পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে কোন রকমে বিনি মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা করেছে, তার স্বপ্ন অন্য জগতের। বাবুদের ছেলের মত তার সনাতনও পাশ দেবে। চাকরি করবে।

মাঠের কাজের সময়ও ছেলেকে যেন ওদিকে পাঠাতে মন চায় না। কাদা জল বৃষ্টিতে মাঠে পাঠাতে রাজি নয়।

সেদিন ধান কাটার সময়েই কাণ্ডটা ঘটে যায়, বাকুড়ির ধান কাটা হচ্ছে—এক টানে সব জমিটার ধান কাটতে না পারলে পিছু পড়ে যাবে ! গরু বাছুরে ধান নষ্ট করবে। তাই নারাণ ঠাকুর বহু কষ্টে কিছু ধান কবুল করে বাড়তি মুনিষ এনে ধান কাটাচ্ছে।

সনাতন মাঠে গিয়ে কি যেন কৌতূহলবশেই একটা কাস্তে নিয়ে মুঠি মুঠি ধান কাটতে থাকে।

নারাণ ঠাকুর ওর দিকে চেয়ে থাকে।

একদিন অতীতে সেও এমনি করে প্রথম মাঠের কাজ শিখেছিল। আজ সনাতনকে দেখে মনে হয় সে-ও তার দোসর হবে, পাশে দাঁড়াবে। খুশি হয়ে ওঠে নারাণ ঠাকুর।

হাসছে অর্থহীন বোবা ভাষায়; মাথা নাড়ে। ইশারা করে দেখায় এই ভাবে আরও তাড়াতাড়ি ধান কাটতে হবে। তালিম দেয় ভাইপোকে।

কি যেন গর্ব আর আনন্দে ওই ভাষাহীন মানুষটার বুক ভরে ওঠে। দাদার চিহ্নটুকু মুছে যায়নি, আবার তারই দোসর হয়ে সনাতন পাশে দাঁড়াবে। মশ্ মশ্ শব্দে ধান কেটে চলে নারাণ।

হঠাৎ সনাতনের অনভ্যস্ত হাতে কাস্তে বেধে যায়; ধারাল কাস্তের ফলায় কেটে যায় হাতটাও। রক্ত পড়ছে। প্যান্ট জামায় লাগে রক্তের দাগ। কোন রকমে সরে চলে আসে বাড়ির দিকে।

তারপরই শোনা যায় গঙ্গা ঠাকরুণের চীৎকার। ন্যাকড়া পোড়া—এটা সেটা দিয়ে কোন রকমে একটু ব্যবস্থা করেই, তারস্বরে সপ্তম সুরে হাঁক পাড়তে থাকে।

—ওগো তুমি কোথা গেলে ? তোমার ছেলেকে ওই বোবা কেটে ফেলাতো গো ?

দু-পাঁচজন লোকও জুটে যায়। গঙ্গা ঠাকরুণ সবিস্তারে বোবা যে কত বড় শয়তান তাই জাহির করতে থাকে ; এবং এও ঘোষণা করে—আজই এর ব্যবস্থা করে তবে ছাড়বে।

বোবা জানল না, তবে বাড়ি ফিরতেই ভাজবৌ-এর হাঁক-ডাকে চুপচাপ বাইরের দাওয়ায় এসে বসল।

সন্ধ্যা নামছে।

শীতের সন্ধ্যা। সারাদিন স্নান খাওয়া নেই, ধানই কেটেছে। অসহ্য বেদনায় টনটন করছে ভাজা কোমর —গা হাত পায়ে শীতের চড়চড়ে বাতাসে ফাট ধরেছে। সারা শরীরে ক্ষুধার নীরব জ্বালা।

অব্যক্ত বেদনায় নির্বাক নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। মাকে মনে পড়ে না —মনে পড়ে দাদাকে। সেও আজ কোথায় কে জানে!

এমনি দিনও কেটেছে অনেক।

তবু যেন সয়ে গেছে তার। সনাতন বড় হবে—পাশ দেবে। বাবুদের ছেলেদের মত চাকরি করবে। আরও জমি-জারাত কিনবে সে ; তালতলার বাকুড়িখানার মত আরও অনেক জমি হবে তাদের। নারাণ ঠাকুরের বুক আশায় ভরে ওঠে। আজকের মত এত দুঃখ অভাব থাকবে না। তার মনে হয় দুর্ভাবনার দিন তার ফুরোবে।

গ্রীষ্মকাল পড়েছে.

নারাণ ঠাকুর গোয়ালের রুদ্ধ পরিবেশে খড় কাটতে কাটতে ঘেমে উঠেছে। গঙ্গা ঠাকরুণের ডাকে বের হয়ে এল। ধান কিছু বিচতে হবে।

কথাটা প্রকাশ করতেই আজ যেন বেঁকে বসে নারাণ ঠাকুর এতদিনের অভিজ্ঞতা আর অভাবের যন্ত্রণায় সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে চাযের সময় ধান ধার নিলে শোধ দিতে দেড়া ধান বের হয়ে যায়। সারা বছর ধরে চলে কেবল অভাব আর অভাব। আবাদ চাযও করতে পারে না ধান অভাবে—মাঠে সার গোবর দেওয়া তো দূরের কথা।

তাই এবার মাথা নাড়ে সে, অর্থাৎ এক ছটাক ধানও বিক্রি করতে রাজি নয় নারায়ণ ঠাকুর।

গঙ্গা ঠাকরুণ বলে,

—এক বস্তা ধানও বিচবি না ?

গঙ্গা ঠাকরুণের বড় শখ সনাতনকে জুতো একজোড়া কিনে দেয়, তাই ধান বিচবার কথাই বলেছিল। বাধা দিতে গঙ্গা ঠাকরুণ যেন মারমুখী হয়ে ওঠে।

—কি বললি ?

জবাব দিতে পারে না, তবু মাথা নাড়ে বোবা লোকটা।

—পাঁ—এ্যা—

—তুর বাবার ধান ?

অব্যক্ত চীৎকার করছে শুধু পাঁ ঠাকুর।

গঙ্গা ঠাকরুণ আগে থেকেই ছানু দাসকে বলে রেখেছিল, তাই এসে পড়েছে সেও বস্তা হাতে। দাওয়ায় রাখা ধান তুলতে যাবে—লাফ দিয়ে পড়ে নারাণ ঠাকুর।

চীৎকার করছে, আর পেট দেখায় ইশারা করে ; জৈবিক ক্ষুধা, শুধু বেঁচে থাকার ওই একটুমাত্র চেতনাই তার তীব্রতর—যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে সে।

—থাম তুই।

ধমকে ওঠে গঙ্গা ঠাকরুণ। তার পরেই ব্যাখ্যানা শুরু হয়।

গঙ্গা ঠাকরুণের ক্ষুরধার জিবের আগে তাও স্তব্ধ হয়ে যায় চোখের সামনে দিয়ে ছানু দাস দুবস্তা ধান তুলে নিয়ে চলে গেল শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল মাত্র নারাণ—ভাষাহীন নির্বাক দুচোখের কোল গড়িয়ে অশ্রু নাম। কি করে বোঝাবে সে ভাজবৌকে আগামী কোন অনিশ্চিত সর্বনাশের কথা—অজন্মায় কঠিনতম দুঃখ-দুর্ভোগের জ্বালা।

গঙ্গা ঠাকরুণ তখনও হাঁক পাড়ছে।

—ধানটা খাওয়াছি তুকে। চাট্টি খেতে দিই দুবেলা, তাই কতো

—আবার উল্‌টে চোখ রাঙ্গানো ?

ভাষার জ্বালা ওকে স্পর্শ করে না—তাই বোধহয় তবুও সনাতনকে ভালবাসে। ভাজবৌকে, নাবালক ভাইপোকে পর করতে পরেনি, অমানুষিক পরিশ্রমে সংসার সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

বাড়ির বাইরে একটু জায়গাতে নারাণ তরকারি লাগায়—এনে বসিয়েছে কোথা থেকে একটা কাঁঠালের চারা।

সনাতনকে ইঙ্গিতে দেখায় কত বড় হবে গাছটা—কেমন পাতা মেলবে, ছায়া হবে। ফুল ফুটবে ফাল্গুন বেলায়—কোন আগামী অপরাহ্ন তার সৌরভে মদির হয়ে উঠবে। আসবে ফলের ইশারা।

গজ্ গজ করে গঙ্গামণি।

—হ্যাঁরে সোনা, ইস্কুল থেকে এসে মুড়িটুড়ি খাব না ?

—যাই মা।

সনাতন কাকার হাত ছড়িয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

চুপ করে কি ভাবছে নারাণ। ভাববার বেশি ক্ষমতা তার নেই—কেমন যেন মনটা অকারণ খুশিতে ভরে ওঠে। আবার আলুর জমি কোপাতে থাকে ; আলু উঠেছে, এবার লাগাবে গ্রীষ্মের মরসুমের কুমড়ো—শশা।

নীরব মাটি আর নীরব ব্যর্থভাব এই লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়ে গেছে।

ওদের সকলেরই সঙ্গে এই মাটির বন্ধন অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। তাই ওরা কোন নির্মম বেদনায় এসে জমায়েত হয়েছে জরিপ-খানপুরীর মাঠে।

টেবিলের উপর ম্যাপটার সরু পেন্সিলের দাগ বোলাতে বোলাতে হাঁক পাড়ে আমিন।

—মৌজা রঘুনাথপুর রেঃ সা-নম্বর আটাশ, তৌজি নং বাহান্ন, খতিয়ান নং সাত, দাগ নং এগারো শ বাইশ। উত্তর সীমার দখলদার শ্রীগতিলাল দিগর। বর্তমান দখলীকার—

মাঠের আলের এদিকে-ওদিকে ছোটখাট সেরেস্তা বসে গেছে—ওদিকে বটতলায় বসেছে মেয়েদের দু-একজন—মিষ্টি লোহার এসেছে দাগ নম্বরে তার দখল বলবান করতে। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে গঙ্গা ঠকরুণও।

ধরণী মুখুয্যে লালখেরোর পুটলি বগলে জাঁকিয়ে বসেছে। এই প্রধান মৌড়া —এখানে পাকা করতে পারলেই ব্যস—কানুনগোই বল, তিনধারা—সাতধারা বল, সব ফৌত।

হুঁকোটা টানছে আর তড়পাচ্ছে।

-বল বল বাহু বল। এই বাহুবল আমার কাগজ। জজে 'না' করুক দিকি, ওটা আমার দখলে আমিন সাহেব। খাস।

—আজ্ঞে সি কি কথা? এগিয়ে আসে অতুল কামার—সিদিন বন্দোবস্ত করলেন ?

অতুল চমকে ওঠে ধরণীর ওই কথায়।

করকরে টাকা দিয়ে এসেছে। হাতচিটেও রয়েছে।

হাসে ধরণী,—ওই তো বললাম অতুলখুড়ো, বল বল বাহুবল। কাগজেই সব সাক্ষ্য প্রমাণ —এই যে।

এগিয়ে আসে এমোকালী।

—তালে সিদিন কলাপাতায় লিখেছিলেন ? ইঃ এটা কি ?

মিষ্টি লোহারও এগিয়ে আসে। ক্ষারে কাচা একটা শাড়ি পরে এসেছে—মুখে একমুখ পান, দোক্তার আমেজে গরগর করছে। একবার খানিকটা পিচ্ ফেলে চাতরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তাকেও ধরণী মুখুয্যেই জমি বন্দোবস্ত করেছে।

কয়েকটা জমিতে নাম বহালও হয়েছে তার।

এবার একটা গণ্ডগোল দেখে বলে ওঠে মিষ্টি,

—লিখে দিলম কলার পাতে—

দেখে লেগা মাঠেমাঠে ।

ইকি তাই হল নাকি গো ? বলি আমাকেও কি কলার পাতে লিখে দিয়েছ এটা ?

—অ্যাই ইসচুপিড—ধমকে ওঠে ধরণী মুখুয্যে। রেগে গেলে ওই ইংরেজিটাও বের হয়ে পড়ে মাঝে মিশেলে।

হাসছে মিষ্টি,—চটছো কেনে গো ?

আমিনবাবুও অবাক হয়েছে।

বাইরের লোক দেখেছে এখানে এসে পাকে পাকে যেন জড়ানো এদের অনেকেরই অন্তর। গঙ্গামণি ঠাকরুণও ঘোমটার আড়াল থেকে ফিসফিসিয়ে বলে আমিনকে একটু পরেই,

—আজ্ঞে ওই দাগে কেবল একটা নামই বসাবেন, গঙ্গামণি দেব্যা।

অবাক হয় আমিন।

—কেন ফকির ভটাচায ফৌত, কিন্তু নারাণ ভটাচায?

জবাব দেয় গঙ্গামণি,—বোকা হাবা মানুষ সে, নইলে আমার এই পোড়া বরাত ! একটা মাত্র পেটের কাঁটা নাবালক !

হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে। একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমিনবাবু ওর দিকে। আইনগত কথা, কি যেন চিন্তায় পড়ে।

ওদিকে তখন বেধে গেছে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ।

ধরণী মুখুয্যে টো বাদই দিয়ে গেছে বন্দোবস্তের পাকা। রোকড়ে—কিন্তু হাতচিটায় কবুল করেছে। দখলও নিয়েছে ভুবন কর্মকার—লাঙল দিয়ে বীজ ধান ছিটিয়েছে । চারাও উঠেছে

কালীচরণ তো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে ওঠে ধরণীকে,—এদ্দিন বলোনি কেনে হে ঠাকুর? এই তো কাগজে লিখেছ ? আর উল্টে দিছ! জিব খসে যাবেক তোমার।

ধরণী ধমক দেয়,—চোপরাও।

এমোকল্লী বিছু বলবার আগেই ধরণী মুখুয্যে এসে লাফ দিয়ে পড়ে কালীর কাছেই, দুর্বার বেগে চড়চাপড় কষতে থাকে।

যেন মরণ কামড় দিয়ে শেষবারের মত ব্যর্থ চেষ্টা করছে ধরণী, কোনক্রমে যদি টিকিয়ে রাখতে পারে জমিটুকু।

শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটা যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

নীলাম্বরবাবু ছাড়িয়ে দেন।

—থাম থাম কালী !

—আজ্ঞে কিছুই করিনি বাবু। ওই তো কুঁদি মেরে এসে পড়ল।

ওরা এসে ধরণীকে টেনে সরিয়ে নেয় ; সত্যিই কালীচরণ ওর অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গেছে ; নইলে ব্যাপার অনেক দূরই গড়াতো।

আমিনও ঘোষণা করে,—ফৌজদারী করবার থাকে তাই আগে করুন, পরে আমার কাজ শুরু করবো তাহলে।

নিরস্ত ধরণী মুখুয্যে তখনও তড়পাচ্ছে,—তাই হবে। মরা হাতি সওয়া লাখ।

—তাই দেখগে হে। কালী গর্জাচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবনী মুখুয্যে। এখানে তার বিষদাঁত যেন ভেঙ্গে গেছে। হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

এ হাওয়ায় ঝরে পড়ে জোড়ধারের অর্জুন শিমুলগাছের জীর্ণপাতা। চারিদিকে ধূ ধূ তপ্তরৌদ্র ; কোথাও ছায়ায় যেন কোন সঙ্কেত নেই।

তারকবাবু এসব ঝামেলায় আসেনি। শশী গোমস্তা এসেছে, কোন আপত্তি থাকে—যেন দাগে বাটানম্বর করিয়ে আপত্তি পেশ করে, তিন ধারা, সাত ধারার দেখবে। হাটের মাঝে ওই লোকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বচসা করতে পারবে না সে। জীবনরত্ন সঙ্গে রয়েছে গোমস্তার।

জীবন, কারণ অকারণে আমিনকে সিগারেট খাওয়াচ্ছে। ফ্লাস্কে করে চাও এনেছে। চাকরটা ছাতা ধরে ফিরছে ওর মাথায়।

দেখিয়ে দিতে চায় জীবন—এখনও ওদের থেকে তারা স্বতন্ত্র।

ধরণী মুখুয্যে তখনও গোঁ গোঁ করছে।

সারা গ্রামের ভাগ্যের বিধান যেন উলটে যাচ্ছে।

বড় জাবেদাখাতা থেকে দখলকার পত্তনিদার তারকরত্ন প্রমুখদের নাম মুছে যাচ্ছে—বহাল হচ্ছে অন্য প্রজা, চাষী, আরও কত নোতুন নাম। অতুল কর্মকার দিগর, মিষ্টি লোহার—আরও কত—

আমিনবাবু বলে ওঠেন মিষ্টি লোহার—স্বামী—

হাসছে মিষ্টি। হঠাৎ কি ভেবে ধরণীর দিকেই আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়—উদিকেই ়ধোন কেনে?

হাসির ছায়া খেলে যায় সমবেত অনেকেরই মুখে।

ধরণী মুখুয্যে আজ যেন ধরা পড়ে গেছে।

এতদিনের গলদ গাফিলতি নীচতার ইতিহাস সব প্রকাশ হয়ে পড়ছে। দেনার দায়ে স্থিতবন্ধকী রেখেছে ইস্তক জমি ; পরিষ্কার শর্ত—'দেনার টাকা দিতে না পারিলে পনের বৎসর তক্ ভোগ দখল করিবার পর আবার জমি মালিকের কাছে ফিরিয়া আসিবে'। তা আর আসে নি। কত নাবালকের সম্পত্তি নিয়েছে অন্যায়ভাবে।

সব ফাঁক আর ফাঁকিটাই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে।

চুপ করে বসেছিল বার বার অপদস্থ হয়ে । মিষ্টির কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ধরণী। গর্জন করে,

—অ্যাই মাগী! জিব টেনে ছিঁড়ে দোব।

আমিনবাবু ওদিকে কান দিল না।

চেনম্যান মেপে চলেছে, দুই সরিকানের জমিতে বাটাদাগ দিতে ব্যস্ত।

বেলা বেড়ে চলে।

লোকগুলো ব্যগ্র ব্যাকুল নয়নে চেয়ে আছে—যদি অতীতের পুঞ্জীভূত গলদের কোন সুবিচার এতদিন পরও হয়।

পড়চায় নামপত্তন নেই—দখল করে বসে আছে , স্বপক্ষে কোন কাগজপত্রও নেই।

জীবন একবার ইংরাজিতে বলে ওঠে.

—Possession is the right.

অবনী মুখুয্যে সায় দেয়,—all right, surely.

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

এদের মধ্যে অশোকও দাঁড়িয়ে আছে, চুপ করে সে দেখছে—এতদিন কি ভাবে এতবড় গলদটাকে ওরা স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে এনেছে। গড়ে তুলেছে এতদিনের প্রসাদ সেই চোরাবালির উপর।

পুঞ্জীভূত সেই পাপের প্রাসাদ চুর হয়ে ধ্বসে পড়েছে, ছিটিয়ে পড়ছে তার ইট কাঠ বালি। পচছে ওর মৃতদেহ—চারিদিকে যত ধারাল নখ আর ঠোঁট বের করে বসে আছে শিবাশকুন দল। ঠুকরে খাচ্ছে সেই গলিত দেহ।

জীবনের কথায় পিছন থেকে কে হরিধ্বনি করে ওঠে,—বলো হরি—হরি বোল।

—এ্যাঁও ।

অবনী মুখুয্যে গাঁয়ের মিটিং-এর মত চীৎকার করছে—সাইলেন্স। চুপ কর সব।

জীবন বলে ওঠে,—ব্যাটাদের বাড় দেখেছ ? তুমিও কিছু বলবা না অশোকদা—

বলার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আজ এই চাষী মজুর —কামারপাড়ার সকলেই যেন টের

পেয়ে গেছে—যে মাটির জোরে বাবুরা একদিন চোটপাট চালিয়েছিল—খেতাব পেয়েছিল জমিদারবাবু, সেই মাটিটুকু সরে যাচ্ছে পায়ের নীচ হতে।

আজ ওকেও যেন তারা অনুকম্পা করে কোথায়।

সেই শ্রদ্ধা ভয় মেশানো সমীহটুকুও যেন মুছে গেছে।

পানু দাস এদের থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামের সে যেন একটি নতুন নবজাত সত্তা। ধ্বংসোন্মুখ এই জমিদারী প্রথা—আর একদিকে ওই মজুর ভূমিহারা শ্রেণীর দিন বদল—এ সবের বাইরে সে এক কটি নতুন মানুষ। কারও সঙ্গে তার বিরোধ নেই, দুজনকেই শোষণ করতে পারে সে।

সেটা সে অনুভব করতে শুরু করেছে ক্রমশঃ।

অতীতের সেই দুঃখের দিনগুলো ক্ষীণভাবে মনে পড়ে।

বহু দুঃখ আর অভাবের দিন।

বাপ মারা যাবার পর সামান্য দোকানটুকুও মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায়। ধার বাকি-বিলেত যা পড়েছিল, তার তাগাদা দিয়েও আদায় ওয়াশীল করতে আর পারেনি।

একবেলাও আহার জুটেছে, কোনদিন বা উপবাস দিয়েছে। দেখেছে ছানু আর তার জন্য তার মা কি না করেছে। লোকের বাড়ির চাল ভেজেছে, ধান ভেনেছে পানু সেই দুঃখের মধ্যে মাথা তোলবার চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। সেগুলো আজও ভোলেনি সে।

ধান ওঠে। মাঠে মাঠে ছড়ানো ধান। মুনিষরা ধান কাটতে নামে। পানু প্রথম প্রথম ডালায় করে ঝালবড়া—আলুর চপ বেচতে বেরুতো। পয়সা নেই, মুনিষ মাহিন্দার মুনিবকে লুকিয়ে দাম দিয়েছে ধানের আঁটি। তাই তাড়া বেঁধে মাথায় করে দু-এক ক্রোশ পথ হেঁটে ঘরে ফিরেছে। দিনান্তে খেয়েছে আকণ্ঠ ওই কাঁইজোড়ের জল।

সামান্য পুঁজি নিয়ে চাট্টি খোলা মালসার দোকান দিয়েছে এর থেকেই।

অবনী মুখুয্যে প্রথম দিন দেখেশুনে বলেছিল,

—খেলাপাতির দোকান। তার চেয়ে কোথাও কাজ-টাজ দেখগে বাপু।

কাজ পেলেও করতো পানু, কিন্তু পায়নি। তাই জবাব দেয় মিষ্টি কথায়।

—গন্ধেশ্বরীর টাট গো খুড়োঠাকুর, বেনের ছেলে—এই তো বেশ।

পানু দাসের মুখে যেন সুধাবর্ষণ করে, চড়া কথা কেউ কোন দিন শোনেনি তার মুখ তেকে।

ক্রমশঃ সদর থেকে মালপত্র এনেছে—তারপর আবার মহাজন ধরেছে। ওদিকে ধানকলের ধান যোগাবার ঠিকেও পেয়েছে, যুদ্ধ আর কনট্রোলের বাজারেই ফেঁপে উঠল পানু।

প্রেসিডেন্ট হাকিম তারকরত্নবাবুর সাহায্য না পেলে পানু পানুই থেকে যেত—দাসমশাই আর হত না, তার জন্য অবশ্য তাঁকে দিতে হয়েছে একটা হিস্যা, কিন্তু দিয়ে থুয়েও যা পেয়েছে পানু তাতেই ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে বাড়িঘর কারবারের।

জমিও করেছে বেশ কিছু এই ধানচালের সময়, তারপর অন্য ভাবেও অর্জিত জমি-জায়গা যা করেছে তাও কম নয়।

পানু দাস কাজ কারবারের ব্যাপারে নিজেই আসে। ছানুকে দিয়ে বিশ্বাস নেই—লেখাপড়াও শেখেনি। তাছাড়া গোঁয়ার লোক। যাকে তাকে যা তা বলে, ফাঁক ফিকিরে কেউ ঠকিয়ে নিলেও জানতে পারবে না। তা দাগ-পড়চার ব্যাপারে নিজেই এসেছে। স্নান সেরে তিলক ফোঁটা কেটে ছাতি বগলে এসে পড়ে পানু, বগলে একতাড়া কাগজ। আমিনবাবুর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কত গরিব নিরীহ একটি প্রাণী।

গড়বড় দেখলেই কাকুতি মিনতি করে পানু দাস।

—মারা যাবো বাবু, গরিব লোক—ল্যায্য বিচার করে দাগনম্বর পালটান, এই যে কাগজ হুজুর !

ওদিকে বসে আছে তার খুড়ো লোচন দাস।

খুড়ো-ভাইপোর প্যাঁচওয়ালী সরিকান সম্পত্তি।

লোচন দাসের বয়স হয়েছে—তবু কঠিন শক্ত সমর্থ দীর্ঘ দেহ। এককালে হেঁটেই বাঁকুড়া-বর্ধমান যাতায়াত করেছে। আজ জোর কমে এসেছে কিন্তু ভাইপোর শ্রীবৃদ্ধি হিংসাতেই লোচন বোধহয় এখনও মহীরুহের মত বলশালী হয়ে টিকে আছে । বিশ্বাস করে, সেও ভাগ্য ফেরাবে ।

আলের মাথায় চোখবুজে ঝিমুচ্ছিল লোচন। হঠাৎ পানুর গলা শুনে কণ্ঠী নেড়ে এগিয়ে এসে দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত বলে,

—আজ্ঞে আমারও একের তিন অংশ উথে আছে। ভরত দাস দিগরের তিন পুত্র—আমি কনিষ্ঠ।

আমিনবাবু থামিয়ে দেন ভরতের পুত্ররত্নকে।

—পানুবাবু অন্য সম্পত্তির কথা হচ্ছে দাসমশাই। সরিকান সম্পত্তি নয়।

লোচন দাস অবনীকে প্রকাশ্যেই বলে,—বুঝলেন গো বাবু, ভাইপো আমায় বেতক্ক হলেই পথে বসিয়ে দেবে।

পানু দাস কথা বলে না, কাকার দিকে একবার চাইল মাত্র।

লোচন তখনও বলে চলেছে,—হ্যাঁগো, তোমার খুড়ীও ওই কথা বলে, শুধিয়ো।

পানু দাস কাজে মন দিয়েছে। ফর্দ মিলিয়ে পড়চার নম্বর দেখছে গম্ভীরভাবে। পঁচাত্তর বিঘে করে জমি—দুভায়ের নামে প্রায় শ'দেড়েক বিঘে জমি রেখেছে। তারই জন্য বোধহয় একটু গম্ভীর। কথাবার্তা কম বলে।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

এই সমবেত জনতার মধ্যে পানুদাসই আজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, ও যেন টের পেয়েছে এখানের প্রথম এবং প্রধান পুরুষ সেই—অন্ততঃ ভবিষ্যতে তা হবার স্বপ্নও দেখেছে। পানু অশোককে বলে,

—দরখাস্তটা একটু দেখে দিন তো ছোটবাবু।

আমিনবাবুকে দেবার আগে অশোককেই দেখিয়ে নেয়।

অশোকের দিকে এগিয়ে দেয় পানু দরখাস্তটা। ফকির ভটচাযের হ্যান্ডনোটের বিনিময়ে দুকাচি জমি দেবার কথা, এতদিন দখল কায়েম করতে চায়।

—মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এক বিঘা জমি ?

অশোক অবাক হয়ে যায়।

পানু দাস বলে ওঠে,

—সুদ কোনমতেই আসলের বেশি হবে না পানু।

নারাণ ঠাকুর আখের ক্ষেতে মেড়া বাঁধছিল, সেও কাজ সেরে এসে জুটেছে। পরনে আট হাতি কাচা। জমির ব্যাপারটা সেও জানে, তাই হাউমাউ করে ওঠে। দুহাতের আঙ্গুলের মধ্যে যতটা গোনা যায় তাই গুনে, তারপর খেই হারিয়ে চীৎকার করছে নারাণ, অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার।

চোখের সামনে দেখে অমন জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে—আমিনবাবু কাজ বন্ধ করে ওর দিকে কি যেন মমতাভরা চোখে চেয়ে থাকে। নারাণ তখনও আর্তনাদ করছে।

দরখাস্তখানা পড়ে ওকে বলে ওঠে আমিনবাবু,

—একটা আর্জি তুমিও পেশ করো।

নারাণ ওর দিকে চেয়ে থাকে, মানুষের ভাষা বোঝে না সে। গঙ্গাঠাকরুণও এসে দাঁড়িয়েছে অশোকই একটা কাগজে ওর হয়ে দরখাস্ত লিখে দেয়, ওর নারাজিনামা দাখিল হয়ে গেল

পানু দাস চটে ওঠে। আমিনবাবুকে প্রশ্ন করে,

—তাহলে দাগ নম্বরে নাম বসাবেন না ?

—এখন সম্ভব নয়। জবাব দেয় আমিন।

পানু দাস গম্ভীর হয়ে উঠেছে, সমবেত জনতাও যেন নারাণের দিকে। অজাতশত্রু একটি মানুষ।

অতুল কামার বলে ওঠে,—বামুনকে মেরো না না দাস মশায়। কে আছে তুমার ?

—তাই বলে কে ছেড়ে দেবে ?

আমিনবাবু জবাব দেয়,—আমি ওদের নামই বহাল রাখলাম দাসমশাই, আপনি তিন ধারায় কানুনগোর কাছে যা হয় বলবেন।

পানু দাস চুপ করে কি ভাবছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন অশোকবাবুই গোলমাল করে দিয়েছে। পানু একটু চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে অশোককে,

—কাজটা কি ভাল হ'ল ছোটবাবু—অশোক জবাব দেয় না,

—আইন তো আজ্ঞে বামুনের শালগ্রাম শিলা, একাৎ ওকাৎ করতে আর লাগে কতক্ষণ? শুধু শুধুই ঝামেলাটা বাড়ালেন।

পানু দসের কথায় একটা অবজ্ঞার সুর রয়েছে। অশোক চটে ওঠে। তবু সামলে নিয়ে জবাব দেয়,

—তাই করো।

তবু ওর কথায় অশোক একটু বিস্মিত হয়েছে। এরা সামান্য জমি পাবার আনন্দে আজ বিভোর হয়ে উঠেছে—কিন্তু পানুর মনের গভীরে তার চেয়ে অন্য কোন বড় নেশার স্বাদ। সে আইনেরও মাথায় উঠতে চায়।

পয়সার জোরে সবকিছু বিকৃত করে দিতে চায় সে। ন্যায়বিচার, কল্যাণময় চিন্তা, মনুষ্যত্ব—সবকিছুকে সে কিনতে চায়।

এতদিন তারকবাবুর দল যে স্বপ্ন দেখেনি, আজ থেকেই ওই নবজাতক শ্রেণী সেই প্রতিষ্ঠা আর সর্বনাশের স্বপ্ন দেখছে। অশোক পানুর মধ্যে তারই সন্ধান পেয়ে অবাক হয়েছে।

বেলা পড়ে আসে। গ্রীষ্মের আমেজ এসেছে বাতাসে। মহুয়া গাছগুলোর পাতা ঝরে গিয়ে বৃন্তেবৃন্তে এসেছে ফলের স্তবক ; কপিশ বন্ধুর প্রান্তরে নেমেছে দিনের শেষ আলো।

গরুগুলো ফিরছে ঘরে। সারাদিন ঘাসশূন্য তামাটে মাঠে বনের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, জোড়ের ধারে সঞ্চিত জলের দুপাশে তবু একটু সবুজের নিশানা মেলে, সেইখানেই ঢুকে দু'এক গাছি ঘাস খুঁটে খেয়ে জলের ধারে ছায়ায় দাঁড়িয়ে, তারা গ্রামে ফেরে দিনান্তে।

ধুলো আর সূর্যাস্তের শেষ আলোয় রাঙ্গা হয়ে ওঠে আকাশ। গরুগুলোর ডাক শোনা যায়।

কেমন শান্ত একটি পল্লীজীবনের স্বপ্নছবি।

আমিনবাবু বাইরের লোক। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে তাকে। এখানেও এসে আস্তানা গেড়েছে। থাকবার বাড়তি ঘর গ্রামে কারো বিশেষ নেই।

তারকবাবুর খামারবাড়ির ওদিকেই একটা ঘরে তারা আস্তানা পেতেছে। গ্রামের শেষ সীমা। কেমন যেন স্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাইরের ওই স্তব্ধ দিগন্তের পানে চেয়ে থাকে।

রাতের অন্ধকারেও তার ছুটি নেই। সারাদিন মাঠে ঘোরার পর ক্যাম্পে ফিরে চেনম্যান দুজনকে নিয়ে খসড়া খাতা থেকে পাকা খাতায় নতুন নাম, দাগনম্বর লিখতে হয়। ওদিকে চাকরটা রান্নার আয়োজন করছে।

অন্ধকার অজ পাড়াগাঁ। শহর থেকে দূরে। ওদিকে দুর্গাপুরের বনঢাকা ইষ্টিশান, ছোট বাজার ও দূরের পথ, মধ্যে ধূ ধূ দামোদর, বর্ষায় সফেন বন্যায় দুর্গম ক'রে তোলে তাকে। গ্রীষ্মে ওর দাবদাহে নদীতে নামা যায় না।

সকাল সকাল পারলো তো নদী পার হয়ে গেল লোকজন—না হয় সেই বৈকাল সন্ধ্যার আগেই পার হতে হবে সেই দুস্তর নদী। সন্ধ্যার পর চলাচল বন্ধ, কেউ নামলে ডাকাত ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতেই শেষ হয়ে যাবে, মানা বনে ছিঁড়ে খাবে তার মৃতদহ নেকড়ের দল।

পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চল।

তবু চাকরির খাতিরে আসতে হয়েছে তাদের। রাত নেমে আসে। বনের বাইরের প্রান্তরে বাতাস উড়ে বেড়ায় ঝরাপাতার শব্দ—যেন দলবেঁধে কোন ঘোড়সওয়ারবাহিনী আসছে জয়যাত্রায়। দু'একটা শিয়াল ডাকে—ডাকে বনতিতির।

আবার সব চুপচাপ।

হঠাৎ কাকে দেখে মুখ তুলে চাইল আমিনবাবু।

একটা মস্ত মাছ, নতুন এঁচড়, একটা বড় সিদে—অনেক কিছু নিয়ে এসেছে ছানু দাস।

—গাছের ফল পাড়লুম, মাছ ধরা হয়েছিল। গাঁয়ে আইচেন—কি আছে ইখানে খাবার ? কই রে পদা দিয়ে যা।

চেনম্যান রমেশ ইতিমধ্যে এসে মাছটাকে নাড়া-চাড়া করতে থাকে। পদ্মাপারের লোক, ওটার উপর তার লোভ জন্মগত।

—বাঃ, বেশ খাসা মাছ আনছেন ত মুশয়।

ছানুদাসের পিছনেই রাতের অন্ধকারে তার চোখদুটো যেন জ্বলছে।

দেখছিল সাগ্রহে ব্যাপারটা।

ছানু চলে গেল।

রাত হয়ে আসে। পানু দাস আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে আসে ক্যাম্পের দিকে। না, লোকজন কেউ কোথাও নেই।

ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নোটগুলো রয়েছে, মনে মনে হিসাব করতে থাকে, এ বাবদ কত দেওয়া যাবে। আঁধারে দিতেই এসেছে সে !

সবাইকে দিয়ে থুয়েই সে নিজে খেতে চায়। ইতিপূর্বে তারকবাবুকেও দিয়েছে—বঞ্চিত করে ব্যবসা করে না পানু দাস।

পায়ে পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল পানু দাস ধূর্ত শিয়ালের মত।

চুপ করে বসে আছে অশোক।

পুরোনো বাড়িটার মেরামত অভাবে চূণ বালি খসে পড়ছে। রাতের আঁধারে যেন নখদন্ত বিস্তার করে প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে কোন মৃত অতীত। ধ্বসে পড়া পাঁচিলও মেরামত করা হয়নি।

সামনেই বৈঠকখানার বারান্দায় একটা পাল্কি পড়ে আছে। রং-চটা বিবর্ণ সাজহীন ; অতীতের প্রতাপ আর হুঙ্কার স্তব্ধ হয়ে গেছে ওর।

দাওয়ায় একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে। সামনের ছোট বাগানটুকু এখনও নিজের হাতে টিকিয়ে রেখেছে অশোক—তাই গোলাপ রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো সবুজ হয়ে উঠেছে—ফুটেছে বেলফুলের দল। রাতের আঁধারে তীব্র সৌরভময় এতটুকু শ্বেত অস্তিত্ব মাত্র।

আজ যেন নতুন একটা সত্য উপলব্ধি করেছে সে মনে মনে। আগামী দিনের একটি নতুন সমাজব্যবস্থা এবং তারই মাঝে নবজাতক একটি নবগোত্রের কথা।

বাতাসের মধ্যে কোথাও কোন শূন্যস্থান থাকে না, বাতাস তাকে পূর্ণ করার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসে, ফলে ঘূর্ণিঝড় ওঠে। আজ সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা নিঃশেষ হয়ে আসছে—সেই স্থান পূর্ণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে অনেকেই। তার মধ্যে যার অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোর বেশি সেই-ই টিকে থাকবে, মাথা তুলবে এই সমাজেব সকলকে ছাড়িয়ে ; এর অন্ধকার অতলে চালিত করবে শোষণ করবার জন্য হাজারো শিকড় মূল।

তারাই সবুজ সতেজ হয়ে উঠবে।

পানু দাসের কথায় আজ সেই সবের আভাস প্রত্যক্ষ করেছে অশোক। বেদনাময় সেই অনুভূতি।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল।

এখানে যে ওকে দেখবে কল্পনা করেনি অশোক। প্রীতির হাতে কয়েকখানা বই। প্রীতিও ওকে দেখে একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

—তুমি ! এসময়ে ? এসো।

প্রীতি এগিয়ে আসে, আজ সে যেন বিচিত্র একটি নারী, দুচোখের চাহনি মেলে চেয়ে থাকে অশোকের দিকে।

মনে কি আশার সুর।

এগিয়ে এসে সহজ ভাবে বলে ওঠে প্রীতি,

—নিয়েছিলাম সেদিন, ফিরিয়ে দিতে এলাম। চুপচাপ বসে আছো—শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?

প্রীতির কথায় জবাব দিল না অশোক ; কি যেন ভাবছে। ওর কণ্ঠে সামান্য উৎকণ্ঠার সুরও তার মনকে স্পর্শ করেছে। একটু হেসে জবাব দেয়,

—না। সারাদিন মাঠে রোদে রোদে ঘুরে ক্লান্ত বোধ করছি।

—ও, সম্পত্তি আগলাচ্ছিলে বুঝি। বাঁচা গেছে বাব্বাঃ—ও দুর্ভাবনা আমার নেই। অন্ততঃ একটা দায় থেকে বেঁচেছি।

—এবার আমরাও মুক্ত হবো।

—অর্থাৎ !

প্রীতি যেন একটু চমকে ওঠে, অজানতেই কেঁপে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। মনের কোণে আশার সুর বাজে।

অশোক আজ সত্যই ক্লান্ত, প্রীতির কথাগুলো ইতিপূর্বে তত গভীরভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করেনি। আজ মনে হয় সত্যিই এবার সামনের কথা ভাবা দরকার, আগামী ভবিষ্যতের কথা।

—বসো !

প্রীতি বসলো।

সন্ধ্যা নেমেছে। নিস্তব্ধ চারিদিক। বাতাসে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ।

অশোক চুপ করে কি ভাবছে। প্রীতির মনেও কোন নিবিড় একটি মধু-স্বপ্নের সংক্রমণ। আবছা তারার আলোয় অশোকের দিকে চেয়ে থাকে।

—কি ভাবছো এতো ?

অশোক জবাব দেয়,

—তোমার কথাই হয়তো সত্যি প্রীতি !

প্রীতির দুচোখ নীরব একটু স্বীকৃতি পাবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যৌবনমদির দেহে ওর কোন নীরব কামনার প্রকাশ। তারই আবেগ দুচোখের চাহনিতে।

খোঁপায় গুঁজেছে ওর বাগানের বেলকুঁড়ি—কালো চুলে সাদা কুঁড়িগুলো যেন সজীব প্রাণময় হয়ে উঠেছে। প্রীতি বলে ওঠে,

—কেন ?

—একটা কিছু করা দরকার।

হাসছে প্রীতি। অন্তরের পুঞ্জীভূত আবেগ চেপে সহজ হবার চেষ্টা করে। কোথায় যেন তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে অশোক। হবে তা জানতো প্রীতি, তাই জিজ্ঞাসা করে,—কি করবে ?

অশোক ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,

—ঠিক জানি না। তবে একটা কিছু করতে হবে।

প্রীতি বলে ওঠে,

—জমিদারী আর জমাদারী যাই বল, তা তো গেল, বসে বসে খেতে গেলে রাজার সম্পত্তিও ফুরিয়ে যায়। শুনছি দুর্গাপুরে কিসব প্রোজেক্ট হচ্ছে—এই বেলা দেখ না, সেখানেও ভাল একটা চান্স পাবে।

জবাব দিল না অশোক। সেও খবর পেয়েছে দুর্গাপুরের নানা কথা ; দামোদরের ব্যারেজ এর কাজ সুরু হয়েছে। দলে দলে নানা স্থান থেকে লোকজন আসছে। সারা বাংলা দেশ কেন, বাংলার বাইরের মানুষের যে করবার কিছুই নাই এইটাই বুঝেছে—নাহলে ভাগাড়ে গরু পড়লে শকুনি লাগার মত পালে পালে তারা এসে ছেয়ে ফেলতো না চারিদিক। তাদেরই দলে মিশে একটি সাধারণ মানুষ হতে কেমন যেন মন সায় দেয় না অশোকের।

মনে হয় তার কি এক নিবিড় পরাজয়। ওই ভিড়ে মিশে কষ্টে ক্লেশে খুঁটে খেয়ে দিন-যাপন করা—আর বংশ বৃদ্ধি করে জানোয়ারের মত টিকে থাকার কোন সার্থকতাই নেই তার কাছে।

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে,

—ওখানেই তো তোমাদের বাড়ি—আসল জমিদারী। বন টিলাও অনেক আছে ?

মাথা নাড়ে অশোক—হ্যাঁ। তাও সব চলে যাবে।

—একটা দাবি নিশ্চয়ই সেখানে আছে। চাকরিও পেয়ে যাবে।

অশোক জবাব দেয়,

—অনেক কিছুর উপরই দাবি থাকা সত্ত্বেও দাবি জানাই নি কোনদিন। চাকরির উপর দাবিটুকুও নাই বা করলাম।

প্রীতি কি যেন নীরব বেদনাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে। ওর মনের গভীরে কি যেন একটা বেদনা জমা আছে তাই হয় তো ইচ্ছে করেই সেই জমজমাট বাড়ি—সেই প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার-বংশের পরিবেশ থেকে সরে এসে এই সামান্য বিষয় নিয়েই তৃপ্ত রয়েছে।

হয় ও এড়িয়ে থাকতে চায়, কোন দুলর্বচেতা একটি মানুষ, সংঘাত—উচ্চাশার তাড়নাকে ভয় করে। না হয় ওই প্রতিষ্ঠা আর প্রতাপকে সহ্য করতে পারে না—মনে মনে ঘৃণা করে, তাই সরেই এসেছে।

ঠিক বুঝতে পারে না অশোককে, কেথায় একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত মনে হয়।

শহরের অনেককেই দেখেছে প্রীতি। শহরের ধানকল, করাত কলের মালিক নিবারণবাবুর ছেলে প্রশান্তকেও দেখেছে—কেমন যেন নেশা-লাগানো জ্বালাময় দৃষ্টি।

সব কিছুতেহ্ তার যে অধিকার আছে, এইটাই আগে থেকেই জেনে নিয়ে পা ফেলে প্রশান্ত।

সেও আশা রাখে সূতাকল বসাবে, দরকার হয় বন অঞ্চলে কাঠ ধানের কারবারও চালাবে।

একটা জিপ কিংবা মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে ফেরে শহরে। তার দাপট আর যন্ত্রদানবের ঐ গর্জনে সে সবকিছুই ছাপিয়ে ঘোষণা করে তার উদগ্র অস্তিত্ব।

প্রীতির মনে রেখাপাত করেছে সেও গভীরভাবে। তার তুলনয় অশোক যেন বিজলীবাতির পাশে হ্যারিকেনের লালভ শিষকাঁপা ম্লান আলো। তবু প্রীতি যেন বার বার ফিরে এসেছে অশোকের কাছে।

প্রীতি বলে ওঠে,—সবকিছুর উপরে দাবি জানাতে হয়, নাহলে ন্যায্য প্রাপ্যটুকুও এখন কেউ দেবে না।

উঠে পড়ে প্রীতি। একটু উত্তেজিতই হয়েছে সে—কেমন যেন বার বার একটা পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকে ফিরে যাচ্ছে সে ব্যর্থ হয়ে।

—প্রীতি !

হঠাৎ অশোকের ডাকে থমকে দাঁড়াল সে।

অশোকের মুখে পড়েছে একটা তারার একটু আলোর আভা ওর দুচোখে কি নীরব কামনার আগুন।

এ যে নতুন কোন মানুষ।

প্রীতি এই মানুষটিকেই জাগাতে চেয়েছিল।

অশোকের মনে হয়েছে তার জীবন নতুন করে বাঁচার অবকাশ আছে।

এদিকের সব পিছুটানই কেটে গেছে। কিই বা করবে সে এখানে!

শহরের জীবনেই তাকে ফিরে যেতে হবে। আজ প্রশ্ন করে অশোক,—বাইরে ফিরে গেলে তুমি খুশি হবে প্রীতি ?

প্রীতি ওর কাছে এগিয়ে এসেছে, ও যেন অশোকের কাছে আজ একটি কামনার স্বপ্নমদির একটু আহ্বান।

ওর হাতখানা প্রীতির হাতে, ওর সারাদেহের তন্ত্রীতে কি যেন একটি সাড়া, অভূতপূর্ব একটি উন্মাদনা জাগে অশোকের সারা মনে, একটি কবোষ্ণ স্বপ্নের স্বাদু উষ্ণতায় সে হারিয়ে যেতে চায়।

প্রীতি সাড়া দেয়।

—তুমি বড় হবে। নতুন করে আবার বাঁচবে। এখানের এই অন্ধকারে তোমাকে কেমন হারিয়ে ফেলি অশোক।

হু হু বইছে রাতের বাতাস, কোথায় গোলক চাঁপা ফুল ফুটেছে, রাতের বাতাস তার সৌরভে আমন্থর।

অশোক যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

সারামনে তার একটি আলোক-স্বপ্ন। প্রীতি বলে চলেছে,—এখানকার পালা চুকিয়ে তাই চল।

অশোকও কি একটা স্বপ্ন দেখে।

ওর মুখে চোখে কপালে পড়ছে প্রীতির উষ্ণ নিঃশ্বাস। নিজেকে সংযত করে নেয় অশোক।

এ কি যেন তার ক্ষণিকের উন্মাদনা, নিজের মনের অতলে অন্য কোন দ্বিতীয় সত্তার এই আবির্ভাবে একটু চমকে উঠেছে সে।

এমনি তারার আলো-ঢাকা রাত্রে আর একজন দিঘির ধারের সরু পথটা দিয়ে এগিয়ে আসছে এ বাড়ির দিকে।

কদম-বৌ অনেকদিন পর আজ এইদিকে আসছে, সারা মনে একটা নীরব জ্বালা।

দেখেছে ভুবন তাকে আজ মনে মনে ঘৃণা করে, একটা মিথ্যা কলঙ্কের কালিতে কদমের মুখ যেন কালো হয়ে উঠেছে, অশোকবাবুও তাকে ভুল বুঝেছে। অনেকদিনই যায়নি ওই বাড়ির দিকে।

কদম-বৌ কি একটা খেয়াল বশেই এইদিকে এসেছে আজ। আঁধার-ঢাকা বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসে।

অনেক আশা নিয়েই এসেছে কদম।

কার কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয় !

মেয়ের গলাই । ওদের দুজনকে ছায়া অন্ধকারে দেখে দরজার কাছে হঠাৎ সেই মুহূর্তেই থমকে দাঁড়িয়েছিল কদম-বৌ।

কদিন অশোক ওদিকে যেতে পারে নি। মাঠে মাঠেই কাটে। নিজের হাতে কদম-বৌ তৈরি করেছে খেজুর গুড়ের সন্দেশ; এনেছিল অশোকের জন্যই।

হঠাৎ প্রীতি আর অশোককে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চকিতের মধ্যে সরে গেল বাইরে।

কেমন চমকে উঠেছে কদম-বৌ। বের হয়ে এসে হন হনিয়ে বাঁধের পাড় ধরে চলতে থাকে কে যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে। সারা মনে কদমের একটা নীরব জ্বালা।

হু হু বাতাস বইছে।

খানিকটা পথ এসে দাঁড়াল কদম-বৌ। অশোকের জন্য আনা মিষ্টিটা চটকে কি ভেবে বাঁধের জলেই ফেলে দিল পাতা সমেত। রাগই হয়েছে, তবু কদম বিস্মিত হয়।

—কামার বৌ !

চমকে উঠে ওর দিকে চাইল কদম ! কেমন যেন মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে নিবিড় একটা উত্তেজনায়, একটু সামলে কদম বলে ওঠে,—ওঃ, তুমি প্রীতিদিদি ? ভাবলাম আর কেউ বা।

—হ্যাঁ। কোথা গিয়েছিলে ?

কদম সহজ হবার চেষ্টা করে,—কালীতলায় পেন্নাম করতে। তুমি ?

প্রীতি হাসতে হাসতে জবাব দেয়,—বইগুলো দিতে গিয়েছিলাম অশোকবাবুর ওখানে।

—ও!

বইপত্র বোঝে না কদম। প্রীতি পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কদম। জীবনের অনেকটাই তার অজানা, এমনি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মূর্খ একটি নারী—ব্যর্থ জীবনে তার পূর্ণতার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আঁধারে জ্বলছে আলো, তারই প্রতিবিম্ব কাঁপছে দিঘির নীল জলে—আলো-কাঁপা আঁধারে।

সারা অন্ধকার মনের অতলে শুধু ভালবাসার অন্ধ আলো, ব্যর্থ বঞ্চিত বেদনায় শিউরে উঠছে বার বার। কদম-বৌ-এর দুচোখে জল নামে। কি জ্বালা—কি পাপ ! তবু এ জল বাধা মানে না। নিজের অন্তরের এই নতুন পরিচয়ে সে শিউরে উঠেছে।

এ কি সে হিংসাপরায়ণ নারী!

অশোককে আজ সে যেন অন্য চোখে দেখে, নইলে প্রীতির উপর এ রাগের কারণ কি ?

ছিঃ ! নীরব লজ্জায় মন ভরে ওঠে তার ।

রাত্রি বেড়ে চলে। নিশুতি অন্ধকার।

পাতায় পাতায় কেমন একটা কানাকানি। বাতাসে উঠছে ঘুমহীন ফুলের জাগর সৌরভ। অশোক কি ভাবছে।

এ যেন একটি সন্ধ্যার অন্ধকারে আজ নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে কি এক অতৃপ্তির মধ্যে।

চারিদিক থেকে একটা গুমোট পরিবেশ দম বন্ধ করে তুলেছে। এতদিন এসব ভাবেনি, ভবিষ্যতের কথা—কোন সার্থক স্বপ্নের ইঙ্গিত।

প্রীতির দুচোখের চাহনিতে আজ তেমনি পথ-ভোলান কোন পথের ইশারা পেয়েছে, পেয়েছে দূর প্রান্ত পারে কোন একটি সার্থক স্বপ্নজগতের সন্ধান। মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অশোকের।

ওর দুচোখের চাহনিতে কেমন দিঘির জলের অতল রহস্য, আবছা আলো পড়েছে কালো চুলে—চোখের কোলে টেনেছে সুরমার ক্ষীণ আভা—তারই মাঝে সুন্দর মুখখানা কেমন যেন একটা পদ্মের লাবণ্য আর সুষমা নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। নিটোল মোমমাজা বাহুমূলে দুটো বালা—একটি স্বর্ণবেষ্ঠনীর পাকে সুন্দর সুডৌল রূপের আদলটিকে সীমায়িত করেছে শান্ত মাধুর্যে।

কোন অন্য জগতের লোক—রাতের তারাকিনী অন্ধকারে ওরা আসে—কাজ ভোলাতে, পথ ভোলাতে।

অশোক জীবনে যেন কোন নতুন সদ্যজাগর বিচিত্র অভিজ্ঞতার আবির্ভাবে শিউরে উঠেছে।

সেই সঙ্গে দেখেছে অশোক তার আগামী দিনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। বসে থাকার কথা নয় —কাজ করার কথাই ভাবে এবং অর্থ অর্জনের কথাও।

এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা কোন দিকে চলে যাচ্ছে, আসছে নতুন দিন। এদিন—এই পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাকেও ভাসতে হবে, আশ্রয় খুঁজতে হবে নতুন কোন সবুজ পলিচরের, যদি সেখানে ঠাঁই মেলে—মেলে নতুন কোন প্রতিষ্ঠা।

আঁধার গাছ-গাছালির বুকে পড়েছে তীব্র একঝলক আলো, আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে আসছে আলোর একটা রেখা। নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গাড়ির গুরু গুরু শব্দে।

ঘুমন্ত পাখ-পাখালির ঘুম ভেঙ্গে যায়—ডানা ঝটপট করে জেগে ওঠে তারা।

কলরব তোলে পাখিগুলো ওই শব্দের আতঙ্কে।

নীরব নিস্তব্ধ পল্লীর অন্তরের নিবিড় শান্তিভঙ্গ করে কোন কঠিন বাস্তব যেন জয়ধ্বনি ঘোষণা করে প্রবেশ করছে। অশোক কান করে শুনছে গাড়ির শব্দটা। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় জিপটা এগিয়ে আসছে। ডাঙ্গা ছেড়ে গ্রামের পথে নামল জিপটা—রাস্তার ধারে ডোম পাড়ায় ঝুপড়িতে ঘুমন্ত দু-চারজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়—ওরা চোখ কচলে অবাক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নবাগত ওই মূর্তিমান বিজয়ীর দিকে।

গাড়িটা টালবেটাল খেয়ে এগিয়ে চলেছে ছায়ান্ধকার-ঢাকা পথ দিয়ে—উছলে উঠেছে সেই অন্ধকার গাড়ির ওই দু'চোখের তীব্র ঝলকানিতে।

অশোক ওকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়েছে।

খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরনে, ঠাঁই ঠাঁই তেলকালির দাগ লাগা, পাইপ টানছে। তামাকের পোড়া বিশ্রী গন্ধে ওর বাগানের ফুলের সৌরভের সব মুছে গেছে, উপে গেছে বাতাসে উঠছে পেট্রল আর তামাকের পোড়ার চিমসে গন্ধ।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকে। বয়সও তেমন কিছু বেশি নয়। এরই মধ্যে যেন অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে সে। চোখেমুখে একটা কাঠিন্যের ছাপ।

ওর কথাগুলো শুনে চলেছে অশোক।

আগামী বাতাসে উঠেছে ঝড়ের সঙ্কেত ; দূর দিগন্তে কালো মেঘসীমা যেন অতর্কিত ধুলোয় লাল হয়ে উঠেছে। ভেসে আসছে সোঁ সোঁ গর্জনধ্বনি। কোন আগামী মহাকালের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সূচিত হতে চলেছে।

তেমনি এক মহাযুগ আগত প্রায়।

তার আগে হতেই ওরা বের হয়ে পড়েছে, এ যুগের নন্দীভৃঙ্গীর দল। আঁধার রাতে বন ভেদ করে জিপ চালিয়ে এসেছে ওই নতুন ঠিকাদার ভদ্রলোক—দামোদরের বাঁধের পাথর সাপ্লাই-এর কনট্রাক্ট নিয়েছে। পাথর চাই, কালো জমাট মেটামরফিক রক। স্যান্ডস্টোন বা বেলে পাথর হলে চলবে না। নদীর বাঁধের কাজ—ফ্যাক্টরির ভিত্তি স্থাপন করা হবে, চাই কালো মহিষে পাথর—বেসাল নিদেন মেটামরফিক রক।

তার সন্ধানও করেছে ওরা, মামড়া মালিয়াড়ার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী জঙ্গলে তার দীর্ঘ স্তর খুঁজে বের করেছে। কিন্তু দুর্গম গহন বন—এদিকে দামাদর নদ। অশোক বলে,

—পাথর নেবেন, রাস্তা কই ?

অশোকের কথায় হাসে ভদ্রলোক।

—তাতে কি। রাস্তা বানিয়ে নোব, ট্রাক যাবার রাস্তা। সে সব খরচ আমাদের। আপনি শুধু বেঘে হিসাবে রয়্যালটি নেবেন—অবশ্য যোগ্য রয়্যালটিই আমি দোব।

বিস্তীর্ণ বন—পার্বত্যভূমি। কোন আয়ই বিশেষ হয় না ওখান থেকে। উর্বর মাটিও নেই সেখানে যে বড় শাল গাছ হবে—সবই ঝুপড়ি বন। অশোক দু একবার গেছল সেখানে। টিলার অনেক নীচে দামোদর বয়ে টলেছে। যেদিকে চোখ যায়, জিরি শালবন আর কালো কালো পাথর।

আজ সেই বন্ধ্যা প্রস্তর স্তূপই তার সামনে এনেছে অযাচিতভাবে বেশ কয়েক হাজার টাকার প্রাপ্তিযোগ। ভদ্রলোক বলে চলেছে,

—অবশ্য আরও কেউ যে এ প্রস্তাব নিয়ে আসবে না তা নয় ; তবে আমি যা দর দিচ্ছি, এ দর আর কেউ দিতে পারবে না।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন নির্লজ্জ প্রলোভন না দর কষে বেসাতি করা, ঠিক বুঝতে পারে না অশোক।

ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভদ্রলোক ফোলিও ব্যাগ থেকে ফস করে বের করে টাইপ করা কাগজপত্র, সেই সঙ্গে একটা বার করে চেক বই। দামী পার্কার ফিফটি-ওয়ান কলমের সোনার ঢাকনাটা আবছা আলোয় ঝকমক করে।

ওর চারপাশে যেন তেমনি একটা চকমকে পালিশ ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক বলে,

—কিছু অগ্রিম নিয়ে আজ যদি ওটা সই করে দেন আমি কাজে হাত দিতে পারি।

অশোক কি ভাবছে।

আজ সন্ধ্যা, সন্ধ্যা কেন, অতীতের কিছুদিন থেকেই দেখে আসছে সে একটা পরিবর্তন। অন্ধকার পাড়াগেঁয়ের মধ্যেও সেই ঝড় এসে বেজেছে। মরচে পড়া চাকাটা বহুকাল পরে যেন নাড়াচাড়া পেয়ে একটা অন্তিম আর্তনাদ তুলেছে আকাশে বাতাসে।

নড়ছে। ধীরে ধীরে নড়ছে সেটা।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে প্রীতিকে। একটি মধুর অজানা স্বপ্নের মোহ তাকে যেন ঘিরে আছে। ব দুঃখ বিপদের মাঝে ও এনে দেবে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন। ঘরের নিশানা আনে, যে ঘর নিঃশেষে লুটিয়ে পড়েছে—তাকে আবার নতুন করে গড়বার আশ্বাস আনে অশোকের মনে।

—দিন !

কাগজগুলোয় চোখ বোলাতে থাকে অশোক।

ভদ্রলোক তখনও বলে চলেছে,

—ওটা একটা ফর্মাল ব্যাপার মাত্র। টাকাটা আপনি কোআর্টার্লি পাবেন—প্রথম অগ্রিম বাবদ এবং সেলামী বাবদ হাজার দশেক টাকা দিই ?

জমিদারী চলে যাবার আগেই পাকাপাকি ভাবে বন্দোবস্ত করে দেবে অশোক। মোটা টাকাটা কেনই বা হারাবে — তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

সই করে দিল অশোক।

রাত নেমেছে। কত রাত্রি জানে না। ভদ্রলোক বের হয়ে গেছে অনেক আগেই। বাঁকুড়া শহরে ফিরতে হবে তাকে।

অশোক বলেছিল,—এই রাত্রে !

হাসে ভদ্রলোক—তাতে কি ! একটু গিয়েই বড় রাস্তায় উঠবো—তারপর তো সোজা বাঁকুড়া—কোশ্চেন অব ফিফ্‌টি মিনিটস্‌। থ্যাঙ্ক উ।

ওরা সময়ের হিসাব করে মিনিট ধরে।

চলে গেছে ভদ্রলোক।

অশোক কনট্রাক্ট ফরমে ভদ্রলোকের নামটা দেখে—প্রশান্ত মজুমদার।

নামটা কেমন চেনা চেনা ঠেকে। কোথায় যেন শুনেছে ।

হঠাৎ মনে পড়ে প্রীতির কাছেই যেন শুনেছে ওর অনেক কথা। হয়তো সেই ভদ্রলোকই, না অন্য কোন জন কে জানে!

রাত নেমেছে। আবার নিস্তব্ধ তন্দ্রা ভরা রাত্রি। আঁধারে সব যেন হারিয়ে গেছে। মুছে গেছে গ্রামসীমা। কি নীরব বেদনায় তারাগুলো জ্বলছে।

শীতের পরেই আসছে এ মাটিতে গ্রীষ্মের দাবদাহ । বসন্তের ঠাঁই এখানে সীমিত। বনে বনে আসে তার রূপবদলের পালা। শালবন পরে নতুন সবুজ বাস—মহুয়াগাছের ঝরাপাতা ফুলের মাদকস্বপ্ন শেষ হয়ে না হতেই আসে সবুজ পত্রসম্ভার—পলাশ ফুলের রক্তরাগ গ্রীষ্মের শুকনো উত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরে পড়ে।

বাতাসে ফাটতে থাকে শিমুল ফলের অন্তরদেশ—হু হু হাওয়ায় নীল আকাশে ভেসে চলে সাদা তুলোর পুঞ্জ—মেঘের সঙ্গে পাল্লা দেয় তারার সঙ্গে।

বসন্ত এখানে ক্ষণস্থায়ী। অন্ততঃ বনের বাইরে ওই বিস্তীর্ণ তাম্রাভ প্রান্তরের বুকে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

ধূ ধূ রোদ কাঁপে প্রান্তরের উপর আর নুড়ি পাথরের বুকে, ঢালু কাঁকুরে ডাঙ্গা নেমে গেছে দূরে ক্ষেতের সবুজের পানে—তারই কাছাকাছি কতকগুলো ছোট তালগাছ ঘনসবুজ আবেষ্টনী রচনা করেছে।

প্রান্তরের ওপর থেকে চোখ মেললে দেখা যায়—দূরে পাতাজোড়ার পরই দামোদরের ধূ বালুরাশি। ওপারে সবুজ শালবন সীমা কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে। গহন অরণ্যসীমা বিড়ালের গায়ের লোমের মত জিরিজিরি দেখায়।

নীল আকাশ আর সবুজ বন রচনা করেছে উপুড় করা আকাশসীমার কোলে পৃথিবীর সীমান্ত। নীরব নিশ্চিন্ত স্তব্ধ কোন পৃথিবী। চড়াইয়ের এদিক ওদিকে শালবন ছায়ায় গড়ে-ও দু-একটা শান্ত গ্রামসীমা দেখা যায়।

বাতাসে কাঁপছে শস্যরিক্ত প্রান্তরের শেষে প্রহরীর মত দাঁড়ানো ওই দু একটা তাল গাছের পাতা।

তারই মাঝখান দিয়ে চলে গেছে খোয়াঢালা সড়কটা দুর্গাপুর ঘাটের দিকে, দামোদরের পারেই দুর্গাপুর ইস্টিশান। কোন বিচিত্র জগৎ!

এরা থাকে এপারে, এদের জীবন আর ওপারের জীবনের মাঝে দুস্তর ওই নদীর ব্যবধান। কা নদীই ষোল ক্রোশ।

সেই ষোলকুশী ব্যবধান। দুটো যুগ—অতীত এপাশে, ওপাশে বর্তমান দুর্গাপুর জাগছে ; মধ্যে ই দুর্মদ দামোদরকে বেঁধে দুই যুগকে এক করবার প্রয়াস চলেছে।

আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছে প্রচণ্ড শব্দে ; বনের পর বন, স্তরে স্তরে উঠে গেছে বনঢাকা ঠিন মৃত্তিকা আর পাহাড়সীমা, কালো পাথরের জমাট স্তর এতদিন মাটির তলে নিশ্চিন্ত রবে পড়েছিল, আজ মানুষ তাকে ডিনামাইট-এর আঘাতে চুর চুর করে ফাটিয়ে তুলে নিয়ে লছে। অতীতের মৃত সমাহিত কোন মহাকালের শবদেহ তুলছে তারা—এ যুগের প্রয়োজনে।

এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে বন থেকে বের হয়ে মস্ত মস্ত ট্রাকগুলো যাতায়াত করছে নদীর কে। রাতের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে বুলডোজার আর ক্যাটারপিলার ট্রাকটারের গর্জনে। নের বেলায় শব্দটা তত আসে না। রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে যন্ত্রদানবের গর্জনধ্বনি বাতাস রিয়ে তোলে। বিস্তীর্ণ নদীর ধূ ধূ বালি সরিয়ে তারা ব্যারেজের পিলার ড্রিলিং করছে। কঠিন থরগুলো কনক্রিট মিক্সচারের নিষ্পেষণে গ্রাইন্ডিং মিলের মধ্যে চুরমার হয়ে চলেছে।

চড়াই-এর উপর থেকে দেখা যায় বনের মাঝে নদীর বিস্তীর্ণ অন্ধকারে আলোগুলো জ্বলছে -পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে প্রকট হয়ে উঠেছে ওদের দীপ্তিমান শিখা।

ছানু দাসই গল্প ফেঁদেছে।

দোকানের কাজকর্ম ইদানিং কম। ধান চাল এ মুলুকে যা ছিল সবই প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। নে টুনে বের করে এনেছে তারা।

কতক লোক বিক্রি করেছে দেনার দায়ে, কতক বিক্রি করেছ বৎসরের কাপড়-চোপড় নতে, তার উপর আছে চাষের হালবলদের খোরাকী খইল, ভূষি, বছরকি মুনিষ মাহিন্দারও খতে হয়েছে মাঘ মাসের শেষেই—তাদের বছরের মাইনে—শিরোপাও দিতে হয়।

টাকা আর আসবে কোত্থেকে ? বেচ ধান।

ধান বেচেই সে সব মেটাতে হয়েছে।

তাই গ্রীষ্মের আগে থেকেই আবার সেই নেই নেই রব। দুচারজনের ঘরে মাত্র কিছু ধান কে আছে। তাও আঙ্গুলের ডগে গোনা যায়। বাকি আর সবাই—যাদের আছে তাদের ঘরে বে থেকে বাকির জন্যে ধন্না দেবে তাই ভাবছে।

সুতরাং তারা পানু দাসকে চটাতে পারে না, কারণ-অকারণেও ধন্না দেয়। পানুদাস অবশ্য জে গালগপ্পে থাকে না, সে কাজের মানুষ, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া জানে সাধারণ াকের সঙ্গে বসে বাজে কথা কইলে—গালগপ্প করলে তারা পেয়ে বসবে।

চাই কি মাথায় হাত দিতে এগোবে।

পানু তাই কথাবার্তা কম বলে। তাছাড়া ওসব সময়ও তার নেই। ব্যবসা আর ম
গন্ধেশ্বরীর পুজো করা একই কথা। পুজোয় তন্ময়তা না থাকলে যেমন পুজো সিদ্ধ হয় ন
ব্যবসাতেও তাই। তন্ময় হয়ে থাকতে হবে।

সেও বুঝেছে, নিজের চোখেও দেখে এসেছে—বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে
এইবার আসবে বিজলী বাতি, বড় সড়ক। কলকাতা বর্ধমান আসানসোল—লোহা-কারখানা
মুলুক-কোলিয়ারি—সব একাকার হয়ে যাবে।

এই যেন চরম সুযোগ আসছে। পানু দাস কি হিজিবিজি হিসাব করছে মনে মনে।

ছানু দাস বাইরের বারান্দায় বসা লোকগুলোর সঙ্গে গল্প করে চলেছে।

—ইরে বাস্‌সে, জবর কল আর তেমনি তার মুরোদ। পাহাড় তুলে লিয়ে যাবেক ম
লাগে।

সতীশ ভটচাযও একদিকে বসে হুঁকো টানছিল, সব ঘটে কাঁটালী কলা সে, এ আড্ডাতে
আসে। তাছাড়া কামারপাড়ার যজমানী ছেড়ে দেবার পর থেকে এদিকেও তার যাতায়া
বেড়েছে ইদানীং।

জবাব দেয় সতীশ,—যা বলেছিস। দেখলাম বাপধন। দামোদরচন্দকে বাঁধনেওয়ালা ইবা
এসেছে।

ছানু বলে চলেছে,

—শুধু কি বাঁধই হচ্ছে নাকি ? ক্যানেলও হবেক গো, শোনলাম পিয়ারবাড়া-আসুড়ে
গয়লাবান্দী সব বিবাক লুটিশ হইছে, জমির উপর দিয়ে ক্যানেল কাটবেক। জল আসবেক
হু হু জল। লাও কেনে কত্তো চায করবা ইবার। আর শুকো রুখো নাই—কেতেরাও না
থোড় গলায় লিয়ে মাঠশুদ্ধ ধান জল বাগড়ে পেসব করতে নারলেক, ঠোর মরে যাবেক আ
সিটি হবেক নাই!

ওরা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনে চলেছে কথাগুলো, যেন তাদের কাছে অবিশ্বাস্য। নিরাপদে চাষ হ
—বৃষ্টি হোক—আর অমন লকলকে ধান শুকিয়ে পুড়ে তামাটে খড়কাটি হয়ে যাবে না—
যেন তাদের কাছে স্বপ্নেরও অতীত।

—সত্যি গো মামু !

সতীশ ভটচাযও অবাক হয়েছে। ছানুদাস বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছে,

—ওই ! তবে কি মিছে কথা বলছি তুদের? শুধো কেনে কাকাকে।

সতীশ ভটচায ইতিমধ্যেই বিজ্ঞতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমর্থন করে কথাটা।—
সত্যিরে ! দেখিস নি বদ্ধোমান ক্যানেলের জমি? আকালপোষ জমি।

ও গ্রামের অনেকেই ওদিকে খাটতে যায়, গুখো-হাজার বছরে এ মাঠে কাস্তে নামে না। গ
নড়বড় করে চরে বেড়ায়। ধানের স্বপ্ন নেই—হু হু বুকজ্বালা রিক্ত শূণ্য মাঠ।

বাউরীপাড়া, লোহারপাড়ায় অন্ততঃ পৌযমাসের দিনে ভাত থাকে। সেবার তাও
না। বনের পাহাড়ী খাম-আলু, কন্দ, ভুঁড়ুর, কেঁদ ফলও নিশেষ হয়ে যায়।

—বৃষ্টি হোক—আর অমন লকলকে ধান শুকিয়ে পুড়ে তামাটে খড়কাটি হয়ে যাবে না—এ যেন তাদের কাছে স্বপ্নেরও অতীত।

—সত্যি গো মামু!

সতীশ ভট্টচার্যও অবাক হয়েছে। ছানুদাস বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছে,

—ওই! তবে কি মিছে কথা বলছি তুদের? শুধো কেনে কাকাকে।

সতীশ ভটচায ইতিমধ্যেই বিজ্ঞতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমর্থন করে কথাটা—সত্যিরে! দেখিস নি বদ্ধোমান ক্যানেলের জমি? আকালপোষ জমি।

ও গ্রামের অনেকেই ওদিকে খাটতে যায়, শুখো-হাজার বছরে এ মাঠে কাস্তে নামে না। গরু নড়বড় করে চরে বেড়ায়। ধানের স্বপ্ন নেই—হু হু বুকজ্বালা রিক্ত শূণ্য মাঠ।

বাঠরী পাড়া, লোহারপাড়ায় অন্ততঃ পৌষমাসের দিনে ভাত থাকে। সেবারে তাও থাকে না। বনের পাহাড়ী খাম-আলু, কন্দ, ভুঁড়ুর, কেঁদ ফলও নিঃশেষ হয়ে যায়।

তারপরই তারা বের হয়ে যায়, সোমত্ত মেয়ে মরদ সকলেই ওই দিকে। তালাই, হাঁড়ি, ঝুড়ি মাথায় দল বেঁধে পায়ে হেঁটে দামোদরের বালুচর, দিগন্তপ্রসারী মানাবন পার হয়ে এগিয়ে চলে তারা ওপারের দিকে।

দিগন্ত ছুঁয়ে চলে গেছে রেল লাইন। বার্ন কোম্পানীর চিনকুঠির লম্বা চিমনিতে ধোঁয়া বের হয়—ভোঁ বাজে। বেগে লাইন দিয়ে ছুটে চলেছে মালগাড়ি—ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তারপরেই ওদিকের ধান ক্ষেত শুরু হয়েছে মানকর ছাড়িয়ে। এ মাঠে ধান মরে না, একতালা ক্ষেত; চৌরস বগিথালার মত। তাদের মত পাহাড়ী সিঁড়ি বন্দী ক্ষেত নয় যে জল গড়িয়ে আল ভেঙ্গে ছুটবে নীচের কাঁইজোড়ের দিকে।

একটু বৃষ্টি হলেই জল বাথায়; তারপর ক্যানেল তো আছেই, গেট বন্ধ করলেই জল উপছে উঠে মাঠ ভাসিয়ে দেবে। ওরাও আজ স্বপ্ন দেখে তাদের গাঁয়ের মাঠের রূপ বদলাবে।

সোনা ধান। যতদূর চোখ যায় সেই ধান আর ধান। বাতাসের সুর তুলবে তার মঞ্জরী, বিচিত্র এক শিহর জাগবে।

ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কি ভাবছে।

নিতে বাউরী যাচ্ছিল পথ দিয়ে, চমকে দাঁড়াল। সে যেন নতুন কথা শুনছে। বৈকালের আবছা আলোয় পড়েছে বাঁশ বনে—তিরোল গাছের পাতায়। কেমন সন সন শুর তোলে।

বাতাসে তামাক পোড়ার মিষ্টি আমেজ; নিতের কদিন ধরে মেজাজটা ভালই আছে। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতেই এ বছর কাজে গতেছে। কাজে ফাঁকি সে দেয় না—তবু কেউ তাকে ঠকাক, অবিশ্বাস করুক—এটা যেন সহ্য করতে পারে না সে। নীলাম্বরবাবু অন্ততঃ সে ধরণের মানুষ নয়। তাই ভালো আছে নিতে।

গরুর খোল নিতে দোকানে আসছিল। হঠাৎ ও পাশের রকে কথাগুলো শুনে দাঁড়িয়েছে সে। কেমন শান্ত মধুর ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

সবুজ ধান সোনা রং হয়ে উঠেছে, ধানের ফাঁকে ফাঁকে আলের উপর বসেছে চড়ুই ছাতারে পাখির মেলা। বাতাসে ধান পাকার মিষ্টি সৌরভ—প্রতি বছর যেন সেই দিন আসবে।

নিশ্চিন্ততার দিন, ফসল পাকার আনন্দের দিন। ছেলেমেয়েগুলোর শীর্ণ মলিন চোখেও হাসি ফুটে উঠবে। তারাও বুঝতে পারবে—না খেয়ে অন্ততঃ কিছুদিন তাদের থাকতে হবে না রাতের অন্ধকারে খালিপেটে কান্নার জ্বালা তারাও জানে জন্ম থেকেই! আজ যেন কেমন আশা জাগে।

নিতে দেখেছে কেমন যেন চারদিকে একটা বদলের দিন—বদলের ঢেউ আসছে।

তারকবাবুদের প্রতাপ কমে আসছে এটাও বুঝতে পেরেছে। জমিজরাত সব চলে যাচ্ছে। আমিনবাবুর দলকেও দেখেছে সে। ছানু দাসকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারে না নিতে।

মিছে কথা বলে উ। যদি সত্যি না হয় তাহলে দুঃখই পাবে নিতে।

মিষ্টি দোকান থেকে তামাক পোস্ত আরও কি সব নিয়ে বের হচ্ছিল, তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে নিতে বাউরী,

—কি গো দিদি! ইবার তালে আর শুকো খরা নাই মাটিতে? ছানুর কথাগুলো মিষ্টিও শুনেছিল।

সেও দেখেছে ক্যানেলের ধারে কেমন বারোমাস সোনা ফসল ফলায় সেখানের মানুষ গ্রামরে রূপ বদলে যায়। একটি নিশ্চিন্ততার ছায়া তার মনে নিবিড় জ্বালাকে শান্ত করে তুলেছে। উপস্থিত সকলের মুখেই সেই কল্পনাটুকু একটি মধুর আবেশ এনেছে। নিতে বাউরীর কথায় মিষ্টি জবাব দেয়,

—বদ্ধোমানে তো দেখেছি তাই কে জানে কি হবেক ই মাটিতে। সিখানে তো ফল ফসল ফলে

নিতে জবাব দেয়,—মাটির আর কি ফারাক দিদি, মানুষ বেইমানী করে, মাটি তো তা জানে না। মায়ের জাত যি গো—কথায় বলে না মা-টি।

নিতে বাউরি মাঝে মাঝে কেমন যেন বিচিত্র কথা বলে। মিষ্টির মনে ধরেছে কথাটা, মা আর মাটি এক। মেয়ে হলেই যেমন মায়ের সার্থকতা—ফসল ফললেই মাটিরও তেমনি সার্থকতা। রূপ বাড়ে—সেই সঙ্গে বাহারও খোলে।

মেয়েও যেন ধন্যি হয় মা হলে।

আনমান মিষ্টি পথ চলছে। গাঁয়ের পথে দিনের শেষ আলো লুটিয়ে পড়েছে, আকাশে একফালি লাল আলো ঠিকরে পড়েছে তির্যক রেখায়, পাখিগুলো ফিরছে গাছের মাথায় পরিক্রমা সেরে।

বাতাসে ভেসে আসে ঘরমুখো গরু-বাছুরের হাম্বা রব, একটা শান্ত মধুর ছবি চোখের উপর ফুটে ওঠে।

মিষ্টিও তারকবাবুর খামারের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। নির্জন পথ, মুক্ত ডাঙ্গায় সন্ধ্যা নেমেছে।

হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াল। জীবনবাবু এগিয়ে আসছে।

—শোন।

—চাকরি-বাকরি কর এইবার। এসব ছাড়ান দাও। এত দেখেও হুঁশ হয়নি ?

চমকে ওঠে জীবন ওর মুখের এই কথায়। যেন অতর্কিতে একটা চাবুক মেরে কে থামিয়ে দিয়েছে ওকে। একটু সামলে নিয়ে জীবন বলে ওঠে,

—কেনে ?

—ওই বললাম আর কি ! সাজ খাজনা—আদায় উশুল সব তো গেল, কলসীর জল বসে খেলে আর কদ্দিন ? কিগো ? বাবুরা যে ইবার কাবু হয়েছেন শোনলাম।

হাসছে মেয়েটা। কেমন বিশ্রী জ্বালা ধরানো হাসি। থমকে দাঁড়িয়েছে জীবন। মিষ্টি চলে গেল সহজ ভাবেই।

মাথা সোজা করে একটি হিল্লোল তুলে চলেছে মিষ্টি পথ দিয়ে।

আজ সে ওদের ভয় করে না। মনে মনে জেনেছে বিষদাঁত ভাঙ্গা নির্বিষ গোখরো—ফণা মেলতেই পারে, ওই পর্যন্ত। ছোবলে আর সেই সর্বনাশা বিষ নেই।

জলটোপ লোকটা কেমন নির্বিকার। মুখ বুজে কাজই করে যায়। ও আর কিছুর খবর রাখে না। মেশেও না বড় একটা গ্রামের লোকের সঙ্গে। মাঝে মাঝে নিতে বাউরী আসে, না হয় আরও দু-একজন। দুচারটে কথাবার্তা বলে বড় জোর।

নেশাটেশাও করে না—ওই বিড়ি তামাক পর্যন্ত তার দৌড়। নিতে বাউরী ওকে কারিগর বলেই ডাকে। ওই নামেই সেও পরিচিত হয়ে উঠেছে।

নিতে বাউরীর সমস্যা—মনের সব জটপাকানো প্রশ্নগুলোও মাঝে মাঝে ওর কাছে তুলে রে। সন্ধ্যাবেলায় আজও তাই এসেছে নিতে।

নিতে দোকানে শুনে এসেছে ছানু দাসের কথাগুলো। কেমন একটা শান্ত মধুর নিশ্চিন্ততার বি ফুটে ওঠে মনে।

কারিগরের বানানো সেই পুতুলের একটা সংসারের ছবি রয়েছে ওর সামনে। নিতে ওই তুলের ঘরের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,

—বাহারের বানিয়েছ কিন্তুক কারিগর ! ঘর—উঠোন—উঠোনে একটা ধানের মরাই, গোয়ালে গরু-বাছুর। মায় চালের ওপর লাউ-এর লতাটুকুনও বাদ দাও নি।

কারিগর হাসছে। অবসর সময়ে নানা কল্পনা তার—অমনি পুতুল আর ছবি হয়ে ফুটে ওঠে নের অতলে। তারই দু-একটা সেই স্বপ্নকে ধরে রেখেছে হাতের কাজে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে বাউরী ওই ছবিটার দিকে। সাজানো সংসার। কেমন শান্তির ছাঁয়া মাখানো তাতে।

ছানু দাসের কথা মনে পড়ে। এমনি কোন আগামী দিনের কথাই ভাবছে নিতে বাউরী। জিজ্ঞাসা করে নিতে,

—ছবি কখনও সত্যি হয় কারিগর ? এমনি ছবি ?

সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়ে উঠেছে। মিটিমিটি জ্বলছে পিদিমটা উঠানের এক কোণে।

আকাশের তারায় তারায় নিঃশব্দ চাহনির বেদনাময় অনুভূতি। নিতে বাউরীর দিকে চাইল কারিগর।

—কেন হবে না নিতাই? এমনি ঘরের ছবি কোনকালে নিশ্চয়ই সত্যি ছিল—আবার যে সত্যি হবে না কে জানে?

নিতে ব্যাকুল চোখমেলে চেয়ে থাকে ওই কল্পনার রূপের দিকে। মনে হয় এমনি শান্ত ভালোলাগা ছবি একদিন সত্যি ছিল, আবার হয় তো সত্যি হবে।

নিতাই মাথা নাড়ে। কথাটা যেন মনে সেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অনেকদিন পর মিথ্যাবাদী ছানুদাস যেন ভুল করে একটা কঠিন সত্যি কথা বলে ফেলেছে।

—আত হয়েছে। আজ চলি কারিগর।

উঠে পড়ে নিতে বাউরী। রাতের অন্ধকারে বের হয়ে এল পথে।

বাঁশবনের ধারে শুকিয়ে আসা জলায় ফুটেছে সবুজ কচু বনে ঘন হলুদ ফুলগুলো, ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে রয়েছে কালকাসিন্দের গাছের হলুদ ফুলের গুচ্ছ। আকাশে ওঠা-নামা করছে জোনাকির দল—কেমন ম্লান আভাগুলো আঁকি-বুঁকি কেটে চলেছে—একটা মিষ্টি আবেশের মত বাতাসভরে তুলেছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে।

তারই মাঝে বহুদিন পর উঠেছে বাঁশির সুর।

অনেকদিন পর আবার ফিরে এসেছে সুরটা, প্রথম রাত্রের অন্ধকারেই কেমন একটি মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

মিষ্টির কানে আসে সুরটা—দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। কারিগর চুপ করে বসে আছে। সামনে নামানো সেই পুতুলের সংসার, তাদের পাশাপাশি সংসার পেতেছে মিষ্টিও। দু-চোখে তার তেমনি কোন সুন্দর স্বপ্ন। বাছুরটা ডাকছে মাঝে মাঝে। বাতাসে দোল খায় বকফুলের গাছে অফুরন্ত সাদা ফুল—মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে ঝর ঝরিয়ে উঠোনে ওই ফুলগুলো

মিষ্টির মনে অতীতের সেই কান্নাব্যাকুল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ওই রাতজাগানি সুরে।

কারিগর !

কারিগর এই মিষ্টিকে চেনে না। নতুন একটি নারী। বর্ধমানের এক রাত্রের সেই নোংরা পল্লীর দৃশ্যটাও ভুলতে চায় সে।

হতভাগ্য একটি মানুষকে পথ থেকে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছিল সেদিন মিষ্টি—পাড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠা রূপোপজীবিনী।

কে জানে চরম ভুলই করেছিল কিনা সেই রাত্রে মিষ্টি।

লোকটাকে দেখেছে সে ইতিপূর্বে বহুবার। কেমন ও যেন হাঁসের জাত। এ পাড়াতেই থাকে —ওই টুকিটাকি কাজ করে আর হাসে। সবাইকে যেন ভালবাসে সে।

তাই মিষ্টি সেদিন ঘর বাঁধতে চেয়েছিল ওকে নিয়েই।

—ঘর বাঁধবা ইখানে ? সেদিন হেসেছিল লোকটা।

মিষ্টিও জানে বর্ধমানের সেই পাড়ায় ঘর বাঁধা যায় না। তার জন্য চাই আলাদা পরিবেশ। ওর দিকে কামনাব্যাকুল চাহনি মেলে বলে ছিল মিষ্টি,

—না !

ইখান থেকে অনেক দূর গাঁয়ে। যাবা কারিগর ?

কারিগরও কেন জানে না ওর ডাকে সাড়া দিয়েছে, আজও সেই মিষ্টি বদলায়নি।

তেমনি উষ্ণ আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে । আজ সার্থক হতে চায় মিষ্টি। ওই ঘরের স্বপ্ন—নিজেকে বিকশিত করার স্বপ্ন—তার সারা মনে একটি দুর্বার উন্মাদনা এনেছে।

—মিষ্টি !

—উঁ !

কেমন তারার আলো জলা রাতে—মিষ্টি আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিঃশেষে ; তৃপ্তির আবেশে দুচোখ বুজে আসে।

কারিগরকে দুহাতের কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে সে।

জীবনকে, যেন কোন সুন্দর স্বপ্নকে এমনি নিবিড় করে সার্থক বাস্তবে পরিণত করতে চায় আজ ব্যর্থ নারী।

রাত নেমে আসে। তখনও বাঁশির সুর থামেনি।

তারার আলো—রাতের জমাট অন্ধকারে কার উষ্ণ দেহের স্পর্শ, আর ওই দূরাগত বাঁশির সুরে সুরে আজ সব শূন্যতা পূর্ণ হয়ে ওঠে, মিষ্টির মনে কেমন একটি বিচিত্র অনুভূতি জাগে. আশা জাগে। সব হারিয়েও কঠিন মৃত্তিকায় বাঁচবার সার্থক চেষ্টা করে চলেছে সে। সব কিছু আজ সুন্দর লাগে—সত্যিই কেমন বিচিত্র আর বর্ণময়!

এমনি আঁধরে হারিয়ে গেছে বাউরীপাড়ার কালো কালো মানুযগুলো। মেয়েমদ্দ সবাই ঘুমে যেন নেতিয়ে পড়েছে।

এখন থেকেই ভাবনা লেগেছে যাদের মনে, তারাই শুধু জেগে আছে নির্বাক নিস্পন্দ আতঙ্ক ক'টি মানুয।

শীতের দিন শেয হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ভাবনা বাড়ে। ক'জন মাত্র গাঁয়ের লোকের ঘরে মজুর মাহিন্দার গতেছে। বাকি সকলেই উটকো রয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ এর বাড়িতে ডাকলে খাটো—নাহয় ওর বাড়িতে কাজ খোঁজো। যদি কেউই না ডাকলে তবে সেদিন ঘরে ধান চাল চাট্টি রইল তো খাও, না হলে উপোস দাও।

ওরা কাজ চাইলেও তাই অনেক সময় পায় না। তখন অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখতে হয়।

রাঙ্গি বাউরী তাই বেশ ভাঁজ করে বলে,

—খাটো তবেই খাও।
না খাটো তো
জুলুর জুলুর চাও।।

গ্রীষ্মের দাবদাহের জ্বালা শুধু কঠিন অনুর্বর মৃত্তিকার বুকেই জ্বালা তোলে না। এদের হাহাকার আনে।

রিক্ত শূন্য মাঠ। কঠিন মাটি।

মাঠেও হালফাল লাগে না, মানুষ তিষ্ঠোতে পারে না ওই কাঠফাটা রোদে। মুনিষ মাহিন্দাররা বাগানের ছায়ায় বসে খড়ের দড়ি পাকায়, না হয় ছানি কাটে। অন্য কাজও নেই।

বাকি বেকার যারা—টেস্ট রিলিফ হলো ত ওই রোদেই ঝুড়ি কোদল গাঁইতি নিয়ে মাটিতে যায়। ছায়াবিহীন ধূ ধূ প্রন্তরে কোথাও রাস্তা মেরামত হয় না হয় পুকুরের কাজ চলে। সেখানে দিনান্ত পরিশ্রম করে মাটি কেটে পয়সা পায় মাত্র দশ বারো আনা, তার থেকে আবার মোহরার কাটে,—সর্দারকে এক আনা দস্তুরীও দিতে হয়।

দিয়ে থুয়ে যা বঁচে, তাতে ফেন ভাতই জোটে মাত্র। অন্য কিছু নেই।

বেজা চুপ করে বসে থাকে—ঘুম আসে না।

ওদিকে বৌটা ঠায় বসে আছে। কদিনেই কেমন বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে।

হঠাৎ যেন একটা অতর্কিত আঘাতে মুযড়ে পড়েছে লাবি-বৌ। এতদিন উদ্দাম দুর্বার গতিতে চলছিল সে, মনে করেছিল যৌবনের দুর্বার স্রোতে সে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাবুদের কাঁচা পয়সা সেও এনেছে বেশ কিছু।

আরও আনতো। হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

সারা শরীরে অতর্কিত কোন অসাবধান মুহূর্তে জড়িয়ে গেছে তার সেই পাপের ফল—পথের কাঁটা।

চমকে উঠেছিল সে।

এ তো সে চায়নি। যেমন করেই হোক দূর করবে সে পথের কাঁটা দেহের নবাগত ওই শত্রুর জাতকে।

বাউরীপাড়ার জীবনে এ এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। মাইতরী বুড়ীরও এসব বিদ্যা—জরি বুটি জানা। কত বড় ঘরের কত কেলঙ্কারী সে দূর করেছে। এ আর এমন কি শক্ত নতুন কাজ!

দাঁত-পড়া মাড়ি বের করে হাসে বুড়ী, বিশ্রী কুৎসিত সেই হাসি।

—কেনেলো থাক না, তবু মেয়ে হলে দেখতে ছিরি হবেক। ওজগারর দোসর হবেক তুর!

ঘৃণায় লাবির সর্বাঙ্গ রি রি করে।

—না দূর কর উটোকে । আজই।

বুড়ী জরি বুটির খোঁজ করতে থাকে।

বেজাও যেন এই অপমান সইতে পারেনি। কোন কথা বলে না সে। লাবির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এত গোপন খবরটাও বাতাসে বাতাসে ভেসে ওঠে। বেজাও কথাটা শোনে; চোখে পড়ে ওদের অর্থপূর্ণ হাসি, সর্বাঙ্গ জ্বালা ধরায়।

বেজা সেই দিনই গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল কি এক নিদারুণ অপমানে। অভাবও সয়েছিল, কিন্তু এতবড় অপমান সইতে পারেনি। তাই মরতেই চেয়েছিল সে।

মরবার শেষ মুহূর্তেও কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে বাঁচবার প্রাণপণ আশায়। ওই লাবিকে কেন্দ্র করেই তার পৃথিবী নয়। এ পৃথিবীতে আরও অনেক মানুষ আছে। বাঁচার আশ্বাস আছে।

সুন্দর ওই নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কাঁইজোড়ের ছায়াঘন তীরভূমি, আখের ক্ষেতে আলো-ছায়ার রঙ্গীন স্পর্শ—একটু মাটির আশ্বাস—সব কিছু মিশে তার জগৎ। এরই মাঝে বাঁচতে চায় সেও। একজনকে বাদ দিয়েও বাঁচবে সে।

তাই আশমানে ঝুলন্ত দেহটা ঝটপট করতে থাকে। দু-চোখে তার ব্যাকুল আবেদন। বাঁচার জন্য অন্তিম চেষ্টা।

বেঁচেছিল সে। ওরাই তাকে নামিয়ে জল দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিল।

আজ তাই বেজা রাত্রির বিনিদ্র প্রহরে জেগে আছে ওই তারার আলোমাখা আকাশের দিকে চেয়ে।

—ঘুমুলি ?

চমকে উঠে ওর দিকে চাইল বেজা।

লাবি-বৌ উঠে এসে তার পাশে বসেছে। কেমন অসহায় দুর্বল একটি মেয়ে। সব তেজ যেন তার হারিয়ে গেছে।

লুট করে নিয়েছে কোন দস্যুদল তার সেই উচ্ছল যৌবন-সম্পদ, প্রাণপ্রাচুর্য।

আজ পড়ে আছে তার মলিন কদর্য জীর্ণ দেহটা।

সাময়িক আনন্দ আর নেশার বহু মূল্য দিয়েছে লাবি।

বেজা ওর দিকে চাইল। আজ মায়া হয়। কেমন মনে হয়—ওর কোন দোষ নেই। বেজা যদি নিজে খেটে সংসার চালাতে পারতো—দু-মুঠো ভাত-এর সংস্থান করতে পারতো, তাহলে হয়তো এতবড় আঘাত সেও পেত না। এমনি করে তার ঘর ভেঙ্গে পড়তো না। কিন্তু বেজা তা পারেনি।

এ তার অদৃষ্টেরই অভিশাপ।

স্বামী হয়েও স্ত্রীকে সে খাওয়াতে পরাতে পারেনি। এ তার দোষ। একথা বার বার ভেবেছে বেজা। তবু মরতে পারেনি।

—লাবি !

মেয়েটার জন্য মায়া হয়।

কান্নাভরা দুচোখ মেলে লাবি চেয়ে থাকে ওর দিকে।

কথা কয় না বেজা, লাবি কাঁদছে । কেমন ক্লান্ত পরাজিত একটি নারী কাঁদছে রাতের অন্ধকারে।

বাঁশিটা তখনও থামেনি। রাতের আকাশে গুমরে গুমরে উঠেছে সেই সুরবেশ, কেমন যেন কান্না আসে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লাবি।

বাউরীপাড়ার বটগাছের ঘন পত্রাবরণে কোন হরিয়াল দম্পতি পরস্পর পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখটুকু উপভোগ করছে।

শান্তি নেই মানুষের মনে।

বাতাসে ভেসে চলেছে—কোন উধাও আকাশের দিকে পাখনা মেলে ওই অতন্দ্র সুরটা, ওদের মনের দুঃখের পাথার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ওর সুরে যেন জাদু আছে। মনছোঁয়া সেই সুর।

অনেকদিন পর আবার অবিনাশ ডোম ফিরে এসেছে গাঁয়ে। আজ সে বদলে গেছে অনেকখানি। যে হতাশা আর ব্যর্থতা নিয়ে গাঁ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আজ সেই ব্যর্থতার বাধা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে। তাই আবার গ্রামে ফিরে আসে।

—ছুটবাবু!

চুপ করে কি সব হিসাবপত্র দেখছিল অশোক, এসে প্রণাম করে তাকে অবিনাশ। পরনে পরিষ্কার জামা কাপড়, চেহারাতেও একটা ভদ্র ছাপ, হাতে চামড়ার একটা ছোট্ট বাক্স। অশোক একটু চমকে ওঠে। গ্রাম থেকে যে যায় সে আর বড় একটা আসে না। ও কিন্তু ফিরেছে। বলে ওঠে,

—অবিনাশ !

—হ্যাঁ ছুটবাবু !

—কোথায় ছিলি এতদিন ? বস।

অবিনাশ দাওয়াতেই বসে, দুচোখে তার বৃহত্তর জগতের স্বপ্ন। ছোট্ট এই পাতাজোড়া আর গদারগাঁয়ের সীমানা পারে ওই দূর জগতে কোন মহানগরীর আলো আর লাস্যময়ী রূপ তার দুচোখে কেমন জয়ের আভাষ এনেছে। বলে ওঠে অবিনাশ,

—কলকাতায় ছিলাম। তালিম নিচ্ছি ছুটবাবু। ওস্তাদ নকীব খাঁ-এর কাছে, বারাণসী ঘরওয়ানা।

—বেশ।

খুশি হয় অশোক, ওর দিকে চেয়ে থাকে।

যে মানুষটাকে দেখেছিল এখানের স্বল্প পরিবেশে ব্যর্থ আর পরাজিত হতে, সেই মানুষই আজ বৃহত্তর জগতের মাঝে তার স্থান খুঁজে নিয়েছে—সার্থক হতে পেরেছে।

প্রীতির কথাটা বার বার ভেবে দেখেছে অশোক।

প্রীতিই বলে,—এখানে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে শুখিয়ে কুঁকড়ে তিলে তিলে মরবে কঠিন গুমোট এই স্বার্থান্ধ সমাজের নিষ্পেষণে। হয়তো প্রীতির কথাই সত্যি—আজ অবিনাশকে দেখে অশোকও কথাটা মনে মনে কোথায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ে থাকে সে অবিনাশের দিকে, চাকরটা চা দিয়ে গেছে ওকে অবিনাশ চায়ে চুমুক দিচ্ছে কলাইকরা একটা কাপে।

অশোকের কথায় মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

অশোক বলে ওঠে,—শহরই ভালো, না রে ? এখানে আবহাওয়ায় মানুষ টিকতে পারে না।

অবিনাশ যেন চমকে উঠেছে ওর কথায়। যে ছোটবাবুকে দেখেছে এ মাটির, এই জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, যার কথাই সর্বাগ্রে তার মনে ভেসে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র করে, এর শ্যামসবুজ জীবনের মাঝ যে যেন একটি জীবন্ত সুর, সেই অশোকবাবুর মুখে এ কথাটা শুনে যেন বেদনাই পায় সে।

বলে ওঠে অবিনাশ,

—তবু এ মাটিতে শেকড় না থাকলে মানুষ বাঁচে কই ছুটবাবু। গাছ লক-লকিয়ে যতই ঠুক, ফুল ফোটাক—ফল ধরুক তার গোড়া তবু সেই মাটিতেই পোঁতা রয়েছে ছুটবাবু, ায়ের মায়া কাটালেই মানুষ কেমন শহুরে আজব জীব তৈরি হয়ে ওঠে।

অশোক চুপ করে বসে রয়েছে।

ও কথা সেও ভেবেছে। দেখেছে—শহরের মানুষকে। তাদের জীবনের বিলাস-সৌন্দর্য নুষ্যত্বের মাঝে কোথায় একটা রূপান্তর ঘটেছে, তারা হারিয়েছে মৃত্তিকার নিবিড় সাযুজ্য আর ান্তরিকতার স্পর্শমাখা সহজ সারল্য। শহর আর বর্তমান সভ্যতার এও অবদান।

তবুও গ্রাম ছেড়ে শহরের বিলাসের দিকে—ওই জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যাবার মোহ াছে, উচ্ছল সমুদ্রমুখী নদীর মত স্বাভাবিক গতিতেই ছুটে চলেছে সে ; কিন্তু তবু জোয়ারের বগ আসে—সেই জীবনকে আবার গ্রামমুখী হতে হয়, পশ্চাদ্‌মুখী হতে হয় প্রকৃতির বিধানেও র নির্দেশ আছে।

তাই হয়ত অবিনাশও গ্রামে ফিরে এসেছে, না এসে পারেনি। অবিনাশও ভেবে দেখেছে ই কথাটা।

ওই যে গাছের সঙ্গে তুলনার কথাটা, ওটা তার মনেরই কথা। নিজের জীবন দিয়ে ওটা ঝেছে, অনুভব করেছে সে বারবার এতদিন শহরের জীবনযাত্রার মাঝে থেকে।

সে বাজায়, বাঁশিতে তার সুর ওঠে।

পিছনে থাকে একটি মন। তারই ব্যাকুলতা আর্তি আর আনন্দ বেদনা ফুটে ওঠে সানাই-সুরে সুরে।

সেই মনটির কথাই বলেছে অবিনাশ তার নিজের অমার্জিত ভাষায়। বারবার অনুভব রছে শহরের পরিবেশে তার ফেলে আসা জীবনের কথা।

পাতাজোড়ার শালবনে—আরক্তিম প্রান্তরে সন্ধ্যা নামে ; তারাজ্বলা সন্ধ্যা। নীরব নিস্তব্ধ কাশে ডেকে যায় ঘরমুখো পাখির দল, ঝরাপাতার মর্মরে দিক হারা বাতাস দীর্ঘশ্বাস তোলে এক নিবিড় বেদনায়। সারগমে আর সুরের নিবিড় আলাপে সেই বিদেহী সন্ধ্যায় নির্জন প্রান্তরের ছবিই ফুটে ওঠে তার মনে।

অবিনাশ ভোলেনি বর্ষার সেই ছবিগুলো—কেমন একটি সুন্দর অনুভূতিতে তাকে ভরিয়ে য়ছে। কালো কালো পুঞ্জমেঘ জমে নীল পাহাড়সীমায়, গাছগুলো ঘনতর হয়ে ওঠে কালো ঘর ছায়ায় ; সন সন হাওয়া হাঁকে। বৃষ্টির সুর বাজে দিকপ্রসারী ধানক্ষেতের বুকে হাজার ুরের ছন্দে।

অজ্ঞাতেই সেই ছবি তার মনে মল্লারের সুর হয়ে বাজে।

সুর বাজে বসন্তের, আলোক ঝলমল বনতলে ভ্রমরের গুঞ্জরণে। কোন নাম না জানা ফুলের নিটোল মদির সৌরভ মন ছেয়ে রাখে। হলুদ লাল রং-এর ফুল। কত সুর—কত খির সুরমেলা—তার বসন্ত রাগকে বিচিত্রিত করে তোলে। ওই তার মনের সুরজন্ম।

হাসে অবিনাশ।

—তাই ফিরে না এসে পারি না বাবু। টিকি যতই মাথা নাড়ুক শেষ-মেষ সেই গড়ে পড়তে হবে তাকে।

অশোক বলে ওঠে,—তা থাকবি কোথায় ?

হাসে অবিনাশ। জবাব দেয় না। কি যেন ভাবছে। সেই পরিচিত বাড়ির পরিবেশে যেতে মন মানে না। আজ সে নিরিবিলি থাকতে চায়। অশোকই বলে ওঠে

—ওপাশে বনের ধারে একটা আস্তানা তুলে নে। বাঁশ কাঠ জায়গা দিচ্ছি।

—দেখা যাক।

অবিনাশ কি ভাবছে। মন যেখানে ভাল লাগে সেই ত ঘর, নাই বা রইল সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই, মনের ঘর তো পাঁচিলের আটক মানে না।

কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বাঁশিটা বের করে সহজ সাবলীল ভাবে ফুঁ দিয়ে চলেছে সে। রাতের অন্ধকারে গ্রামসীমায় জেগে উঠেছে একটি সুর ; বহুমনের আকুতি আর কান্নামেশা তার প্রকাশ।

জীবনকে—এ মাটিতে ভালবাসার সুর ; সেই ভালবাসার মাঝে আঘাতের ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ যেন গুমরে ওঠে ওই সুরে।

অশোক স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে। আজ অবিনাশকে নতুন করে চিনেছে অশোক।

প্রীতি চুপ করে বসে আছে। ওই সুরটা তার মনে কি যেন একটা আবেশ এনেছে।

কোথায় তারা চলেছে দুজনে কোন মহানগরীর আলো ঝলমল পথে, অশোক আর সে রাস্তার দুদিকে চলেছে লোকজন, মাঝে মাঝে কঠিন ইঁটকাঠের বেষ্টনীর মাঝে মাথা তুলেছে একটা গাছ, একটু সবুজ রং বহুকষ্টে ত[illegible] মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে।

বাতাসে কিসের সুর।

কেমন একটা সাড়া ওর দুচোখে; প্রায়ান্ধকার গ্রাম নয়—লাল কাঁকুরে ডাঙ্গার অসীম নির্জনতা শ্বাস রোধ করে আনে না। প্রাণ এখানে ওই হাসির স্রোতে উধাও হতে চায়।

—কি দেখছ !

ওর হাতখানা অশোকের হাতে। সারা শরীরে একটা বিচিত্র শিহরণ ; অতীতের একদিন সন্ধ্যায় ওই অনুভূতির নবজাগরণ সে প্রত্যক্ষ করেছিল অশোকের চাহনিতে—কোন অন্ধকার গ্রাম প্রান্তরের একটি নির্জন বাড়িতে।

প্রীতির তবু এই ক্ষণিকের মোহটা ভাল লাগে না। বলে ওঠে,

—কিছু না !

প্রীতির সবকথা যেন শেষ হয়ে যায়। দুর্বার উচ্ছল ওই প্রাণের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে আজ উধাও হতে চায়, হারিয়ে ফেলতে চায় সে ওই কর্মব্যস্ত জীবনের ভিড়ে।

ওই কর্মব্যস্ত জীবনেই নীড় বাঁধবে সে। নিজেকে তাই সঁপে দিতে চায় ওর নিবিড় বন্ধনে। শোকের দিকে চেয়ে থাকে সে। প্রীতি বলে ওঠে,

—কবে যাচ্চ ওখানে ?

—কেন ? আনমনা অশোক যেন জবাব দেয়।

প্রীতির মনে একটি আলোক-স্বপ্ন। বলে চলেছে,

—আমার খুব ভাল লাগে। বাঁচতে হলে ওরই মাঝে বাঁচতে হবে। দিন বদলের দিনে ড়ের মাঝে এসে তাকে জয় করেই বাঁচতে চাই। সরে কোন নিরাপদ পল্লীর বুকে কুনোব্যাঙ- র আত্মরক্ষা করার মূলে আর যাই থাকুক না কেন—সৎসাহস নেই তাই বলবো। আর সেই লতাকে ঢাকবার জন্য গ্রামসেবার আদর্শের দোহাই পাড়াও ভীরুতা।

অশোককে যেন জয় করেছে সে। হাসছে অশোক।

আজ মনে হয় প্রীতির কথা হয়তো সত্যি। জীবনের বেদনা ঝড়কে অস্বীকার করে বাঁচার ম ভীরুতা। সেও ওই জগতে ফিরে যাবে। প্রীতিকে ভালবেসে ঘর বাঁধবে। বাঁচবে নতুন র।

নিবিড় করে তোলে তাদের বাঁধন। প্রীতি আজ বিচিত্র স্বাদে মন ভরে তুলেছে। কেমন টা সুর জাগে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। রাত নেমেছে নীরব পল্লীর বুকে। ানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ব্যাকুল বেদনায় তারাগুলো জ্বলছে। অনেক রাত। প্রীতির তবু আর আসে না।

কেমন স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রীতি চেয়ে থাকে—নিজের অন্তরের নিভৃতে একটি লজ্জা ফুটে উঠেছে, র নতুন সত্তাকে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে সে।

সুরটা কেমন অশরীরী একটি কল্পনার মত প্রীতির সমস্ত চেতনাকে নিবিড় একটি মাধুর্যে রিয়ে তুলেছে নব জীবনের আশ্বাসে। কালই ফিরে যেতে হবে প্রীতিকে শহরে, অশোকের ঙ্গ দেখা করার অবসর মিলবে কি না জানে না। তবু তার কথা মনে পড়ে।

কদম-বৌ-এর ঘুম আসে না। সংসারের চাকাটা কঠিন হাতে ধরে থাকতে থাকতে কেমন স্ত অসাড় হয়ে উঠেছে চেতনাগুলো। মানুষের সব কামনা বাসনাগুলোকে এতদিন সে পিষে লেছিল ওই চাকাটার চাপে।

শ্বশুর—স্বামী—দেবর—পোষ্যবর্গ—জা—নানা জনের প্রতি নানা কর্তব্য। সেই কর্তব্যই র এসেছে এতদিন কদম-বৌ।

ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছে জীবনের নিভৃত গহনে কোথায় একটা ফাঁক আর ফাঁকি বিরাট য় উঠেছে।

সেই পরম দৈন্য আবিষ্কার করে সেদিন ব্যর্থ মাতৃত্বের নিদারুণ বেদনায়। মা সে হয়নি।

হতে পারেনি—হয়তো তার যোগ্যতা নেই। কদমের অন্তর মনের সেই নীরব হাহাকার প্রতিটি দিনের প্রতিটি কাজের মাঝে এনেছে কেমন একটা নীরব অবহেলার আভাষ।

চাপা ইঙ্গিত—সেই কদর্য কথাটার স্মৃতি মনে জাগে বারবার। অনেকেই হেসেছিল গোকু সেই প্রকাশ্য ঘোষণায়, অনেকে দুঃখ পেয়েছিল। কেউ বা উড়িয়েই দিয়েছে কথাটা।

কিন্তু কদম-বৌ-এর মনে তার স্বামীর ব্যবহারটা গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল, আ তা ভোলেনি কদম।

ভুবন কোথায় তাকে ভুল বুঝেছে। কান্না আর কান্না—কত আবেদন নিবেদনে হয় আপাততঃ থেমেছিল ভুবন, কিন্তু তবুও মনের মাঝে একটা অবিশ্বাসের কালো ছায়া বিশ্বাসের নীল নির্মল আকাশটুকুকে মলিন করে রেখেছে আজও।

সেই পরম দুঃখের কথা আর কেউ না জানলেও কদম-বৌ জানে। সেইটাই তার জী এনেছে একটা নীরব ক্লান্তি, অবসাদ আর অপমানের আভাষ। কি তার দাম। মা-ই পারেনি কদম।

ওদের চোখে তার ঠাঁই অনেক নীচে নেমে গেছে।

এ অভিযোগ সে ভুবনকেও করতে পারে। করতে চেয়েছেও। কিন্তু পারেনি। পুরু কাছে নারীর এ অভিযোগ কোনকালেই যেন টেকেনি।

তাই কদমও চেষ্টা করেনি।

রাত হয়ে আসে ! গভীর নিঝুম রাত। বনের দিক থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আ কোথাও অর্জুন গাছের মাথায় শকুন ঝটপট করছে। কাঁদছে শকুন-শিশু—ছোট ছেলের ম ওই কান্নাটা বাতাসে ভেসে ওঠে।

জেগে আছে কদম। ঘুম তার আসে না। কিসব আজেবাজে চিন্তা তার মনে।

অতীতের সেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। উঁচু চড়াই-এর মাথায় আমবাগানে সীমানার পারে তার বাপের বাড়ির গাঁয়ের সেই ছায়াচ্ছন্ন সবুজ কৈশোরের দিনগুলো বাবুদের বাগানে আমের বোল আসত, শীতের রোদে চারিদিকের বন ভরে ফুটে উঠতো মি একটি স্বপ্নের ইশারায়।

দূর থেকে কদম চেয়ে থাকতো বাবুদের সাদা চকমিলানো দালানের দিকে। দেউড়ির ফট বিচিত্র সাজপরা দারোয়ানজি রোদে বসে খৈনি দলতো—মাঝে মাঝে দেখা যেত ঘোড়া দাব বাবুরা কেউ বার হয়ে গেল।

ছোটবাবু ওদের থেকে যেন আলাদা ধাতের। বাগানের ফাঁক দিয়ে পাঁচিল টপকে আমগ বেয়ে নেমে আসতো অশোক ওই বন্দী কোন রহস্যপুরীর বাইরে।

—চল ?

দুহাতে ধুলোময়লা ঝাড়তো জামা কাপড় থেকে। কদম তখনও অবাক হয়ে চে থাকতো অশোকের দিকে। সেদিনের তরুণ একটি কিশোর। চঞ্চল উদ্দাম। কেমন যেন ভ করতো কদমের।

ওই বিরাট পাঁচিল-ঘেরা দুমহলা বাড়িটাকে কেন্দ্র করে তার কিশোর মনে একটা পুঞ্জীভূত রহস্য মে আছে, ওদের সম্বন্ধে কেমন বিচিত্র ধারণা। অশোককেও তাই কেমন বিচিত্র লাগে তার।

তেল বিহীন রুক্ষ ঝাঁকড়া মাথা, পরনে একটা শাড়ি—তাও ধুলো আর ময়লায় বিবর্ণ। দমের মুখখানা তবুও কচি কাঁচা।

তরুণ দুটি কিশোর-কিশোরী কেমন অবাক আনমনা হয়ে চেয়ে থাকে দূরে, গ্রামের ওপাশে র্জন মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেনখানা—একটু গিয়েই বন-সীমা আর পাহাড়ের াড়ালে হারিয়ে যায়।

আকাশে তখনও কালো ধোঁয়া কেমন পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমে রয়েছে, বাতাসে ভেসে চলেছে।

পলাশ বনে নেমেছে রং-এর হোরি।

আনমনে অশোক বলে,—অমনি ট্রেনে করে দূরে দূরে চলে যাবো আমি।

কদম ট্রেনই দেখেছে। একবার মাত্র চড়েছে সেবার পানাগড়ে মেলা দেখতে গিয়ে। কেমন য় করে।

—সত্যি !

—হ্যাঁ। বর্ধমানে পড়তে যেতে হবে এইবার।

কদম কথা বলে না।

দিনের আলোয় ঝলমল ওই মাঠ—পলাশের রং, পাখি-ডাকা নীল নির্জন বনস্থলী কেমন যাদময় পাণ্ডুর হয়ে ওঠে তার মনে।

মনে হয় ছোটবাবু কেমন অজানা ওই দূর আসমানের লোক—ওকে ধরা যায় না।

অবাক হয়ে বলে অশোক,—কাঁদছিস ?

—কই না !

চেপে গেল কদম। কেমন যেন এড়িয়ে যায় তাকে। সেদিনের কিশোর দুটি মন কেমন নেছিল দুজন দুজনকে।

অশোককে সেই-ই রুদ্ধ বন্দীশালার পাঁচিল টপকাতে শিখিয়েছিল, মনে এনেছিল নতুন অন্য বন সম্বন্ধে একটা ধারণা। সারা গ্রামের অন্ধিসন্ধি—বন—মাঠ ঘুরে ঘুরে সেই তরুণ মন মুক্ত ার পৃথিবী আর তার মানুষকে চিনেছিল, তাদের চোনবার উপায় ছিল না দু-মহলা সেই বিলাসের সাদ থেকে। কেমন তাদের ভালবেসে ফেলেছিল অশোক—নতুন সেই সুন্দর বৃহৎ পৃথিবীকে লবাসতে গিয়ে। তার থেকে কদমও আলাদা নয়। অবাক হয়—তার চোখে জল দেখে।

কদম কথার জবাব দিল না, সরে গেল। তার কাছে ওই সবুজ বনানী, ফুলফোটা পলাশ ন—সব কেমন কালো আঁধারে ঢেকে গেছে। এই প্রথম অনুভব করে একটি কিশোর মন চ্ছেদের নিবিড় বেদনা।

আজও তা ভোলেনি কদম।

তারপরই কদমের বিয়ে হয়ে যায়, হারিয়ে যায় মেয়েটি।

কদমও ভুলে গিয়েছিল সেই দিনগুলোর কথা, অনেক মেয়ের জীবনেই সেই রঙ্গীন দিন

আসে প্রজাপতির মত পাখনা মেলে—আবার কোন দিগন্তে হারিয়ে যায়। দুঃখ পায়—দুঃখও ভোলে, তাদের নতুন জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলে।

কদমও তাই চেষ্টা করেছিল স্বামীর ঘরে এসে। নিদারুণ সেই চেষ্টায় নতুন সংসা পেতেছিল।

অভাবের সংসার, এতগুলো খাটিয়ে মরদ। স্বামী —বৃদ্ধ শ্বশুর—দেওর—পোষ্যবর্গ—স হাল সে ধরেছিল।

ভেবেছিল বানচাল সংসারের নৌকাটাকে উত্তাল তুফান থেকে বাঁচাতে পারাটাই সবচে বড় চাওয়া তার।

দিনরাত কাজ আর কাজ করে গেছে কদম।

ধান ভানতেও দেয়নি বাইরে, ভানারীকে মজুরি বাবদ যে ধান দিতে হবে তাও কম না নিজেই সিজেভিজে করেছে। মুড়ি ভেজেছে ভোর থেকে উঠে। কামিনিও রাখেনি, এক উঠোন—ঘরদোরে ছড়ামাডুলি দিয়েছে ভোরে উঠে, সংসারের অবিরাম ঘূর্ণায়মান চাকাটা তিলে তিলে পিষে মরেছে।

বুড়ো অতুল কামার বলে—বৌমা, একটা লোকজন রাখি। তিন বাপবেটায় ওজকার করছি মত দেয়নি কদম। ডাঁটো পুরু শক্ত সমর্থ একটি মেয়ে। ভুবন স্ত্রীর দিকে চাইবার সম পায়নি। সারাদিন ওই শালের আগুনে তেতেপুড়ে হাতুড়ি পিটে এসে পড়েছে আর ঘুমিয়েছে

ক্রমশঃ দিন বদলেছে।

আজ বাড়িতে ধানের মরাই বেঁধেছে অতুল। ভুবন আজ আর পরের শালে মজুর খা না, নিজে শাল করেছে দুটো। শূন্য অভাবের সংসারে আজ পূর্ণতার দিন এসেছে।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

এতদিন কোন হিসাব করেনি—লাভ লোকসান খতিয়ে দেখেনি কদম। আজ মনের কো জমেছে কোথায় শ্লেষ আর গ্লানির আবছা কালো মেঘ। কি সে পেয়েছে ?

নতুন জা এসেছে—ছোট জা মালতীর কোলে ভরে এসেছে একটি নবাগত শিশু। কে ঘর ভরে উঠেছে। তাকে বুকে তুলে নিয়েছে কদম।

কিন্তু দিনের আলোয় যে দুঃখ চাপবার জন্য নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরে, রাতে অন্ধকার নির্জনে সেই বুকচাপা দুঃখ আর হতাশায় ঝড় ওঠে।

হু হু ঝড়। একটার পর একটা আঘাত তার মনের সব শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে ব্যাহত করেছে।

কেমন যেন চমকে উঠেছিল কদম সেদিন গোকুলের কথা শুনে। একবার সামনাসামি দেখা হয় নি—ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। করবে একদিন।

কিন্তু আশ্চর্য হয়েছে কদম, যে ভুবনকে—যাদেরকে এতকাল বিশ্বাস করে এসেছে সে, মাটিতে ঘর বেঁধেছে সেই ঘর বাঁধার কি দাম, সেই বিশ্বাসের মূল কত হালকা মাটিতে পোঁতা—দেখে বিস্মিত হয়েছে কদম। চমকে উঠেছে।

বিতৃষ্ণা এসেছে মনের গহনে এই সংসারের উপর। নিবিড় একটি গোপন কোণে উঠেছে লো মেঘ।

ব্যর্থ সে ! মা হতে পারেনি।

পূর্ণ হলে বোধ হয়, এই ঝড় আঘাতগুলো কোথাও স্পর্শ করতো না। অত্যন্ত এক অসহায় । স্বামী কোন অন্য মানুষ। কিন্তু সন্তান নিজের দেহরক্তসঞ্জাত একটি সত্তা, তার সঙ্গে নারীর র্শর্ক সব চেয়ে আপন, সেই সবচেয়ে বড় নির্ভর। এমন কি স্বামীর চেয়েও । স্বামী মারা য়ার পরও সেই পুত্রের নির্ভরেই বেঁচে থাকে মেয়েরা।

তেমনি কেউ নেই কদমের, জীবনের অসীম শূন্যতা তাই মন ভরে তোলে।

সবদিক থেকেই ব্যর্থ বঞ্চিত সে।

আঘাতই পেয়েছে নানা ভাবে। তবু একটা নির্ভর তার ছিল। গোপন মনের অন্তরে সেই পরম র্ভরটুকুকে সযত্নে স্মৃতির মণিকোঠার অক্ষয় সম্পদের মত আগলে রেখেছিল কদম। আবাল্যের ই স্মৃতির অমূল্য স্মরণ সম্পদটুকুও আজকে নিষ্ঠুর হাতে লুণ্ঠন করে নিতে চলেছে।

প্রীতিকে সেদিন অশোকের ওখানে দেখে অবাক হয়েছিল কদম। ভাবেনি অশোক তার জানতেই ওইখানে ধরা দেবে।

কদমের মনে হয় সব তার নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

এই আঘাতটাই বেজেছে সব থেকে বেশি তার অবুঝ মনের অতলে।

সেই সন্ধ্যারাত্রের সেই ছবিটা ভোলেনি কদম।

ছোটবাবু আর প্রীতির সেই নিবিড় দুর্লভ মুহূর্তের দৃশ্যটা। এক নিমেষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে।

সরে এসেছিল অন্ধকারে; আবিষ্কার করেছিল, নিদারুণভাবে হেরে চলেছে কদম একটার একটা ক্ষেত্রে—জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে।

আজ তাই হিসাব করে। দেখেছে জমার ঘরে কেবল শূন্যই।

রাত কত জানে না।

অসাড়ে ঘুমুচ্ছে ভুবন, একটা জড় পদার্থের মত।

কোন সাড়া নেই, চেতনা নেই। বলিষ্ঠ দুর্মদ দেহটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নড়ছে। ওইটুকু ওর থাকার একমাত্র পরিচয়। আর দিনমানের হাঁকডাক, ব্যস ওই পর্যন্ত।

গায়ে কেমন যেন শালের আংরা আর রাং খাদের ঘাম মেশানো বিশ্রী উৎকট গন্ধ ওঠে। প্রথম আজ বিদ্রোহী কোন অতৃপ্ত নারীর সত্তা জেগে উঠেছে শান্ত ওই কল্যাণী কদমের রের অতলে। সে আজ সব কিছুকে নীরবে ঘৃণা করে। মনে করে এই ঘর বাঁধা—এই বাসার অভিনয়ে বেঁচে থাকাটাই কেমন অর্থহীন।—শুধু একটা বোঝা বওয়াই মাত্র।

হু হু বাতাস বয়, তারাজ্বলা আকাশের অসীমে কেমন যেন হু হু কান্না জাগে।

বাঁশির সুরটা ব্যর্থ অন্তরের নিবিড় কান্নায় গ্রামসীমার বেণুবন মর্মরে মিশে গেছে। কদম ছে—একক অসহায় ব্যর্থ একটি নারী।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রির অন্ধকারে বিস্ফোরণের শব্দ আসে, মালিয়াড়ার জঙ্গল সুঁদে মহি পাথরের স্তরে ওরা ডিনামাইট চার্জ করে পাথর ফাটাচ্ছে। আবছা আলো দু-এর দেখা যায় বন পাহাড়ের কোলে, ধরিত্রীর বুক কি এক নবকালের জন্মবেদনায় কেঁপে ও দুঃসহ আর্তিতে।

ফাটছে কঠিন মৃত্তিকার অতলে পালল শিলার বুক।

বুম্—ম্—ম্ !

নৈশ অন্ধকার কেঁপে ওঠে গুরু গুরু গর্জনে।

তবুও ওই বাঁশির সুরের পরশ তেমনিই রয়ে গেছে। বাতাসে বাতাসে পুঞ্জীভূত একা বেদনায় কাঁপছে সেই সুরটা রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকারে।

শহরেই ফিরে এসেছে প্রীতি।

ক'দিন গ্রামে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিল। অন্ধকার সেখানে সন্ধ্যা থেকেই বাসা বাঁ বুকচাপা দমবন্ধকরা সেই আঁধার থেকে আলোয় এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে।

পাহাড়ী আর সিঁড়ি সিঁড়ি জমিগুলো গিয়ে শালবন সীমায় মিশেছে। তবু এখানে আ জ্বলে, কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে শহর।

বাতাসে সুর ওঠে।

সিনেমা লোকজন জলসা—সবই আছে। এই যেন প্রীতির জগৎ। এখানের ভিড়ে অশোককে হারিয়ে ফেলে।

আসবার সময় দেখা হয়েছিল অশোকের সঙ্গে।

—চলে যাচ্ছো ?

অশোকের দুচোখে নিবিড় একটি বেদনার ছায়া দেখে মনে মনে খুশিই হয়েছিল প্রী জবাব দেয়,

—হ্যাঁ।

অশোককেও যেতে হবে শহরে, কদিন লাগবে সেখানের কাজ সারতে। তার কথাটা বলে প্রীতি,

—বেশ তো।

হাসে প্রীতি। আমন্ত্রণ জানায়।

—আমাদের ওখানে এলে খুশিই হবো।

বাসটা এসে পড়েছিল, আর কথাবার্তা বেশি দূর এগোয়নি। প্রীতি দেখেছিল অশো দাঁড়িয়ে থাকতে।

আজ শহরের ভিড়ের প্রীতির মনে হয় অশোককে ঠিক যেন চেনেনি সে। ওর ম অতলে রয়েছে অন্য কোন মানুষ। কি যেন খেয়ালের বশেই সে তার দিকে এগিয়ে এসে

প্রশান্ত এই কাজের মধ্যেও অবকাশ খুঁজে নেয়। ওরা কিছু দিন থেকে কাঞ্চন মৃগয়ায়

ঠছে, প্রশান্ত আর শহরের ধানকল-সুতোকলের মালিক গজানন রাঠির ছেলে চৌথমল রাঠি। দুজনে ইতিমধ্যে দুর্গাপুরের ব্যারেজে অনেক কাজই ঠিকে নিয়েছে, পাথর যোগান দিয়ে নছে হাজার হাজার টাকার।

কি যেন নেশায় পেয়েছে তাদের, একটার পর একটা বিল পাচ্ছে, অনায়াসেই আসছে টাকা, জও জুটছে ঠিক একটার পর একটা।

কি করে কাজ জোটাতে হয় সে পথটাও জেনে ফেলেছে ওরা। সেদিন প্রশান্ত প্রীতিকে রে ফিরে আসতে দেখে খুশি হয়।—যাক, ফিরেছো তাহলে?

প্রীতি হাসে, সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যবতী একটি নারী। ওর মনের কামনায় প্রশান্ত কেমন রয়ে যায়।

ওর মতই প্রীতির মনে একটা উদ্দাম লাস্যময়ী নারী আছে, যাকে প্রশান্ত ভালবাসে, ওরা মন নেশার মত তিলে তিলে সারা শরীরের তন্ত্রীমতে সেই নেশার সাড়া জাগায়। প্রশান্ত তমধ্যে নিজের বাড়িতে একটা মহল আলাদা করে নিয়েছে, তার ব্যবসা আর বন্ধুদের জন্যই করেছে এটা।

ব্যবসা করতে গেলে আজকাল সমাজেও প্রতিষ্ঠা পেতে হয়। তারজন্য সংস্কৃতির পথই সব য়ে সোজা পথ।

প্রশান্ত চুপ করে বসে থাকে।

ঘরের মেঝেতে এসে লুটিয়ে পড়েছে বেলা শেষের একফালি হলুদ সোনালী আলো, মিঃ ঠর মুখে চোখে খুশির আভা। বলে চলেছে প্রশান্ত প্রীতিকে।

—এসেছো এইবার বুঝে নাও, এদিকের রবীন্দ্র-উৎসবের আর দেরি নেই।

রাঠি হালফিল বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে পড়েছে। বলে ওঠে,

—হ্যাঁ প্রীতিদেবী, সবসে আচ্ছা ফাংশন করনে হোগা রূপেয়া যা লাগে পরোয়া নেই।

প্রশান্ত প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে।

জীবনের স্রোতে এমনি করে কোথাও যেন উধাও হয়ে যেতে চায় তারা।

শহরের অনেকেই এসে জোটে ওই হালফিল গড়ে ওঠা ধনীলোকের সংস্থায়। কর্তাস্থানীয় াকেও আসেন।

প্রশান্ত তাদের আপ্যায়নের ত্রুটি করে না। ওদিকের ঘরে তারজন্য পানীয়ের স্থাও থাকে।

রাত নামে।

শহরের রাস্তায় তবু চাঁদ ওঠে। ঝাঁকড়া বট অশ্বত্থ শাল গাছের মাথায় থমথমে রহস্যভরা টা আবছা আঁধার, নীচে আলো-ছায়ার হিজিবিজি কাটা।

ওরই মাঝ দিয়ে আসছে গাড়িটা।

প্রশান্তের দুচোখে পানীয়ের নেশা। প্রীতিও দেখেছে ওকে, বলিষ্ঠ দুর্বার একটি মানুষ। প্রশান্তের দুচোখে কি এক কামনার নেশা। প্রীতি বলে ওঠে,

—বাড়ি যাবো।

হাসে প্রশান্ত,—এমনি রাতে না হয় একটু ঘুরলাম, এমন কিছু দেরি হবে না।

প্রীতির মনে একটা সাড়া জাগে। এমনি করে মাঝে মাঝে শালবনের ছায়াবীথি দিয়ে যেন কোথায় অজানায় হারিয়ে গেছে। তবু বলে ওঠে,

—বেশ তো লোক তুমি ?

প্রশান্ত হাসে। গাড়িটা দ্বারকেশ্বর নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে ছায়া ঘন নির্জন পথটা দিয়ে

মাঠের বুক ক্রমশঃ নেমে গেছে, এখান ওখানে দু একটা বাড়ি, নতুন শহর গড়ে উঠে এই দিকে।

প্রশান্ত বলে ওঠে,

—জীবনে আজ সময় অনেক কম প্রীতি, কেবল হুড়মুড়িয়ে চলা ছাড়া দাঁড়াবার অবস নেই। তবু মন আজও মরেনি।

হয়তো তাই আজও ওরা বাঁচবে একজন আর একজনকে কেন্দ্র করে।

প্রীতি কি ভাবছে।

প্রশান্তের হাতখানা ওর হাতে। নদীর বালির উপর পড়েছে চাঁদের আলো। সাদা রূপ বালি, একফালি জলরেখা ওরই মাঝে কোন রকমে টিকে আছে, তির তির করে বইছে উষ মরুভূমির রুক্ষতার মাঝে প্রাণের এইটুকু প্রবাহ।

ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যায়, সাদা বালিয়াড়ি আর কাশ ফুলের উত্ত বিছানো ওই নদীর বিস্তারের দিকে।

প্রশান্তের হাতখানা প্রীতির হাতে। প্রীতি আজ স্বপ্ন দেখছে।

এমনিই জীবন, এই স্বপ্ন আর এমনি কোন দুর্মদ একটি মানুষকে সে চেয়েছিল জীব

সহজ যাকে পাওয়া যায় তেমনি একটি মন নিয়ে খুশি নয় সে, একালের জীবনের স তাল রেখে চলতে পারবে না সে।

অশোককে মনে হয় প্রশান্তের তুলনায় অনেক নীচে। প্রীতির মনে হয় আজকের ঝড়ের দি ওরা ভেসে যাবে স্রোতের আবর্তে।

প্রশান্ত বলে চলেছে,

—জীবনকে আমি ভোগ করতে চাই প্রীতি। সব কাজের মাঝে একটু অবসর আমার সেই অবসরটুকু ভরে তুলবে তুমি!

প্রীতির দুচোখে চাঁদের আলো পড়া নদীর এতটুকু জলের ঝিলিমিলি ফুটে ওঠে। সারা হারিয়ে যাবার সুর ওঠে।

অশোক ক'দিন থেকেই কথাটা ভেবেছে।

শহরে এসেছে অনেক আশা নিয়ে। গ্রামের জীবনে কেমন বিতৃষ্ণা এসেছে তার, কর্ম শান্ত জীবন যাত্রাকে প্রীতি বলে অক্ষমের আশ্রয়।

কথাটা হয় তো সত্যিই।

প্রীতির দুচোখের চাহনি, তার কথাগুলো কেমন যেন দিক্‌ভ্রান্ত করেছে তাকে।

টাকা বেশ কিছু পেয়েছে।

শহরেই একটা বাড়ি কিনবে, এইখানেই ব্যবসাপত্র কিছু ফাঁদবে। প্রীতিকে পাশে পেলে সেও নতুন করে আবার জীবন কাটাতে পারবে। নানা কাজ আর আশা নিয়েই আজ শহরে এসেছে অশোক।

দু-চার দিনের জন্য সব ছেড়ে এসে এমনি একটি আলো ঝলমল পরিবেশ তার মন্দ লাগে না।

ছোট হোটেলটা অপরিষ্কার হলেও তলাটা বেশ ছিমছাম। ছোট নদীর ধারে বাঁশবন আর শিমুল গাছ ক'টা জড়াজড়ি করে রয়েছে। মাঝে মাঝে আলোগুলো জ্বলছে।

কাজকর্ম নেই। অবকাশ মুহূর্তগুলোয় প্রীতির কথা মনে পড়ে। এগিয়ে যায় অশোক নীলাম্বরবাবুর বাড়ির দিকে।

ওখানে নীলাম্বরবাবু একটি যেন নির্বাসিত মানুষ। বাড়ি করেছেন সত্যি, অনেক বাড়িও উঠেছে নতুন মাঠে, বাসিন্দাও এসেছে।

তবু এরা কেমন ছাড়া ছাড়া, কেউ কারও সঙ্গে কোন প্রকারেই জড়িত নয়। এদের ভাগ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামীণ সমাজের মত এদের পরস্পরের মাঝে কোন আত্মিক যোগসূত্র বা সম্পর্ক নেই। কোন প্রীতির সম্বন্ধও গড়ে ওঠেনি, সব কেমন ছাড়া ছাড়া সমাজ বন্ধনহীন জীব।

তাই এদের মধ্যে একটা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মনের দিক থেকে শহুরে জীবরা যেন নীতিবিহীন, আর একটু লাগাম ছেঁড়া উদ্দাম। মনের আদিম প্রবৃত্তিটাও তাই যেন ঈষৎ প্রকট।

এখানে এসে দেখেছেন তিনি প্রীতির সেই পরিবর্তন। ওর যত্রতত্র অবাধ স্বাধীনতায় তিনি বাধা দেন নি, কিন্তু মনে হয়েছে ভুলই করেছেন তিনি।

আজ প্রীতির ব্যবহার, ওর চাল-চলনও ভাল ঠেকে না।

একটু বলার চেষ্টাও করেছেন নীলাম্বরবাবু।

—এসব নাই বা করলে ?

প্রীতি জবাব দিয়েছিল,

—সমাজে মিশলেই দোষ ? নীলাম্বরবাবু জবাব দেননি তার প্রশ্নের। সমাজ যে আজ কোনখানে কোথায় নেমেছে, কি তার অর্থ এবং উদ্দেশ্য তাও জানেন তিনি। তবু জেনে-শুনেও ওই প্রশান্ত, রাঠি, আরও কাদের তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নীতি আর মত বদলানোয় সিদ্ধ, নীতিহীন, তারা সর্বদিকেই এমনি ফাঁকো আর ভঙ্গুর।

তাই ভয় হয় তাঁর।

তবু চুপ করে থাকেন, আজ তিনি যেন অসহায় একটি মানুষ।

রাত হয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি প্রীতি। প্রায়ই রাত করে ফেরে। বলে, ক্লাবে ফাংশানের রিহার্সাল চলেছে।

স্তব্ধ রাত্রির তারাজ্বালা আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন নীলাম্বরবাবু। দূর দিগন্ত সীমায় কালো পাহাড়ের ছায়াটা মাথা তুলে রয়েছে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইলেন।

—অশোক ?

এগিয়ে আসে অশোক। বলে ওঠে,

—শহরে এলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

—বসো।

অশোক এদিক ওদিক চাইছে, এখুনি বোধহয় প্রীতি বের হয়ে আসবে, ওর হাসি আর কণ্ঠস্বর নির্জন পরিবেশ মধুর হয়ে উঠবে। বাড়িটা তবু স্তব্ধ থেকে যায়। একটু হয় অশোক।

বলে চলেছে.—ভাবছি একটা বাড়ি কিনবো এখানে।

একটু অবাক হন নীলাম্বরবাবু।

—কেন?

—ভাবছি এইখানেই থাকবো। তাছাড়া ব্যবসাপত্র যাহোক একটা করবো।

নীলাম্বরবাবু অশোকের দিকে চেয়ে থাকেন। মনে হয় এতদিনের ওর আদর্শ, কর্মপন্থা বোধহয় আরও পাঁচজনের মতই ধ্বসে পড়েছে শহরের জীবনের নীল নেশায়, আলোর ইশারায়, কিন্তু এ যে আলো নয় আলেয়া, তা ও বোধহয় বোঝেনি।

বলেন নীলাম্বরবাবু ,

—কেন, গ্রামে থেকে কিছু করা যায় না ?

অশোক চুপ করে থাকে, কথাটা সেও ভেবেছে কিন্তু তবু যেন কেমন শূণ্য মনে হয়ে সেই ভাবনা। অশোক প্রশ্ন করে নীলাম্বরবাবুকে,—আপনি কি বলেন?

নীলাম্বরবাবু অসহায় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। বলে ওঠেন,—এ সম্বন্ধে কা কথাই ও ক্ষেত্রে খাটে না অশোক। আমরা সবাই গ্রাম ছেড়ে উৎখাত হয়ে একদিন শহরে নকল মানুষে পরিণত হবো এইটাই যেন নিয়তির বিধান। গ্রাম বলতে মনে হয় দুঃখ-দারি পীড়িত কতকগুলো মানুষ আর অসহায় জীবের আস্তানা। কিন্তু দেশ, সমাজ বলতে ক'টা শ নয়, সারা বাংলার অগণিত গ্রাম। তাদের যদি রূপ না বদলায়, কোন উন্নতি না হয়, তাহলে সা জাতের দারিদ্র কোনদিনই ঘুছবে না। আমি অবশ্য ভীরুর মত পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে এখানে পড়ে আছি। তাই বলে এই শহরের জীবনকে ভালবাসি না, এর সব কালোটুকুকে ম মেখে নিয়েছি। এক অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি অশোক। কিন্তু মুক্তির পথ কই ? তাই যারা সেখা মুক্তির পথ খুঁজছে, সেই পুরানো জগদ্দল পাথরটাকে ঠেলে নতুন দিনের মুখ দেখতে চায় তাদে শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস করি তাদের স্বপ্ন একদিন সার্থক হবে।

অশোক চুপ করে থাকে।

একথাটা সেও বিশ্বাস করে, দিন একদিন বদলাবেই শহর শিল্প আর গ্রাম কোনটাকে কোনটাই টিকতে পারে না, তিনের মাঝে একটা সমতা আসতেই হবে।

রাত হয়ে আসে। নীলাম্বরবাবু বলেন,

—প্রীতি এখনও ফেরেনি, ফিরতে বোধহয় দেরি হবে।

অশোক উঠে পড়ে।—চলি, রাত হয়েছে।

নীলাম্বরবাবু ওখান থেকে বের হয়ে সোজা পথ ধরে ফিরছে অশোক হোটেলের দিকে। পথ জনহীন, নদীর ধারে রূপালি বালুচরে কেমন স্বপ্নমাখা রাত নেমেছে. দু-একটা তিতির ডাকছে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে।

বাতাসে কাশ বনের হাওয়ায় একটানা সুর ওঠে।

ছায়াঘন ছাতিম গাছের নীচে দাঁড়াল অশোক, হঠাৎ একটা সুর কানে আসে। চেনা ওই সুর।

প্রীতি এই পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে, রাত্রির স্তব্ধতায় ওই সুরটা ওঠে। কোন রহস্যময়ী নারী তাকে কোন নিশির ডাকের মত ডেকে ডেকে এই অজানা ছায়ান্ধকার রাজ্যে নিয়ে এসে ওই অসীমে হারিয়ে গেছে।

একটু থমকে ওঠে অশোক প্রীতি আর প্রশান্তকে এখানে দেখে। একটা ফুল ভারাবনত আকন্দ গাছের নীচে বসে আছে ওরা দুজনে। প্রীতির দেহ বেষ্টন করে রয়েছে প্রশান্তের হাতটা. দুচোখে কি যেন স্বপ্নের মায়া।

অশোক চুপ করে সরে এল।

ওখানে ওই অধরা সুরের রাজ্যে তার কোন প্রবেশাধিকার নেই। ওই রহস্যময়ী নারীকে সে আজ চেনে না, প্রীতিও এই অশোককে একেবারে ভুলে গেছে।

সে আজ অন্যপূর্বা স্বপ্নবিভোরা কোন নারী।

অশোক আঁধারে সরে এল ; সব কিছু তার সামনে আজ হারিয়ে গেছে।

জীবনের একটা উষর বালুচরে সে এসেছিল তৃষ্ণার পানীয়ের সন্ধানে, বহুদূর পথ পার হয়ে এসেছে সে। তৃষ্ণার্ত একটি মানুষ।

হঠাৎ আবিষ্কার করে, জল মনে করে যার সন্ধানে ছুটেছে—সেটা জল নয়, মরীচিকা। মায়া হরিণের পিছু পিছুই সে ছুটেছে বনপথে ক্লান্তবিরক্ত দেহমন নিয়ে।

স্তব্ধ পথটা এসে হোটেলে মিশেছে।

রাত কত জানেন। নিশুতি ঘরে এসে উঠল অশোক।

সারা মনে তখনও রাতের হাওয়া ঝড় তুলেছে—টুকরো কালো মেঘ চারদিক আঁধারে ঢেকে ফেলেছে ধীরে ধীরে।

তারাগুলোও হারিয়ে গেছে অতলান্ত ওই অন্ধকারে।

কি যেন একটা আলেয়ার পিছনেই ঘুরেছিল সে, হঠাৎ সেই ভুল তার ভেঙ্গেছে। প্রীতির গানটা মনে পড়ে।

কোথায় অশোক অত্যন্ত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল, তাই এই আঘাতটা নিষ্ঠুর ভাবেই বেজেছে তার মনে।

নীলাম্বরবাবু ভোরেই ওঠেন।

সকালটা এখানে কেমন শূন্য বলে মনে হয়। ওপাশে ফাঁকা মাঠের শেষে পাহাড়টা সীমা প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

পাখিগুলো ডাকে।

প্রীতির এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি, ও কাল রাত করেই ফিরেছে। নীলাম্বরবাবু বলেছিলে অশোকের কথাটা, কেমন যেন খুব ঔৎসুক্য দেখায়নি প্রীতি।

অবাক হয়েছিলেন নীলাম্বরবাবু।

সকালেই অশোককে আসতে দেখে ওর দিকে চাইলেন তিনি।—এসো।

অশোকের মুখে একটা থমথমে গাম্ভীর্য। বলে ওঠে,

—আজই গ্রামে ফিরছি।

নীলাম্বরবাবু ওর দিকে চাইলেন।

—সদরের কি সব ছিল বল্লে ? বাড়ি কেনার ব্যাপারে—অশোক স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে

—ওসব এখন থাক। শহরে আর কাজ নেই।

প্রীতি ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে বের হয়ে আসছে কাপড়চোপড় বদলে। অশোকের কথাগুলো শুনেছে সে।

চা দিয়ে গেছে চাকরটা। সেও সহজ ভাবে ঘরে ঢুকে বসল।

—কতক্ষণ এসেছো ?

—একটু আগে।

প্রীতি বলে ওঠে,—শহরেই থাকবে শুনলাম। যাক্ সুমতি হয়েছে তাহলে।

অশোক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে,

—না গ্রামেই ফিরছি আজই। আজই।

প্রীতি হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। অশোক যেন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রয়েছে তার দিকে

চা খাওয়া হয়ে গেছে। অশোক উঠবে, প্রীতিই বলে,

—আমিও লাইব্রেরির দিকে যাবো, চলো একসঙ্গেই বেরোনো যাক্।

সকালের সোনালি রোদ গাছগুলোর মাথায় রং এনেছে। রাস্তার লোক চলাচল বিশেষ শুরু হয়নি। দু-একজন তরকারি ওয়ালা গ্রামের দিক থেকে বাজারে চলেছে।

বাতাসে তখনও ভিজে ভিজে আভাস। বলে ওঠে প্রীতি।

—হঠাৎ মত বদলালে কেন ?

অশোক আজ কথাটা পরিষ্কার বলে ফেলতে চায়। জবাব দিল,

—দেখলাম, গ্রামের মানুষও শহরে এসে বদলে যায়। লোভী হয়ে ওঠে। যা পায় তার চার পাশে ভাল মন্দ বিবেচনা না করেই তাকে কুড়িয়ে নেয়। কোন ত্যাগ নেই, ভালবাসা নেই আছে শুধু অন্ধ স্বার্থপরতা।

হাসে প্রীতি,—ক'দিনেই দিব্যদর্শন হয়ে গেল ?

অশোক জবাব দেয়,

—হ্যাঁ। একটি রাত্রের একটি ঘটনাই আমার মত বদলে দিয়েছে।

—মানে—একটু চমকে ওঠে প্রীতি।

অশোক বলে ওঠে,—দেখলাম তোমার আমার মত আর পথ দুটোই আলাদা। আর আমার থটাই যে সত্যি, সেই কথাটাই প্রমাণ করার জন্য আমি আজ গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। কথা বললো

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কাল রাত্রে হয়তো সে দেখেছে তাদের। প্রতিবাদ করতে গিয়েও সে কিন্তু করে না।

হাসি আসে প্রীতির, ব্যঙ্গের হাসি।

অশোক একটা পথ চলতি রিক্সা ডাকল। বলে ওঠে,

—আমার কতগুলো জরুরি কাজ আছে। চলি।

রিক্সায় উঠে বসল অশোক।

প্রীতি কথা বলে না। ওর দিকে চেয়ে থাকে

শিশির ভিজে পথ দিয়ে চলেছে রিক্সাটা, একটা মুচকুন্দ চাঁপা গাছের নীচে দিয়ে সে গিয়ে গেল।

প্রীতি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে যে পথে চলেছে তা ঠিক না ভুল, জানে না। কিন্তু ফরার আর পথ নেই।

প্রশান্তের কথা মেনে পড়ে। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে দেরি হয়ে ঘেছে। ওরা তার জন্য পেক্ষা করবে। সকালে চায়ের নেমন্তন্ন আছে প্রশান্তের ওখানে প্রীতির। সে এগিয়ে যায় তার জের পথে।

অশোক হোটেল থেকে বের হয়ে আসবার আয়োজন করছে। তার সারা মনে থমথমে কটা ভাব ; অনেক বেদনায়, অনেক ত্যাগ আর বঞ্চনার মাঝে দাঁড়িয়ে সে জীবনকে চিনেছে।

প্রীতির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয়। অনেক দিন-রাত্রির স্মৃতি জড়ানো সেই পরিচয়, জীবনে ঃশেষ হয়ে গেল।

অশোক এই বঞ্চনাকে সইতে চায়নি। সে চেয়েছিল সহজ ভাবেই প্রীতিকে স্বীকার করে য়ে ঘর বাঁধতে। কিন্তু চোরাবালিতে পা দিতে গিয়ে চমকে উঠেছে সে।

এ যুগের সব ঘরই যেন ওমনি কোন মিথ্যা আপোশের উপর গড়ে উঠেছে, ওরা চরম পদটার সামনে দঁড়িয়ে সেই বিপদকে খেয়াল করেনি।

মানুষের বাঁচার শেষ আশ্রয় এই ভালবাসা, তাকেও এ কালের সভ্যতা কলঙ্কিত—ব্যর্থ র তুলেছে।

গ্রামে তবু এখনও সেই কৃত্রিমতা ঢোকেনি, আজও তারা নিজেকে এমনি করে তিলে তিলে না করে না।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে পিছনে ফিরে চাইল অশোক।

নীলাম্বরবাবু ঢুকছেন, বলে ওঠেন,

—ভাবলাম চলে যাচ্ছো, যাবার আগে একবার দেখা করে যাই।

—বসুন !

নীলাম্বরবাবু ওব দিকে চেয়ে থাকেন, কিছুটা অনুমানে বুঝেছেন অশোকের হঠাৎ চ যাওয়ার কারণ। হয়তো তার ভাবনাটা সত্যি।

প্রীতির ঔদাসীন্যই তাকে আজ বদলে দিয়েছে। প্রীতি ভুল করেছে, করে চলেছে এখন

নীলাম্বরবাবু ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কিছুদিন থেকে দেখেছেন সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অশোকের কোথায় যেন অবলুপ্তি ঘটছে—তার আভাসও তিনি পেয়েছিলে

আর কারোও কঠিন প্রভাব পড়লে মানুষও বদলায়, যেমন লোহার গলা অবস্থায় হাতুড়ি আঘাতে তাকে অস্ত্রও বানানো যায়, আবার শিকলও তৈরি করা যায়। ভালবাসা আর মোহে আগুনে পুড়ে মানুষ গলে যায়—হারিয়ে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব, আত্মসচেতনতা—তখন আ কেউ ইচ্ছে করলেই তাকে সেই মত গড়ে তুলেতে পারে।

অশোকের অবস্থা সেই পর্যায়েই এসে পৌচেছে। নিজেকে হারিয়ে আজ অন্য কিছু অবলম্ব করে বাঁচতে চায়।—সেই অবলম্বন কি—কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরশীল, তা বিচার করবা সামর্থ তখন থাকে না।

একালের এই সামগ্রিক চেতনার মূলে নেই কোন আশা—কোন আদর্শ। তাই হয় ভুলের পর ভুলই করে চলেছে ওরা। অশোকও তার থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

—ওটা কি বলতে পারো অশোক ? কোন্ তারা?

আবছ অন্ধকারে আকাশে ফুটেছে অজস্র তারার দল। ওর মাঝে নীলাভ দ্যুতিতে জ্বলে একটা বড় তারা। অশোক কেমন যেন বিস্মিত হয়েছে ওঁর কথায়। জবাব দেয়,

—কেন ? সপ্তর্ষি মণ্ডল।

—অকূল সমুদ্রে একদিন ও নাকি বহু নাবিককে পথ দেখিয়েছে।

—হ্যাঁ।

নীলাম্বরবাবু একটু থেমে বলে ওঠেন,—আমাদের কালেও তেমনি পথ দেখাবার অনে মানুষ ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী, আচার্য পি-সি-রায়—আরও অনেকে আদর্শও একটা ছিল। ভারতকে স্বাধীন করা। মানুষ হয়ে ওঠা। তারই উন্মাদনায় আমরা লো —পাপ—কামনা সব ভুলেছিলাম। কতটা সার্থক হয়েছিল সেকালের তরুণরা—তার বিচা করবে ইতিহাস, আর আজকের দিনের মানুষ। কিন্তু একালের তারুণ্য—এ যুগের যৌবন আদ আর নির্দেশ হারিয়ে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে ? আগামীকালের মানুষের কাছে এইটা বড় হয়ে উঠবে—তারা একমুঠো শুকনো বাসি ফুলের মালা, দেবসেবাতেও লাগেনি, দেশসেবাতে না। শুধু বিলাসের উপকরণই হয়েই ফুরিয়ে নিঃশেষে হয়ে গেছে।

অশোক ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। চমকে উঠেছে সে। প্রতিটি কথা যেন একটা নির্মম চাবুকে মত তার চেতনার মূলে আঘাত করে চলেছে।

কথাটা সত্যিই। নিজের জীবন দিয়েও তা বুঝতে পারে অশোক। সব কাজ ভুলছে। কি যেন এক উদ্ভুত নেশায় আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে।

নীলাম্বরবাবু বলেন,

—কি কাজ, কি পথ, তা জানি না অশোক। মনে হয়—এরা ভুল করছে। মস্ত ভুল। এ যুগের ছেলে মেয়ে—সবাই। তাই আমার অভিযোগ। একা আমার নয়—প্রতিটি মানুষের আজ এই প্রশ্ন।

খবরটা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে।

অশোকবাবু নাকি সদরে বাড়ি কিনেছে, সেইখানেই থাকবে কি সব ব্যবসাপত্র নিয়ে।

অতুল কামারও কথাটা শোনে। এমোকালী—আরও অনেকেই শুনেছে, তারকবাবুর ওখানে কথাটা আলোচনা হয়।

অবনী বলে,—কথায় আছে না কান টানলেই মাথা আসে—এ তাই হয়েছে।

তারকবাবু প্রশ্ন করেন,

—তা মাথাটি কে হে? অশোক তো কান তা বুঝলাম।

অবনী হাসে,—কেন ওই নীলাম্বরবাবুর মেয়ে !

কদমও কথাটা ভেবেছে। মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা, অশোক এখানের মানুষ নয়। এখানে থাকাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। জীবনে যার কোন আশা, স্বপ্ন আছে, সেই-ই এখান থেকে চলে যায়।

যায় না তারা যারা সে সব হারিয়েছে ।

নিজের কথা মনে হয় কদমের। সারা মনে হু হু ঝড় বয়। নীরবেই মনের মধ্যেই হাহাকার নিয়ে থাকতে হবে তাকে। এই যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি নেই।

এমোকালীও ভাবনায় পড়েছে। আজ তলিয়ে ভাবনার দিন এসেছে আবার এই সমবায়ের দায়-দায়িত্ব তারা নেবে কি করে!

একজন তবু ছিল, বিপদে আপদে তার ওপর ভরসা করতে পারতো। সেই অশোকবাবুও চলে গেছে।

সদরে এসেছে এমোকালী মহাজনের গদিতে।

অশোকবাবু কোথায় আছে জানে না, একবার দেখা করে জিজ্ঞাসা যেতো কথাটা কতদূর সত্য!

ওকে দেখতেও ইচ্ছে করে। মন কেমন করে ওর জন্যে।

কাজকর্ম সেরে গ্রামের দিকে ফিরছে কালী ক্ষুণ্ণ মনে। বাসের ছাদে তুলেছে কয়েক বস্তা গাং খুট বাসনপত্র, হঠাৎ ওদিকে সাইকেল রিক্সা থেকে নেমে অশোককে এগিয়ে আসতে দেখে ছুটে যায় কালী। আনন্দে চীৎকার করে ওঠে,

—ছুটবাবু !

অশোক ফিরছে গ্রামের দিকে।

নীলাম্বরবাবুর কথাগুলো ভেবেছে, মনে হয়েছে সবই সত্যি। এই ভাঙ্গাগড়ার দিনে মানুষও অনেক দুঃখ বেদনা পায়, অনেকেই এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে।

কিন্তু কিছু মানুষ থাকবে যারা এর মাঝেও দুঃখ বঞ্চনা সয়ে বাঁচার পথ খুঁজবে সেই চিরন্তন জ্বলন্ত আলোক-শিখার ক্ষীণ আলোয়।

এরই নাম জীবনায়ন।

অশোক তাই যেন ফিরে চলেছে গ্রামের দিকেই আজ নতুন মন নিয়ে।

কালীকে দেখে এগিয়ে আসে অশোক।

—তুমি !

অশোককে প্রণাম করে কালী। বলে ওঠে,

—আমাদিকে ফেলে চলেন এলেন ছুটবাবু? অশোক ওর বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কালী বলে ওঠে, —ভাবছি সমবায় তুলে দেব, শেষ মেষ কি জেলে যাবো আমরা মুখ্যু সুখ্যু লোক, মামাও তাই বল্লেক।

হাসে অশোক।

—তার দরকার হবে না কালী। মালপত্রগুলো তোল ছাদে—ওই সুটকেশ, হোল্ডঅলটা

কালী অবাক হয়।—আজ্ঞা ! তাহলে—

অশোক জবাব দেয়,

গ্রামের ছেলে গ্রামেই ফিরছি কালী। জয়-পরাজয় সেখানেই যা হোক হবে।

—সত্যি ?

কালী টিপ করে আবার প্রণাম করে দৌড়ল বাসের দিকে। এক খাবলায় ওর সুটকেশ হোল্ডঅল তুলে নিয়ে হাঁক পাড়ে,—ওহে, ও ভাই —ছাদের ওপর এ দুটো তুলে লাও কেনে

তাড়াতাড়ি করে কালীচরণ, মনে হয় এ দুটো এখুনিই ছাদে না তুলতে পারলে বোধহয় অশোকবাবু আবার নামিয়ে নিয়ে পথ ধরবে, তাই না তোলা অবধি স্বস্তি নেই তার।

বৈকালের সোনালি আলোয় শালবন ভরে উঠেছে।

পথটা তার খুব চেনা। চড়াই উৎরাই বয়ে পথটা চলেছে, দুপাশে, ওর ছায়াচ্ছন্ন গাছের সমারোহ।

আম—জাম—বট মহুয়া গাছগুলো কতকাল পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে এমনি অনেক মানুষের আসা-যাওয়া দেখেছে, কত আশা আনন্দ ভরা মনের পরতে ওরা আলো আঁধারি জাল বুনেছে ওদের বুকে রৌদ্র-ছায়ার খেলায় কোন অলস অপরাহ্ণে।

আজও এমনি অপরাহ্ন বেলায় ওর মনে একটি স্বপ্ন জাগে। পাখি ডাকে, লাল মাটির বুকে ওই সোনারোদ আর সবুজ দিগন্তসীমা শান্তির ছায়া আনে তার মাঝে।

শহর থেকে গ্রামে ফিরছে নতুন একটি মানুষ। কালীচরণ মনের খুশিতে গান ধরেছে

বেশ ভিড়। সবাই প্রায় চলেছে লোহাকারখানায় কাজের সন্ধানে। তাদের মুখ কেমন স্তব্ধতা র চিন্তার ছায়া।

ভয়ে ভয়ে চলেছে তারা।

এদের মাঝে বসে কালীচরণ আজ খুশিভরে গুনগুনিয়ে গান গাইছে।

অশোকের ডাকে হুঁশ ফেরে।

—শালিন্দীর বন পার হয়েছি কালী।

—তাই নাকি ?

ওরা উঠে পড়ে, এইবার বাস থেকে নামতে হবে ওদের।

দেড়-ঠেঙ্গে সতীশ ভটচায বাতাসের ইশারা বোঝে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আর চেতন মনের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছে—কেমন যেন দিন বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে লের হাওয়াও।

তারকরত্নবাবুর বড় বাড়িটার গায়ে অনেকদিন ধরেই চুন পলেস্তারা, এমন কি চুনের কলিও ড়নি। ওর খামার বাড়ির মুলুক জোড়া পাঁচিল সেই যে ভেঙ্গেছে—তাও আর মেরামত নি, বরং দু'এক জায়গায় ফাটল ধরে ধ্বসে পড়েছে। বাড়ির ভিতরের সাজানো বাগান ই আগুন লাগার পর থেকে যে পুড়ে ঝলসে গেছে, তা আর সবুজ হয়ে ওঠেনি। গনোলিয়া, গন্ধরাজ, শিউলি ফুলের সবুজ গাছগুলো পুড়ে গেছে—মাটিতে ছিটিয়ে রয়েছে নও শ্রীহীন কালো ছাই-এর দাগ।

নিঃশেষ হয়ে গেছে হলুদ খড়ের পাহাড়-প্রমাণ সঞ্চয়। কলা গাছের নিবিড় প্রহরাও কেমন থল হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছে সতীশ ভটচায, সকালের আড্ডাধারী ওই হেলু ন্টার, যতীন, মুক্তি চাটুয্যে—আরও অনেকের উপস্থিতি কেমন কমে যাচ্ছে। যদিও বা কেউ সে—থাকে না বেশিক্ষণ।

চা-এর মাত্রাও কমে আসছে, মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ চেয়েও চা আসে না, যদি বা আসে ও গুড়ের বিবর্ণ বদগন্ধওয়ালা চা। সদরের সেই ফিকে গোলাবী খোসবুদার চা আজ দেখা য় না তারকবাবুর বাড়িতে।

সতীশ ভটচায জানে সামনের ওই ধানের গোলাগুলোও প্রায়ই শূন্য। মা লক্ষ্মী একবার র গেছেন এবং তাকে ফেরানো সত্যিই কঠিন। এ সতীশ ভটচায মানে। তারকরত্নবাবুর থ-চোখে কেমন যেন একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গ্রহাচার্য সতীশ জবাবে বলে,

—শনির অন্তর্দশা চলেছে।

একদিন দেউড়ির দারোয়ানদের জবাব হয়ে গেল। বহুকালের পুরোনো দারোয়ান—দেউড়ির ভা হয়ে থাকতো, আলো জ্বালতো পরীওয়ালা লোহার গেটের মাথায়। অন্ধকার গ্রামে ওই টি আলোর নিশানা থাকতো। মাঝে মাঝে পেটা ঘড়িতে বাজতো কেমন অলসমধুর টার শব্দ।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও নির্জন ঘন রাত্রের মাঝে মনে হয় জেগে আছে ওই আ
আর সদাজাগ্রত প্রহরী। পাড়ায় দিনরাত জেগে থাকে।

তাও বন্ধ হয়ে গেল। আলোটুকু নিভে গেল একদিন।

সতীশ ভটচায এবাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ, দেবসেবা দোল হেনাতেনায় তার গতায়
তাছাড়া রোজকার আড্ডার মন্ত্রীও। বলে ওঠে,

—সে কি বড়বাবু ? এতদিনের সরোওয়া—দারোয়ান—

হাসে তারকরত্ন।

—আবার দরকার কিসের? তা ছাড়া কি কাজই বা করতো তারা? বসে বসে ডাল
পাকাতো—এই তো। তাই তুলেই দিলাম।

এতকাল পর যেন তারকবাবু আসল কথাটা ধরতে পেরে চালাক হয়েছে। হাসে স
ভটচায। আবার ভয়ও পায় মনে মনে।

অন্য সময় হলে এই বুদ্ধির জন্য সভাসদ্‌রা তারিফ করতো বড়বাবুর। আজ নির্মম অ
আর আগামী ভবিষ্যতের অন্ধকার একটা ছবি ওদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তাই হ
চুপ করে গেল।

—এই! এই!

গোটাকতক ছাগল খামারের পাঁচিল ভাঙ্গা ঠাঁই দিয়ে ঢুকে পড়ে ভিতরে এসে এব
অবশিষ্ট সবুজ বাগানের গাছে মুখ লাগিয়েছে, পটপট করে ছিঁড়ছে পাতাগুলো। তারক
জিজ্ঞাসা করে,

—কার ছাগল রে?

ছাগলগুলো তাড়া খেয়ে ছুটছে। দেড়-ঠেঙ্গে সতীশ ভটচাযকেই হুকুম করে তারকর

—ধরুন তো ভটচাযমশায় দু'একটাকে ?

ভটচায দেড়-ঠ্যাং নিয়ে চার ঠ্যাং-এর ছাগলের সঙ্গে পারবে কেন? ওরা দৌড়ে পা
গেল চোখের সামনে দিয়ে।

তারকবাবু উঠে বসেছে। আগে হলে ওই ছাগলগুলোর একটাও ফিরতো না। উপ
ছাগল তাকে ধরে এনেই জুতোপেটা করে ছাড়ত। ভয়ে কোন জীবজন্তু এদিকে মাড়াত

আজ অবলা জানোয়ারগুলোও যেন টের পেয়ে গেছে কোথায় ভাঙ্গন ধরেছে তারকবা
সব তাই তার বিরুদ্ধে লেগেছে এইবার।

চলে গেল তারকবাবু বাড়ির ভিতরে দিকে, যেন এই অপমান থেকে বাঁচবার জ
সরে গেল।

সতীশ ভটচায খানিকটা দৌড় ঝাঁপ করে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু সামলাতে সময় লা
ফিরে এসে দেখে বারান্দা খালি, তারকবাবু উঠে কখন ভিতরে চলে গেছে। বিরাট বা
কেমন ফাঁকা— শূন্য। কেউ কোথাও নেই।

সতীশ ভটচায বের হয়ে ঠাকুরদালানের দিকে চলেছে। এককালে হাঁকডাক জমজমাট

। ঠাকুরমহল একেবারে আলাদা। সামনে ঘেরা নাটমন্দির, চারিদিক উঁচু রকের উপর গমন্দির, ভাণ্ডার ঘর, তার সামনেই ঠাকুরদালান।

থামগুলোয় পঙ্কের কাজ করা —মেঝেতে কালো আর সাদা মার্বেল পাথর, মাজা ঘসায় ত্তক করতো। দুপুরের সময় ক' বছর আগেও দেখেছে—কত লোকজন অতিথি ফকির আসতো। াসেবার ভোগ সবই বিলিয়ে দেওয়া হতো ওদের মধ্যে, বাকি যেতো পূজারী ঠাকুরের— রাহিত ব্রাহ্মণদের বাড়িতে। খোলকর্তালের বাজনার সঙ্গে হত ভোগারতি, তারপর কীর্তন।

আজ নাটমন্দিরের হুকে ঝুলছে দুটো বিবর্ণ ছেঁড়া খোল—তেলচিটে দড়ি ঝোলান কর্তাল। াবার কেউ নেই ভোগ-এর মাত্রাও কমে গেছে। সমারোহ নেই। অতিথ ফকিররাও কোথায় র্হিত হয়ে গেছে।

সতীশ ভটচায যেন তাদেরও অধম। তার বোধ হয় যাবার জায়গা কোথাও নেই। বাবুরা বু হয়ে আসছে—দৈনিক দশ সের ভোগ বরাদ্দ থেকে আড়াই পোয়ায় নেমেছে। তাতে য়ের লুচির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ক'খানা ডালদায় ভাজা এইটুকু পদার্থতে। তা য় ওই পাথরের ঠাকুরের সামনে নামিয়ে পূজার ছলনা করা হয় মাত্র—মানুষের পেট ানো যায় না। চোখে দেখা যায় মাত্র।

তার অবস্থাও এইবার ওই পাথরের ঠাকুরের মত হবে, উপোসই দিতে হবে হয় তো! দেড় ং টেনে টেনে ছেঁড়া নামাবলী জড়িয়ে সেই ভিক্ষা বৃত্তিরই নামান্তর হিসাবে দোরে দোরে ন কলা কুড়িয়ে বেড়াতে হবে।

ক'টা পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে চুন বালি খসা নোনাধরা দালানে। বাতাসে রঙ্গীন কাঁচের ড়টা শূণ্যপুরীতে ব্যঙ্গের মত ঝুলছে একটা মৃদু শব্দে।

জনহীন মন্দির থেকে বের হয়ে এল সতীশ ভটচায। কেমন ভাবনার কালো ছায়া দেখা য় ওর মনে, আগত কোন চরম বিপদের ছায়া।

কামারপাড়ার মুরুব্বিদের সঙ্গেও ছোড় ছাড় করে এসেছে। কয়েক বৎসর আগে ওদের রুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল সতীশ। একেবারে দল ছেড়ে যজমান ছেড়ে এসে পড়েছিল রকবাবুদের দলে, ভেবেছিল বড়গাছেই নৌকা বাঁধা নিরাপদ, ওই সব গাবভেরাণ্ডা বনে ৌকা বাঁধার চেয়ে।

কিন্তু অতর্কিত ঝড়ে সেই বনস্পতি উপড়ে পড়বে—এ কল্পনা স্বপ্নেও করেনি কোন দিন।

আজ সেই অবিশ্বস্য দিনটাই এসেছে।

পরগাছা শ্রেণীর এই যাজকবৃত্তির ব্রাহ্মণ আজ অসহায় বোধ করে নিজেকে।

টেঙ্গিয়ে টেঙ্গিয়ে চলেছে সতীশ ভটচায।

দুপুরের প্রায় জনহীন পথ। বাতাসে হু হু জ্বালাকরা রোদের তাপ মেশানো; দুর্দিন সমাগত। ৈবার পুকুরের জল—সব সবুজ শুকিয়ে যাবে। প্রকট হবে মরুভূমির উষর রুক্ষতা। কালো ঘ ক্রমশ লালধুলো মেখে উন্মত্ত গৈরিক সন্ন্যাসীর মত রুদ্রগর্জনে হানা দেবে কালবৈশাখীর শে, উদ্দাম জটাজালের বিঘূর্ণনে ছিটিয়ে দেবে ওদের ছোট্ট গৃহটুকু।

তীব্র রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে সতীশ ভটচায কোনরকমে দেড় পায়ে হেঁটে, ভি
গামছাটা যথারীতি টাকে চাপানো। তাই ভেদ করে যেন রোদের তাপ এসে সূঁচ ফোটাচ্ছে

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। বড় রাস্তার এপাশে মস্ত ফাঁকা মাঠটায় উঠছে পানু দসের টিনের শে
ইট দিয়ে চারিপাশে গেঁথে তুলেছে, নতুন ঝকঝকে টিনগুলো চকচক করছে রোদে, চোখ ঝলসে দে

টিন পেটার ঠং ঠং শব্দ নীরব দিগন্ত ভরে তুলেছে। পানু দাসের জয়ধ্বনি ঘোষণা করছে

পানু মস্ত মাঠটায় পাঁচিল তুলেছে—খোয়া পিটিয়ে মাঠটাকে বাঁধিয়ে তুলবে। কথাটা যি
যেন ভুলে গিয়েছিল সতীশ ভটচায। শুনেছিল লোকমুখে পানু দাস নাকি খোয়া বাঁধানো
রাস্তার ধারে ধানকল করবে। তার কাজ এতদূর এগিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। একটা ঝাঁক
আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ পানু দাসকে আসতে দেখে কি যেন ভাবছে সতীশ ভটচা
পানু দাস অনেক বদলে গেছে।

আজ সেই-ই এ গ্রামের মাথা। চারিদিকে মা-লক্ষ্মীর প্রসাদের চিহ্ন।

শুভদিন দেখে আজ পানু ধানকলের ভিত্তিপুজো করাচ্ছে।

বেশ সমারোহের সঙ্গেই আয়োজন করেছে সে।

জাঁকিয়ে পুজো করছে।

পানুর শীর্ণ চেহারায় ইতিমধ্যেই বেশ শাঁসজল লেগেছে। আশপাশ গোবিন্দ বেনে-
ডেঙ্গো বড়ঠাকুরও রয়েছে। কে যেন ছাতা ধরে চলেছে পানু দাসের মাথার উপর।

সতীশ ভটচাযকে দেখে দাঁড়াল পানু। গ্রামের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এই দিনে ওকে দে
কি ভেবে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে পানু।

—ভাল আছেন?

সতীশ ভটচায ওই দিকজোড়া ইট আর টিনের শেড্-এর দিকে চেয়ে থাকে! ওর কথা
জবাব দেয়,

—কল্যাণ হোক। তা শোনলাম এলাহি কারখানা করছো। গ্রামের মুখ উজ্জ্বল কর
যাহোক। কিন্তু বাবা বলছিলাম—

পানুকে এসব কথা বিশেষ কেউ বলেনি। এতদিন খেটে এসেছ, কিন্তু এমনি প্রকা
স্বীকৃতিতে কেমন একটু খুশিই হয় পানু। ভটচাযের কথায় সে বলে ওঠে,

—কিন্তু কি বলছিলেন কাকা?

সতীশ ভটচায এই মৌকা খুঁজছিল। বলে ওঠে,

—মানে তোমার মঙ্গল কামনা করি, তাই বলছিলাম। ওই জায়গায় বাল্যকালে আম
দেখেছি গো-ভাগাড় ছিল, সেখানে মা-লক্ষ্মীর আসন গড়ছো—সবই ঠিক আছে। তবে একবা
গ্রহশান্তি-স্ত্যয়ন একটা করিয়ে নিয়ো কাউকে দিয়ে। কিসে কি হয় বলা যায় না। একবার
হয় পঞ্চতীর্থ মশায় আছেন কোতলপুরে—তাঁকে দিয়ে গুনিয়ে নিয়ো। চলি বাবা

সতীশ ভটচায ঠোকটুকু দিয়েই সরে পড়ল, দাঁড়াল না। নিজের জন্যও উমেদারী কর
না। মাত্র হিতাকাঙ্খীর মত উপদেশই দিয়ে গেল বিনা দর্শনীতে।

পানু দাস কথাটা ভাবছে। গদারগাঁয়ের পেনো আজ পানু দাস, সোজা কথায় দাসজি ‍মশায়ে পরিণত হয়েছে। কি অবস্থা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা নিজে আজও ভোলেনি এবং কি ভাবে কোন্ পথে এসেছে—কত লোককে কি ভাবে ঠকিয়েছে তা সেও জানে।

এখনও খুব অভ্যস্ত হয়নি হয়তো এই পথে, তাই নীতিজ্ঞান, ধর্মের নামে একটা আতঙ্ক আর পতনের ভয়টা বিরাট হয়ে জেগে রয়েছে মনে, পানু ওটাকে নিঃশেষে জয় করতে পারেনি।

তবু মাঝে মাঝে দিব্যি কঠিন স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে। এই জায়গাটা দখল করবার বেলাতেই কি কম করতে হয়েছে পানু দাসকে? সামান্য জমিমাপের আমিন—চেনম্যান, কি তাদের মাইনে? অমন মাইনে দিয়ে পানু দাসও রাখতে পারে দু একজনকে। তেমনি মেক্দারের লোকদের কি কম খোশামুদী—হেঁ হেঁ করতে হয়েছিল! তারপর ভেট—টাকা তো আছেই।

জায়গাটার আসল মালিক ওই নারায়ণঠাকুরই—বোবা প্যাঁ ঠাকুর, আর ওই নাবালক সনাতন। একজন কথা বলতে পারে না, অন্যজনের কথা বলবার অধিকার নেই। গঙ্গামণি ঠাকরুণও কিছু করতে পারে না। কাঁদে শুধু, আর শূন্যের কোন অদৃশ্য দেবতার দিকে চেয়ে আবেদন-নিবেদন জানায়।

পানু দাস অবশ্য ওসবের মধ্যে নেই। সে কাজের মানুষ—তার দৃষ্টি অন্য পথে চলে। তাই দখল নেবার জন্যই বড় রাস্তার ধারে রাতারতি পঞ্চাশ-ষাট জন মজুর-মিস্ত্রি লাগিয়ে ট্রাকে করে ইট আনিয়ে দখলদারি করে শেড তুলতে শুরু করেছে। অবশ্য ওর বুদ্ধিতে এসব করতে সাহস করেনি পানু, গ্রামে এখনও সালিশ মধ্যস্থতা আছে। জমিদাররা ফৌত হলেও হাঁকডাক কমেনি। পঞ্চজন আছে—কিন্তু তাদেরকে দাবিয়ে দেবার ক্ষমতা আর সাহস সে অর্জন করেছে। বুদ্ধিটা দিয়েছিল ব্যবসাদাররাই, মানিক রাঠিই তার মহাজন, সেই-ই বুদ্ধিটা দিয়েছে।

—দখল কর লেও তুরন্ত।

ঝড়ের অগে ওঠে সিঁদুরে মেঘ—ধুলোমাখা কালো মেঘ। আর ঊর্ধ্বাকাশে ঝড়ের শোভাযাত্রার নিশান বয়ে আসে ঘূর্ণায়মান ঝরাপাতার পুঞ্জ।

দুর্গাপুরে কোন বিরাট নতুন জীবনের ঝড় আসছে। শুধু বাঁধই নয়, মস্ত কারখানা বসছে। বার্নপুর—জামসেদপুরের মত। দুর্গম ওই দামোদরের উপর দিয়ে রাস্তা হলে তাদের গ্রামের উপর দিয়েই যাবে পাকা সড়ক সদরের দিকে। ইলেকট্রিক লাইন আসবে, এই সময় বড় রাস্তার ধারে ডাঙ্গা—সোল—আবাদী অনাবাদী খিল সব জমিরই রকম—কদর কিস্মৎ কতগুণ যে বাড়বে তার ঠিক নেই। আর এ মুলুকের সব ধানই পানুর হাতে। যদি ধানকল করে—রাঠিই গোপনে সাহায্য করবে তাকে।

—টাকা?

পানু দাস ওর গদিতে বসে স্বপ্ন দেখেছিল। রাঠি হাসছে।

—তার ভাবনা হামার দাসজী মশায়। দশ আনা, ছ আনা ভাগ। তুমি কাজ শুরু করো। মাল লেও যিতনা জাগা মিলে। শেড বানাও। টিন—সিমেন্ট—বিলকুল দেগা।

কনট্রোল-এর বাজার, টিন সিমেন্ট মেলা দুষ্কর। রাঠির দিকে পানু চেয়ে থাকে, লোকটা ঠাট্টা করছে না ত ? রসিকতা ?

কিন্তু তা করেনি।

পানু দাস বুঝেছে, ভেড়া লড়াই করে খুঁটোর জোরে। সদরের সব ব্যবস্থার ভার যাদের হাতে—তাদের দরবারে রাঠির সম্মান প্রতিপত্তির অভাব নেই।

ওর সাহসে বুকে ভরসা নিয়ে কাজে নেমেছে পানু। তাই নারায়ণ ঠাকুর—অবনী মুখুয্যে—নিজের কাকা বৃদ্ধ লোচন দাস, সবাইকে আজ ঠকিয়ে আমিন-কানুনগোর কাছে অবধি সূঁচ এবং ফাল চালিয়ে সব মেরামত করে শেড তুলছে।

স্বপ্ন দেখে—টাকা, গাড়ি, বাড়ি সবই করবে সে। দুর্গাপুরের কাছে ওই ধানকলের পাশে আরও প্রায় শত-খানেক বিঘে জমি তার দখলে এনেছে।

সবই করেছে—কিন্তু একটা জায়গায় কেমন খটকা বাধে। অদৃশ্য কঠিন শাসনরূপা কোন নিদানকে একেবারে ফেলতে পারে না। পানু ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে—তাই আশা করে সেই অদৃশ্য দেবতাদের তৃপ্ত করতে। আরও পেতে চায় তার লোভী মন—অন্তরে অন্তরে আরও কামনা করে। পানু দাস তাই ভটচাযের কথাটা ভাবছে।

রোদের আভা কমে এসেছে। দূরে ফাঁকা মাঠ ; শস্যরিক্ত খাঁ খাঁ দিগন্ত ক্রমশঃ উঠে গেছে লাল পাথুরে মাটির বুক ঠেলে চড়াই-এর দিকে—সবুজ আর নীল শাল কেঁদ-এর বন শুরু হয়েছে। তারই বুক চিরে চলে গেছে খোয়া-ঢাকা রাস্তাটা, একদিকে সদর, অন্যদিকে দুর্গাপুরের এপারে দামোদরের দুস্তর বালি রাশির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে, তৃষিত জনহীন ক্লান্ত পরিত্যক্ত পথ যেন নেমে গেছে দামোদরের জলরাশির দিকে নিদারুণ কোন পিপাসা মেটাবার জন্য।

মাঝ মাঝে দু-একটা গাড়ি এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় তেলবিহীন চাকার আর্তনাদ তুলে চলেছে বনের দিকে—সদরে যাচ্ছে ওরা মালপত্র আনতে, সারারাত যাবে। ভোরে পৌঁছুবে সদরে।

এই জীবন—আদিম যাত্রা আর থাকবে না।

ওই খোয়াঢাকা রাস্তা কালে পিচের রাস্তা হবে। হাওয়ার বেগে ছুটে যাবে বড় বড় ট্রাকগুলো, জি টি রোডের মত ঝড় তুলে। তারই পাশে সাইনবোর্ডে তুলবে দাস রাইস্ মিল প্রোঃ—প্রাণগোবিন্দ দাস।

কিন্তু!

বৈকালের ম্লান রোদে একটা আবছা মলিন বিষণ্ণতা জেগে ওঠে। বনের বাইরে মস্ত কেঁদ গাছে ঝটপট করছে পাখ-পাখালির ঝাঁক। সব কিছু সুন্দর শান্ত পরিবেশের মাধুর্য দূর করে টিনপেটার শব্দে উঠছে বাতাসে—ঠং ঠং।

কেমন যেন ভয়-ভয় করে পানুর। গা-ভাগাড় ছিল, শুদ্ধি করে নিতে হবে জায়গাটা! ভটচাযমশায়ের কথাটা তখনও মনের মধ্যে পাক দেয়, একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। মুনিষ জন মিস্ত্রি কারিগররা মালিককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছে।

ছুটির সময় হয়ে গেছে—তবু এত কাজের লোক তারা যে কাজ ফেলে ভারা থেকে নামবারও নাম করে না। ইট গেঁথে চলেছে।

নিতে বাউরী ইট বইছিল, সেই প্রথম ঝুড়িটা নামিয়ে মাথা সোজা করে বলে ওঠে,

—বেলা বাউড়ে গেছে, আর ইট বইতে লারবো হে।

ছানু দাঁড়িয়েছিল,ধমকে ওঠে,—শালা গতরকুড়েটা কোথাকার ?

নিতে জবাব দেয়,

—মাইনে বেশি দিবা, চারপহর খাটবো। না হলে টাম হয়ে গেছে, কেনে খাটবো হে ?

ছানু তেরিয়া হয়ে ওঠে।

—ভারি টাইমিওয়ালারে ?

আর সবাই যেন এই পথই খুঁজছিল। সারাদিন এই রোদে কাজ করে হাঁফিয়ে উঠেছে। ইট বয়ে, চুন সিমেন্ট বালি মেখে হাত-পা জ্বালা করছে। তারাও কাজ ছেড়ে বের হয়ে এল।

গজ্ গজ্ করছে ছানু।

পানু দাস এ সবই শোনে, কিন্তু চটতে জানে না সে। হাসছে।—কাজ শেষ হল গো?

মিষ্টি মধুর বাণী। ওরাও খুশি হয়। গলে পড়ে বিনয়ে, সারাদিন কাঠফাটা রোদে প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরও।

বেজা বাউরী ঝুড়িটা নিয়ে বের হচ্ছে, অনেকদিন পর এখানে খাটতে এসেছে বাধ্য হয়েই। ইট গাদার পিছনে হাসির শব্দ শুনে চাইল, লাবি-বৌ কোন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে ইতিমধ্যেই জমিয়ে নিয়েছে। নামেই সে যোগানদারী কাজ করে মশলার কড়াই মাথায় নিয়ে। এখানেও এই সব শুরু করেছে—ওদের সঙ্গে আবার হাসি মশ্‌করাও জুড়েছে সে। বেজা ওকে ডাকে,

—আয়!

বেজার ডাকে লাবি হাত-পা ধুতে ধুতে অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়,—চল, যেছি।

তবু যেন ওর দিকে ফিরেই চাইল না। আবার হাসিতে ভরে উঠে রাজমিস্ত্রির দিকে চেয়ে। প করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বেজা আবার চলতে থাকে বিরক্ত হয়ে, তখনও লাবির হাসির ব্দ শোনা যায়।

হাসছে টেরি ।উরী। কুৎসিত দেড়চোখো মেয়েটা হাসছে বিশ্রী কদর্য দৃষ্টিতে বজাকে দেখে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে বেজা।

—এ্যাই! হাসছে দেখ না খ্যাঁক খ্যাঁক করে।

খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে মেয়েটা। বলে ওঠে,

—উকে ধমকাগা কেনে রে? সি মুরোদ নাই বুঝি—এইরো ধমকাতে এসেছিস। হ্যাঁরে—মামি কি তুর কেউ হই নাকি? অ্যাঁ? এমনি করে যি ধমকাছিস?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বন ধারের আটাড়ি ঝোপের পাশে যৌবনবতী মেয়েটা কেমন দিকতার আভাষ আনে সারা ক্লান্ত দেহ মনে। চুপ করে সরে গেল বেজা। লাবির উপর রাগ য়েছে। এত লোকের সামনেও মানছে না তাকে।

তখনও কলঘরের চালাটায় হ্যারিকেন জ্বেলে দিনকার কাজ আর মজুরির হিসাব মেলাতে পানু দাস ব্যস্ত। অনেক টাকার খেল—দৈনিক তার হিসাব রাখা, মজুরির দর আর গরহিসাবে ফাঁকে রাঠির দাদনের টাকাটা কিছু বাড়াবার চেষ্টাও করে চলেছে।

বারো আনা মজুরির জায়গায় টিপ ছাপ দিয়ে দেড় টাকা করতেও পিছপা নয় পানু—দৈনিক নিদেন পঞ্চাশ টাকা রোজকার। ঠকানো ? এ ব্যবসায় এ সব কারবার হামেশাই হয় তবু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি সতীশ ভটচাযের কথাটা। সেই উপদেশ-বাণী।

একটা বিহিত করা দরকার। একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে পানুর ভাগ্য। কথাটা ভাবে পানু, মহাদেবকেই খুশি রাখতে চায় সে।

আবছা রাত্রি নেমেছে। কি তিথি জানে না, বাঁশবনের ঘন আঁধারে হারিয়ে গেছে চাঁদে আবছা আলো। জোনাকির ঝিকিমিকি জাগে।

চুপ করে ঘরের দাওয়ায় বসে আছে সতীশ ভটচায। বিপদে পড়েছে এইবার, দিন কি করে চলবে তাই ভাবছে।

ওদিক থেকে ভটাচাযগিন্নী গজ গজ করছে।

—ন্যানা নাই ফ্যানা আছে। যা না এইবার ভাত রাঁধার কাজ করগা ডেঙ্গো বড় ঠাকুরে মতন। আর কি করবি ?

সতীশ ভটচায ভাবছে। সত্যিই এবার যেন ওমনি জমাট আঁধার ঘেরা দুর্দিন আসছে এককালে জরি বুটি তাবিজ কবজের কারবার ছিল, গ্রহশান্তি—ঠিকুজী কুষ্ঠির বিচার করতো সে

কিন্তু সে সেব ছেড়ে দিয়েছিল তেমন পয়সাও পায়নি। গুনিয়ে গাঁথিয়ে কে-ই বা পয়স দেবে, তাছাড়া ওসব গ্রহাচার্যের কাজ করতে, শ্রাদ্ধের অগ্রদানী বামুন হতে সে পারবে না ওসব কুষ্ঠি ঠিকুজী ছাড়া তারকবাবু দেবসেবা—ওপাড়ার যজমানিই করে দিন চলছে এখন! দেবসেবাই বন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরে হঠাৎ কার ডাক শুনে সোজা হয়ে বসল সতীশ। তাড়াতাড়ি পিদিমের সলতে উস্‌কে দিয়ে কলুঙ্গি থেকে ময়লা কাপড় জড়ানো জীর্ণ বই পুঁথি-পত্তর খুলে তৈরি হয়ে বসে সাড়া দেয় ভারি গলায় সতীশ।

—এসো !

দাওয়াতে বেশ ভব্যিযুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতই গুরু-গম্ভীর ঠাটে বসেছে সতীশ ভটচায। বাইরের মুখোশটা তবু বজায় রাখতে হবে, লোকের কাছে ওইটুকু তার মূলধন

হ্যারিকেনের আভা পড়েছে সবুজ বাঁশবন আর ভাঙ্গা মাটির প্রাচীরের উপর। গোয়াল ঘ এককালে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে ছাউনি অভাবে বৃষ্টির জলে গলে গলে পড়ে মাটির ঢিবিতে পরিণত হতে চলেছে। ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিচিত্র জীবের মত দাওয়ায় বসে আছে সতীশ ভটচায।

এগিয়ে আসে আলোর আভাষ। সতীশ এতটুকু অবাক হয়।

—পানু ! এসো, এসো।

পানু দাস এগিয়ে এসে ভক্তিভরে প্রণাম করল। সতীশ ভটাচায একবার ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

কি দেখছ ওর চোখে। মরিয়া হৃতসর্বস্ব ব্রাহ্মণ আজ বাঁচবার দুর্বার প্রচেষ্টায় যেন সত্যদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠবার ভান করে।

পানু দাস তার কাছে আসবে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য তা যেন জানতো সে। সেই পানু দাওয়াতে বসল ভক্তি ভরি।

নির্বিকার পরম ঔদাসীন্যভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সতীশ,

—তারপর ?

পানু আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে বলে ওঠে,

—আজ্ঞে সেই যে গ্রহশান্তির কথা বলছিলেন আর সেই সঙ্গে ধনদাকবচ নাকি বলছিলেন, তারই একটা ব্যবস্থা করে দেন তাহলে।

সতীশ ভটচায চোখ বুজে মোচড় মারে,

—সে তো অনেক কর্মপ্রক্রিয়া। ব্যয়সাপেক্ষ।

রৌপ্য-কাঞ্চনে পানু দাস আজ পরোয়া করে না। বলে ওঠে,

—খরচের জন্য ভাবনা করবেন না কাকামশাই, আপনি ফর্দ করে দিন বরং।

সতীশ ভটাচায ওকে দেখছে, চারে যেন মাছ ঘাই মারছে। এইবার বলে ওঠে ভটাচায,

—বলছ যখন, না করে পথ কই ?

আমতা আমতা করে রাজি হয় সতীশ ভটাচায। নব রাজসূয় যজ্ঞের ঋত্বিকের পদই গ্রহণ করে আজ অতীতের পূজারী ব্রাহ্মণ।

পানু দাস বলে চলেছে,

—যদি সুফল পাই কাকামশায়, মানসিক আমি পুরণ করবো। খুশি করবো আপনাকে।

পরম বিজ্ঞের মত সতীশ ভটচায ফর্দ করতে করতে অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়,

—সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে বাবা। দেখা যাক তিনি কি করেন !

করজোড়ে পানু দাস বসে আছে।

দেবতাকে কত ঘুস দিলে তা ক'গুণ ওয়াশীল হয়ে আসবে এবং খরচ-খরচা বাদ দিয়ে কি পরিমাণ লাভ তাতে থাকবে—তারই হিসাব করে সে মনে মনে।

বেজা বসে আছে। গরমকালের রাত্রি। ঘুপসিঘরের ভিতর টেকা যায় না। বাইরের মাঠে তারা পড়ে আছে মেয়ে-মদ্দ সবাই। বাউরীপাড়ায় রাত্রি নেমেছে।

মাথার উপর বটগাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যায়, নিকানো তকতকে আকাশে ঝিকিমিকি তোলে অজস্র তারাফুল।

বেজা কমাসের পরিশ্রমে নতুন ঘর তুলেছে। সেই গলায় দড়ি দেবার সময়কার গ্লানি আর হতাশা তার মনে নতুন করে বাঁচবার সামর্থ্য এনেছে।

আবার নতুন উদ্যমে লেগেছে সে কাজে—মনের জোর ফিরে আসে নিতের কথায়।

নিতে বাউরীই সেদিন বলেছিল তাকে।

—মরদের মত বাঁচ, খাট— দেখবি সব আবার ফিরে আসবেক। মরতে যাবি কুন দুঃখে শালো মাদী কুথাকার ? তু মাদী না মরদ ?

বেজা মরদের মতই খেটেছে আবার। ঘর তুলেছে।

কিন্তু এক জায়গায় সে হেরেই গেছে বারবার। ওই লাবির কাছে। তার মনে নিত্যি নতুন চাওয়ার নেশা, সেই নেশা মেটাবার সামর্থ্য বেজার নেই। এত পয়সা সে রোজকার করে না।

—ঘর ! করলাম, নতুন ঘর। খরচ পাতি হয়ে গেল।

হাসে লাবি !

—ঘর ! মাগো মা—ওই এইটুন মাটির দেওয়াল অর ঝুপড়ির চাল, এই তুর ঘর না শুয়োর খুপরি ? ইখানে মানুয থাকে, হ্যাঁরে ?

লাবির দুচোখে কোঠা বালাখানার নেশা, বাবুদের চকমিলান দালানের বাসিন্দা সে, দামী খাট পালং—বড় ঘরের স্বপ্ন তার মনে। পয়সা—নতুন শাড়ি, গহনা তার কাম্য। বলে,—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে গতর জল হয়ে গেল ইখানে।

—তবে করবি কি—ইখানে সব্বাই যে খাটে।

—খাটুক উরো।

লাবি অজ্ঞাতেই তার যৌবন-মদির দেহের দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথার জবাব দেয় না বেজা।

তাই লাবি বেশ স্বাধীন। নিজের মতেই চলাফেরা করে। নতুন ওই বড় কলবাড়ি তৈরি হবার সময় থেকেই লাবি বদলে গেছে। ওই বড় মিস্ত্রি ছোকরার সঙ্গে দিনরাত ফুফাস গুজগাজ করে, হাসাহাসি চলে।

বেজা গর্জন করে আড়ালে,—ইকি তুর ব্যাভার ?

হাসে লাবি দুচোখে মাদকতার ঢেউ তুলে! বলে ওঠে,

—কেনে রে ? না খেটে দুটাকা রোজ দিচ্ছে, একটু হাসলামই বা ?

বেজা চটে ওঠে।

—না, দুটাকা চাই না। বেজার মনে পুরুযকার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

লাবি রঙ্গীন ঠোঁটে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়ে বলে,

—উরে মরদ ! তু তো পাস বারা আনা।

জোঁকের মুখে যেন চুন পড়েছে, চুপ করে যায় বেজা।

মনে মনে গজ গজ করে। মুখে কথা বিশেষ কিছু বলতে পারে না।

রাত হয়েছে। এখনও ফেরেনি বৌটা আজ।

ভাসুরের মার। ডেকে হেঁকে বলবার উপায় নেই বেজার। ঘরের বৌকে শাসন করতে পারে না—সে আবার কেমন মরদ ! বাউরীপাড়ার মর্দদের কাছে নিজেরই লজ্জা করে বেজার।

চুপি করে থাকে। সারা মনে একটা অসহ্য জ্বালা বেজার।

বুড়ো পশু বাউরী হুঁকো টানছে, আব কাশছে খক খক করে।

তার গজ গজানি শোনা যায়।

—শালো মাগের উপ দেখে টলে গেইছে, কেঁৎ কেঁৎ করে লাথি মার—দেখ মাগী ঠিক থাকবেক। তা লয় হাঁ করে চেয়ে থাকবি তো মাগী ঘরে থাকবেক কেনে রে ? খোশামুদিতেও মেয়ে মন্দ হয় রে ?

বেজা চুপ করে থাকে।

রাত নামে। বৌটা আর ফেরে না।

শূন্য প্রান্তরে হু হু হাওয়া বইছে। রাতের হাওয়া । তারাগুলো নিভে আসে। ঝরাপাতা উড়ে আসে বন থেকে। থমথমে নীরবতা জাগে। কেউ ফিরল না আর সেখান থেকে।

বেজার অনুমান সত্যিই।

পরদিন পাড়ায়, সারা গাঁয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নতুন ছোকরা রাজমিস্ত্রি ভূষণ মাহাতো উধাও হয়েছে কাল ভোরেই। সঙ্গে মজুরদের মেটাবার জন্য কিছু টাকা ছিল—সেও নিয়ে গেছে, আর ফাউ হিসেবে নিয়ে গেছে বোজার ডব্‌কা বৌটাকে।

বুড়ী মা খবরটা পেয়েই চীৎকার করতে থাকে, আর সেই সঙ্গে শুরু করে গালাগাল বেজার উদ্দেশেই।

এতদিন আর যাই হোক বুড়ী এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল—দুমুঠো ভালমন্দ খেতে পেয়েছে এবং তা জুটিয়েছিল ওই লাবিই। আজ তার উধাও হয়ে যাওয়ায় বুড়ী ভাবনায় পড়েছে, খাবার ভাবনা। বাঁচার ভাবনা। তাই বিষিয়ে উঠেছে সারা মন। বেজার উপরই এখন রাগটা পায়।

চীৎকার করছে বুড়ী।

—মরদ ! সব আমার মরদ রে ! ঘরের বৌ আখতে পারিস না, ঘরের লক্ষ্মী বাইরে যায়, সি আবার মরদ! জুমড়ো কাঠ গুঁজি অমন মরদের মুয়ে।

বেজা চুপ করে ঘরে আসে।

সকালের রোদ উঠেছে বটগাছের মাথায়—গ্রামের খড়োবাড়ির চাল ছুঁয়েছে সেই রোদ বাশবনের ফাঁক দিয়ে, হাঁসগুলো পুকুরের জলে জটলা করছে।

তার নতুন ঘরের দরজাও বসান হয়নি এখনও, কেমন হাঁ হাঁ করছে ওই দরজা-বিহীন আবছা অন্ধকার ভরা ঘরখানা; বাইরে এত আলো, ওর মধ্যে তবু আলো ঢোকেনি।

লাবি পালাল। এ আর এ পাড়ায় এমন ঘটনা কিছু নয়। ঘটে।

তবে এবার যেন অন্য রকম। এতকাল ওরা বনিবনাত না হলে ছোড় ছাড় করে নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছে অন্য গাঁয়ে গিয়ে। জাত জ্ঞিয়াতের মধ্যেই ঘটেছে নিকে-সাঙ্গার ব্যাপারটা। তাদের সাঙ্গানী সমাজের মধ্যেই রয়ে গেছে তারা।

এবার সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ঘটেছে।

নিতে বাউরী তখনও কাজে বের হয় নি। জামবাটিতে করে পান্তা নিয়ে বসেছে—খেয়ে-দেয়ে বেরুবে কাজে।

কথাটা সেও ভাবছিল-- বেজাকে দেখে মুখ তুলে চাইল। কেমন যেন মিইয়ে গেছে লোকটা একরাতেই। নিতেও নিজে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করে, সেদিন বেজাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এই জগতের সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে বেজার নিষ্কৃতি পাবার পথটুকু সেই-ই রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কাঁই-জোড়ের ধারে।

কোথায় নীরব প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল বেজাকে—সমাজে তার বাস করবার একটু দাবির জন্য সেও লড়বে। সেই কর্তব্য হয়েতো ঠিক পালন করতে পারেনি।

—খাবি একগাল ? নিতে আমন্ত্রণ জানায় তাকে।

মাথা নাড়ে বেজা,—না। তামুক টানি বরং।

নিতের ছোট জলবিহীন হুঁকো নিয়ে কড়া ঝনঝনে দা-কাটা তমাক টানতে থাকে। নিতে চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে,

—কুন খপর পেলি বৌটার —

—উহুঁ। মাথা নাড়ে বেজা।

—মারধোর করেছিলি ? হ্যাঁরে ?

—না তো। বেজা জবাব দেয়।

কি ভাবছে নিতাই। দেখেছে এতদিন লাবিকে কেমন বেসরম—ইতর। মিষ্টিকেও দেখেছে আগে।

আজকের মিষ্টি লোহারকে চেনা যায় না। আর আজকের লাবি কেমন পথ খুঁজছিল—ওরা ঘরে থাকে না। সেই পথ ও পেয়ে গেছে—তাই সরেছে।

বলে ওঠে নিতে,—না মারলেও উ যেতো।

তা যাক্ তবুও কোথাও সাঙ্গা করে ঘর বসত করলে পারতো। বেজার, ওদের জাতের সকলেরই এই বক্তব্য। দল ছেড়ে—গেঁরাত ছেড়ে গেল। বেজা বলে,

—গেল একটা মাতাল বজ্জাত লুকের সাথে, সি তো এঁঠো পাতা করে ফেলে দেবে কুনদিন।

বেজা বলে ওঠে কথাগুলো অনেক দুঃখে।

নিতে কি ভাবছে।

শহরে—দুর্গাপুরে হালফিল নতুন বসতের আশে-পাশে ওদের অনেককেই দেখেছে, যারা একদিন কোন সবুজ গাঁয়ের কোন অজানা ঘরের এমনি বৌ-ঝিই ছিল. তারপর কোন দুর্বার টানে—কোন বিরাট জালে পড়ে ওই নোংরায় গিয়ে উঠেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে নর্দমার পোকার মত।

কোথায় একটা বাইরের লোভী হাত এসে পড়েছে তাদের ঘরের মধ্যে, কিছুই নেই তাদের দিন আনে দিন খায়—না হলে উপোস দেয়। তাদের শেষ সম্বল ওই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে ঘরের এতটুকু আশ্বাস, তাও আজ যেন নিঃশেষে বিলীন হতে বসেছে। বেজা সেই লুণ্ঠনপর্বের ধ্বংসাবশেষ।

—কুথাকে চলে যাবো ভাবছি।

বেজার কথায় নিতে বাধা দিয় ওঠে। সে এই আঘাত মুষড়ে পড়তে চায় না। আশ্বাস দেয়,

—যাবি মানে ? যে মাটিতে পড়ে লুক ওঠে তাই ধরে। ডাক পুরুষের কথা রে ?

বেজা চুপ করে থাকে। নিতে বলে চলেছে,

—পালাবি ল্যাজ গুটিয়ে খেঁকি কুকুরের মতন ?

কথার জবাব দিল না বেজা। নিতের বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে থাকে, ওর চোখ মুখে কেমন একটা দৃঢ়তা।

ছোট ছেলে-মেয়ে দুটো বাবার পান্তার দিকে চেয়েছিল। নিতে তাদের দিকে বাটিটা ঠেলে দেয়, আধপেটাও বোধহয় জোটেনি নিতের। তবু মুখে কেমন যেন একটা তৃপ্তি। হাত ধুয়ে হুঁকোটা টানতে থাকে।

কি যেন দুর্বার তেজ আর জালা ওর মনের অতলে ঠেলে উঠেছে। নিতের কথাগুলো ভাবছে বেজা।

দুঃখটাকে নিতে কেমন সইয়ে নিতে পেরেছে—সহজ করতে পেরেছে। না হলে একবেলা খেয়েও মনের জোর কোথা থেকে পায় ? বলে চলেছে নিতে,

—যে গেছে সে যাক। দুনিয়া কারও জন্য বসে থাকে না, ভারি তো একটা মেয়ে।

মাথা ঠুকছে গঙ্গাঠাকরুণ।

আর চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর—অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার। ক'দিন পরেই ওরা বুঝতে পেরেছ—বড়রাস্তার ধারে একলপ্তে তিন বিঘে জমি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে আমিনের এক কলমের আঁচড়ে।

এতদিনের সব দাবি—অধিকার থেকে উৎখাত হয়ে গেল তারা। ও জমি আজ চেনাও যায় না।

ছানু দাস সেদিন তেড়েঙ্গা শরীর নিয়ে তুড়ি লাফ দিতে থাকে পলাশতলার জমির মাথায়। বাকুড়ির উঁচু পগার ভেঙ্গে সমান করছে—ধানকলের উঠোন তৈরি হবে। নারাণ ঠাকুর বাধা দিতে যায়। কিন্তু দলবল দেখে পিছিয়ে আসে।

—এ্যাঁ এ্যাঁ ও!

অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে পথচলতি লোকজন জমে যায়। কৌতূহলী জনতার সামনে ছানু দাস সবিস্তারে বর্ণনা করে হাত-পা নেড়ে,

—একবার বামুন কচু খেয়ে,
আবার এলো কোদাল লিয়ে।।

ও জমি এদ্দিন বন্ধুকী ছিল, ছাড়াবার নাম নাই। বাকিকর করে লিয়ে লিইছে হে। ল্যায্য ভাবেই লিয়েছি। দাসরা এমন হরে হম্মে কারুর লেয় না—সে জিনিসে পেস্বাব করি।

ওরা ভাবছে হবেও বা !

নারাণ ঠাকুর অব্যক্ত আর্তনাদ করে আকাশের দিকে চেয়ে। ভাষাহীন অব্যক্ত সে চীৎকার। কাঁদছে গঙ্গামণি ঠাকরুণ। কিন্তু পানু দাস তখন পুজোয় বসে, সে সবের কিছু জানে না বোধ হয়। তার দেখাও মিলবে না, শেডের টিন-কাঠ ইট খোয়া পড়েছে।

কয়েকদিনেই সবুজ পলাশতলির বাকুড়িকে আর চেনা যায় না, ওর সবুজ শস্যদাত্রী বুকবে ওরা ইটের আবরণে মুড়ে দিয়েছে। শেড উঠেছে। রোদে চোখ ধাঁধানো তার জ্বালা—সবুজের স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেছে !

ওই ভূমিতেই আজ ঘটস্থাপনা করছে মহাসমারোহে।

ঢাক বাজছে।

নীরব আকাশ—রোদপোড়া তাম্রাভ ডাঙ্গার ওদিকে নীল শালবন ঘেরা শস্যরিক্ত চড়াই-এর মাথায় ঢাক বাজছে। কেঁপে কেঁপে উঠেছে ওই রাবণের বাদ্যির শব্দটা।

পানু দার গ্রহশান্তি যোগ করছে মহাআড়ম্বরে।

শুভকাজ। ব্রাহ্মণভোজন করাবার ব্যাপারও রয়েছে। নতুন কলবাড়ির প্রতিষ্ঠা-উৎসব।

সতীশ ভটচায জানতো—বাতাসে শূন্যতা থাকে না, একদিক না হয় অন্যদিক থেবে বাতাস এসে তার শূন্যতাকে পূর্ণ করবে।

সমাজে একশ্রেণী বিলুপ্তপ্রায়, একদিন তাদের রসে সমৃদ্ধ হয়ে পরগাছার মত বেঁচে ছিল ওই সতীশ ভটচায সম্প্রদায়। সেই জমিদাররা উৎখাত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর এব শ্রেণীর মহাপুরুষের নবজন্ম ঘটেছে। তারাই আগামী দিনের প্রথম পুরুষ।

তাই পানু দাসকে ফেরাতে পারেনি সতীশ ভটচায, এগিয়ে এসেছে তার কাজে। ভবিষ্যতে এদেরই হাতে রাখতে হবে—এটা ও বুঝেছে।

নতুন পট্ট বস্ত্র পরে শিখায় ফুল বেঁধে সতীশ আজ ব্যস্ত। পানু দাসের আশপাশে এসে জুটেছে অবনী মুখুয্যে, হলধর, ইউনিয়ন বোর্ডের ভক্তি চাটুয্যে, মায় হরিনারায়ণ মুহুরী অবধি

সাবেকী দলের অনেকেই আজ এদিকে ভিড়েছে তারকরত্নকে ছেড়ে।

নতুন কলবাড়ির সিমেন্ট করা হলঘরের ওদিকে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে, পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণদের আহ্বান করেছে পানু। দিকজোড়া জাজিমের উপর চন্দ্রভূষণ পাতা আসরে সমবে হয়েছে তারা। নতুন হুঁকোয় তামাক আসছে, বিষ্ণুপুরী বালাখানার তামাক। তা সৌরভে বাতাস ভরে উঠেছে আজ।

পানু দাসও অবাক হয়েছে—তার যে এত শুভাকাঙ্খী চারিদিকে ছড়ানো ছিল তা কল্পনাও করেনি। মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করে আজ।

ওদিকে ভটাচায মশায় দুজন তন্ত্র ধারককে নিয়ে সমারোহে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে হোমকুণ্ডের সামনে। আগুনে ঘি পড়ছে—খাঁটি গব্য ঘৃত।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের নীলাভ শিখা। এর পর আছে শ্মশানকালীর পূজা এবং বলিদান। সব দেবতাকেই সন্তুষ্ট করতে চায় পানু দাস।

জীর্ণ খোয়াঢাকা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে মিশেছে দামোদরের বালিতে. এখনও তার রূপ বদল হয়নি। শালবন থেকে বের হয়ে এসে ঝড়ঝড়ে বাসটা দাঁড়াল রাস্তার মোড়ে কালী লায়েকের নুইয়ে-পড়া তেলেভাজা ফুলুরির দোকানের সামনে।

বাসটা থেকে নেমে দাঁড়াল অশোক আর এমোকালী। রাস্তার উপর লোকজনের ভিড়

দেখে একটু অবাক হয়ে দাঁড়াল তারা। ঢাক বাজছে ওপাশে, ঝকঝাক করছে পানু দাসের টিনের শেড। ফুল-আম্রপল্লব, রঙ্গীন কাগজের পতাকা দিয়ে সাজানো।

শ্মশানকালীর বলিদান হচ্ছে রাস্তার ধারেই, ভিড় জমেছে সেখানেও। সতীশ ভটাচায ছাগলটাকে হাড়িকাঠে পুরেছে। চীৎকার করছে সে—অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকার। অশোক দেখে, সতীশ ভটাচাযও আজ পানুর দলে ভিড়েছে।

পানু দাস হাত জোড় করে চোখবুজে পরম ভক্তেরমত চীৎকার করছে,—মা ! মাগো !

ধূপ-ধুনো আর ঢাক-ঢোলের শব্দে—ওই রক্ত উপচারে জাগ্রত শ্মশানকালীকে পুজো দিচ্ছে প্রাণবল্লভ দাস, নতুন কলমালিক, তার ঋত্বিক হয়েছে ওই, সতীশ ভটাচায।

ছাগলের আর্তকান্নার শব্দ ডুবে গেছে ওদের কলরব আর জয়ধ্বনিতে।

হঠাৎ কিসের চীৎকার কানে যেতে অশোক ফিরে চাইল। চীৎকার করছে আকাশের দিকে হাত তুলে নারাণ ঠাকুর। বোকা ছাগলটাকে এরা হাড়িকাঠে পুরে স্তব্ধ করে দিয়েছে চিরতরে। ঢাক বাজিয়ে কলবাড়ির দিকে ফিরে চলেছে পানু দাস রক্ততিলক পরে গৌরবে শ্মশানকালীর পুজো সেরে।

তখনও চীৎকার করছে—নীরব অভিযোগ জানাচ্ছে নারাণ ঠাকুর আশমানের দিকে হাত তুলে। তার পলাশতলার বাকুড়ি গেছে—লুট করে নিয়েছে শক্তিমান ওই পানু দাস। তার মুখের গ্রাস লুটে নিয়েছে তারা।

অশোককে দেখে এগিয়ে আসে নারাণ। অব্যক্ত কান্নায় ফেটে পড়ে সে হাউ মাউ করে। শুক্ত মাটিতেই মাথা ঠুকে চলেছে নারাণ ঠাকুর ঠুই ঠুই করে। ভিড় ঠেলে অতুলভুবন ওরা এগিয়ে আসে। খুশিভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে,

—এসেছো ছুটবাবু ?

—এলাম। চুপ কর নারাণ।

নারাণকে হাত ধরে তুলল অশোক।

ভিড়ের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসে নিতে বাউরী। প্রণাম করে অশোককে।

—ফিরে এলে ছুটবাবু ! দেন এগুলো।

ওর হাতের ব্যাগটা তুলে নেয় সে, অশোক হাসিমুখে জবাব দেয়,

—না এসে যাবো কোথায় বল!

গোকুলও বাস থেকে নেমেছিল আগেই। পরনে ছেঁড়া মলিন কাপড়—একটা হাফশার্ট। পায়ে জুতো নেই। কেমন শ্রীহীন উস্কোখুস্কো চেহারা। তাকে বলে ওঠে অশোক,

—চল রে।

এদিকে গ্রামের খড়োবাড়িগুলোর মাঝ দিয়ে বালিঢাকা পথটা চলে গেছে ওই পুরোনো বাড়িগুলোর দিকে। মাথা তুলে আছে দূরে বাবুদের পলেস্তার খসা বাড়িগুলো—কেমন স্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম ভাবে।

ওদিকে রোদে মুক্ত প্রান্তরের উপর ঝকঝক করছে পানু দাসের নতুন শেডটা। ঢাক বাজছে—কলরব ওঠে। বাতাসে কেমন ঘি-এর মিষ্টি গন্ধ।

সদর থেকে খানকয়েক ঝকঝকে গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এসে কলবাড়ির সামনে দাঁড়াল। অশোক চেয়ে থাকে।

প্রশান্তবাবু—মিঃ রাঠি নামছে গাড়ি থেকে, আরও কারা সব। প্রশান্ত রয়েছে ওদের মধ্যে একটু অবাক হয় অশোক।

—ছুটবাবু ! চলুন গো।

কালীর ডাকে ওর দিকে চাইল অশোক। স্তব্ধ গ্রামখানা কেমন একটা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে দাঁড়িয়েছে। নারাণ ঠাকুরকে কি-ই বা বলবে আর!

কালীর সঙ্গে অশোক গ্রামের দিকে এগিয়ে চলে।

দুপুরের রোদে যেন বৃদ্ধ স্থবিরের মত জীর্ণ গ্রামখানা অন্তহীন জপ-মালার সুমেরুর দিকে এগিয়ে চলেছে—জপের পরিকক্রমা শেষ করবার দুর্বার প্রচেষ্টায়।

কামারপাড়ার লোকেরাও পথে এসে দাঁড়িয়েছে—ওরা যেন অধীর আগ্রহে অশোকেরই পথ চেয়ে ছিল।

পথ চেয়ে ছিল আর একজনও।

স্নান করে ঘরের দিকে ফিরছিল কদম—হঠাৎ কাকে দেখে পথের ধারে ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল।

কাছে আসতেই চমকে ওঠে,—ছুটবাবু !

চকিতের মধ্যে কেমন কলসীর জল আর সারা মন একসুরের মিষ্টি অনুরণনে চল্‌কে ওঠে কদমের. নিজের মনের অবাধ খুশি যেন চাপতে পারেনি—দুচোখের চাউনিতে তারই আভাস ফুটে উঠেছে।

কেমন ভাল লাগেতার। অশোক ওকে দেখে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ ! ভালো তো ?

মাথা নাড়ে কদম।

কোন জবাব দিল না কদম। সরে গেল বাড়ির দিকে। তবু মনের খুশি যেন কলসীর কাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে।

তারকবাবুর বড় জনহীন বাড়ির পাশ দিয়ে আবছা আলো আঁধারি ঢাকা পথে ফিরছে অশোক—বাতাসে কোথায় গোলকচাঁপা ফলের উদগ্র সুবাধ—মাটির গন্ধে মিশে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন পর অশোক ফিরছে গ্রামে—কেমন ভালো লাগে।

দিঘির ধার থেকে তাদের পুরোনো বাড়িখানা দেখা যায়। কয়েকদিনেই অনেক ঠাঁই ঘুরেছে সে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত ঠিকানাবিহীন ভাবে।

আজ আবার নিজের স্থানেই ফিরে এসেছে। তাই বোধহয় মন আবার সেই যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে কজের কথা ভবছে—দুচোখ মেলে চেয়ে দেখছে এখানের সবকিছু। শুধু মাটি, ওই সবুজ দিগন্ত, শস্যরিক্ত প্রান্তরই নয়—এখানের মানুষ, তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না সব কিছুই দেখছে

গঙ্গামণি ঠাকরুণের চীৎকার কানে আসে—সব হারিয়ে গেল তার। দেখেছে বেজা বাউরীকে—তেকে। ওদের মনের অতলে গুমরে ওঠে অসহায় জ্বালা।

বিজয় গর্বে উন্মত্ত পানু দাসের সগৌরব ঘোষণা আর সতীশ ভটচাযের শুধু বাঁচবার জন্যই ই দলচ্যুতির কথা ভাবে সে। এত অতৃপ্তি ভরা জ্বালাময় এই গ্রামসীমাতে কদম-বৌ-এরও কটি অস্তিত্ব আছে—সবকিছু মিলিয়ে আবার অশোক নিজের হারানো দিনগুলো নানা স্মৃতির ং-এর জাল বুনে ভরাট করে।

বাড়িটার কাছে এসে মনে হয় সে যেন অনেক বড়; অনেক দিন বাইরে থেকে মনটা হয়ে উঠেছে। এইটুকু ঘরের পরিবেশে তাকে যেন ধরে রাখা যাবে না, ঠেসেঠুসে চেপে রবে তাকে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়ে ওইটুকুর মধ্যেই আবার খাপ খাইয়ে নেয়—ছোট বাড়িটা ক্রমশঃ হং হয়ে ওঠে—তারই মাঝে সেই উধাও ডানামেলা মন আবার নিজের ঠাঁই খুঁজে পায়।

আর একজন এই দিনেই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে—সে ওই গোকুল।

এত মিথ্যা বলেও সে রেহাই পায়নি। শেষের দিকে তারকবাবুও আর তদারক করেনি তার ামলা, বছরখানেক জেল হয়ে যায় গোকুলের।

এক বছর—বারোটা মাস!

কয়েকটা ঋতুর আবর্তন দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে।

আজ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে গোকুল দেখেছে এতবড় পৃথিবীতে তার থাকার এতটুকু াশ্রয় নেই।

কোথায় যাবে তাও জানে না।

তাই যেন আর কোন পথ না পেয়ে গ্রামেই ফিরে এসেছে।

এখানে আজ যেন সে অজানা মানুষ।

বাড়িখানা প্রায় ধ্বসে পড়েছে। পথের দু-একজন ওর দিকে চেয়ে থাকে। নেহাৎ কৌতূহলী ণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

—কি রে এলি ?

—এলাম ! গোকুল জবাব দেয়। আশা করে হয়তো তাকে ডাকবে, খেতেও বলবে—কিন্তু া হয়না। সেও চলে যায় তার নিজের পথে গোকুলের দিকে আর না চেয়ে। এ গ্রামে সে যন অবাঞ্ছিত কোন অতিথি।

শেষ পর্যন্ত বাস রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে গোকুল।

চেয়ে থাকে পানু দাসের ওই নতুন শেডের দিকে।

সমারোহ ব্যাপার চলেছে সেখানে। বাতাসে উঠছে লুচিভাজার গন্ধ। কতকগুলো কুকুর দিক ওদিক ঘুরছে।

সাজিয়েছে কলবাড়িটাকে, গেটে লাল শালুতে লেখা 'স্বাগতম'। কি যেন একটা আকর্ষণেই ই দিকে চেয়ে থাকে গোকুল।

এত উৎসব ভোজনপর্বের মাঝে হয়তো তারও এক পাত জুটে যাবে।

বাস স্টপের দোকানে বটগাছের ছায়ায় বসেছিল গোকুল। এখান থেকে চলে যাবে কি ভাবছে, হঠাৎ কামারপাড়ার ওদের দেখে ভয়ই হয় গোকুলের। বাস থেকে নামছে এমোকালী আর অশোকবাবু।

গোকুল যেন নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার জন্যই পানু দাসের কলরবমুখর ওই কলবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

গোকুল এখানে পা দিয়েই বেশ জেনেছে যে এক বছরে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এখানে, তারকবাবু আজ ফৌত হয়ে গেছে, নির্বিষ। ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছে। পানু দাস এখন প্রথম পুরুষ।

গোকুল একটু দ্রুত পায়েই ঐ দিকে এগিয়ে যায়।

আজ দুকান কাটা সে। পানু দাসকেও অনেক সময় অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, গোকুল হয়তো সেদিকটা সামলাতে পারবে। পানুকে সামন দেখে বলে ওঠে গোকুল,—এলাম গো দাসমশাই!

পানু স্বাভাবজাত মিষ্টি হাসি হেসে আপ্যায়ন করে।

—আসুন। ব্রাহ্মণ মানুষ, আসুন।

গোকুল এই প্রথম আপ্যায়নের মুখ দেখল দীর্ঘদিন পর।

ছানু দাসও দাদার বাহন হিসাবে বেশ একটু বদলেছে। সেই নেহাৎ মেঠো ভাবটা আর নেই, পঞ্চাশ ইঞ্চি ধোয়া ধুতি পরে আজ এই কাজের দিনে ভদ্রলোক হয়েছে। অবশ্য জুতো পায়ে দিতে পরে নি, ফোস্কা পড়ে যাবে—তাই একটা হাতখানেক মাপের চটি পায়ে দিয়ে এসে হাঁকডাক করছে ছোট ঝুপড়িটার সামনে।

—অবা—এই অবা!—

ওর হাঁক ডাকে ডোমপাড়ার আরও দুচারজন এসে জোটে। একটু অবাক হয় তারা ছানু দাসকে দেখে।

—ছানু নতুন ওই ডাকে একটু খুশিই হয়।

উৎসবের জের চলেছে এখনও—সদর থেকে বাবুরা অনেকেই এসেছেন। দুর্গাপুর থেকেও এসেছেন কারা জিপে করে। বড় জাল ফেলেছে পানু দাস। একবার গুটিয়ে তুলতে পারলে হয়। তাদের আপ্যায়নের জন্যই ছানু এসেছে অবিনাশকে ডাকতে।

একটু গানবাজনা হবে। বাবুরাও কেউ কেউ গাইতে পারে, তাদের গান গাইবার মত মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি করেছে পানু।

ছানু তাই এসেছে অবিনাশের কাছে.

অবিনাশ চুপ করে বসেছিল। কেমন যেন একলা বোধ হয়। কদিন শহরে বাজিয়ে এসেছে, কলকাতায় নামডাক হয়েছে তার গুণী মহলে, পয়সাও দেয় তারা।

রেডিওতে বাজাবার সুযোগও পেয়েছে। আরও শিখছে,—রেওয়াজ করছে অবিনাশ।

শুনেছে বিসমিলল্লা খাঁ সাহেবের সানাই। কত লোকজন সমারোহ—কি এক আলোকময় চিত্র একটি জগৎ, তারই মাঝে সুরটা উঠেছে। শুদ্ধ রাগিণীয় বিশুদ্ধ স্বরগ্রাম—তানকর্তব, তাড়াগৎ। সে বাদনাও শুনেছে।

অবিনাশের মন ভরে উঠেছে। বিষ্ণুপুরের ঘরাণার সঙ্গে দীর্ঘ দিন পরিচিত হয়েছে সে, রেওয়াজ করেছে। ওটা তার খানিকটা আসে। কিন্তু শুদ্ধ রাগরাগিণীর বিলম্বিত— বৈমধ্যলয় থেকে আলাপ, তারপর তানকর্তা তোড়া সব কিছু যে এমনি খেয়ালের ঠাটেই নিবদ্ধ করা যায় ঠিক জানেনি। সানাই-এর সুর মানুষকে মুগ্ধ করে এতখানি তা জানতো না।

বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সানাই বেশ কয়েকবার শুনেছে। নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেচে গিয়ে শোনায় খাঁ সাহেবকে তার বাঁশি। কেমন যেন সেই স্মৃতিটা ভুলতে পারে না।

কোন ছোট্ট নদী গিয়ে উন্মাদ কলরবে সমুদ্রে মিশেছে—কল কল খল খল রবে বাতাসে জাগে তার আনন্দধ্বনি। মুক্তির—সার্থকতার আস্বাদ। তেমনি উতরোল হয়ে উঠেছিল সেই সুরে অবিনাশের সারা মন।

সেও যেন নির্ভর খুঁজে পায়। পেয়েছে নিবিড় সাধনা করার অক্ষয় অমিত শক্তি। গ্রাম থেকে আবার ফিরে এসেছে নতুন একটি মানুষ। তন্ময় হয়ে ডুবে গেছে তার সাধনার মধ্যে। ই আকাশ বাতাস রৌদ্রছায়া ভরা উদাস বৈকালের দিগন্তে বিলীন কোন দিনান্তের মূলতনের সুর বেজে ওঠে তার বাঁশিতে।

বেণুবন কাঁপে—দূরে বাজে কোন রাখালিয়া বাঁশি। গরুর গাড়ি চলে পথ দিয়ে। অখণ্ড জীবনের একটি স্তব্ধ মহামুহূর্ত। ওর সুর সেই জীবনকে চিহ্নিত করেছে প্রহরে প্রহরে। যেন অবিনাশ কোন অন্ধলোকে হারিয়ে গেছে ওই বাঁশির রেওয়াজের মধ্যে।

—এ্যাই অবা ! ব্যাটা কানে কি তুলো দিইছিস ? বলি কথা যে কানেই যেছে না ? অ্যাঁ?

অবিনাশ বিরক্ত হয়ে বাঁশি থামিয়ে বাইরে এল। ছানুকে দেখে বিনীত কণ্ঠে বলে,

—ডাকছেন ?

ছানু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাটা ডোম কলকাতা চিনেছে। পানুবাবু ডাকছে, সাড়া নাই তবু হুজুরের।

কথার জবাব দিল না অবিনাশ। বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে চাইল মাত্র। আদিম বন্য রক্ত যেন গমন করে ওঠে ওই গালাগাল আর কথাবার্তায়। ছানু ধমকে দেয়।

—একবার চল দিকি, সানাই বাজাতে হবে কলবাড়িতে।

অবিনাশ ওর মুখে কথাটা শুনে অবাক হয়।

একটু স্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে জবাব দেয় অবিনাশ,

—যেতে পারবো না এখন।

ছানু ফোঁস করে ওঠে ।

—কেনে হে ? টাকা দিব। দশ টাকা। মাগ্না বাজাতে হবেক নাই তুমাকে। ছানুদাস ওসব কারবারে নাই। লাও টাকা, আভি চল।

পকেট থেকে একখানা নোট বের করে এগিয়ে দেয়। অবিনাশ কথা বলে না, কেমন বিশ্রী

লাগে লোকটাকে। শুনেছে—দেখেছে ওখানে বাবুদের কথাবার্তা। কলকাতার বাবুদেরও দেখেছে-দেখেছে সেখানকার শ্রোতাসমাজকে, চিনেছে। এরা পাড়াগেঁয়ে মফঃস্বল শহর থেকে এসে যে পাড়াগাঁকে ক্ষণিকের জন্য স্বীকৃতি দিয়ে ধন্য করেছে। মন বিষিয়ে ওঠে অবিনাশের। বলে ও

—যাবো না বলে দিইছি ছানুবাবু।

—যবি না তালে ? ছানু গর্জে ওঠে। ঘোষণা করে ওঠে ছানু—ঘাড় ধরে নিয়ে যেতে পা জানিস ব্যাটা ডোম?

ডোমপাড়ার পদাই বলে ওঠে,

—ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে? এ্যাঁ ?

কৌতূহলী জনতা অনেকেই জমে যায়। অবিনাশ কিন্তু অচল অটল স্থির, সে যাবে ন ঘৃণায় মন ভরে চলেছে তার।

ছানু ব্যাপার সুবিধা নয় দেখে ওই ঘোষণাটা কাজে পরিণত করতে সাহস করে না পা করে পিছিয়ে যায়।

স্থির নির্বাক অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত !

—আচ্ছা ! দেখে লোব তুকে ?

ছানু যাবার সময় শাসিয়ে যেতে ভোলে না।

তখনও নির্বাক অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মত।

অনেক কষ্টে সে আজ নিজেকে সামলাতে পেরেছে, নাহলে এখুনি একটা কাণ্ড বেধে যে

সমবেত ডোমপাড়ার অনেকেই ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়। অবিনাশ সম্বন্ধে ও ধারণা কেমন অন্য রকমেরই।

এখন থেকেই ছোঁড়াটার মাথা সোজা। বসনা ডোম সারাদিন ঢোলঢাক পিটেও রোজ করে বড়জোর নসিকে, না হয় দুটাকা। আর খোরাকি।

গবা ডোমও সানাই বাজায়—সে বুক ফাটিয়ে ফুঁ দিয়ে সারাদিন নেচে-কুঁদে ঢোল-এর স সানাই বাজিয়ে পায় ওই দেড়-দুটাকা। ইদানীং অবিনাশের দলে জুটেছে। পোঁ ধরে ম দম টেনে শুধু সুর রাখে—মাঝে মাঝে একটু ছিদ্র টিপে কাজ করতে গেলেই অবিনাশ চো পাকিয়ে তাকায়।

রেগে যায় গবা।

চোখের সামনে অবিনাশকে ওই ঘণ্টা দুয়েক বাজানোর জন্য নগদ দশ টাকা ফেরৎ দি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছে তারা। তারপর ওই ছানু দাসকে হাঁকিয়ে দিয়ে যেন ঘোর অপরাধ করে ফেলেছে অবিনাশ।

—হ্যাঁরে ফিরিয়ে দিলি ওকে ?

অবিনাশ গবার ডাকে ওর দিকে চাইল। তখনও মুখচোখ ওর থমথমে। অবিনাশ বলে ও

—যা তা বলবে ?

—তা টাকা দিতে এসেছিল যে।

অবিনাশ বলে,

মেলা টাকা ওর, লয়?

ওরা অবিনাশের দিকে চেয়ে থাকে।

অবিনাশ বলে ওঠে কঠিন স্বরে,

—উ টাকা তাই ফেরৎ দিলাম। টাকার জন্য অবা ডোম বাজায় না।

—তবে ? গোবিন্দ প্রশ্নটা করে।

অবিনাশ উত্তর দিল না ওর কথার।

সে কেন বাজায়, কিসের জন্য বাজায়, তা ওদের বোঝাবে কি করে ? নিজেও সব সময় ক বোঝে না. মাঝে মাঝে সবকিছু ঠেলে কোথায় একটা সাড়া জাগে মনের অতলে। বৈশাখী ড়ের মত দুর্নিবার বেগে আসে সেই মাতন, মুঠো মুঠো লালধুলো মেখে বাতাস ওঠে মেতে।

বর্ষার কাজলকালো মেঘ জুড়ে শ্যামল দিগন্তকোলে শালবন সমাকীর্ণ প্রান্তরে নামে বৃষ্টির াড়া। পাংশু আকাশ কোল—চড়াই উৎরাই ঘেরা নীল স্বপ্নমুখর কোন পরিবেশে তায় মনে র আনে।

শরতের সোনালি আলোয় সবুজ মৃত্তিকার বুকে ঘাসফুল ফোটে, হেমন্তের শিশির আর রাদে হীরক দ্যুতির আভাস জাগে।

সুর জাগে।

অবিনাশ বাঁশি বাজায়। সেখানে কেন বাজায়—কার জন্য, তা কোন দিনই ভাবেনি। কি রে সে বোঝাবে ওদের। চুপ করেই থাকে। গেবিন্দ বলে ওঠে,

—বড় বজ্জাত রে ওই ছেলেটা।

গবা ডোম-এর কথার জবাব দিল না অবিনাশ।

বের হয়ে গেল অবিনাশ পথের দিকে, পিছনে ওরা বিস্মিত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে বিনাশের দিকে। এমন বিচিত্র কথা ওরা বিশেষ শোনেনি।

মাথা গরম করা কথা।

ডোমপাড়ার ওরা অবাক হয় অবিনাশের ব্যবহারে। শাবি ডোম বলে,—বিয়ে সাঙ্গা করেনি াই এমনি বাউড়ে বাউণ্ডুলে।

মিষ্টি খুশিতে ভরে উঠেছে। জীবনের সব ক্ষয় ক্ষতি অপচয় আজ তার পূর্ণতার আনন্দে ানন্দময়। নতুন ক্ষেতের ধান এসেছে ঘরে—ওদিকে ছোট্ট খামার ভরে তুলেছে সোনাধান। াবর দিয়ে নিকিয়ে তকতকে করেছে ঘরের আঙ্গিনা, পিঠুলিগোলার আলপনা দিয়েছে।

জলটোপের অবকাশ নেই।

হাতের কাজের ফাঁকে তাকে পড়তে হয় জমিজারাত-এর তদারক নিয়েও। ওই পূর্ণতার ঝে মিষ্টি লোহার আজ সার্থক হয়েছে অন্তর বাইরে। মা হতে চলেছে সে।

সন্ধ্যা নামে।

পৌষ সন্ধ্যা। গ্রামের নিম্ন আকাশ কুয়াশার হালকা রেখায় চাদরের মত মুড়ে রেখেছে,

সবুজ আখের খেতের মাথায় সাদা ফুলকোগুলো যেন সারিবদ্ধ নিশান তুলে রয়েছে—পাখ-পাখালির ডাকে ভরে ওঠে আকাশকোল।

ঘরে ঘরে বাজছে শঙ্খধ্বনির সুর।

দিনান্ত নামে। আলতো পায়ে খড়োঘরের পাশ দিয়ে কোন বৌ চলে গেল সন্তর্পণে প্রদীপ শিখাটুকুকে আগলে সন্ধ্যা দিতে গ্রামদেবতার থানে।

কারিগর বসে আছে। কি যেন ভাবছে সে। অজান্তেই কেমন জড়িয়ে পড়েছে নিবিড় ভাবে—মিষ্টি নয়, এই মাটি, এই পল্লীপ্রান্তর, ওই ছায়াঘন আঁধার-নামা বটবৃক্ষের মত এ মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

—তুই !

প্রদীপটা নামিয়ে প্রণাম করে উঠে আসছে মিষ্টি।

গলায় তখনও শাড়ির আঁচল জড়ানো, কি যেন অজানা আবেশে ঢিপ করে প্রণাম করে ওকে।

—ভাবলাম আর কেউ।

হাসছে মিষ্টি। নিজেকে নিবিড় ভাবে সঁপে দেয় ওর বাঁধনে।

—হ্যাঁরে, তুই দেখছি খুশি হোস্ নি ?

মিষ্টি যেন কারিগরের মন বুঝেছে। কারিগর জানতো মিষ্টির জীবনের নির্মম অভিশাপ, কোথায় অতীতের সেই পাপ আজও রক্তের সঙ্গে হয়তো মিশে আছে—জড়িয়ে আছে নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে। তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।

কোনদিন রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির মত জেগে উঠবে সেই পাপের পুঞ্জীভূত উত্তাপরাশি, অসহ্য দহন জ্বালায় অতীতের সেই গরল ঠেলে উঠবে—চুরমার করে দেবে ওর সব স্বপ্ন-সাধনা।

সবুজ ধরণী—শান্তগৃহকোণ, জনপদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে যেমন জাগে আগ্নেয়গিরির সর্বনাশা ধ্বংসপর্ব তেমনি সেই ঝড় জাগবে।

সেই সর্বনাশা দিন যেন না আসে। আতঙ্কে তাই শিউরে উঠেছে কারিগর। মিষ্টির কথায় জবাব দিল না। ওকে আরও কাছে টেনে নেয় নিবিড় প্রীতিতে।

—না রে, খুশি কেন হবো না ?

মিষ্টি নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিবিড় প্রশান্তি আর তৃপ্তিতে। আজ সব ভুলেছে সে।

কিন্তু সব কিছু ধ্বসে পড়ে, ছিটিয়ে পড়ে তাসের মিনারের মত। এমনি কিছু একটা ঘটবে জানতো করিগর।

সেদিন সামান্য একটা উপসর্গ থেকে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ায়। কারিগর ছুটলো রমণ ডাক্তারের কাছে।

হাতের কাছে সেই-ই এখানকার সিভিল সার্জন।

মুখে সোজা বাঁকা কথা আর কপালে ইদানীং কোন তান্ত্রিক গুরুদেব পাকড়ানোর নজির হিসাবে রক্তচন্দন ললাটিপ আঁকা।

সাইকেলে ওষুধ ইনজেকশনের বাক্সটা বাঁধাই থাকে, শুধু দুগ্গা বলে বের হয়ে ড়ার ওয়াস্তা।

বাপুতি চালার দাওয়ায় একটু মাটির ঢিপি বেদী মত করা—সেইটাই তার বাপের আসন। াশপাশে পাতা রয়েছে মাদুর তালাই। রোগীরা এখানে বসে থাকে রোদপিঠ করে। রমণ াক্তার এ-শিশি ও-শিশি থেকে এটা-সেটা অন্দাজমত ঢালে—তারপর ডাইলিথট করে গাড়ুস্থিত ল দিয়ে। ওই জলটুকুই নাকি তার পিতৃদেবের আবিষ্কৃত বাড়ির পিছনদিককার খিড়কি পুকুর াাড়ার গড়ের' জল, সর্ব-রোগ-জ্বর-হর।

অবশ্য তার গুণেই হোক বা ওষুধের স্পর্শমাত্রেই হোক রোগ জ্বর সারে। আর সাহসটাও মণ ডাক্তারের অপরিসীম। অপারেশনও করে। এমন কি সেবার প্রতাপপুরের ঘোষেদের াড়িতে ম্যানিঞ্জাইটিসের রোগার লাম্বার পাংচার করেছিল বস্তা সেলাই করা গুণসূঁচ দিয়ে—বং ততোধিক বিস্ময়ের ব্যাপার, মধো ঘোষ এখনও সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে হালের াায়ের মেরুদণ্ডে সজোরে পাঁচন হাঁকড়ে চাষবাস করছে।

রমরম পসার রমণের।

জগন্নাথপুরের সরকারী ডাক্তরবাবুও অবাক হয়ে যান।

—বিচিত্র ডাক্তারী মশায়, আর ধন্যি সাহস !

এই করেই রমণ ডাক্তার চালিয়ে যাচ্ছে ; অনেক দেখেছে, কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। াঁচ-দশখানা গ্রামের মধ্যে একটা মান-খাতিরের আসন তার কায়েম হয়ে গেছে।

কারিগরের ডাকে বের হয়ে আসে রমণ।

খবরটা আগে থেকেই জানতো। কিন্তু সেও বিশেষ কিছু আশা করেনি।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে জানতো এমনি একটা কিছু হতে পারে। আজ তাই ঘটেছে। াগটা ওর হাতে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে হাজির হয় রমণ ডাক্তার।

মিষ্টির সুন্দর পুষ্ট চেহারা তীব্র যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। কালো হয়ে উঠেছে মুখ-চোখের াল। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় গর্ভজাত ভ্রূণের পরিসমাপ্তির নিদারুণ হতাশা ওর চোখে।

মা হবার দীর্ঘ দিনের বাসনা কামনা সব তার ব্যর্থ হয়ে গেল। দেখে শুনে বলে ওঠে রমণ,

—হাসপাতালে নি..য় যেতে হবে করিগর।

—এই রাত্রে!

—না হলে সমূহ বিপদ।

এতেই বা বিপদ কম কি ! দীর্ঘ আটক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়িতে করে যেতে হবে, অন্য কোন নবাহন নেই। যে দুর্বল এবং মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে রোগী, তাতে পথেই কোন বিপদ না ঘটে।

রমণ ইনজেকশন দেয় কয়েকটা—কিছু ওষুধপত্রও।

ইতিমধ্যে গাড়ি ঠিক করে এনেছে। রাতের অন্ধকারেই মিষ্টিকে নিয়ে চলে গেল ওরা। াাহার ও বাউরী পাড়ার অনেকেই এসে জুটেছে—কামারপাড়ার দু'চার জনও।

দায়ে-আদয়ে লোকের উপকারই করেছে মিষ্টি—অনেকেই ওর এই বিপদে আজ সমবেদনা জানায়।

চুপ করে থাকে রমণ ডাক্তার।

ওর মনেও আজ মিষ্টির জন্য দুঃখ বোধ হয়।

মা হতে পারবে না সে। যে পাপের বীজ তার রক্তের অতলে আত্মগোপন করে রয়েছে, দীর্ঘদিনের প্রায়শ্চিত্তের পরও তা নিঃশেষে নির্মূল হয় নি। মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠেছে। ব্যর্থ করেছে তার কামনা—তার মাতৃত্বের সাধ।

রাত শেষ হয়ে আসছে। মিষ্টির সাজানো বাড়ি আবছা আঁধারে স্তব্ধতার অতলে ডুবে আছে। কোথায় পাখ-পাখালি ডাকছে ভোর হয়ে আসে।

জীবনরত্নের সেদিন বাপের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল বেশ। কালীপুজো উপলক্ষে থিয়েটার হবে, ইতিপূর্বে বরাবর তাই হয়ে এসেছে। ওই পুজো ধুমধামও বেশ করে তারা। এতাবৎ অন্য সব পুজোর চেয়ে ওই পুজোটাই করে এসেছে তারা জাঁক করে।

তারকরত্ন কেন, এ গ্রামের এদিক-ওদিকে দুচার ঘর ধ্বসেপড়া জমিদার গোষ্ঠী এখনও ওই এক অমাবস্যার রাত্রে বেশ জাঁকিয়ে ওঠে।

সারা বছরের পরিত্যক্ত কালীবাড়ির গায়ে চুনকলি ফেরান হয়; সামনের মাঠের আগাছ ঘাস কালকাসিন্দের জঙ্গল সাফ করে বড় হাড়িকাঠ পুঁতে তাতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে জাঁকালো করে তোলে পুলিন কর্মকার। সেই এই পূজার হন্তারক, তারজন্য জমিরও বরাদ্দ আছে। একটা দুটো নয়, এক কুড়ি পাঁঠা পড়তে থাকে।

একধার থেকে কোপ বসাত আর পিছনে ছুঁড়ে গাদা লাগাতে মুণ্ডুগুলো। সে আজ কয়েক বৎসর আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

নামে মাত্র চারটা পাঁঠা পড়ে চার প্রহরে। আর প্রসাদ ভোগ, তাও ক্রমশঃ কমতে কমতে আসছে

পরদিন থিয়েটার-যাত্রা হতো। সমারোহ উৎসব। জমজম করমতো গ্রাম।

এবারও তেমনি একটু সমারোহ হবে ভেবেছিল জীবনরত্ন। এই ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব খাটে—একটু অন্য দিকেরও কদিন সুবিধা হয়। কারণবারি ইত্যাদিও জোটে।

গোকুল গ্রামেই রয়ে গেছে, এদিক ওদিকে তাল দেয়। এই সময় সেও এসেছে জীবনের কাছে, কালীপুজোর উৎসবে তবু কদিন কাটাবে গোকুল।

মাল চলে টলে। জুয়ার আড্ডা বসে সারারাত। এবার কথাটা পাড়ে গোকুল।

—কি হবে-টবে আগে থেকে হুকুম ফরমাইস করুন দাদাবাবু, নালে সমসম কালে হেনো চাই তানা চাই বললে লারবো কিন্তু।

জীবন বাবাকে তাই বলতে গিয়েছিল কথাটা।

তারকবাবু কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে গেছে একেবারে।

বিপদ দুর্ভোগ একা আসে না, আসে একসঙ্গে, না হয় একটার পর একটা। কোথায় যেন এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত অভিশাপ জমে আছে। আজ তাই ফলতে চলেছে।

সাজান বাগান, সবুজ শ্যামল গাছগুলো সেই অগ্নিকাণ্ডের পরই পুড়ে ঝলসে গেছে। চারিদিকের দেওয়ালে কালো বিবর্ণ ঝলসানো দাগ। মাটিও রুক্ষ কর্কশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বর্ষার জলে সেই কালো রং লাল মাটিতে মিশে বিশ্রী দেখাচ্ছে। আগুনের প্রচণ্ড তাপে বড় দালানের দোতলা থেকে নীচের দেওয়াল অবধি ফাট ধরে গেছে। ওই এক আগুনই তার সর্বনাশ করেছে, তখন থেকেই সব যাচ্ছে একে একে।

এক বর্ষার ফলে সেই কার্নিশের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, মেরামত করবার সাধ্যটুকুও নেই। এটাও বেশ যেন বুঝতে পেরেছে। এতবড় বাড়ি কেবল খসে খসে পড়তে শুরু হয়েছে।

ফাঁকা বৈঠকখানা—বোর্ড অফিসের প্রবল শাসনেও আর মন নেই। নিজের পায়ের তলের মাটি সরে যাওয়া একটি মানুষ ত্রিশঙ্কুর মত যেন শূন্যে ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়বে। তাই অযথা লোককে শাসন করতে যেন শক্তি খুঁজে পায় না তারকরত্ন।

অবনী মুখুয্যেই খবরটা আনে—অশোকের ওই পাথরের ঠিকা দেওয়ার খবর। বলে অবনী,

—লাল হয়ে গেল হে ! শ্রেফ রেড বনে গেল।

—কে ? তারকরত্ন মুখ তুলে চাইল।

—ওই অশোক, মালিয়াড়ার জঙ্গলে পাথরের ইজারা দিল, কাঠও বিক্রি করেছে। শুনলাম তা মবলক তিরিশ হাজার তো পাবেই। আর করিতকর্মা ছেলে।

চুপ করে থাকে তারকরত্নবাবু, কথার জবাব দিল না।

এ যেন একটা নীরব বেদনার মত বাজে তার বুকে। একজন তার সামনে মাথায় উঠে যাচ্ছে, সে পড়ছে পায়ের তলে, নীচে।

নিজের ছেলেকেও মানুষ করতে চেষ্টা করেছিল তারকবাবু কিন্তু পারেনি। ব্যর্থ হয়েছে। তবুও চলে যেত একটা ছেলের দিন কোনরকমে বিষয় সম্পত্তি নাড়াচাড়া করে।

কিন্তু এমনি দুর্যোগ আসবে স্বপ্নেও তা ভাবেনি। ওই মালিয়াড়ার জঙ্গল, ওই বন্ধ্যা কাঁকুরে ডাঙ্গা ছিল তাদেরই দখলে, বাঁটোয়ারার সময় তারকরত্ন ফিকির করে ওই উষর পার্বত্যভূমি সোল বলে চালিয়ে ওদের বাগে ঠেলে দিয়ে নিজে দখল নিয়েছিল ভালো ধানী জমি। ছোটকর্তা পরে হেসেছিলেন জমির রকম দেখে। বলেছিলেন,

—ওই সোলে যে শুধু পাথর আর পাথর, ঘাস অবধি হয় না। কি সোল জমি দিলে তারক ?

সোল বলতে প্রথম শ্রেণীর ধানীজমিই বোঝায়। কথাটা শুনে তারক সেদিন যেন আকাশ থেকে পড়েছিল।

—তাই নাকি কাকামশায়! আমিন ফৈলাদার কাণ্ড সব! ছিঃ ছিঃ, কিন্তু এখন আর কি করা যাবে?

ছোটকর্তার একটি মাত্র কন্যা সন্তান—ওই অশোকের মা। বৃদ্ধ হাসেন।

—যাকগে, আমার নাতি না হয় পাথরই চুষবে।

আজ সেই ধানী জমি চলে গেছে চাষীর হাতে, ভিন প্রজা আজ সে, ওই অনুর্বর পাথুরে ডাঙ্গা এনে দিয়েছে ওই অভূতপূর্ব সম্পদ ছোটকর্তার নাতি ওই অশোকের ভাগ্যে।

—কোত্থেকে শুনলে? তারক ফুরসি ফেলে প্রশ্ন করে।

—ওই পানুর কাছেই। তারই মহাজন নাকি নিয়েছে।

—ও ! চুপ করে গেল তারকবাবু।

কথাটা তা হলে মিথ্যা নয়। চুপ করে কি ভাবছে তারক।

দু'চারজনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কালীপুজোর ব্যাপারে আগে থেকেই কর্তারা ঢাকী, ঢুলী, পূজারী ব্রাহ্মণ, ওই হস্তারক—সবাইকে জমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তারাই সমবেত হয়ে যে যার কাজ করতো, তা ছাড়াও তারকবাবু সমারোহ করতেন।

এবার তাদের কারও দেখা নেই।

মূর্তি গড়তো ভূষণ ছুতোর—এবার জবাব দিয়ে গেছে, একে একে

অনেকেই। আজ তারকবাবু চিন্তায় পড়েছে।

ওরা কেউ আর আসবে না, কোন দায়-দায়িত্ব তাদের আর নেই। তারকবাবুও পূজো চালাতে সামর্থ্য নেই, মনে হয় অপচয়।

বন্ধ করে দেবে এতদিনের পুজো। ! পিতৃপুরুযের পুণ্যকর্ম।!

ভূষণ ছুতোর সাফ বলে ওঠে,

—এতকাল বিনিখাজনায় জমি পেয়েছি, কাজ করেছি। এখন তো সরকারের ওয়াশীলদারকে খাজনা মিটিয়ে দিতে হছে আজ্ঞে—বিনামজুরি আর বেগারিতে কেমন করে কাজ করি বলেন?

ওদের সকলেরই এক কথা। এক বছরের মধ্যেই বেমালুম সব বদলে গেছে। আজ জমি তাদের নামে, খাজনারও রেয়াৎ নেই। কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয়।

—তবে কি পুজো হবে না?

অসহায়কণ্ঠে তারকবাবু যেন আর্তনাদ করছে। অবনী মুখুয্যে ধমকে ওঠে।

—ইস্টুপিড কোথাকার—বেলাড়ি—

হস্তারক নিতাই কামার বাধা দেয়,

—যা তা বলবা নাই বেলাড়িবাবু।

সতীশ ভটাচায তাদের সামল নেয়।

—মায়ের পুজো হবেক নাই—হ্যাঁরে ভূষণো ?

মাথা চুলকোচ্ছে ওরা। সতীশ ভটচায পরম মাতৃভক্ত সন্তানের মত তখন বলে চলেছে,—এতকালের পুজো !

কোন রকমে ওরা রাজি হ'ল, তবু বলে,

—কিন্তু খোরাকি আর আধারোজ দিতে হবেক আজ্ঞে?

হস্তারক নিতাই দাবী করে,—আর ফি পাঁঠার মুড়ো।

হাসে তারকবাবু,—এবার পাঁঠা দেবে মাত্র একটা। তা নিতে চাস নিবি।

কোন রকমে ওদের দয়াতেই যেন পুজো সুরু হয়।

কমপেনসেশন-এর টাকারও মুখ দেখেনি এখনও—তা বের করতেও নানা হাঙ্গামা ; সেও এক কোর্ট কাছারি—মোক্তারের ব্যাপার। তাদের পিছনেই সব খরচান্ত, তবু টাকা কবে পাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই, এদিকে এ বছরের ফসলও এক দানা ঘরে ঢোকেনি। ভাবনায় পড়েছে তারকবাবু।

বৈঠকখানা খালি হয়ে গেছে।

কোন রকমে গরিবের পিতৃদায় সারার মত পাঁচজনের অনুগ্রহে আজ কালীপুজো হতে চলেছে। বন্ধই করে দিত, কিন্তু পারেনি।

এমন সময় হঠাৎ জীবনকে ঢুকতে দেখে একটু চাইল ওর দিকে।

—কিছু বলবে ?

তারকবাবু প্রশ্ন করে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। এখনও ওর বেশ-বাস তেমনি ছিমছাম, ও বোধহয় জানে না যে পায়ের নীচের মাটি আর তাদের নেই।

জীবন বাবার সামনাসামনি বিশেষ হয় না। এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে। বৈকালের আবছা আলো নেমেছে, কেমন মলিন বিবর্ণ সেই আলো। কোথায় পাখি ডাকছে, শূন্য অসীম ঠাণ্ডায় খাঁ খাঁ করছে নির্জনতা।

আটিল পাঁচিল ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে মূর্তিমান ধ্বংসের মত বসে আছে তারকবাবু। জীবন বলে চলেছে,

—এবার গ্রামের ছেলেরা ধরেছে কালাপাহাড় যাত্রা করবে কালীপুজোয়। বেশি নয়, শ'তিনেক টাকা লাগবে। জুয়া আর ঝাণ্ডির ছকওয়ালারা একশো দেবে বলেছে। বাকি দুশো আমাদের দিতে হবে।

তারকবাবু অবাক হয় ওর কথা শুনে। রাগ চেপে বলে ওঠে,

—দুশো টাকা! যাত্রা করবে ?

খুশি ভরে বলে ওঠে জীবন,

—হ্যাঁ।

তারকবাবু সোজা হয়ে বসল। একটু অবাক হয়ে গেছে জীবন বাবর কথা-বার্তায়। তারকবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকে।

আজই যেন মনে হয়, কি একটা অপদার্থ ওই জীবন—তারই সন্তান। চোখে মুখে এরই মধ্যে জমেছে বিশ্রী একটা কদর্যতার ছাপ। কোনদিনই বোঝবার চেষ্টা করলো না—কি করে দিন চলে। এতবড় পরিবর্তনও একবার চোখ চেয়ে দেখল না।

বলে ওঠে তারকবাবু,—জীবনে দুশো টাকা রোজকার করেছ কখনও ?

অতর্কিতে যেন মুখের উপর চড় খেয়েছে জীবন।

—এ্যাঁ !

—হ্যাঁ, দুশোটাকা নিজে রোজকার করোনি কখনও—অথচ খরচ করতে চাও কি বলে?

—কিন্তু পুজো—যাত্রা ?

তারকবাবু আপন মনে বলে চলে,

—ও সব আর হবে না। নিজেরা কি করে বেঁচে থাকতে পারো খেয়ে পরে—তাই ভাবো এইবার। এদিকে তোমারও সংসার হয়েছে।

জীবন চুপ করে থাকে। এসব কথা কোনদিনই ভাবেনি।

বাবা শখ করে কবে কোন বাল্যকালে বিয়ে দিয়েছিল জানে না, ওটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সব নিয়েই এতদিন বাবার স্কন্ধে ভর করে এলাহি কারবার চালিয়েছে জীবন।

আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে কোথায় একটা ফাঁক—একটা বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে, তার অতল গহ্বরে যেন সবকিছু সেঁধিয়ে যাবে।

তারকবাবু বলে ওঠে, —চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখ। রোজকার কর এইবার। নাহলে দিন আর চলবে না।

চুপ করে কথাটা শুনে বের হয়ে আসে জীবনরত্ন।

এই কথাটা মিষ্টি লোহারও কয়েকমাস আগে তাকে বলেছে, এমনি কঠিন কথা। আজ বাবাকেও তা বলতে শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে জীবন। ফিরে এলে গোকুল ওকে দেখে বলে ওঠে,

—কি হল দাদাবাবু ! এদিকে পানুর দোকানে বরাত দিয়ে এলাম—পাঁচ সের সোরা, পাঁচ ছটাক গন্ধক ; বনে কুলগাছ কাটতে পাঠিয়েছি, পুড়িয়ে আংরা করুক। গেঁঠে যা হবে একেবারেগান্দাগুড়ুম ! আর যাত্রা—

গোকুল বাইরের পথে অপেক্ষা করছিল। এতবড় পুজোর সবই যেন তার দায়িত্ব। জীবনকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে,

—তা মাইরি অমন টাউরি খেয়ে গেলেন কেনে? ওদিকে ঈশ্বর ডোম আজ এসেছিল, ঝাণ্ডির ছক পাতবে, পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে, আমি বলে দিইছি ছোটবাবুর হুকুম।

চুপ করে থাকে জীবন। আজ বুঝতে পেরেছে হুকুম দেবার হক আর নেই, নেই সেই হুকুম তামিল করবার লোকও। গোকুল তবু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে,

—তা চলেন আখড়ায়।

—শরীরটা ভাল নাই গোকুল।

জীবন চলে গেল বাড়ির দিকে।

গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা পাড়াটা নিঝুম। সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে কেমন ভূতোপুরীর মত দেখাচ্ছে।

অনেক প্যাঁচ পয়জার কসছিল গোকুল, পুজোর ব্যাপারে যদি কিছু হাতানো যায়, একেবারে মিইয়ে গেছে জেল ফেরৎ এসে। দলবলও নেই।

কিন্তু এখানে যে কিছু হবে না, তা বেশ বুঝতে পেরেছে। বিরক্ত হয়ে ওঠে গোকুল, এবারে এরা এমনি ছিবড়ে হয়ে গেছে তা বুঝতে পেরে রেগে ওঠে।

—ধ্যুত্তোর !

কেরকম চটেমটেই হতাশ হয়ে চলে গেল সে। এবার সব যেন গোলমেলে লাগছে।

চুপ করে আঁধার পথ দিয়ে বাড়িতে ঢুকল জীবন। আগে দেউড়িতে আলো জ্বলতো—কেরাসিনের পুরোনো আলো, এখন তাও জ্বলে না। দারোয়ানদের খুপরিগুলো ফাঁকা পড়ে আছে।

কেমন যেন একটা ধ্বংসপুরী।

আগাছায় ঢেকে আসছে পথটা বর্ষার জলের পর, জন্মেছে কালকাসিন্দে আর কুক্‌সিমার জঙ্গল। কি একটা সড় সড় শব্দ ওঠে।

আবছা অন্ধকারে দেখা গেল না, সাপই হবে বোধ হয়, সেটা গিয়ে ওই ফাটা পাঁচিলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

থমকে দাঁড়াল জীবন।

কোথায় বাড়ির পিছনের বিস্তীর্ণ আগাছার জঙ্গলে ডাকা পুকুরের ধারে শিয়াল ডাকছে। কেমন একটা অমঙ্গলের চিহ্ন—আতঙ্কের কালোছায়া সারা মনে এসে বাঁধে।

বাড়িতে ঢুকতে মণিমালা একটু অবাক হয়ে স্বামীর দিকে চাইল। এত সকাল সকাল বাড়ি ঢোকে না জীবন বড় একটা, ঢোকে অনেক রাত্রে। মুখে গায়ে ওঠে বিশ্রী একটা টকটক গন্ধ।

আজ জীবনকে দেখে একটু অবাক হয়েই চাইল মণিমালা। জীবনও স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে।

এতক্ষণ বোধ হয় হেঁসেলের আঁচে ছিল, টকটকে ফর্সা রং কেমন লালাভ হয়ে উঠেছে। আগে বাড়িতে রান্নাবান্না করার কাজটা ছিল অপরের হাতেই। ঝি—চাকর—ঠাকুরের অভাব ছিল না।

আজ সবকিছুই সীমিত হয়ে এসেছে।

—রাঁধছিলে ?

—হ্যাঁ। শরীর খারাপ ?

ওর কণ্ঠে ব্যাকুলতা। জীবন জবাব দিল না। উঠে গেল উপরের ঘরে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানালার বাইরে প্রায়ন্ধকার গ্রামের বসতিতে হেথা হোথা জ্বলছে দু'একটা আলো। তার পরেই বনের জমাট অন্ধকার।

দূর আকাশের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। কোন দিন রাতনির্জনে ওদিকে চেয়ে ওকথা ভাববার অবকাশ হয়নি জীবনের।

আজ মনে হয় তার জীবনও অমনি আঁধারে ঢাকা, কি করবে তা জানে না সে। চেয়ে থাকে দূরের পানে। অন্ধকারে দৃষ্টি হারিয়ে যায়।

আলো জ্বলছে দূরে চড়াই-এর মাথায়। নৈশ অন্ধকারে সম্মিলিত আলোকপুঞ্জ কেমন উজ্জ্বল আভায় রাঙ্গিয়ে তুলেছে অন্ধকার দিগন্ত। বাতাসে ভেসে আসে বুলডোজার ইঞ্জিনের গর্জন—কোথায় ব্লাস্টিং-এর শব্দ উঠছে।

দুর্গাপুরের ব্যারেজ স্টিল প্লান্ট বসছে। প্রবল একটা ঢেউ যেন একটা আবর্তের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চারিদিকে তাই ভাঙ্গার পালাই চলেছে। জীবনবাবু কাকে দেখে বলে ওঠে,

—কে ?

মণিমালা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মলিন বিবর্ণ ওর চেহারা, চোখের কোলে জমেছে কালির দাগ। পরনে বিবর্ণ আধময়লা শাড়ি।

আজ স্ত্রীকে নতুন করে দেখল জীবন। একটি মূর্তিমান আগত দৈন্য আর হতাশা ঘেরা ভবিষ্যতের ছবি। মণিমালা এগিয়ে আসে।

—বাবা কি বলছিলেন ?

কথাটা এখানেও এসে পৌঁছেছে। কি ভেবে জবাব দেয় জীবন,

—কথাটা বোধহয় সত্যি, ঠিকই বলেছেন বাবা। দিন আর এভাবে চলবে না।

চুপ করে থাকে মণিমালা, নীরব নিস্তব্ধ ঘরে বাচ্চাটা হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে ওঠে। ওকে বুকে তুলে নেয় মণিমালা। নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারে কাঁদছে ছোট্ট খুকিটা—কি যেন করুণ অসহায় আর্তনাদে।

জীবন এই প্রথম শুনল ওর অসহায় কান্না। কদিন থেকে জ্বর বাছার ! মণিমালা বলে ওঠে,

—জ্বর !

জীবন নিজেই লজ্জা পায়, সংসারের কোন খবরই সে রাখে না। মণিমালা বলে চলেছে,

—রমণ ডাক্তার কাল এসেছিল।

—ও! তা কি বলছে ?

—বাবাকে কি বলল ওষুধ দিয়েছে। বাবা মাকে বলছিলেন—ঠিক সোজা অসুখ এ নয়, সাবধানে থাকতে হবে। চিকিৎসা আর পথ্যও দরকার।

কথাটা এতদিন ভাবেনি জীবন। ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি। এইবার যেন করছে। বাবা পরিষ্কার আজ জানিয়ে দিয়েছে পাকে-প্রকারে তার অসহায় অবস্থার কথা।

জীবনকে নির্দেশও দিয়েছে তার কর্তব্যের। কি এক নতুন সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আজ জীবন।

—কি ভাবছো ?

—কিছু না!

মণিমালার নিরাভরণ হাতের দিকে চেয়ে থাকে। কেমন একটি স্তব্ধ হতাশার প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে শীর্ণশিশুকে কোলে নিয়ে।

ওর গহনাপত্র সবই প্রায় গেছে সেবার লাটের কিস্তি মেটাতে। তীরে এসে বাকি করের দায়ে তরী ডুববে—ফৌত হয়ে যাবে জমিদারী—এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাবে না, তাই যেমন করে হোক তারকরত্ন সেবার হালসন অবধি কিস্তি মিটিয়েছে।

এই টানে শ্রীহরি ফাঁদতে হয়েছে পানু দাসের কাছেও কয়েক হাজার টাকার; জমি বাড়ি, মণিমালার গহনার বেশির ভাগই গেছে।

মাসে মাসে শতকরা বারো টাকা হিসাবে আছে প্রাণবল্লভ দাসের সুদ, এটাও ক্রমশঃ জেনেছে জীবন।

রাত নামে।

কেমন চঞ্চল অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছে সে আলসে-কার্নিশ-ভাঙ্গা জীর্ণ ছাদে।

দূর আকাশে উঠেছে রোশনী, দামোদরের মানাবন—মামড়ার শাল জঙ্গলের সীমানা, আকাশ-কোল আলোয় ভরে উঠেছে। বাতাস ভরে উঠেছে ওদের যন্ত্রদানবের ক্রুদ্ধগর্জনে।

বিনিদ্র রাত্রি কাটে জীবনের।

কথাটা গ্রামে চাউর করেছে গোকুলই। পানু দাসের ধানকলের আশে পাশে ঘোরে, মাঝে মাঝে সে লোকজন যোগাড় করে দেয় কলে। তাদের দালালি করে, পানু হেথা হোথা গেলে তার গাড়িতে সঙ্গে যায়।

পানুও ওকে সঙ্গে নিলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করে। ধানকলের মিস্ত্রি-ফিটার-ইলেকট্রিসিয়ান-ক্যাশবাবু—আরও ক'জন কর্মচারী মিলে একটা শেডের একধারে বেড়া দিয়ে মেস-এর মত করেছে, সেখানেই চাট্টি খেতে পায় আর পড়ে থাকে ওইখানেই গোকুল। কামারপাড়ায় যাবার সাহস তার নেই। ওইখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

সেদিন খবরটা সেই-ই চাউর করে পানু দাসের বৈঠকখানায়। পানু এখন সকালে এক ঘণ্টা ধানকলে আসে, বাইরে থেকে লোকজন মহাজন আসে, আসে দুর্গাপুর আড়তের আড়তদার। আর নিজেকে দাঁড়িপাল্লা ধরতে হয় না। ওসব কাগজ কলমেই হয়।

সকালে অনেকেই প্রাণবল্লভকে দেখবার জন্যই আসে। চায়ের আড্ডা এখানেই জমে, তারকবাবুর ওখানের জবাব দেওয়া দারোয়ানদের দু-একজনও এইখানেই আশ্রয় পেয়েছে। গোলাব সিং, প্রভু সিং—আরও কয়েকজন। শুধু তাদের মনিব বদলেছে মাত্র। তারাই চায়ের জলও বানায়।

সতীশ ভটাচায এখন পানুর মাথার মণি।

তার যাগ-যজ্ঞ বৃথা হয়নি। একা পানু কেন—পানুর মহাজন সেই রামরতন রাঠি, মায় দুর্গাপুরের আরও দু'চারজন তেজীমন্দার কারবারীকেও সে হাত করেছে—কবচ দিয়ে সৌভাগ্যের শিখরপানে ঠেলা মেরেছে। দিন বদলেছে, সতীশ ভটাচাযের।

গোকুল সেদিন কথাটা পাড়ে,—এতকালের পুজো পড়ে যাবেক, জাগ্রত ঠাকুর !

—মানে ?

ওই বড় কালীপুজো গো ?

বড়বাবুদের পুজো, সেই থেকেই ওই নামটা হয়েছে—বড় কালীপুজো।

—তাই নাকি ? পানু দাস কথাটা শুনল মাত্র।

সতীশ ভটাচায বলে ওঠে,

—সত্যিই গ্রামের এতবড় একটা পুজো পড়ে যাবে বাবা ! চাকরান জমি ছিল যাদের তারা তো আর আসছে না।

গোকুলও মাথা নাড়ে,—সত্যি !

ডেঙ্গো বড়ঠাকুর বুড়ো হয়ে গেছে। বাইরে আর কোথাও রসুইদারী কাজ করতে পারে না, শরীর ভেঙ্গে গেছে। আর সেদিনও নেই, সেই প্রচুর্যের দিন। তখন খেয়েছে বিলিয়েছে ঘি সন্দেশ কলকাতার বাজারে। আজ সেখানে ঠাঁই নিয়েছে দালদা, খাবারও নেই।

বয়সের ভারে জীর্ণ হয়েছে দেহ। সেবার কলকাতায় কোন কাজের বাড়িতে ভারি কড়াই নামাতে গিয়ে কেমন করে বুকের একটা শির ছিঁড়ে যায়, সেই থেকে শুরু হয়েছে কাশি।

অমন শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

পানুর ধানকলের মেসে আশ্রয় নিয়েছে সেও।

কালীপুজো আর মাংস পোলাও-এর কথা ভেবে সায় দেয় সে।

—তাই দেখেন বাবু, মায়ের পুজো। তাছাড়া সদর থেকে দু-চারজান বন্ধু-বান্ধব আসবে, দুগ্‌গাপুরের সাহেবরাও।

পানু দাস একবার ডেঙ্গো বড়ঠাকুরের দিকে চাইল। কথাটা কেমন মনে ধরেছে। ধানকল প্রতিষ্ঠার সময় সতীশ ভটাচাযের কথাতেই শ্মশান-কালীর পুজো করেছিল, প্রসাদ লাভ করেছে বৈকি।

তাছাড়া দুর্গাপুরেও কিছু কাজকর্ম অর্ডার পত্র পেতে চায় ; শুনেছে এদিকে ইলেকট্রিক লাইন বসবে—কোন রকমে কলবাড়িতে কনেকশন নিতে পারলে অর্ধেক খরচ কমে যাবে ; অন্যান্য কিছু কারখানাও বানাতে যাবে।

সতীশ ভটাচায, গোকুল, ওই ভুলু ভটাচায ওরফে ডেঙ্গো ওরফে বড়ঠাকুর—সকলেই যেন পানুকে নীরব অনুরোধ জানাচ্ছে ওই পুজো টেনে নিতে।

পানু জবাব দিল না। তবু কথাটা তার মনে ধরেছে।

আজকাল মতামত দিতে সে চিন্তা ক'রে কথা বলে। তাই ভাবছে।

চুপ করে বসে আছে কদম-বৌ।

আজ সে খানিক থমকে দাঁড়িয়েছে—যেন জীবনের পথ পাড়ি দিয়ে এসে আজ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। নেজ বৌ-এর ছেলেটা ককিয়ে কাঁদছে।

অন্য সময় হলে তুলে নিত, বকাবকি করতো বৌকে।

—হ্যাঁলো, বলি এত কিসের কাজ যে ছেলেকে সময়ে মাই দিবি না?

আজ কেমন বিরক্তি এসে গেছে তার।

চুপ করে সরে গেল, যেন দেখেও দেখে না কদম।

বৈকাল হয়ে আসছে, বাঁশবনের মাথার উপর নীল আকাশে সাদা মেঘের পাশে ভেসে চলেছে একটা কালো ধোঁয়ার ছোট্ট মেঘের মত কুণ্ডলী, পানু দাসের ধান কলের চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে নির্ধুম নীল আকাশে। কালো একটা রেখা সাদা মেঘের পাশাপাশি চলেছে।

শালের হাতুড়ি পেটার শব্দ উঠছে ঠং ঠাং, নীরব আকাশ ওই শব্দ আর ধোঁয়ার স্পর্শে কেমন বদলে গেছে, নতুন কারা এসেছে—কি এক অন্য জগতের ভাবনা নিয়ে।

—বলি কথা কানে যেছে না ?

ভুবন বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করেছে, সারাদিন তেতে পুড়ে এসেছে শালে। চান-ভাত করতে বেলা গড়িয়ে যায়।

কদমের মনে তখন অন্য জগতের সুর। ওই নীল আকাশে ভেসে যাওয়া ধোঁয়ার ক্ষীণ আভায় তার মনে অজান্তেই কোন অন্য সুর এনেছে। তার হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলোর সুর। ছেলেবেলার সেই বঁইচি শেয়াকুল বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অভিযান, তেমনি ঘর-পালানো কিশোরীর চোখে ট্রেনের ধোঁয়া আজ কেমন সেই দিনের কথা স্মরণ করায়।

ভুবনের ডাকে বিরক্ত হয়ে চাইল কদম। বলে ওঠে,

—কেনে ঘরে আর কি লোক নাই যে শরীর মন বেজুত হলেও কাজ করতে হবেক ?

—শরীর এত কি তুর বেজুত? বেশ তো আছিস?

চটে ওঠে কদম ভুবনের কথায়। বিচিত্র একটা মানুষ, কোন দিনই তার দিকে চেয়েও দেখল

না। মানুষ নয়—আগুনের তাপে থেকে আর শালে হাতুড়ি পিটে ওর মানুষের সব পরিচয় মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। আজ রাগও হয়—কেমন অসহায় অভিমান আর রাগ।

বলে ওঠে কদম,

—কোনদিন খপর নিয়েছো রইলাম না গেলাম ?

সারাদিন খাটাখটুনির পর এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে ছিল। তার উপর ওই সব বাঁকা কথা শুনে দপ্ করে জ্বলে ওঠে ভুবন। খিদে আর তেষ্টাতেও জ্বলে ওঠে মন। জবাব দেয়,

—তুর খপর নেবার জন্য কত লোক রইছে ?

চমকে ওঠে কদম, এতদিনের চাপাপড়া সেই অতীতের কলঙ্কময় কাহিনীটা যে ও আজও ভোলেনি, তা কদম বুঝতে পারে।

ঘৃণায় রাগে জ্বলে ওঠে কদম,—কি বললে ?

—ঠিকই বলেছি। অনেক লোক আছে তাই যখন তখন যা তা কথা বলিস।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কদম ওর দিকে। আজ সব হারিয়ে যাচ্ছে তার, এ বাড়িতে তার প্রতিষ্ঠা, এত পরিশ্রম করে এই সংসারকে দাঁড় করানো, সব কিছু। বলে ওঠে কদম,

—সহ্য করতে না পারো দূর করে দিলেই তো পারো।

ভুবন গর্জে ওঠে,—তাই দোব এইবার। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দোব।

লাফ দিয়ে উঠেছে ভুবন দাওয়ায়, দুচোখ দিয়ে যেন আগুন বের হয়।

কদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সে একটা বোঝাপড়া করতে চায়।

বুড়ো অতুল বাড়ি ঢুকছিল, হঠাৎ ভুবনকে অগ্নিমূর্তি ধরে কদমের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সেইখান থেকেই চীৎকার করে ওঠে অতুল।

—ভুবনা ?

ভুবন বাপের ডাকে দাঁড়াল। বুড়ো কথাগুলো কিছু শুনেছিল, কিন্তু ভুবনের ওই হেঁকে তেড়ে যাওয়াটা সমর্থন করতে পারে না বুড়ো । বকতে থাকে—

—এত বড় বাড় তুর, ঘরের লক্ষ্মীকে গলা ধাক্কা দিতে যাস ?

—ঘরের লক্ষ্মী !

ভুবন আজ যেন প্রকাশ্যেই ফেটে পড়বে।

বাবাকে দেখে থামল, ওদিকে মেজবৌ-ছোটবৌও এসে দাঁড়িয়েছে। চুপ করে গেছে সবাই।

কদম চলে গেল ঘরের ভিতর।

ভুবনও খেল না, ভাত রইল পড়ে, শালের দিকে চলে গেল।

—খেয়ে যা !

ডাক পাড়ে বুড়ো অতুল। ভুবন যাবার মুখে জবাব দেয়,

—এ ছাই আর খাবো না।

কেমন একটা অন্তহীন স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে, উঠানে। একটা কাক শুধু ডাকছে কর্কশ কঠিন স্বরে।

—বৌমা !

অতুল ডাকছে কদমকে।

সাড়া দিতে পারে না কদম, কি এক অসহায় বেদনা আর ব্যর্থতায় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু নামে, গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে কি একটা বস্তু।

কাঁদছে কদম—ব্যর্থতায় আর অপমানের তীব্র জ্বালায়।

ভুবন সরে গেছে বাইরে। নিস্তব্ধ নীরব দিগন্তে ঘণ্টা বাজে।

বৈকাল পাঁচটা।

প্রাণবল্লভই বড়বাবুর দেহউড়ির পরিত্যক্ত কাজটা তুলে নিয়েছে। ওই মহাকালের অখণ্ড বুকে কঠিন আঘাতে চিহ্নিত করছে তার প্রহরগুলোকে।

সন্ধ্যা নামে গ্রামপ্রান্তে। কেমন করুণ বিষণ্ণ সুরে বাজছে ওই ঘণ্টাটা। কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর শব্দ।

অশোক ফিরে এসেছে গ্রামে অন্য মন নিয়ে। দু'দিনের জন্য সে যেন বদলে গিয়েছিল, চেয়েছিল গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে শান্তি আর উপভোগের জীবনে বাসা বাঁধতে, তাই বোধহয় চেয়েছিল প্রীতিকে। একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে নিজেকে হারিয়ে যেতে।

কিন্তু তার এতটুকু চিহ্ন সে যা দেখেছে তাতে শিউরে উঠেছিল, হতাশ হয়েছিল ; ব্যর্থ মন হয়তো বেদনায় ভরে গেছে, সরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল।

কিন্তু তা পায়নি। ফিরে এসেছে তাই এই গ্রামেই নিজের কাজের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে।

ক'মাসেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে এই গ্রামের জীবনযাত্রার স্রোত। গঙ্গামণি ঠাকরুণ, নির্বাক ওই নারাণ ঠাকুরের সর্বনাশ রোধ করতে সে পারে নি। পানু দাস তার আগেই গ্রাস করেছে ওদের সেই পাঁচ বিঘের বাকুড়ি, পাকা দখল করেছে। ধানকলের ধান শুকোবার সিমেন্টের জমানো মাঠ তৈরি করে ফেলেছে।

তারকবাবুর প্রাসাদে ফাটল ধরেছে ; ও ফাটল ধরবে, ধ্বসে পড়বে ওই প্রাসাদ তা সে জানতো। কিন্তু তারপর ?

বিরাট এই পরিবর্তনের পর কি ভূমিকা নিয়ে গ্রাম-জীবনের পরিবর্তনের সুচনা হবে তা ঠিক ভাবেনি।

ধীরে ধীরে অশোকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে দুটি পথ; কামারপাড়ার এবং অন্যান্য শ্রেণীর রুজি-রোজকারকারীরাও বেশ বুঝতে পেরেছে, তাদের দিন বদলাচ্ছে। সচেতন হয়ে উঠেছে তারা।

তারাও জমির মালিক হয়েছে কিন্তু চাষবাসে মনমেজাজ তাদের নেই। ; তবু গ্রামের সব ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসছে, পাশে পাশে প্রভুত্ব আর প্রতিপত্তি নিয়ে উঠছে পানু দাস, ছানু দাস। তারা যেন ঠাঁই নিয়েছে তারকরত্ন শ্রেণীর।

কিন্তু দু'দলের সংঘাতই সেই বুদ্ধিহীনতার দোষে দুষ্ট। সেদিন অশোকের কাছে এইটাই রিষ্কার হয়ে ওঠে।

তারকরত্নবাবু একেবারে বদলে গেছে। বদলেছে তার বাড়ির আশপাশও। দুপুরের রোদে নিস্তব্ধ পথ—বোর্ডের অফিসের ওদিকে দু একজন ঘোরাফেরা করছে, কাছারি বাড়ির বড় ফটকটা তালাবন্ধ, পাশে একটা ছোট দরজা আছে—সেইটাই খোলা থাকে। চলেছে অশোক, হেলু মাস্টার ক'দিন থেকেই এসে ধন্না দিচ্ছে তার কাছে।

স্কুলটার অবস্থা যায় যায়। মাস্টাররা মাইনে পাচ্ছে না, ছাত্রও তেমন নেই, যা আছে তারাও মাইনে দেয় না। বাকি ছাত্র অনেকে আসুড়ে দুর্গাপুরের ইস্কুলে গেছে কতক গেছে মালিয়াড়ার দিকে।

অশোকও দেখেছে দূর থেকে মাঠের মধ্যে বাগানের ধারে ইস্কুলের অবস্থা। গ্রামের কারো নজর নেই, অবহেলার—অনাদরের চিহ্ন ওর সারা গায়ে। চালে খড় নেই, খসে পড়ছে মাটির পাঁচিল।

পানু বাবু আজ গত্যন্তর না দেখে বলে,

—একটা কিছু করুন অশোকবাবু !

হেডমাস্টার এম-এ হওয়া চাই, এবং স্কুলের বাড়িও থাকা চাই। তবেই সরকার গ্রান্ট দেবে। কিন্তু বীরেনবাবু চলে যাবাবব. পর হতে সে সব করবার আর কেউ নেই।

অশোক ভাবছে। স্কুলটা রাখতেই হবে।

একটা কিছু করা দরকার।

হেলু মাস্টার বলে চলেছে,—আর কোথায় এম-এ পাশ লোক পাবো বলুন, যে দরদ দিয়ে নিজের বলে দেখবে।

অশোক জবাব দিল না। আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে। ইস্কুলে সেও কমিটিতে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা দিয়েছিল ওরাই। অশোককে সেদিন ওরা চায়নি।

অভিমান ভরে তারকবাবু সেদিন পরিষ্কার জানিয়েছিল, —আমাকে সেক্রেটারি হতে রেহাই দাও।

তারকবাবু সেদিন প্রেসিডেন্ট, হাকিম, জমিদার। দায়ে অদায়ে সেই দেখবে, তাকে বাদ দিয়ে ইস্কুল চালানো অসম্ভব। অশোককে সেদিন এড়িয়ে গিয়েছিল ওরা। হেলু মাস্টারও ছিল তাদের দলে। আর আজ !

কি ভাবছে অশোক। সেই তাই নিজে এসেছে তারকবাবুর বৈঠকখানায়।

অনেকদিন পর দেখা, কেমন যেন বয়স বেড়ে গেছে তারকবাবুর, মাথায় চুলে পাক ধরেছে, চোখে-মুখে বসেছে কালির দাগ, তারকবাবু কি ভাবছে।

আগে থেকেই ওদিকে কারা বসে আছে। পানু দাস, অন্যদিকে কামারপাড়ার এমোকালী,—আরও কয়েকজন।

পানু দাস অশোককে দেখে মুখ তুলল মাত্র। বলে চলেছে সে,

—তাহলে বড়কালীর পুজোর আমাকেই অনুমতি দেন ?

তারকবাবুর কাছে আজ ঐ জন্যেই এসেছে সে। বড়কালী পুজোটা পানুর কাছে আজ সম্মানের। তারকবাবুর পরিত্যক্ত ওই পুজো সে তুলে নেবে।

তারকবাবু ওর কথাটা শুনে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

কামারপাড়ার ওরা বলে,—কেন গ্রাম পঞ্চজনই করুক।

—বারোয়ারী পুজো ? পানু দাস-এর ঠোঁটের ডগায় যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে।

—কেনে ? এমোকালী বলে উঠে।

—তাহলেই হয়েছে আর কি ? পানু দাস জবাব দেয়। চটে ওঠে ওরা। সতীশ ভটাচায ব্যাপারটাকে মোলায়েম করবার জন্যই বলে ওঠে,

—কালীপুজোর সঙ্কল্প একজনের নামেই হবে। তাছাড়া মায়ের পুজোয় নিষ্ঠা চাই, ভক্তি চাই।

গোকুল ফোড়ন কাটে,—পাঁঠা বলি দিতে হবে।

এমোকালী ধমকে ওঠে,—তা তোমাকে ভাবতে হবেক নাই ঠাকুর, বল কেনে নরবলি দিয়ে দোব।

গোকুল চুপ করে যায়। পানু দাস তখনও কোট ছাড়েনি।

—তাহলে কাকাবাবু !

কালীচরণ এবং অন্যান্য সকলেও চেয়ে থাকে তারকবাবুর দিকে। কি ভাবছে তারকবাবু। অশোক, হেলু মাস্টারও চুপ করে রয়েছে। পুজোর দখল নিয়ে যেন লাঠালাঠি না বাধে।

বলে ওঠে তারকবাবু,

—এখনও বেঁচে আছি পানু, যতদিন বেঁচে থাকবো পৈত্রিক পুজো ওটা—আমাকেই করতে হবে। করবোও।

—ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা।

খুশি হয় কামারপাড়ার দল। এখনও মনে মনে তারা তারকবাবুকে ফেলে দিতে পারেনি। পানুর মুখে-চোখে এক পোঁচ কালি কে যেন লেপে দিয়েছে।

সে উঠে গেল চুপ করে। ওরাও চলে গেল পিছু পিছু। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তারকবাবু। কি ভাবছে।

অশোক স্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

—মামাবাবু !

তারকবাবু ওর দিকে চাইল,—তুমি আবার কি বলবে ?

—ইস্কুলের ব্যাপারে এসেছিলাম।

—কালীপুজো নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করছিল, তারা এতে এলো না যে ? তারকবাবুর কথাটা ব্যঙ্গের মত শোনাল।

অশোক বলে,

—ওতে মাদকতা আছে, এতে তা নেই।

অশোকই বলে চলেছে,—আপনিই সেক্রেটারি থাকুন।

—কিন্তু তারপর ? জানো ত আমার অবস্থা ?

তারকবাবুকে এমন করে কথা বলতে ওরা দেখেনি। চুপ করে থাকে হেলুমাস্টার।

বলে ওঠে অশোক,

—একে গড়ে তোলা দরকার। একটু চেষ্টা করলেই গার্লস ইস্কুলও হবে। সরকারই টাকা দেবেন। সবই হবে, কেবল একটু চেষ্টা করতে হবে।

তারকবাবু এসব কথা শুনেছে। ইস্কুল এখন সরকারই চালাবে।

দিন বদলেছে। কিন্তু তারকবাবু এ সবের থেকে আজ সরে এসেছে অনেক দূরে। বলে ওঠে,

—কিন্তু ওসবের কিছুই তো বুঝি না ?

অশোক জবাব দেয়,—আপনি থাকুন,যা করবার আমরাই করবো।

—বেশ ! গম্ভীরভাবে কথাটা বলে তারকবাবু।

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে তারকবাবু । কেমন যেন মনে হয় তাকে ভরসা করা যায়। এই দুর্দিনে একজনকেও যেন দেখেছে, যে একটা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারে। তারকবাবু বলে ওঠে,

—যা ভাল বোঝ করো।

কামারপাড়ার সমবায় বেশ চলেছে। দিন বদলেছে তাদের। মজুরিও পাচ্ছে। তারকবাবুর দল-বদলের হাত থেকে বেঁচেছে তারা।

ধরণী মুখুয্যের বন্ধকী কারবার উঠে গেছে। উঠে গেছে তারকবাবু, অবনী মুখুয্যের সেই হিসাবের মারপ্যাঁচের ফাঁক দিয়ে দু'একশো গলে যাবার দুঃখটা। পঞ্চায়েতের অতুল কামারই প্রেসিডেন্ট। আর এমোকালী হয়েছে সেক্রেটারি।

কামারপাড়ার একটা ঘরে কাঠের বোর্ড লাগানো হয়েছে। ওদিকে জাবেদা খাতা লেখে পদ মাস্টার; পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টারি করে, সন্ধ্যায় এসে বসে সমবায়ের অফিসে।

ভুবন গুম হয়ে বসে আছে সেদিন। কদমের সঙ্গে ঝগড়াটা যে এমনি বাড়াবড়িতে দাঁড়াবে ভাবতেও পারেনি। খামোকাই ঝগড়াটা করল—মাঝে মাঝে কেমন যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে ভুবনও, ওই কদমও।

কি যেন হয়েছে তার।

হঠাৎ কলরব করে ওদের ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। ফিরছে এমোকালী দলবল নিয়ে তারকবাবুর ওখান থেকে। ভুবন চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

কে যেন বলে,— পেনো কিন্তু রেগে রইল কালীদা।

—রাগুক, আর বাড়িতে যেয়ে বেশি করে ভাত খাক্‌গে।

অতুলও শুনেছে কথাটা। প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি তার ওসব। বলে ওঠে,

—তাই বলে শুধু শুধু ঝগড়া করবি ?

—ঝগড়া কুথা করলাম গো মামা ! কালী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কোথায় অন্যায় করেছে তারা।

—বড্ড বেড়েছে পেনো।

—তুরাও কম বাড়িসনি। বুড়ো গজ্ গজ্ করে।

অশোককে আসতে দেখে ওরা চুপ করল।

কালী তখনও বলে ওঠে,

—শুধোও কেনে ছুটবাবুকে কি করেছি অন্যায়টা!

অশোক ব্যাপারটা দেখেছে। পানুও বের হয়ে গেল অযথাই। কিন্তু অর্থবান, শক্তিমান সে। ছেড়ে কথা কইবে না।

চিরকালই একজাতের শত্রু আর একজাত থাকবেই। তারকরত্ন সেদিন এদের দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল, আজ যদি পানু সেই অধিকার চায় অন্যায় হবে না। অন্ততঃ প্রকৃতি এবং সমাজ-ব্যবস্থার নিয়মে এই-ই বলে।

সেদিকে গেল না অশোক। বলে ওঠে,

—একটা আর্জি নিয়ে এসেছিলাম অতুলকাকা?

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বুড়ো,—সেকি ছুটবাবু, বলুন হুকুম!

হাসে অশোক—হুকুম দেবার দিন গেছে, তাই আর্জিই বলবো।

অতুল কামার খুশি হয়,—সেকি কথা আজ্ঞে!

ইস্কুলের কথায় আসে অশোক।

—তোমাদের ছেলেদেরও মানুষ করতে হবে।

—তাতো বটেই আজ্ঞে।

ক্রমশঃ এটা তারাও বুঝেছে যে দিন বদলের দিনে এটার দরকার।

এতবড় কথাটা এতদিন ওরা কেউ ভাববার অবকাশ পায়নি। আজ ভাবতে শুরু করে। গদাই কামারও বলে,

—নেখাপড়া না শিখলে কিছুই আর হবেক নাই আজ্ঞে। সেদিন দুগ্‌গোপুরে গেছল মোনা—শোনালাম অনেক লোক লিছে। তা মিস্ত্রিগিরি করতে হবেক—শুধোলে কতদূর পড়া শোনা করেছ। ছেলের তো ক-অক্ষর গোমাংস। নেখাপড়া তাই শিখতে হবেক উদের। এতদিন দরকার হয়নি, আজ ইবার বুঝছি।

অশোক বলে ওঠে,

—ইস্কুলটাকে তাই রাখা দরকার।

জবাব দেয় ভুবন। ইদানীং ব্যবসাবুদ্ধি তার একটু বেড়েছে।

—কিন্তু সি ত অনেক টাকার ব্যাপার?

এমোকালীর কথাটা ভালো লাগে না। বল ওঠে,

—পুজো করতে গেছলা যি। সেই টাকাটাও দাও কেনে?

ভুবন বিরক্ত হয়ে ওঠে,—সি ত ঈশ্বর বৃত্তির টাকা।

ওদের সমবায় থেকে রেওয়াজ হয়েছে প্রতি মণ মাল কেনাবেচায় একটা সামান্য অঙ্ক তুলে রাখতে হয় ঈশ্বরবৃত্তি খাতে। কয়েকশো টাকা জমেছে তাতে।

এমোকালীই জবাব দেয়,—রাখ তোমার ঈশ্বরবৃত্তি। উতো ভাল কাজেই লাগবেক।

সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থক জুটে যায়। তাছাড়া ছোটবাবুর কথাও তারা ফেলতে পারে না। অতুল কামারও চুপ করে বসে শুনছিল কথাটা। সেও বলে ওঠে,

—ঠিকই বলেছে কালী। ও টাকা ইতেই দাও।

—তবে ! কালীচরণও ভরসা পায়।

ভুবন ওদের কথাগুলো শুনেছে। অশোকবাবুর কথাটাও ভাল লাগে না।

ভুবন একটু চটে উঠে। বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়,—যা ভাল বুঝিস কর্‌গে তোরা। আমাকে শুধোনো কেনে ?

কালী জবাব দেয়,

—তুমি যে ছেকেটারি। টাকা দিবার মালিক।

—কলা ! কাঁচকলা।

গজগজ করে ভুবন।

অশোক তবু বোঝাবার চেষ্টা করে,

—তুমি অমত করো না ভুবন, ওরা ভালো কথাই বলেছে।

ভুবনের সেই রাগটা এখনও পড়েনি।

বলে ওঠে—সবাই ভালো কথা বলে, ভুল বলি শুধু আমিই। টাকা ইস্কুলে দিতে হয় দেক্ গো উরা।

বের হয়ে চলে গেল ভুবন সামনে দিয়ে, যেন ওদের সম্মিলিত জনমতকে সে অগ্রাহ্য করে গেল।

অতুলকামার ঘোলাটে চোখে মেলে ধমকে ওঠে,—ভুবনা !

দাঁড়াল না ভুবন। ফিরেও চাইল না ওর ডাকে।

তবু ব্যাপারটা ওর অবর্তমানেই পাশ হয়ে গেল। ইস্কুলের ব্যাপারে সবাই সায় দেয়। ও টাকা দেওয়া হবে স্কুলেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যা।।

অশোক বের হয়ে আসছে। ছোট্ট গলিটা পার হয়ে রাস্তায় নামতে হঠাৎ কার ডাক শুনে ফিরে চাইল!

—শোন !

ডাকছে কদম। কেমন উস্কোখুস্কো চেহারা—দুটো চোখের তারায় কিসের আবেশ। ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কদম।

—কি বলছিল তুমাকে উ ?

—কে ভুবন ?

অশোক পায়ে পায়ে ওদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে যায়। খামার বাড়ি করেছে অতুল সামনের ফাঁকা জায়গাটাতে।

খড় গাদা করা—একজোড়া বলদও বাঁধা রয়েছে গোয়ালে, ওদের ল্যাজ দিয়ে ডাঁশ মাছি তাড়ানোর শব্দ শোনা যায়। আবছা ধোঁয়ার যবনিকা গ্রামের আকাশ ভরিয়ে তুলেছে।

ভুবনের মতিগতি কেমন বদলে গেছে, সকলের আগেই কেমন উড়ে গিয়ে ঝগড়া করছে। এ সব তার ভাল লাগে না। অশোকের উপরেও একটা অহেতুক রাগ তার রয়ে গেছে। রাগের হেতুটা যে কি তা সঠিক জানে না কদম, তবুও অনুমান করে খানিকটা। আজ সেই রাগ যেন ভুবনের কথায় ফেটে পড়ে এটা বুঝেছে কদম। অশোককে কাছে দেখে তাই বলে ওঠে,

—হ্যাঁ ! ওর কথাই বলছি। কি বলছিল তুমাকে ?

অশোক প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

—কই না তো ? এমনি তর্ক হচ্ছিল স্কুলের টাকা দেবার ব্যাপারে।

অশোক আজ ভুবনের ব্যবহারটাকে ভালো চোখে দেখে না।

কদম আজ যেন বদলে গেছে। হঠাৎ বলে ওঠে,

—তোমাকে ও যেন ঠিক সইতে পারে না।

—কেন ? অশোক আবছা আলোয় কদমের দিকে চেয়ে থাকে।

ওর দু'চোখের চাহনিতে কি নিবিড় একটা মাদক স্পর্শ ! কদমের সারা যৌবনপুষ্ট দেহের আঙ্গিনায় কোন বরণের সন্ধ্যাদীপের আকুতি !

চমকে উঠে অশোক।

অতল অন্ধকারে কেমন হারিয়ে ফেলে নিজেকে, নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে আকাশের তারা। কদমের ডাগর দুচোখের তারায় বিচিত্র একটু হাসির প্রকাশ। বলে ওঠে কদম

—সব কেনর কি জবাব আছে ?

সরে গেল কদম অস্পষ্ট একটা হেঁয়ালির মত।

বিস্মিত-হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নির্জন আঁধার ঢাকা পথে যেন ওকে বিচিত্র এক রূপ আজ দেখেছে সে।

এ কোন্ কদম !

রাতের আবছা অন্ধকারের রহস্যের মত তাকে নিভৃতে নিরালায় ডেকে কি যেন বলতে চেয়েছে, শোনাতে চেয়েছে।

সেকথা অসোককে যেন ইতিপূর্বে আর কেউ শোনাতে চেয়েছিল।

প্রীতির কথা ভুলতে চেষ্টা করেছে, ভেবেছিল ভুলে গেছে—কিন্তু আজ মনে হয় পারেনি তাকে ভুলতে।

স্তব্ধ চিন্তিত মনে পথে নামল—রাত ঘনিয়ে এসেছে তখন। জনহীন পল্লীতে আকাশ বাতাসে একটা সুর ওঠে, একক সেই সুর যেন মনের সেই করুণ ভাবটাকে স্পর্শ করেছে।

ক'দিন ও সুরটাকে কানে নিতে পারেনি। আজ এই উদার বিধুর রাত্রির অন্ধকারে নিজের মনের অতলে কোন এক নবজাগ্রত সত্তাকে চিনেছে অশোক। প্রীতির কথা মনে পড়ে।

এমনি একটি সন্ধ্যায় সে গিয়েছিল—তার কাছে কি যেন বলতে চেয়েছিল। ওই ব্যাকুল

সুরের ইঙ্গিতে হারিয়ে গেছে সেই না-বলা কথা, সেই ব্যাকুল-চাহনি মিশে আছে আঁধার-জড়ানো একক তারার চাহনিতে।

অবিনাশ সুর সাধছে।

দূর আকাশে ভেসে ওঠে সেই সুর।

মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—হারানো দিনের কথা, কত এলোমেলো স্মৃতির পাথারে ঝড় উঠেছে। অশোকের অজানতেই মনে পড়ে পাটনার কলেজের সেই দিনগুলো।

শিখাকে মনে পড়ে।

কোথায় মনের তলে একটা কামনার স্তব্ধতাকে আজ কে জাগিয়ে দিয়েছে দুটো চোখের নীরব প্রশ্নে।

দেখেছে আজ সবাই ওরা কেমন যেন এক সুরে বাঁধা। ওই প্রীতি, কদম, হারানো সেই শিখা—সবাই। একটি সত্তা, একটি চেতনা, একটি কামনারই রূপান্তর, বার বার পুরুষের জীবনে আসে কোন নীরব সুরের অণুরণনে। তার মন ভরিয়ে তুলে আবার হারিয়ে যায় মহাসমুদ্রের একটি ঢেউ-এর মত।

শিখাকে সেদিন চিনতে পারেনি অশোক।

গঙ্গার ধারে এমনি প্রায়ান্ধকার রাতে সেও গড়েছিল কত স্বপ্নসৌধ। গঙ্গার প্রবহমান জলধারায় দূরে কোথাও ভেসে গেল একটা নৌকা, প্রদীপ জ্বলছে তাতে। নদীর কালো জলে সেই প্রকম্প লাল আলোটুকু হারিয়ে গেল।

শিখাও তেমনি অশোকের স্মৃতির আকাশে নক্ষত্র হয়ে হারিয়ে গেছে। ওরা হারিয়ে যায় ; তবু নিঃশেষ হয় না। চুপে চুপে মনের অতলে বার বার বহুরূপে আসে, একই সত্যের—স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র জীবনে।

তাই ওরা একসুত্রে বাঁধা।

কিন্তু কদম ! গ্রামের ঘরের বৌ। কোথায় তার মনের অতলে এই রূপের প্রকাশ আজ অশোককে বিস্মিত করে তুলেছে।

সরু ধূলিধূসর পথ দিয়ে আসছে। আগেই তারকবাবুর ঠাকুরবাড়ির কাঁসর-ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ থেমে গেছে, পানু দাসের ধানকলের জেনারেটারের শব্দটাই গ্রাস করেছে নীরব পল্লীর স্তব্ধতাকে।

হঠাৎ বকুলতলায় এসে থমকে দাঁড়াল। দীর্ঘ মাসকয়েক পর প্রীতিদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। জানলার ফাঁক দিয়ে আবছা অন্ধকার পথে এসে লুটিয়ে পড়েছে এক চিলতে আলো।

কি ভাবছে অশোক। চলে যাবে কিনা ! হঠাৎ নীলাম্বরবাবুর ডাক শুনে দাঁড়াল।

—অশোক না ? এস এস !

অশোক যেন কি একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। সামলে নেবার জন্যেই বলে ওঠে,

হ্যাঁ। যাচ্ছি, ভাল ছিলেন তো ?

অশোক দাওয়ার ওপর উঠে গেল।

হঠাৎ নীলাম্বরবাবুর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। ক'মাসেই তাঁর দেহমনের উপর একটা ঝড় বয়ে গেছে। মুখে চোখে তারই ছাপ। শরীরও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি কেমন ক্লান্ত—মলিন।

—বসো।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখছে।

বলে চলেছেন নীলাম্বরবাবু,—তোমাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু তুমি—

অশোক জবাব দেয়,—কিছুদিন এখানে ছিলাম না। বাবার ওখানে গিয়েছিলাম। রিটায়ার করেছেন, শরীর ভাল নেই।

—ও ! চুপ করে বসে থাকেন নীলাম্বরবাবু।

অশোক দরজার দিকে চেয়ে থাকে। এমনি শান্ত নিভৃত পল্লীর পরিবেশের সব অভাব যেন এখুনি প্রীতির আবির্ভাবে বদলে যাবে। পূর্ণ হয়ে উঠবে এই নীরব ঘরখানা তার কলকণ্ঠে, দেহের ম্লান সৌরভে।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,—সেদিন তোমাকে হয়তো দুঃখ দিয়েছিলাম।

সদরের সেই রাত্রের কথা আজও ভোলেনি অশোক। কি এক মোহ আর মুগ্ধতার আবেশে তার মন ভরে উঠেছিল—আজ তাকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সে মোহ তার ভেঙ্গেছে।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,—মনে হয় ঠিকই করেছিলাম।

অবাক হয়ে অশোক ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। ফুরসিটা টানছেন তিনি। হঠাৎ নলটা রেখে উঠে পায়চারি করতে থাকেন, মনের মধ্যে একটা চাপা ঝড়ের গতিবেগ প্রশমিত করবার চেষ্টাই করছেন মনে হয়। বলে ওঠেন নীলাম্বরবাবু,

—নইলে দুঃখই পেতে।

অশোক কথা কয় না। নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,

—প্রীতি শেষকালে প্রশান্তকেই বিয়ে করলো। আমার মত ছিল না, নেইও। কিন্তু একালের ছেলেমেয়েরো কারো মতামতের কোন মূল্য দেয় না। এর ফল কি হবে জানি না অশোক।

চমকে ওঠে অশোক। কেমন চকিতের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি সারা মনে দোলা আনে। সামলে নিয়ে সহজ কণ্ঠে জবাব দেয়,

—বেশ তো! প্রশান্তবাবু ব্যবসাপত্র করছেন।

—তা করুন। কিন্তু কি জান ? সমস্ত ব্যাপারটাই ওদের ছেলেমানুষী। আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না। মন দিয়ে স্বীকার করি—দিন বদলাচ্ছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাবে। কিন্তু তাই বলে তার মূলে সত্য কিছু থাকবে না—আসলের বদলে সমস্তটা জুড়ে থাকবে মেকি আর ফাঁকি, এটা মেনে নিতে পারি না।

অশোক ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় ওঁর মনে একটা নিবিড় ব্যথা বেজেছে। বলে চলেন নীলাম্বরবাবু,

—ওরা আজ যাকে পরম সত্য বলে জানে—কাল মিথ্যা বলে ফেলে দিতে এতটুকুও বাধে

না। সত্য ওদের কাছে নিজের কাছে স্বার্থ এবং সেইটার জন্যে সব কিছু করতে পারে। প্রীতিও ভুল করল শেষে !

অশোক কথা বলে না। এর মধ্যে কথা বলবার কিছু নেই তারও।

কয়েকদিন ওই প্রশান্ত আর ওর বন্ধু-বান্ধবদের দেখেছে অশোক। মনে হয়েছে একটা কথা তাদের কাছে পরম সত্য—সে ওই স্বার্থবুদ্ধি। তার জন্য সব কিছু করতে তারা পারে। একালের মানুষ খড়ের পুতুল। কাঞ্চন সম্পদের ক্ষেত্রে মূক পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,

—প্রীতি এ যুগের ব্যর্থতা আর গ্লানিকেই সুন্দর বলে দেখেছে। শুধু প্রীতি নয়—ওরা অনেকেই তাতে ভুলেছে। চোখ ধাঁধিয়েছে সেই আলোর আভায়।

অশোক বলে ওঠে,—লেখাপড়া শিখেছে, বিচারবুদ্ধি তারও আছে।

নীলাম্বরবাবু আজ তিক্ত কণ্ঠে বলেন,

—লেখাপড়া আর বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কতখানি যোগ আছে এটা আমার কাছে কঠিন প্রশ্ন হয়ে ঠেকেছে অশোক। ওরা দলে ভারি—তাই সত্যি কথা যদি বলি বুড়ো সাবেকী-কনজারভেটিভ বলে উড়িয়ে দেবে।

চুপ করেন নীলাম্বরবাবু।

অশোক কি ভাবছে।

—কিছুদিন থাকবেন তো ?

ওর দিকে চাইলেন নীলাম্বরবাবু এক মুহূর্ত। কি ভেবে শান্তকণ্ঠে জবাব দেন,—হ্যাঁ।

—একটু পরামর্শের ব্যাপার ছিল। এসেছেন যখন ভালোই হয়েছে।

হাসেন নীলাম্বরবাবু,—এখনও ওসব অভ্যাস ছাড়োনি ?

—কই ছাড়তে পারলাম।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,

— দেখ অশোক, এযুগের ওপর মাঝে মাঝে আস্থা হারাতে পারি না। কিছু বোকা ভালো মানুষ এখনও আছে তাই অনুকম্পা হয়। ভালোও লাগে। বিশ্বাস করতে পারি—হয়তো এখনও বাঁচবার পথ আমরা পাবো।

চুপ করে থাকে অশোক।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,—হ্যাঁ, রাত হয়ে যচ্ছে। তুমি এসো।

বের হয়ে এল অশোক।

জনহীন পথে চুপ করে দাঁড়াল।

শীতের প্রথম কুয়াশা পড়ছে। কি তিথি জানে না। আবছা চাঁদের আলো, স্তব্ধ পথ, ঘুমিয়েপড়া বাড়িগুলো গাছগাছালির বুকে কেমন একটা নিবিড় শান্তি আর আচ্ছন্নতার মধুর আবেশ এনেছে।

প্রীতির কথা মনে পড়ে।

অশোকের সেখানে কোন ঠাঁই-ই নেই। একা সে। সুরটা জেগে আছে তখনও। মন কাঁদানো

অপরূপ একটি সুর, ওই সুরটা নিশীথরাত্রের কোন অধরা রূপবতীর আকাশজোড়া কান্নার সুরে মিশে গেছে।

কাঁদছে মিষ্টি।

এমনি আঁধার রাতে ওঠে ওর কান্না—বুকচাপা কান্না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে মিষ্টি; যেন অন্য মানুষ। একেবারে বদলে গেছে। সেই রূপ-যৌবন হারিয়ে গেছে কোথায়, বর্তমানে ও যেন একটা ধ্বংসাবশেষ।

যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, যে আশা করেছিল এতদিন, তা নিঃশেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তার তাসের প্রাসাদ।

বড় ডাক্তাররা দেখে শুনে পরীক্ষা করে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করেছে, তার শরীরের রক্তকণিকার সঙ্গে যে বিষ এতদিন মিশিয়ে ছিল তা আজও প্রকট। সেই চাপা-পড়া বীজ এতদিন পরেও মাথা তুলেছে, তারা যেন অমর। চিরজীবনই মিশিয়ে থাকবে তার দেহের অণুপরমাণুতে, ধ্বংস করে দেবে তার সব আশা—স্বপ্ন।

মা সে কোনদিনই হতে পারবে না—সে সাধ পূর্ণ হওয়ার পথে তার দুস্তর বাধা।

কথাটা শুনে সেই যন্ত্রণা আর বেদনার মাঝেও গুমরে উঠেছিল মিষ্টির মন। অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে।

—সত্যি ডাক্তারবাবু ?

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

গম্ভীর কণ্ঠে কোন রুদ্র বিধাতা যেন বিধান দিচ্ছেন।

কাঁদে না মিষ্টি কথাটা শুনে, স্তব্ধ হয়ে যায়। কেমন স্থির চাহনিতে সে চেয়ে থাকে ওই ভাবলেশহীন মুখগুলোর দিকে। ঘসাকাচের অস্বচ্ছ আবরণের ওদিকে কেমন আলোগুলো বিকৃত ছায়া ফেলেছে—লম্বাটে ছায়া, মার্বেল পাথরের মেঝেটা চকচক করে। সাদা পোশাক-পরা মূর্তিগুলো যেন কোন অন্যলোকের বাসিন্দা !

ওরা ছিনিয়ে নেবে—কেড়ে নেবে তার কাছ থেকে তার শেষ সম্বল—জীবনের একান্ত গোপন মহামূল্য সঞ্চয়টুকুকে।

চীৎকার করে ওঠে মিষ্টি। আতঙ্ক-বিজড়িত যন্ত্রণা-ভরা সেই চীৎকার, আর অসহায় কান্না মিশেছে ওতে।

কেমন অনড় অচেতন হয়ে আসে সারা দেহ।

চুপ করে হাসপাতালের সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে আছে কারিগর। মিষ্টির জন্য বেদনাবোধ করে।

প্রথম থেকেই তারও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। জীবনে কেন বা যে সে আটকে পড়ল ওর ওই প্রচণ্ড আকর্ষণে তাও জানে না, নিজের সম্বন্ধে চিরকালই জানে সে হিসাব-বাতিল একটি প্রাণী ; কোথায় কিছু মনভোলান দেখলে যারা কাজ ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তারিফ করে, ও যেন সেই হতচ্ছাড়াদের দলে।

মিষ্টিকে ভাল লেগেছিল—যদি ও ভাল হয়, খুশি হয় তাই হয়তো এসেছিল ওর সঙ্গে, ঘর বেঁধেছিল। কারিগর ডুবেছিল তার মনের আনন্দে। কিন্তু মিষ্টি ক্রমশঃ ঘর সাজাল—জমি জায়গা কিনল। কারিগর ওর ব্যাপারে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

বলেছিল,—এত যে পাবো পাবো করছিস—হারাবার দুঃখটুকু জানিস ?

মিষ্টি ডাগর চোখ তুলে হাসে,—আগে তো পাই ?

কারিগর বলেছিল,

—পাবার জন্য তৈরি হতে হয় মিষ্টি, হারাবার দুঃখ সইবার ক্ষেমতা আগে পেতে হয়।

—ধ্যাৎ, কি যে আবোল-তাবোল বকিস তুই ?

মিষ্টির কাছে তার কথার মানে কিছু নেই, ছিল না।

আজ ওর অসহায় ব্যাকুল কান্নায় কারিগরের মন ভরে ওঠে। জীবনে এই কাঁদবার ভয়েই সে কিছু পেতে চায় নি। বেশ ছিল। অজানতে কোথায় নিবিড় বেদনাবোধ করে সে ওই মিষ্টির জন্য।

সেরে উঠেছে মিষ্টি বাড়ি ফিরে। এখন অনেকটা সুস্থ।

বাইরের দেহের ক্ষয়-ক্ষতি সারতে দেরি হয় না। সেরে সে উঠেছে—কিন্তু মনের দিক থেকে যে নিবিড় বেদনার পুঞ্জীভূত ক্ষতি তা যেন সারবার নয়।

তাই রাত আঁধারে কাঁদছে মিষ্টি হারানো সেই নবাগতের উদ্দেশ্যে। কারিগর থামাবার চেষ্টা করে।

—চুপ কর মিষ্টি! কেঁদে কোন লাভ নাই।

মিষ্টি জবাব দিল না, ওই দিকে চাইল কেমন কান্না ভিজে সেই চাহনি মেলে।

কি ভাবছে !

কান্না থামিয়ে কি ভাবছে সে। দুচোখের চাহনিতে সেই ভাবনার কঠিন ছায়া। হঠাৎ আঁধারের মাঝে ওর দুচোখ জ্বলে ওঠে।

—কি বললি ? কেঁদে কি হবেক ?

কারিগর এগিয়ে আসে।

মিষ্টির মনে চকিতের জন্য ঝড় বইতে থাকে। আঁধার আকাশ-ফাটানো কোন নতুন জ্বালা আর প্রতিশোধের ঝড়। কি পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত তা জানে না সে। অতীতের দিনগুলো এমনি করে আজও তাকে দমাবে তা জানে না।

ওই চাহনি চেনে কারিগর—ওর সেই আগেকার চাহনি যা দেখেছিল হারানো কোন অতীতে বর্ধমানের পথে। আজও যেন সেই চাহনিই ফুটে ওঠে। কিন্তু মনে হয় মিষ্টির এই জীবনও মূল্যহীন।

—তা সত্যি ! ঠিক বলেছিস তুই কারিগর।

—মিষ্টি!

চমকে ওঠে কারিগর।

হঠাৎ হেসে ওঠে মিষ্টি। হা হা শব্দে হাসছে নতুন কোন হারানো মেয়ে—সেই অতীতের লাস্যময়ী প্রতিবাদের ব্যর্থতার শিখা।

কারিগর ওকে ডাকছে,—মিষ্টি !—শোন !

—অ্যাঁ ?

কেমন যেন চমক ভঙ্গে তার। চুপ করে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে কারিগরের দিকে চেয়ে থাকে। ওকে কাছে টেনে নেয় কারিগর।

ওর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অসহায় কান্নার ভেঙ্গে পড়ে স্বৈরণী—পরাজিত ব্যর্থ কোন মিষ্টি।

রাত নামে। অতন্দ্র রাত্রি। অবিনাশের বাঁশির সুর তখনও থামেনি।

কি এক নিবিড় প্রেম আর মাধুর্য নিয়ে সুরটা রাতের আকাশ ভরে তুলেছে, চুপ করে তাই শুনছে মিষ্টি। কেমন যেন স্বপ্ন দেখছে।

অশোক বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখে চাকরটা তখনও জেগে আছে। খামারের গেটটা খোলা। বাড়ির ভিতরেও আলো জ্বলছে। দাঁড়াল অশোক,—কি ব্যাপার রে বুনো ?

বলমালী বলে ওঠে,—আজ্ঞে কর্তাবাবু এসেছেন।

অশোক খেয়াল করেনি উঠানের একপাশে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়,—বাবা !

—আজ্ঞা।

—তা হঠাৎ ?

—কি করে বলি ?

কথাটার কোন জবাব সে দিতে পারে না।

কি ভাবতে ভাবতে অশোক ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে—বাইরের ঘরের টেবিলের ওপর নামানো রয়েছে কয়েকখানা চিঠি, আজ বৈকালের ডাকে এসেছে। সে তখন ব্যস্ত ছিল কামারপাড়ার মিটিং-এ। কয়েকখানা দরখাস্ত লিখতে হবে।

ইস্কুলের জন্য ইতিমধ্যে কাগজে কয়েকটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছে—নতুন মাস্টার রাখবে। সেই সঙ্গে গার্লস্ স্কুলটার কাজও শুরু হবে।

সদর থেকে স্কুল ইনস্পেক্টার, জেলাবোর্ড-এর চিঠিও এসেছে। কি যেন আশার খবরও পায় তাতে অশোক।

কয়েকখানা দরখাস্তও রয়েছে।

হঠাৎ একখানা চিঠি আনমনে খুলে পড়তে থাকে। চমৎকার হাতের লেখা—নামটাও পড়বার সময় হয় না। কোন নতুন শিক্ষয়িত্রী এখানে এই বন্য আদিম পরিবেশে চাকরি নিয়ে আসতে রাজি হয়েছে।

অনেকেই যেন দূর-দূরান্তর থেকে তার আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

বাবার চটির শব্দ শোনা যায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

—খোকা !

অশোক চিঠিগুলো আপাততঃ চাপা দিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে।

—আপনি, হঠাৎ !

মিঃ রায়-এর চোখে মুখে কেমন বলিষ্ঠতার ছায়া। দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে বাইরে বিভিন্ন শহরে ঘুরছেন। হাব ভাবও তেমনি বাঙ্গালীয়ানা-বর্জিত ! চুরুটটা টানছেন।

বলে ওঠেন,—কলকাতা যাচ্ছি, দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে। তারকের সঙ্গেও দেখা হলো, সে খবর পেয়ে এসেছিল।

তারকবাবু যে অন্য কারোও বাড়িতে দেখা করতে যায় উপযাচক হয়ে এই প্রথম শুনলো যেন অশোক। বিস্ময় চেপে রেখে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। বাবা বলে চলেছেন,

—শুনলাম নাকি ইস্কুল নিয়ে পড়েছো ?

—হ্যাঁ, দেখা যাক।

—তার পর? মিঃ রায় চুরুটটার পোড়া ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন,

—তারক বলছিল ওর ছেলে জীবনের চাকরির ব্যাপারে।

—জীবন চাকরি করবে ? অবাক হয় অশোক।

—তা পেলে করবে বৈকি। এদিকে অবস্থা যা শুনলাম, তাতে গজভুক্ত কপিত্থের মতই একেবারে ফোঁপরা। দুর্গাপুরে আমার জুনিয়র অনেক অফিসার চাঁই হয়ে এসেছে—বলে কয়ে দিলে যা হয় একটা ব্যাবস্থা হয়ে যাবে।

অশোক বাবার দিকে চেয়ে থাকে, কি যেন বলতে চান তিনি।

স্তব্ধ ঘরের মাঝে তাঁর ভারি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে,

—ভাবছিলাম কথাটা তোমার জন্যেই বলবো। এদিকে জমিদারীও চলে গেল, আমার মাইনেও তো এসে পেন্সনের তলানিতে ঠেকেছে।

বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অশোক। কি ভাবছে। যে কথা বার বার প্রীতি তাকে শুনিয়ে গেছে, যে কথা শুনিয়েছিল অতীতের সেই পাটনার গঙ্গার তীরে কোন অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে যাওয়া শিখা—আজ বাবাও যেন অন্ধকারের বুকে মহাকালের কঠিন কণ্ঠস্বরে নির্ম্মম ভবিতব্যের কথা শোনাতে এসেছেন।

কিন্তু কদম তা শোনায় নি, শোনায় নি অবিনাশ! তারা জীবনের বৃহৎ কোণে এতটুকু শান্তি আর পরম পাওয়ার সার্থকতা খুঁজছে—নিশ্চিন্ত জীবনের নিঃস্বতার মাঝেও।

বলে ওঠে অশোক,—তার দরকার হবে না বাবা।

মিঃ রায় কথা বলেন না, ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন কেমন অসহায় দৃষ্টিতে।

জীবনে আজ মনে হয় কোথায় ভুল করেছেন তিনি, করেছেন অশোকের ওপর একটা অবিচার। ছেলেবেলায় মা মারা যাবার পর অশোক স্কুল-বোর্ডিং আর কলেজ-বোর্ডিংএ মানুষ হয়েছে। তখন থেকেই অশোক সৎমায়ের ছায়া থেকে ছিটকে পড়েছে। বাবার স্নেহ, মায়ের

ভালবাসা কোনটাই সে পায়নি। তাকে ওর নিয়তি ভাগ্যহীনের মত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে মিঃ রায় নিজেকেই দোষী মনে করেন।

অশোককে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত করেছেন তিনি।

আজ মনে মনে তাই একটা অভিমানও অশোকের রয়ে গেছে।

মিঃ রায় আবার সংসার পেতেছিলেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সাজানো সমৃদ্ধ সংসার।

অশোকের সেখানে কোন ঠাঁই নেই। ছুটিতে মাঝে মাঝে বাবার কাছে গেছে অশোক— যে অপরিচিত কোন অতিথি সেই বাড়িতে। দু'চারদিন থেকেছে, আবার চলে এসেছে বোর্ডিং-এ

বাড়ীতে কোন মায়া তার ছিল না।

মিঃ রায়ও কাজের চাপে পড়ে রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে এস ঠিক খোঁজ-খবর নিতে পারেননি। নেবার চেষ্টা করলেও যেন স্ত্রীও ঠিক পছন্দ করতে না।

মায়া জবাব দিত,—তোমার ছেলেকে কি অযত্ন করবার জন্যই আমি রয়েছি ?

—না, না ! বড্ড লাজুক কিনা তাই বলছিলাম।

মায়া স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে —

তবু মিঃ রায় জানতেন ছেলের প্রতি অবহেলাই করেছেন তিনি।

মিঃ রায়-এর মনে সেই নীরব কর্তব্যবোধটা আজও যেন তাঁকে এনেছে এখানে।

অশোকের ওই জবাব শুনে চুপ করে যান তিনি। কি ভেবে বলেন,

—কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে।

—করছিই তো।

—অর্থকরী কিছু করা চাই।

অশোক বাবার কথায় জবাব দেয়,

—বাঁচবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ঠিকই পাবো। তাছাড়াও তো করবার অনেক কিছু আছে।

মিঃ রায় ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। ঠিক ওর কথাবার্তা বুঝতে পরেন না। দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন, নানা শহরের জীবনযাত্রা—তাদের সমাজ দেখেছেন। সেখানে মুহূর্ত অবসর নেই। বোম্বাই গুজরাট মারাঠার লোকেরা বলে,—রোকড়াকা ধান্দা। অন্যপ্রদেশ বলে 'পয়সে'।

যেন সকলের কাছে এটাই একমাত্র কাম্য।

দিনের সব চেষ্টা সবসময় তার জন্যই ব্যয়িত হয়, সব উৎসাহ উদ্যম সবকিছু। এ যেন নতুন কথা শুনলেন তিনি। বলে ওঠেন,

—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না অশোক।

নীলাম্বরবাবুর কথা মনে পড়ে অশোকের। সেদিন আগেকার বৎসরের সেই যুগে শত শত হাজার হাজার ছেলে সব কাজ ছেড়ে, অর্থ ছেড়ে দেশ ছেড়ে স্বাধীন করার—বৃটিশের কবলমুক্ত করার সংকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যোগ্যতা শিক্ষা তাদেরও কম ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের তারাই ছিল বলি। তাদের দলে পিযে মথিত করে স্বাধীনতার জয়রথ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের পরিচয় ?

আজ সেটা রাখার কেউ দরকার বোধ করে না।

কিন্তু তাতেই কি সব শেষ—সব পাওয়া হয়ে গেছে? মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা—শিক্ষা সমাজ সংগঠন, নতুন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা, সব কিছু সমাপ্ত—সম্পূর্ণ হয়ে গেছে !

তার জন্যে—সেই মহান ব্রতে দীক্ষা দেবার জন্য কই সে ঋত্বিকের দল।

আজ গ্রামসেবকের জন্য মাইনের স্কেল বেঁধে চাকরি দিতে হয়েছে, সমাজসেবার জন্য মোটা মাইনের লোক বহাল করতে হয়েছে। আর বিনা মাইনেতে যারা আছে দেশসেবার ব্রতের অভিনয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে, তারাও কেবল লুণ্ঠন আর স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগে ওৎ পেতে আছে।

এরই মাঝে সাধারণ গ্রামীণ জীবন—তার মানুষের ভবিষ্যৎ কোথায় কোন্ রসাতলে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থ আর কাঞ্চন-কৌলিন্যই সমাজের সেই মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। অশোক সেই পরিচয়ে আজ পরিত্যক্তের দলে।

তাই বোধ হয় প্রীতি পরিত্যাগ করে গেছে তাকে, হারিয়ে গেছে শিখা। আজ বাবা এসেছেন অশোককে সেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ করে দিতে—তাঁর পদমর্যাদা আর প্রতিষ্ঠার পায়াজোব দিয়ে।

একটা ভুল—বৃহৎ ভুলকে তারা সমর্থন করে চলেছে সমাজবদ্ধ সবগুলো মানুষই। কোথায় যেন বিশ্রী ঠেকে অশোকের। সারাঘরে একটা অখণ্ড স্তব্ধতা নামে।

ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলেছে। কোথায় একবার একটা শিয়াল ডেকে থেমে গেল। সন সন বয় রাতের হাওয়া। সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

অশোক বাবার কথার জবাবে যেন এড়িয়ে গেল ওই প্রসঙ্গটা।

—ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না বাবা।

বোঝাতে সে সত্যিই পারবে না। তার কথাগুলো কেউই বিশ্বাস করবে না। এ তার নিজস্ব মতবাদ—দর্শন। তার জন্য দামও দিয়েছে—আরও কত দিতে হবে কে জানে। তবু এটাকে সে কোথায় মনের গভীরে বিশ্বাস করে নিবিড়ভাবে।

মিঃ রায় ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর এতদিনের ধারণা বিশ্বাস সবকিছুর মূলে একটা নীরব বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ওই অশোক। যাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছেন, সেই কঠিন শাসনের বিধান নিয়ে মাথা তুলেছে অতীতের বুক হতে।

—আমার উপর রাগ করে কি এমনি সরেথাকতে চাও ?

চুপ করে থাকে অশোক। মনে হয় রাগ অভিমান এসব নেহাৎ ছেলেমানুষী।

—জবাব দিচ্ছ না যে? মিঃ রায় যেন জেরা করছেন।

হাসছে অশোক। বলে ওঠে,

—আপনি সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য চোখে দেখছেন বাবা। দেখা হয়তো আপনার কাছে স্বাভাবিকই। রাগ অভিমান এসব করবার কোন হেতু নেই। যা করছি, যে পথে চলবো ভাবছি, অনেক ভেবেচিন্তেই তা আমি ঠিক করেছি। মনে হয় ভুল করিনি।

মিঃ রায় জবাব দিলেন না। পায়চারি করছেন চুপ করে। আবছা অন্ধকারে সিগারের

লালাভ আগুনটা দেখা যায়—কেমন রক্তিম একটু আভা। ওঁর অন্তরের অতলেও বোধহয় বেদনার অমনি আভা একটু ফুটে উঠেছে।

অশোকের মনে কি একটা নীরব ঝড়।

নিজের অজ্ঞতসারেই সে কোথায় যেন নিজের সত্যের কাছে বার বার জড়িয়ে পড়েছে কঠিন প্রতিশ্রুতিতে।

প্রীতির কথা তার মনেও ঝড় তুলেছিল, সেই সন্ধ্যার পর সেও চেয়েছিল সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে, ঘরের সীমানায় একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে শান্তি আর তৃপ্তির অতলে হারিয়ে যেতে—কিন্তু তা পারেনি।

নীলাম্ববাবুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গ্রামের অনেক সর্বহারাকে তাদের বেদনার সঙ্গী হতে—সেই জ্বালা দূর করতে।

আজ বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কোন অন্যমন ওই বিলাসব্যসনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবার শপথ ঘোষণা করে ফেলেছে।

মিঃ রায় বলে ওঠেন,—তবে কি রাজনীতিই করতে চাও ? ইলেক্‌শন—এম-এল-এ—অবশ্য ওটাও—

অশোক বাবার দিকে চাইল।

ওঁরা কোথায় একটি নীতি এবং একটি রীতিতে বিশ্বাস করেন। মাপ করেন মানুষের মর্যাদা ওই অর্থ না হয় প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে।

জবাব দেয় অশোক, —ওসব ভাবিনি বাবা।

মিঃ রায হতচকিত দৃষ্টি মেলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। ওর সামনে কোন্ পথের নিশানা তা তিনি জানেন না। কি সে করতে চায় বলতে চায়—তাও বোধ হয় জানে না নিজেই।

অশোক বাবার এই বিরক্তি ভাব চাহনির সামনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তরের প্রদীপ্ত তেজ ফুটে ওঠে তার চাহনিতে। নীরব কঠিন শপথের মতই ঋজু স্বচ্ছ সে চাহনি। মিঃ রায় তাকে ঠিক বুঝতে পারেন না।

অশোকের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

এ যেন কোন অপরিচিত একটি মানুষ। অনেক দিনের পর নিজের ছেলেকে দেখে মনে হয় একে তিনি চেনেন নি।

আজ এসেছিলেন তিনি অশোককে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠা করে দিতে। এ যুগে বাঁচতে হলে তাকে রোজকার করতেই হবে।

কিন্তু অশোক সে ভাবে সহজ প্রতিষ্ঠা পেতে চায় না। তার পথ অনেক কষ্টসাধ্য, বহু দুর্গম। সে পথে আদৌ কোন প্রতিষ্ঠা আছে কিনা জানেন না তিনি।

বলে ওঠেন,

—ভুল না করলেই খুশি হবো অশোক। তবে একটা সুযোগ ছিল, ভালো চাকরিও জুটতো।

অশোক বলে ওঠে,

—জীবনে কোন কিছুর উপর লোভ আমার নেই, তাই ওপরে ওঠার জন্যও লালায়িত ই। কিছু রোজকার করার ব্যবস্থা আমার আছে, তাতেই চলে যাবে মোটামুটি। সবাই খাপের ধ্যেই আরামে থাকতে চায় ছকবন্দী জীবনে, খাপের বাইরে খাপছাড়াও অনেক কিছুই থাকে। মি না হয় তাদের দলেই রইলাম।

হাসেন মিঃ রায়।

—কথাটা স্বাধীনতার আগে অনেকেই বলতো, আদর্শ দেশসেবা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি, আজ দের কি পরিণতি দেখেছো নিশ্চয়ই।

অশোক একটু অবাক হয়েছে বাবার কথায়। আদর্শ.ত্যাগ আজ হাসির কথা, পরিহাসের স্তু। এ যুগের মানুষ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে।

আজ অশোক তেমনি কোন আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তাই সে ওদের কাছে রিহাসের পাত্র। প্রীতিও তাই তাকে ফেলে গেছে।

আজ বাবাও সেই কথা শোনান।

তবু দমবে না সে, জীবনে একটা পরম বেদনা তাকে এই পথে চলার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ই তার কাছে একমাত্র সত্য পথ।

মিঃ রায় হতাশই হয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না কি করে এমনি আলেয়ার ছনে মানুষ ছুটতে পারে। বলে ওঠেন,

—তোমার মতে বিশ্বাস করি না অশোক, হয়তো ভুলই করছো তুমি। অল রাইট ! উইস উ গুড লাক।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অশোক আজ বেশ বুঝেছে বাবার সঙ্গে তার মতের পার্থক্যটা আজ কট হয়ে উঠেছে।

একজন হিতাকাঙ্খীকে সে হারাল যাঁর কাছে ছিল তার সব চেয়ে নির্ভর আশ্রয়।

মিঃরায় বলে ওঠেন,

—রাত হয়ে গেল। কাল আবার বেরুতে হবে আমাকে। গুড নাইট্।

কথা বললো না অশোক। বাবা ওপরে উঠে গেলেন। দীর্ঘ ছায়ামূর্তিটা ক্লান্ত পদক্ষেপে রিয়ে গেল সিঁড়ির মাথায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

টেবিলের উপর চিঠিগুলো উড়ছে।

বাইরে থেকে আসা চিঠি কয়েকটা, তার প্রচেষ্টাকে নানারকমে সাহায্য আর স্বীকৃতির সংবাদ য়ে এনেছে চিঠিগুলো।

অশোক ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ভরসা পায়—জোর পায় মনে মনে। তবু সে শেষ পর্যন্ত দেখবে।

এবার নারাণ ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আলের মাথায়। ক্লান্ত পরাজিত একটি মানুষ। কে মেরে হটিয়ে দিয়েছে ওরা আজও।

বঁইচিতলার বাকুড়ির ধান কেটে চলেছে ছানু দাস লোকজন নিয়ে। প্রথমে কাস্তে নিয়ে বাঁধা দিতে গিয়েছিল নারাণ ঠাকুর। ওর অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস।

ছানু দাস মাথায় বেঁধেছে মস্ত এক পাগড়ি, হাতে একটা লাঠি। সঙ্গে জন কয়েক মুনিষ নিয়ে এসে বাধা দেয়।

—এ্যাই ঠাকুর ! এ্যাই দেখো মশমশিয়ে ধান কেটে চলেছে যেন উর বাপের ধান। এ্যাই।

কথা কানে যায় না,ছানু নেমে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে। অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল নারাণ ঠাকুর বাধা পেয়ে ! আর্তনাদ করে,

—এ্যা—এ্যা —

ইশারা করে দেখায়।

নিজের হাতে পুঁতেছে সে বাকুড়ির ধান। লকলকে হয়ে উঠেছে। সার গোবর ছিটিয়ে হাঁটুজলে বসে নিড়িয়েছে—স্পর্শ করেছে দুহাতের নীরব মমতায় ওই ধানগাছগুলোকে। বড় করে তুলেছে যেমন করে অসীম প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে তুলেছে সনাতনকে ওর হাত থেকে কেন ছানু তা কেড়ে নেবে ?

—হট্।

আজ হঠাৎ ছানু নিষ্ঠুর আঘতে সরিয়ে দিল তাকে মাঠ থেকে।

—সরে যাও ঠাকুর। মাথা পেড়ে দোব নাহলে।

—এঁ্যা !

নারাণ ঠাকুর চীৎকার করছে, মাথা ঠুকছে আলের মাথায়।

ওর চীৎকারে মাঠের এদিক ওদিক থেকেও মুনিষরা এসে জোটে। নিতে বাউরী, ধেনা পদো বায়েন, আরও অনেক।

ছানু দাস সকলকে হাঁকিয়ে শোনাচ্ছে,

—বলিনি যে পরের হরে-সম্মে নেওয়া সম্পত্তিতে ছেনো পেস্বাব করে ? খোস কওল করে দিয়েছেগঙ্গা ঠাকরুণ গঙ্গাজলঘাটি কোটে তারপর দখল লিইছি। কাট রে মসু—গজা হঁ করে ভাবছিস কি শালোরা।

ওরা ধান কাটছে। সকালের শিশিরভেজা সোনা ধান, এখনও ওদের ডগা হতে মুক্ত বিন্দুর মত রাতের জমা শিশির ঝরে পড়ে !

নারাণ ঠাকুর বিশ্বাস করতে পারে না—কি করে এটা সম্ভব হ'ল। তার বুকের মাড়ি এই জমিটুকুনও চলে গেল কি ভাবে। ওর দু চোখের সামনে অন্ধকার নামে এই সকালেও।

শীতে আর আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাঁপছে। কে যেন হাতের ইশারা করে দেখায়—গঙ্গা ঠক্রুণ বিচে পয়সা নিয়েছে। এ জমি আর তাদের নয়।

কি ভাবছে নারাণ ঠাকুর। স্তব্ধ হযে গেছে তার চীৎকার—আর্তনাদ। আস্তে আস্তে উঠে আসছে ছেঁড়া ময়লা চাদরখাঁনা আলের মাথার খেজুর ঝোপের ওপর থেকে তুলে নিয়ে।

—কাস্তেটা, ও ঠাকুর !

নিতে ওর কাস্তেখানা হাতে তুলে দিতে যায়।

একবার তার দিকে চাইল নারাণ, ওই কাস্তেটারও আর প্রয়োজন নেই। বাতিল করা নের শেষ চিহ্নের মত ওটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল সেইখানেই। ফিরছে বাড়ির দিকে াণ ঠাকুর। একানি জমিও নেই তার, কাস্তেও লাগবে না কোন কাজে।

নিতে বাউরীর হাতে কখনও রয়েছে ওর পরিত্যক্ত কাস্তেখানা।

কি ভেবে ওটা নিতে এগিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিল তাকে।

নারাণ ঠাকুর চলেছে গ্রামের দিকে হন্ হন্ করে।

গঙ্গা ঠাকরুণ ঠিক পথই নিয়েছে, অন্ততঃ তার মনে হয় এ ছাড়া আর পথ নেই। বেদনা ধ সেও যে করে নি তা নয়, কিন্তু এছাড়া আর পথ কি ? তাই জমিটুকু বিচেই দিয়েছে।

সনাতন কোন রকমে বড়সড় হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি, ক্লাশ সেভেন-টে বার দুয়েক ফেল করে হেলুমাস্টারকে শেষ প্রণাম করে বের হয়ে এসেছিল ইদানীং। গ্রামেই ছিল—মাঝে মাঝে ফুটবল খেলতে যেত এগ্রাম ওগ্রামে। আড়ালে দু একটা করে গ তাদের কাছ থেকে রোজ নিত। অবশ্য গঙ্গা ঠাকরুণের হাতে তা পৌঁছয়নি কোনদিনই। াতনের ফুল প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট আর হাওয়াই চটি হয়ে যা থাকতো, বিড়ি সিগ্রেট খরচায় লাগতো।

মা চেয়ে চেয়ে দেখে ছেলের দিকে—কেমন বাপের মতই বাড়-বাড়ন্ত গড়ন। তেমনি াবার্তাও। রসিক বলে ফকির ঠাকুরের খ্যাতি ছিল। তার শেষ কথা সেই বরযাত্রী হয়ে রবার মুখে বেসামাল হয়ে গাড়িতে পড়ে পড়ে 'লড়িও না, চড়িও না, ধরিয়ে দাও'—জও গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তারই যোগ্য ছেলে সনাতন।

হঠাৎ একদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে মাকে সে জানায়,

—চাকরি পেয়েছি। ভাল চাকরি।

গঙ্গামণি খুদ বাচছিল, ক্রমশঃ সংসারের অবস্থা এসে ঠেকেছে কোনখানে তা বেশ বুঝতে রেছে। বোবা নারাণ ঠাকুরের দিনান্ত পরিশ্রমে সামান্য জমি পেকে একবেলাও জোটে না। াটা শুনে গঙ্গামণি উপছে পড়ে খুশিতে।

—বলিস কি রে ? চাকরি পেয়েছিস ?

গঙ্গামণি আশার আলো দেখে। তার মুখ উলসে ওঠে।

সনাতন যুৎ করে বসে জবাব দেয়,

—হ্যাঁ।

সনাতন সত্যই একটা যোগাযোগ ঘটিয়েছে। দুর্গাপুরে ফলাও কাজ শুরু হয়েছে। লোক ই। বাঁধ—ইটখোলা, বিরাট লোহাকারখানার পত্তন হয়েছে। এলাহি কাণ্ড।

এতদিনের নিষ্কর্মা সনাতন তারই মাঝে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। সেদিন খেলতে

গিয়েছিল বড়জোড়ায়। ডি, ভি, সি, টিমের বিপক্ষে খেলা। তার খেলা দেখে খুশি হয়ে কোন একে মস্ত ঠিকাদার নিজে যেছে তাকে চাকরি দিতে চেয়েছে। তবে জামিন চাই, নগদ টাকার কারবার—তাই জামিন চাই তিনশো টাকা। কেমন মুযড়ে পড়ে গঙ্গা ঠাক্রুণ।

—তিনশো টাকা জামিন চাই ?

—হ্যাঁ ! মাসে একশো টাকা মাইনে, বাসা—সব দেবে।

গঙ্গামণি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। এই নগ্ন অভাব আর দারিদ্র্যের জীবন থেকে মুক্তি পাবে। দুবেলা দুমুঠো খেতে জুটবে, পরতে পাবে। কি ভাবছে। তারপরই ওই পথ নিতে বাধ্য হয়েছে। জমিটুকু দিয়ে দেয় পানু দাসকে নারাণের অগোচরে।

সনাতন মিথ্যে বলেনি। দুর্গাপুরের বনের ধারে ফাঁকা ডাঙ্গায় বাসাও পেয়েছে। গঙ্গামণি খুশি হয়েছে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে সেও বেঁচে গেছে—মুক্তি পাবে এই দুঃসহ দারিদ্র আর হতাশা-ঢাকা পল্লীর জীবন থেকে এখান থেকে চলে গিয়ে।

সেই আয়োজনই করছে গঙ্গা ঠাকরুণ।

স্বামীর ঘর ভিটে জমিজারাত সবই প্রায় যাবার মুখে, তাই এ ছাড়া আর পথ কি ?

শনিবার দিন আসে সনাতন, রবিবার দিনই চলে যাবে তারা। নতুন ঘর-কন্না আর নতুন গেরস্থালীর স্বপ্ন দেখছে গঙ্গামণি। গাছের সজনে ডাঁটাগুলো পাড়ছে সনাতন, তাড়া বাঁধছে। খামারের কলাগাছে কয়েকটা কলার কাঁদি—মোচাও ঝুলছে। তাও নিয়ে যাবার মনস্থ করে গঙ্গামণি।

—ওগুলো কাট বাছা!

সনাতন কেমন ইতস্ততঃ করে,—ফলন্ত গাছ।

গঙ্গামণি আজ ঘর ভাঙ্গতেও দ্বিধা করে না। বলে ওঠে,

—ঘর নাই আগড় বাঁধে। কার জন্য রেখে যাবো উ সব ?

গঙ্গামণি ইতিমধ্যে ছেলের বাসায় যাবার সব আয়োজন করে ফেলেছে খুশি মনে। এই দারিদ্র্য আর গ্রামের অভাব ভরা জীবনের চেয়ে সেখানের জীবন অনেক ভালো।

সনাতন সেখানের জীবনের স্বাদ পেয়েছে, তাই মায়ের এই ব্যাপারে সে খুব উৎসাহিত হয়নি

—বাসায় নাই বা গেলে ?

গঙ্গা ঠাকরুণ তবু নিরাশ হয়নি।

মায়ের এই সাজসাজ রবের মধ্যে সনাতন কেমন সাড়া পায় না। মা যেন গ্রাম ছেড়ে একটা ভুলই করছে।

মা প্রশ্ন করে চলে,—হ্যাঁরে তোর বাসায় ইলেকটিরি আলো আছে ? সেই যে বোতাম টিপলে জ্বলে?

সনাতন জবাব দেয় না। মা তখনও বলে চলে,

—যদি বলিস বাপু, না হয় খামারের চাকলদা গাছটা কাটিয়ে ভূষণ ছুতোরকে দিয়ে গোটা দুয়েক টেবিল বানিয়ে নিয়ে যাবো। সায়েব সুবো আসে, তাদের বসতে দিস কোথায় ? আর

কতকগুলো চিনেমাটির কাপ গেলাস কিনিস বাপু, অজাত বিজাতের ছোঁয়া বাসন পত্তর আমি ধরতে পারবো না।

সনাতন বিরক্ত হয়ে ওঠে,—থামো দিকি।

সে জানে মা-এর কল্পনার সেই খাসা বাংলোর কাছে তার বাসার কি পরিচয়। কি যেন একটা মস্ত ভুল করে চলেছে মা। তাকে শহরের ওই আলোর মোহই পেয়ে বসেছে, তার আড়ালের অন্ধকারটাকে ও চেনে না।

পাত্রসায়েরের গিন্নী, সোনামুখীর বৌ, আরও কারা এসেছে। সনাতনের মা আজ মনে মনে খুশি হয়—ওরা যেন তার এই পুত্রভাগ্যকে হিংসা করে।

গঙ্গামণি আমন্ত্রণ জানায় ওদের।

—মাঝে মাঝে আস্‌বি বাবা, এই তো দুগোপুর।

সোনামুখীর বৌ বলে,—সেইখানেই কি থাকবা দিদি ?

—নয়ত কি বাছা ? সনাতনের খুব অসুবিধা হয়। ইখানে আর কি মায়া রইল বল ?

—তলে নারাণ থাকবেক কুথায় ?

গঙ্গামণি জিব আর তালু দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করে—ঠিক কি যে তার মানে বোঝা গেল না। তবে এই প্রসঙ্গে নারাণের নাম উচ্চারণ করাতে খুব খুশি যে হয়নি তা বেশ বোঝা যায়।

সনাতন কথাটা বলতে চেয়েছিল মাকে।

—ওকে ফেলে যাবে ? অবলা একটা লোক।

গঙ্গামণি ওকে ঝেড়ে জবাব দেয়,

তাতে কি ? পুড়োঁতে চাল রইল—সিজেবেক আর খাবেক। ওর গোদা গতরটা তো নিয়ে যাইনি। তাছাড়া আর কাজই বা কি রইল মিন্‌যের ?

ব্যাপারটা যেন জলের মতই সোজা ঠেকে গঙ্গা ঠাকরুণের কাছে।

কিন্তু ওই কটি চালেই কি সব হবে? তারপর ? সারা জীবন বোবা লোকটা তাদের পুষেছে, মুখের অন্ন জুগিয়েছে আজ সনাতন একটু আশ্রয় পেতেই তাকে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সব জমি জায়গাও বিচে ওকে পথে বসিয়ে যাচ্ছে। ও ভাবেনি নারাণের কথা। ঘরবাড়িও ছাউনি অভাবে ধ্বসে পড়ছে।

কেমন সব ছেড়ে যেন পালাচ্ছে সনাতন, হেরে গিয়ে গ্রাম থেকে সরে যাচ্ছে পরবাসে —পরমাটিতে। কাকাকে ঠকিয়ে পালাচ্ছে। গঙ্গামণি তাগাদা দেয়,

—নে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে এগো দিকি।

ডাঙ্গার ওই দিকেই বনের সীমানা, তার বুক চিরে চলে গেছে দুর্গাপুরে যাবার পাকা রাস্তা। আগে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল খোয়া আর পাথর ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা—এখন তাতে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তার আয়তন বেড়েছে, পিচের প্রলেপ পড়ছে, পাশে পাশে বসছে ইলেকট্রিক তারের পোস্ট—বাঁকুড়ার দিকে বিজলী যাবে, লাইন আসছে দুর্গাপুর মাইথন—ওদিকে বোকারোর দিক থেকে।

ব্যারেজের কাজ শুরু হয়েছে। ওদিকে উপরে রাস্তা জমানোর ও দেরি নেই, আর ক' তার পরেই নাকি ওই নদীর উপর দিয়ে ছুটবে যাত্রীবাহী বাস, মালবোঝাই ট্রাক, সবকিছু দুর্গাপুর, বাঁকুরা এক নেভাড়ে হয়ে যাবে।

সকালের রোদ পড়েছে বনের মাথায়—শালবনগুলো নীলাভ স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। ডাকে কোথায় পত্রাবরণে দোয়েল হরিয়ালের ঝাঁক।

থমকে দাঁড়াল সনাতন।

গ্রাম ছেড়ে—দেশ ছেড়ে সেই-ই প্রথম চলেছে কোন অন্য জগতে ভাগ্য অন্বেষণে এ শিশিরমাখা পথ—বাতাসের সঙ্গে মেশা নাম নাজানা ফুলের কত গন্ধে গন্ধময়। ওই ধূ দিগন্তসীমা—এ মাটির বুক থেকে মুছে দিল সে তার নিজের অধিকার।

বেজার মা পুঁটুলিটা নিয়ে যাচ্ছে বাস রাস্তার দিকে। পিছনে চলেছে গঙ্গামণি ঠাকরুণ ছেলেকে দাঁড়াতে দেখে বলে ওঠে,

—আয়, ও সোনা, চট করে আয়। সাতটার বাস ফেল করবি নাকি ?

—এই যে যাচ্ছি, চল।

সনাতনকে ওরা যেন জোর করে এ মাটি থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল—ওই পরমাটিতে

পিছনে তবু চাইতে থাকে মাঝে মাঝে, বাতাসে মাথা নাড়ছে কামারপাড়ার তালগাছটা— দূরে পড়েল পুকুরের ধারে কাদের কলসী কাঁকে দেখা যায়—সবকিছু মিশে একটা সবু রৌদ্রস্নাত ছবি হয়ে ধরা দেয়।

সনাতন এক কালে ওই গাঁয়ের কোন ছায়াঘন একটি কুটিরে মানুষ হয়েছিল। আজ সে পরিচয় তার হারিয়ে গেল, সেও হারিয়ে গেল অপরিচিতের ভিড়ে।

গ্রাম, দেশ, পিতৃপরিচয়—সব তার চারি পাশ থেকে খসে পড়ল, সে আজ নতুন জীব ওয়েল্ডার সনাতন। ব্যস ! এই তার পরিচয়।

বাস আসার শব্দ শোনা যায় দূর থেকে !

চড়াই-এ উঠছে পুরোনো আমলের ছ্যাকড়া বাসটা। ঝকঝক—ধকধক নানা রকম শ করছে। পিছনে উড়ছে লাল ধুলো। ভক ভক করে উঠছে বাষ্প।

বাস-রাস্তার মহুয়া গাছের নীচে এসে দাঁড়াল ওরা। হারিয়ে যাওয়া গৃহহারা দুটি নতু মানুষ—সনাতন আর গঙ্গামণি।

নারাণ ঠাকুর একমনে আসছে মাঠ থেকে। জমি বেহাত হবার দুঃখটা মনে পাথরের ম জমে বসেছে। কি করে ভাজবৌ এমন কাজ করতে পারে জানে না সে। কত কষ্ট কত আ করে এতদিন সে টিকিয়ে রেখেছে এসব। ভাষা নেই তার—কিন্তু আর সব ইন্দ্রিয়গুলোই তা অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সচেতন।

ভাইপো সনাতন-এর সম্পত্তি, তাকেই মানুষ করেছে। তার দাদার শেষ চিহ্ন, কত আ তার। সনাতন চাকরী করছে। এইবার বিয়ে-থা দেবে। সেদিন গোপ-গাঁ থেকে হরষিত চৌধু এসেছিল—তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথাও নাকি বলেছে।

খুশি ধরে না নারাণের।

নিজেই ছোট্ট গামছাখানা মাথায় ঢাকা দিয়ে বৌ-এর মত ঘোমটা দিয়ে ডানহাতে বৌ-এর উচ্চতার একটা আন্দাজ দেখিয়ে মাঠ-পথে অনেককেই বলেছে সনাতন-এর বিয়ের কথা।

বৌ আসবে। নতুন বৌ।

কিন্তু সব যেন তার ভেস্তে যায়। ওই বাকুড়িখানা বেহাত হয়ে যেতে দেখে মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

বাড়ির কাছে এসে একটু দাঁড়াল। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নেয় কি ভাবে ভাই-বৌকে জানাবে কথাটা। চোখ দিয়ে তার তখনও জল বের হচ্ছে।

নারাণ ঠাকুর আজ সত্যিই গভীর ব্যথা পেয়েছে।

ছানু দাস ওর হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ঘাড় গুঁজে পড়েছিল সে আলের মাথায়। মারতো আরও ছানু দাস, কিন্তু ওরা এসে থামিয়ে দিয়েছে। বাড়ির ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়াল নারাণ।

—অ্যাঁ !

কেউ কোথাও নেই। সারা বাড়ি জনহীন।

জৈবিক ভাষাহীন আর্তনাদ ওঠে। এদিকে ওদিকে খুঁজছে আর চীৎকার করছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর। কোন সাড়া নেই। কেউ কোথাও নেই। ঘর উঠোন সব ফাঁকা—জনমানব নেই। ভাজ-বৌ—সনাতন, সবাই চলে গেছে।

রান্নাঘরের পাশে পড়ে আছে ভাত রাঁধার কালিমাখা মেটে হাঁড়ি, দু একটা সরা মাত্র। ওদিকে মাটির কলসী। আর সব ফাঁকা। দরজায় তালাবন্ধ। তার ঠাঁই কোথাও নেই।

কেমন কাঁপতে থাকে নারাণ।

অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করছে। সবাই তাকে ফেলে চলে গেছে—সরে গেছে। চারিদিকে দিনের আলো অন্ধকার হয়ে আসে, কেমন স্তব্ধতা আর হতাশার রাজ্য—চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো। ওইখানে! তার দাদার শেষ দৃশ্য মনে পড়ে— কেমন করুণ কাতর অবেদনভরা চোখে ভাষাহীন নারাণের দুটো হাত চেপে ধরেছিল, তুলে দিয়েছিল সনাতন আর ভাজবৌ-এর ভার।

কই সে তো ভুল করেনি—প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে, দুঃসহ অপমান সব সয়েছে কিন্তু শেষকালে তারাই ফেলে গেল তাকে নিশ্চিত অনাহার আর অতল দুঃখবেদনার একাকীত্বের মাঝে!

কাঁপছে ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর।

সারা শরীরের অতল থেকে উঠছে একটা অব্যক্ত চীৎকার—দূরের আকাশের দিকে চেয়ে আর্তনাদ করছে নারাণ।

মাথা ঠুকছে শক্ত মাটিতে—ঠুই ঠুই ঠুই।

একটা জড় পদার্থের আছাড় খাওয়ার মত শব্দ উঠছে। দুচারজন প্রতিবেশী এসে জুটেছে।

আহা ! অবলা মানুষটাকে ফেলে গেল ?

সমবেদনা বোঝাবার ভাষা তার জানা নেই।

নারাণ ঠাকুর চীৎকার করছে, একটানা ভাষাহীন একটা আর্তনাদ। ভয়ে আতঙ্কে, অসহায় রাগ আর ক্ষোভে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

কতক্ষণ আর্তনাদ করেছিল জানে না নারাণ ঠাকুর।

বেলা পড়ে আসছে। বোধহয় সারাটা দিনই এক ভাবে বসে থেকেছে দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে আর মাঝে মাঝে কান্নাভরা কণ্ঠে চীৎকার করেছে।

কোথায় দুর্গাপুরে চলে গেছে ভাজ-বৌ সোনাকে নিয়ে, আর বোধহয় ফিরবে না।

তার সব আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করছে ঘরখানা—দুটো কাক রান্নাঘরে মাটির হাঁড়িটায় ঠোকর মেরে জল দেওয়া ভাতগুলো ছিটিয়ে ছত্রাকার করেছে। ভাজ-বৌ হাঁড়িতে একবেলার খোরাক রেখে গেছে দয়া করে। কিন্তু মুখে দেবার সামর্থ্য তার হয় নি।

বুক ফেটে হু হু কান্না আসে।

সাজানো ঘরবাড়ি, মা বাবা—দাদা—বৌদি—কতলোক, আনন্দের দিন তার বুকের অতলে এ বাড়ির সঙ্গে একটি মধুর স্মৃতি হয়ে মিশেছিল !

কিন্তু !

হু হু করে ওঠে বুক। কেমন একটা অসহ্য জ্বালা ওঠে। চাপড় মারতে থাকে বুকে। কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণায় দুচোখ বেয়ে জল আসে।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে ওকে, ওর দুচোখ—মুখ তন্ন তন্ন করে। অবাক হয়েছে নারাণ ঠাকুর।

মিষ্টি লোহার ঢুকছে।

—ঠাকুর! অ ঠাকুর !

একজনের বেদনা আর একজনের মনের অতলে কোন নিভৃতে স্পর্শ করেছে। একজনের ঘরবাঁধা হয়েছে ব্যর্থ, অন্তর তাই শূন্য। অন্য জনের ঘর ভেঙ্গে গেছে কোন নিদারুণ ঘূর্ণিঝড়ে তাই বুক ফাটিয়ে কাঁদে সে। বলে ওঠে মিষ্টি,

—চুপ দাও ঠাকুর, কেঁদে কি হবেক?

মিষ্টি এসে পাশে দাঁড়াল ওর।

ভাষা বোঝে না নারাণ। ওর দিকে অবাক বেদনাহত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে।

মিষ্টি সান্ত্বনা দেয়,—একটা প্যাট যেমন তেমন করে চলে যাবেক! কেঁদো না অমন করে।

চোখ মোছে নারাণ ঠাকুর।

সান্ত্বনা সমবেদনা জানাবার ভাষা বোধ হয় ফুটে ওঠে সর্বপ্রথম চোখের চাহনিতে, মূকবধির ওই অর্ধনরটির কাছেও তা প্রকাশ পেতে দেরি হয় না।

গজ গজ করে মিষ্টি।

—ঘরে খাবারও কিছু রেখে যায় নি?— ঠাকরুণ কি লক্ষ্মীর হাঁড়ির ধান পাইটাও খুঁটে বেঁধে লিয়ে গেছে? মরণ! বাসাকে গেছে—পাখির বাসা। ঝাঁটা মার মুয়ে।

খুঁট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়। ইশারা করে দেখায়,—চাল ডাল যা হয় আন, খেতে তো হবেক ?

মাথা নাড়ে নারাণ, খিদে তার নেই।

খিদে তেষ্টা সব যেন ভুলে গেছে সে নিদারুণ এই নীচতায়।

আপন জনের দেওয়া কঠিন অঘাতটা তার বুক পাথর করে দিয়েছে। কেমন ঘৃণা বিতৃষ্ণা এসেছিল মানুষের উপরই। কিন্তু মনে হচ্ছে পানু দাস—ছানু দাস —ভাজ-বৌ—সোনা — এরা ছাড়া মানুষ আছে গ্রামে।

অনেক ভালো মানুষ আছে।

এ বিশ্বাসটুকু ফিরে পেয়েও আনন্দিত হয়েছে সে। তাই বোধহয় চোখের জল মোছে।

আবার সোজা হয়ে বসে নারাণ ঠাকুর । কোথায় যেন ভরসা পায়।

মিষ্টি বলে ওঠে—ছানু মেরেছে ?

মাথা নাড়ে নারাণ জল ভরা চোখে। ওকে সবাই আজ আঘাত করে চলেছে।

কি তার অপরাধ জানে না সে। মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—তোমাকেও মারে মানুষ!

নারাণের বুকে সে মারের চেয়ে অনেক বেশি বেজেছে ওই ভাজ-বৌ-এর ব্যবহার— সনাতনের বিশ্বাসঘাতকতা।

বৈকালের আলো ম্লান স্পর্শ লাগায় বেণুবন সীমায়। পাখিডাকা বৈকাল, দিন শেষ হয়ে আসছে রাত্রি।

কেমন নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামসীমা, আকাশে জেগে ওঠে দু-একটা সন্ধ্যাতারা। মিষ্টি চলে গেছে। একা ঘরে নারাণ ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, কোথায় সব তার হারিয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে গ্রামসীমানা, স্তব্ধতা আর অন্ধকার নেমে এসেছে ওর বুকে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা জোনাকিজ্বলা রাত্রি। পশ্চিমদিকের অন্ধকার উলসেউঠে, আলো জ্বলছে দুর্গাপুরে, নদীর বুকে শালবনের অন্ধকারে আলোগুলো আকাশ-কোল ভরে তুলছে।

বিচিত্র শব্দ উঠছে নানা যন্ত্রপাতির । ব্রিজের উপর আলো জ্বেলে ওরা রাস্তা বাঁধাচ্ছে, রিবেট করছে লোহার বিশাল স্লুইস গেট, গার্ডারগুলো। ওদিকে উঠছে লোহার কারখানার শেড।

আলো আর আলো।

আদিম আরণ্যক অন্ধকারকে নিঃশেষে জয় করেছে ওরা।

তারই চারিপাশে কালো ছায়ার মত মানুষ—দিনরাত নেই—ওই যন্ত্রদানবের হুকুমে যেন চরকির মত পাক দিচ্ছে, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে ওর হুঙ্কারে।

মাথা নীচু করে কাজ করছে ওরা কেনা গোলামের মত।

দূর দূরান্তরের কোন ছয়াঘন গ্রাম—ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন ছেড়ে তারা এসেছে ওই বন্দীশালার কর্মকুণ্ডে। আরও কারা যাবে, কতজন তার হিসাব নেই। কতঘর এমনি ভেঙ্গে যাবে কে জানে !

দূরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে নারাণ ঠাকুর।

ওই আলো— ওই কর্মব্যস্ততা—ওই কঠিন বেষ্ঠনীর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঘরবাড়ির স্বপ্ন—সবুজের স্পর্শ—তার অতীতের সেই দিনগুলো।

সবকিছু।

সনাতনও হারিয়ে গেল সেই সঙ্গে। কানে আসে। একটা জানোয়ারের মত ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদছে নারাণ ঠাকুর। ভাষাহীন সেই কান্না রাতের বাতাস ভারি করে তুলেছে।

জীবনরত্ন আজ আমূল বদলে গেছে ! বদলাতে বাধ্য হয়েছে নিষ্ঠুর নির্মম কোন আঘাতে।

চোখের সামনে আজ নতুন করে সমস্যাগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। এতদিন পিছনে ফিরে চায়নি। চাইবার দরকারও বোধ করেনি জীবন।

কিন্তু এখন দেখেছে—বাবা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে চারিদিকের প্রকৃতি, তার পরিবেশ। গ্রামের রূপও সেই সঙ্গে।

বড় বিশাল বাড়িটা এতদিন অনেক কিছু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে দাঁড়িয়েছিল, একবার সেই ফাটল ধরার পর থেকে ক্রমশঃ তা বেড়ে চলেছে। চারিদিকে চুনবালি খসছে, চুনকাম অভাবে কালো শেওলাধরা বাড়িটা দিনের আলোতেই কেমন থমথমে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রাত নির্জনে মনে হয় প্রেতপুরী।

চারিদিকের বিশাল প্রাচীর ধ্বসে পড়ছে, একসঙ্গে সব কিছু যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে।

শেষ কথা সেদিন রমণ ডাক্তারও শোনায়।

খুকীর অসুখ বেড়েই চলেছে। ছোট বাচ্চাটা কেমন নেতিয়ে পড়ে। জীবনরত্নের একমাত্র সন্তান, তারকরত্নের বংশের ওই একটি প্রদীপ। রমণ ডাক্তার দেখেশুনে বলে,

—জগন্নাথপুরের ডাক্তারেও কুলোবে না, মনে হচ্ছে নেফ্রাইটিস বা অন্য কিছু; একবার সদরে দেখাও। ভাল চিকিৎসার দরকার।

জীবন সেদিন অনুভব করে ক্যাশবাক্সের অবস্থা।

বাবাকে কিছু বলতে সাহস করে না।

কোন রকমে সদরে নিয়ে যায়, কিন্তু ওষুধপথ্য আর মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করার যা দমক এবং খরচ তা জোগাবার ভাবনাতে শিউরে ওঠে।

মণিমালা স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। তার গহনা-পত্রও গেছে লাটের কিস্তি মিটিয়ে জমিদারী বহাল রাখতে।

—বাবাকে বলবো টাকার কথা? মণিমালার কণ্ঠে কাতর অনুনয়ের সুর।

—না। জীবন বাধা দেয়। তার সম্মানে বাধে।

—তবে? অসহায়ের মত মণিমালা চেয়ে থাকে ওর দিকে।

পানু জানতো এমনি করেই চাকা ঘুরবে। এতদিন রাতের অন্ধকারে সে প্রায়ই গেছে অতীতে বড়বাবুর দরবারে আবেদন জানাতে। প্রেসিডেন্ট হাকিম—তার হাতেই তখন এ মুলুকের সব ভার—কনট্রোলের দোকান, পারমিট ইসু করা তার মর্জি; তাছাড়া কিছু জমি জারাত করেছে, বড়বাবুকে খুশি করার প্রয়োজন তার হয়েছিল সেদিন।

আজ জীবন যে আসবে তা যেন অনুমানই করেছিল পানু। কলঘরের একপাশে তার নিজের বসবার ঘর বানিয়েছে—রাস্তার ধারের আগেকার সেই পরিবেশ বদলে গেছে।

রাস্তার আয়তন বেড়েছে। পিচ পড়েছে খোয়া ওঠা বিশ্রী পরিত্যক্ত রাস্তায়। দুপাশের ডাঙ্গায় বসেছে চা-এর দোকান, নানা রকমারি দোকান, আড়তও। শোনা যাচ্ছে নাকি সিনেমা হাউসও তৈরি হবে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে ইলেকট্রিক লাইন। সব কিছুর মাঝে জাঁকিয়ে বসেছে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাণবল্লভ দাসের ধানকল।

দুটো ট্রাকও কিনেছে, ওপাশে মিস্ত্রি আনিয়ে বডি তৈরি হচ্ছে। আরও দু একটা শেড উঠছে সেখানে, না জানি আরও কি কারখানা বসাবে পানু।

কোন রকমে চুপিসাড়ে গিয়ে ঢুকল জীবন পানুর ঘরে। বিজলীবাতি তখনও পায়নি, হেসাক জ্বলছে।

ওপাশেই শালবনের সীমানা। জনমানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল স্থান যে এমনি জাঁকালো হয়ে উঠবে কে তা ভেবেছিল!

পানু একাই হিসেবপত্তর দেখছিল। ওকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

—আসুন, আসুন ছোটবাবু। কি মনে করে? বসুন। একটু চা হোক। ওরে—

জীবন সঙ্কুচিত হয়ে তক্তপোশের একপাশে বসল। আজ মাথা উঁচু করবার সামর্থ্য যেন নেই তার। বলিরাজার কাছে বামন হয়ে বিষ্ণুকে যেতে হয়েছিল ভিক্ষা চাইতে, উঁচু হয়ে নয়।

তেমনি আজ জীবনও যেন পঙ্গু হয়ে উঠেছে। আমতা আমতা করে,—না, না। চা খেয়ে এসেছি। একটু কথা ছিল পানুবাবু।

পানু ওর দিকে চাইল। বেশ অনুভব করে, জীবনের আজ পানু বলবার সাহসটুকু নেই। পানুবাবুই বলতে হয়।

ওই ডাক শুনে মনে মনে একটু খুশিই হয় পানু।

খাতা থেকে মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। ওর আসার খানিকটা কারণ অনুমান করে পানু।

—বলুন?

—কিছু টাকার দরকার ছিল। ধর শ'খানেক। বাড়িতে মেয়েটার অসুখ। হাতেও কিছু নেই।

—বড়বাবু জানেন?

পানু সন্দেহ করছে জীবনকে। ওর আগেকার পরিচয় জানে পানু। ওই টাকা নিয়ে কে জানে কি বদখেয়ালে উড়োবে, না হয় গোকুলের জুয়োতেই এড়ে দেবে, ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না।

একবার বেদনাহত দৃষ্টি মেলে চাইল জীবন।

—বাবাকে বলিনি। তাঁরও মন মেজাজ ভালো নেই। শরীরও খারাপ।

পানু কি ভাবছে।

দূরের কথাই ভাবছে সে। ক্রমশঃ তার মন আজ সব কিছু গ্রাস করতে চায়। আজ তারকবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবে না। অনুকম্পা করে তার সহযোগিতাই চায় সে এবং একটা যোগাযোগের সূত্রও খুঁজে পেয়েছে যেন।

কি ভেবে ক্যাশবাক্স খুলে দশখানা নোট গুনে দেয় জীবনের হাতে।

একটু অবাক হয় জীবন।

পানুই ছোট্ট হার্তচিটায় একটা সই করিয়ে নেয়,—ওটা মামুলি ব্যাপার মাত্র। আসবেন মাঝে-সাঝে। একদিন কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবো।

জীবন উঠে পড়ে। বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

পানু কি ভাবছে। আলোছায়ার সংমিশ্রণে উঠোনের কেঁদ গাছটা কেমন বিচিত্র একটা রূপে পরিণত হয়েছে। পানু ওরই দিকে চেয়ে থাকে।

বাইরে থেকে কে যেন এতক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, জীবন বের হয়ে যেতেই সে ঘরে ঢোকে। এদিক ওদিক চাইছে।

পানুও একটু সাবধানী হয়ে ওঠে, কি ভেবে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। ভুবন কামার একটু সহজ হয়ে ওঠে। একপাশে চেপে বসলো সে।

পানু তখনও আজকের চালানী বিলের হিসাব করছিল। ভুবনকে যেন দেখেও দেখেনি।

পানু ভেবেছে কথাটা। ভুবন ওর প্রতিপক্ষ দলের। তারকবাবু আজ্ঞে ফৌত, তার বিরুদ্ধপক্ষ বলতে ওই কামারপাড়াকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চজন আর তাদের সমবায় সমিতি। পানু ভুবনকে দেখে মনে মনে একটু খুশিই হয়, তবে মুখের হাবভাবে তা আদৌ প্রকাশ পায় না।

সমবায়ের ফান্ড থেকে ইস্কুলে টাকা দেবার ব্যাপারে ভুবন সেই রাত্রের কথাবার্তার পর বের হয়ে গিয়েছিল, সে ভাবেনি তার অমতে ওরা অশোকবাবুকে টাকা দেবে ওই সব ব্যাপারে।

ভুবন কিছুদিন থেকেই বুঝেছে ওকে না হলেও এদের চলবে। তাই বোধহয় ভুবনের অমতেই কামারপাড়ার সমবায়ের টাকা ওরা দিতে পেরেছে।

মনে মনে বেশ রাগই হয় তার।

কালী বোঝাবার চেষ্টা করেছিল পরে।

—ভালো কাজেই দিলম্ টাকা, সবাই বললেক।

ভুবন বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে,

—সম্মাইকে লিয়েই থাক গে তুরা। আমাকে আবার দরকার কেনে?

কালী কথাটা বোঝাতে পারেনি।

ভেবেছিল ভুবনের রাগ দুচার দিনের মধ্যেই পড়ে যাবে, সবকিছুর একটা মীমাংসা হবে কিন্তু ভুবন সেই থেকেই বেঁকে বসেছে।

সব কথা শুনে অশোক বাবু টাকা ফেরৎ দিতে চেয়েছিল কিন্তু বাধা দেয় অতুল বুড়ো। বলে ওঠে

—টাকা আপনাকে দিইনি ছুটবাবু, সবাই মিলিত হয়ে ইস্কুলে দিইছি, ও ফেরৎ দিলে জানবে ইস্কুলের ব্যাপারে কুন সাহায্য আপনারা চান না।

অশোক চুপ করে যায় এর পর।

ভুবন সেই থেকেই বুঝেছে এখানে তার কথার দাম নেই, অশোককে কেন জানে না সে সহ্য করতে পারে না।

কদমের মুখে ওর কথা শুনেছে বার বার। গোকুলের সেই কোর্টে দাঁড়িয়ে ওই কথা বলার পর থেকেই কেমন মন ভেঙ্গে গেছে ভুবনের। মনে হয় কোন সত্য এর মূলে আছে।

কদমও ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

—ছুটবাবুর সঙ্গে ও নিয়ে মন-কষাকষি করো না।

ভুবন গজরায়,—তাতে তোর এত মাথা ব্যথা কেনে রে? এ্যাঁ?

কদম চুপ করে যায়।

লোকটা এইবার হয়তো যা তা বলেই বসবে। ওর ঘাড়ে কখন কি ভূত ভর করে। চোখের চাইনিও বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ভুবন বলে চলেছে।

—সবার সব তেল আমি মারবো। তোরও। ঘাসে মুখ নিয়ে চরি না বুঝলি?

কদম চুপ করে সরে যায়।

মানুষটা এমনি করেই তাকে তিলে তিলে এইবার দগ্ধে মারবে।

অনেক ভেবেছে ভুবন।

এখানের এই আবহাওয়ায় অনেক সাবেকী কালের বাঁধন আর বশ্যতা রয়ে গেছে, দল ছেড়ে কিছু করার নেই।

তার প্রাধান্য সে দলে কতটুকু তা টের পেয়েছে। এখান থেকে চলে যাবে সে। মনস্থির করে ফেলেছে।

—তারপর?

পানু যেন নেহাৎ গরজের সুরেই কথাটা বলে। উৎসাহিত হয়ে ওঠে ভুবন।

— ওদিকের সব ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছি পানুবাবু।

পানু তথাপি উৎসাহিত বোধ করে না। বলে ওঠে চিন্তিত স্বরে,

—শেষকালে খরচাপাতি করে ভাইপো সাজবো নাতো ভুবন? দেখো আবার ভেবে চিন্তে। ওরা বলবে আর তুমিও তেমনি চলে যাবে।

পানু কি যেন ইঙ্গিত করে। ভুবন বাধা দিয়ে ওঠে,

—কি যেন বলেন পানুবাবু। ভুবন কামার কাউকে ডরায় না। যা বলেছি তা করবোই। মতে মিলল না তবু সেখানে পড়ে থাকতে হবেক কেনে?

পানু বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। বলে ওঠে,

—তোমার কথা তুমি ভাবো গে ভুবন। আমার দিক থেকে কথাটা বলছি, ধর— যন্ত্রপাতি, বিজলী, মিস্ত্রি, কাঁচামাল—এসব যোগাড় করে এনে শেষকালে তোমাকে আর পেলাম না, তখন?

ভুবন বেশ জোরের সঙ্গেই বলে ওঠে,—মানুষের বাচ্চা আমি পানুবাবু। কথার নড়চড় হবে না।

পানু সায় দেয়,—সেইটা যেন ঠিক থাকে।

—দেখে নেবেন।

ভুবন বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে। ইতিকর্তব্য সে স্থির করে ফেলেছে।

মনে মনে কিছুদিন থেকেই সে আঁচ করছিল, ওই সমবায় আর অন্য কিছু করে যা পাচ্ছিল, তা যেন তার তুলনায় অনেক কম। পানু দাসও মাঝে মাঝে বলতো কথাটা, এক সঙ্গে ব্যবসা করি আয় ভুবন। তোর গতর আর আমার মূলধন। অবশ্য মূলধন—কাঁচামাল কে দেবে তা জানে পানু। আসবে সদরের মহাজনের মোকাম থেকেই। সেই সব ব্যবস্থাই করছে পানু দাস।

বিজলী, শান পালিশ, র‍্যাঁদা বসাবে। অল্প খরচে বেশি মালও তৈরি হবে এবং দরও সুবিধা পড়বে। কিছুদিন একটু দর নামালেও ক্ষতি নেই, ওদের সমবায়ও ঘা খেয়ে যাবে—ব্যাঙের

পুঁজির সমবায়। তাছাড়া ওদের আঘাত করা দরকার। মাথা তুলছে বিরাট একটা পুঞ্জীভূত শক্তি—সেই নবজাগ্রত চেতনাকে বাধা দেওয়া দরকার।

এ কথাটা পানুর নয়, ওটা সদরের বাবুদের। বুদ্ধিটাও দিয়েছে তারা। পানু সুযোগ খুঁজছিল, ভুবন আসতেই সেও এমনি আশ্বাস পেয়েছে ভুবনের কাছ থেকে। পানু দাস আজ বসে নেই।

টাকা যা লাগে তারা দেবে।

মহাজন রাঠী, প্রশান্তবাবু ওদের কথা এটা। সেদিন ধান-কলে বসে তাঁরাই বলে গেছলেন সাহায্যের ওই কথা।

তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছে পানু দাসও—হক্ কথা। তাই সরষের মধ্যেই ভূত ঢোকাবার চেষ্টা করেছে।

ভুবন পানুর কাছে ঘোরাঘুরি করছে।

ভুবনকে তাই বোধহয় মন্ত্রণা দেয়,—ওর নতুন কারখানার ম্যানেজার হবে ভুবন। ম্যানেজার সাহেব। দুশো টাকা মাইনে মাসিক।

কথাটা ভুবন প্রথমে শুনে হকচকিয়ে গেছল। পানু বলে,

—কাউকে ভাঙ্গিস না এখন ভুবন, অনেকেই চাকরির লোভে এসে পড়বে।

ভুবন মাথা নাড়ে,—না গো বাবু।

আস্তে আস্তে ভুবনকে গ্রাস করেছে ওই চাকরির মোহ; ব্যবসায় লাভ-এর অংশও একটা থাকবে। তাছাড়া নতুন বাসা দেবে পানুবাবু এই দিকে। পাকা বাড়ি।

ভুবন ওদের পাড়ার লোককে দেখাতে চায় তার এখন দাম কত!

ওই ঘিঞ্জি নোংরা পরিবেশ থেকে সরে আসবে। বদলাবে তার জীবনযাত্রা—সব কিছু।

ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ভুবন। পানু দাসকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আয়োজনও চলেছে তার গোপনে গোপনে এইখানে চলে আসার।

নতুন শেড উঠছে—যন্ত্রপাতিও আসছে। ভুবন তলায় তলায় অন্য কারিগরদের সমবায় থেকে ভাঙ্গিয়ে আনবার যোগাড় করছে। ভালো মাইনে—বিক্রি হলে পয়সা পাবার জন্য অমন হাঁ করে ধারকর্জের ভাবনা ভাবতে হবে না। খাটো—হপ্তাহে রোজ মিলবে নগদ টাকা।

অনেকেই ভাবছে কথাটা।

পানু দাসও তোড়জোড় করছে। ভুবন বের হয়ে এল—রাত তখন অনেক।

এই এলাকাটা বেশ ভালো লেগে গেছে ভুবনের। খড়ো চালের ঘিঞ্জি বস্তি নেই এখানে, শালের পোড়া কয়লা ঢাকা পথটাও নেই; এখানকার মানুষগুলো হাঁটুর উপর ছহাতি কাপড় গুটিয়ে বিশ্রীভাবে কথা বলে না।

ট্রাকের ড্রাইভার দুজন পাকুড়গাছতলায় বসে মেরামতি কাজ তদারক করছিল, ওদিকে ধানকলের মিস্ত্রিও আড্ডা জমিয়েছে—ওদের দলে ভিড়েছে গোকুলও। ইদানীং সে এইখানেই ডেরা পেতেছে তারকবাবুর আড্ডা ছেড়ে। এই তার একটা পথ। সে আশ্রয়ও পেয়েছে। পানুবাবুর এখানে। ট্রাকেই থাকে—ধুতি ছেড়ে ইদানীং একটা তেলকালি মাখা প্যান্ট পরে মটরের কাজ শিখছে গোকুল।

ভুবনকে বের হয়ে যেতে দেখে ডাকে নস্তু।

—আরে ও দাদা ! ভুবনদাদা।

ভুবন দাঁড়াল। কি ভাবছে।

—এসো না। একটু না বসেই চলে যাবা?

ভুবনও এখানেই আসছে—এদের নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে। তাই ওদের সঙ্গে 'ও করছে কিছুদিন। মাঝে মাঝে ট্রাকে করেও বেরিয়ে আসে নদীর ধার অবধি—লাহি ব্যাপার, কাজকর্মও দেখে। কেমন একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।

প্রাণখোলা লোক ওই নস্তু—বলরাম ড্রাইভার। এগিয়ে আসে ভুবন। ওরা শুধুমুখে বসে নেই। মাঝখানে কয়েকটা বোতলও নামানো। ভুবনের ও মন্ত্রেও দীক্ষা হয়ে গেছে। তবু কেমন মন এখনও ভয় ভয় করে। ভয় 'আর লজ্জা।

বলে ওঠে,

—না নস্তু, বাড়ি যাই। রাত হয়েছে।

হাসে নস্তু,—তোমার বাড়িতে তো লোক আছে। জাড়ের রাত কাটাবার লোক, আর আমাদের! বসো—একটু গা তাতিয়ে লিয়ে যাও। দে রে গোকুল—

গোকুলও যেন তৈরি ছিল। কলাইকরা গেলাসে খানিকটা ঢেলে এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

কি ভাবছে ভুবন। ইদানীং কেমন লোভও লাগে। তাজা ওই পানীয়টা গলা-বুক জ্বলিয়ে নামে, শরীরের সমস্ত শিরা তন্ত্রী দেহকোষ একটি কবোষ্ণ মনোরম অনুভূতির চাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। একটা নতুন স্বাদ রোমাঞ্চ আনে, জীবনের উপভোগের নতুন সাড়া জাগে।

হাসছে নস্তু। বলে ওঠে,

—কদ্দিন আর ওই আঁধার গাঁয়ের ভেতর শাল ঠেঙ্গাবা দাদা ! এসো পড়ো। এখন তো তের কাজেরই দাম। কল-কারখানার দিন।

গলায় ওটা ঢেলে ভুবন কয়েকটা বাসি বেগুনী চিবুতে চিবুতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। মনে একটা খুশির আমেজ। বলে ওঠে,—আসবো ইবার।

--মাইরি!

বলরাম ড্রাইভার কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বলে ওঠে নস্তু,—বৌদি এলে সত্যি মাটি সাজন্ত হয়ে উঠবেক। পানুবাবু সব করেছে, ওইটি কিন্তু করতে পারে নাই। তাই ডাঙ্গা খাঁ করে।

--নয়তো কি? বলে ওঠে বলরাম।

হাসছে ভুবন,—তা যা বলেছ।

রাত নেমেছে। শীতের রাত্রি। নীরব নিস্তব্ধ গ্রামসীমা। নিশুতি চারিদিক। কামারপাড়ার সরু পথটায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে।

চুপি চুপি এগিয়ে আসছে ভুবন। পকেটে ক'টা টাকা। পানু দাস তাকে দিয়েছে। নতুন বাসায় জিনিস-পত্তর সদরে কিনতে যাবে কাল বলরামের ট্রাকে।

সারা দেহে একটা উষ্ণ মাদকতা। পা দুটো বেশ সাবধানে ফেলে আসছে। মাটিটা বার ব একটু একাত-ওকাত হচ্ছে যেন। স্ফূর্তিতে গান আসছে। গান গাইতে ইচ্ছে করে ভুবনের

দূর ছাই—গানও কি জানে এক কলি? ওসব কিছুই এতদিন জানেনি। জানবার সময় হয়নি—মরার মত দিনরাত নেংটি পরে শালের আগুনের সামনে বসে লোহা পিটেছে। জীবনটা এমনি করে উপভোগ করার স্বপ্নে আজ মেতে উঠেছে ভুবন।

সারা শরীরে একটা কেমন বিজাতীয় নবজাগ্রত ক্ষুধার তীব্রতায় কদমের কথা মনে পে

আবছা অন্ধকারে দরজাটা ঠেলে বাড়ি ঢুকলো ভুবন। খক্ খক্ কাশির শব্দ ভেসে আ

—কে?

অতুল কামারের গলা শোনা যায়। বয়স হয়ে গেছে—কেমন অথর্ব হয়ে এসেছে সেই স চোখের দৃষ্টিও কমে গেছে, রাতেও ঘুম হয় না। অতন্দ্র প্রহরীর মত বসে আছে রাত্রি মহাশূন্যে বুজে আসা চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, আকাশ বাতাসে কান পেতে আছে—শো কোন মহাকালের পদধ্বনি। আর কাস্‌ছে।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে জবাব দেয় ভুবন,—আমি।

—অ! তা এত আত অবধি ছিলি কুনখানে?

জবাব দিল না ভুবন। দেবার দরকার বোধ করে না। উঠে গেল খড়ের চালের নীচু দা পেরিয়ে ওর খুপরির দিকে। পা দুটো টলছে, টাউরি খেয়ে পড়ছিল, কোন রকমে খুঁটি সামলে অন্ধকারে এগিয়ে যায়।

কদমও ঘুমোয় নি। চুপ করে বিছানায় পড়েছিল। কিছুদিন ধরে সেও দেখছে একটা বে উঠেছে এ বাড়িতে।

ভুবনকেও দেখে এসেছে এতদিন। শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভালমানুষগোছের একটি কতবার চেষ্টা করেছে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে মানুষ করে তুলতে। যত্ন করে চিরুনি দিয়ে অগোছাল চুলগুলোকে আঁচড়াতে গেছে। বাধা দিয়েছে ভুবন।

—ওসব তুই কর বাপু, মানাবে তুকে। খাটিয়ে মরদের উসব বাহার সাজেনাকো সোন্দর, তুকে উসব মানাবে।

—আমি আবার সোন্দর কুনখানে গো?

হাসে কদম। সলজ্জ সুন্দর সুঠাম একটি নারী—কামনাময়ী দৃষ্টি তার দুচোখে। বলিষ্ঠ ভু ওকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে,—ল'স আবার। আরশিতে দেখ কেনে?

—ছাই।

কদমের এত রূপ গুণ তবু বুক জুড়ে সেই চাপাপড়া ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ওঠে। সেই দীর্ঘ হতাশার কথা মনে পড়ে।

ভুবন বোঝেনি। হয়তো বোঝবার মত বুদ্ধি তার ঘটে নাই।

তবু ভালোই ছিল কদম। কিছুদিন থেকে অনুভব করছে, ভুবনের মনে অন্য কি এব ঝড় উঠছে।

বাইরে এর-ওর সঙ্গে ঝগড়ার খবরও আসে। সেদিন ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি শালে বসে ...ল ঝগড়া করেছে ইস্কুলের ব্যাপারে, কালী ঠাকুরপোকেও দেখতে পারে না আজকাল।

ঘরেও দেখেছে কদম, বদলে গেছে মানুষটা। সরে গেছে অনেক দূরে এ বাড়ির জীবন-...ত্রা থেকে।

নিজের মনের শূন্যতা তবু এতদিন ওকে কেন্দ্র করে ভুলেছিল। তারই মাঝে ঝড় উঠেছে মনে।

কেমন অতি বড় দুঃখের মাঝে বাঁধন ছেঁড়ার ঝড় জেগেছে। ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনে সে ...খেছে মিষ্টিকে, দেখেছে প্রীতিকে—ওদের মনের সুর মিশেছে তার মনে—একজনকে কেন্দ্র ...রে মনের গহনে সে-ও কি এক দুর্বার স্বপ্ন দেখেছিল তার সব ব্যর্থতার মাঝে। মাঝে মাঝে ...ন চেয়েছে বিদ্রোহী হতে, ব্যর্থ বঞ্চিত মন ভোগের দুর্বার কামনায় অতন্দ্র রাতে মেতে উঠেছে, ...পসাড়ে কবে যেন এগিয়ে যেতে চেয়েছে অভিসারে; সেই সন্ধ্যারাত্রের কথা ভোলেনি, ...তিকে অশোকের ওখানে দেখে ফিরে এসেছিল কি এক অপরিসীম বেদনার জ্বালা নিয়ে। ...ড়ে ফেলে দিয়েছিল কদম রাগ আর অভিমানে তার সামান্য সেই প্রীতির চিহ্ন কাজলদিঘির ...ন জলে রাত নির্জনে। ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল তার সব দুরাশার অশান্তি—কিন্তু পারেনি। ...ক বোঝাতে চেয়েছে—বামন হয়ে চাঁদ ধরার কল্পনা।

দূর থেকেই চাঁদকে দেখতে চায়—মাখতে চায় তার হিমসুরভিত আলো সারা অঙ্গে অঙ্গে। ...ছ থেকে পেতে গেলে অনেক জ্বালা।

তাই অশোককে ঘিরে যে স্বপ্ন—তা মনের অতলেই লুকিয়ে রেখে দিন কাটিয়েছে কদম। হেসে কথা বলেছে ওর সঙ্গে, যে মুহূর্তে গহন নির্জনে সেই ব্যাকুল মন ঠেলে উঠতে ...য়েছে,—সরে এসেছে কদম-বৌ। রহস্যময়ী কোন আদিম নারী। শিউরে উঠেছে মনের এই ...ল্ল প্রকাশ-বেদনায়, কেঁদেছে অন্তরালে। কেঁদেছে শুধুই।

তাই প্রীতির বিয়ের খবরে খুশিই হয়েছিল সেদিন। অশোককে প্রশ্ন করে,—তাহলে বিয়ে ...বে না?

হাসে অশোক,—এখনও ঠিক করিনি।

ওর দিকে চেয়ে থাকে কদম। স্তব্ধ দুপুরের ম্লান রোদ গড়িয়ে পড়েছে আতা গাছের সবুজ ...য়ে, কোথায় বাঁশ বনের ছায়াঘন অন্ধকারে শালিখ পাখি কিচমিচ করছে।

বাতাসে আতা ফুলের তীব্র মদির সৌরভ শান্ত গ্রামসীমায় কি এক বিষণ্ণতার আভাস ...ন। বলে ওঠে কদম,

—সেই ভাল। বিয়ে না করাই ভাল।

অশোক ওর দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত হয়ে বলে,

—কেন? তুমি কি এই কথা বলো?

কদম চমকে ওঠে, ওর কালো দুচোখের চাহনিতে সেই অধরা নারীর ব্যাকুল কান্না যেন নীরব ফুটে ওঠে, অজানতেই কেমন অসতর্ক মুহূর্তে চকিতের জন্য হারিয়ে ফেলে নিজেকে কদম। বলিষ্ঠ যৌবনপুষ্ট দেহের নিঃশেষ মাদকতা প্রকট হয়ে ওঠে। অশোকও চমকে উঠেছে ওকে ...ন রূপে দেখে।

একটি মুহূর্ত। সারা জীবনের চরম প্রকাশের কয়েকটি বিশেষ সন্ধিলগ্নের একটি।

উঠে গেল কদম। উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। এড়িয়ে গেল—সরিয়ে নিয়ে গেল নিজে ওর সদ্যজাগ্রত কোন দৃষ্টির সামনে হতে।

চমকে উঠেছে ঘরের মধ্যে আরশিতে নিজের মুখখানা দেখে। এ যেন অন্য কোন কদম- একে নিজেও চেনেনি সে এতদিন। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে। বাড়ি ঘর স্বামী, কত কামনা - সব কিছুর বাধা ভেদ করে এ যেন ক্ষণে ক্ষণে ঠেলে উঠতে চায়।

ডুকরে কাঁদতে চায়। পারে না।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল জানে না কদম, বের হয়ে আসে। বৈকালের আলো নেমে ঘরের চালে। পাখির ডাক থেমে গেছে।

উঠানে অশোককেও দেখতে পায় না। কখন চলে গেছে অশোক। যাক্।

ক'দিন তারপর দেখাই করেনি কদম। বাইরের দিকে ওর গলা শুনেছে—ঘরের হয়নি।

ভুবন হাসে,—কলা-বৌ হবি নাকি অ্যাঁ? শোন।

—কাজ আছে।

কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে নিজেকে। মনে হয়েছে জোর গলায় শুনিয়ে অশোককে,—তুমি এ বাড়ির ভেতর আর এসো না ছুটবাবু।

কিন্তু পারেনি। ভয় করেছে; কি যেন হারাবার ভয়; ভুবন এ খবরও রাখেনি।

তাই সেদিন মিথ্যা ওই কলঙ্কের কথায় ভুবনকে চটে উঠতে দেখে রেগেছিল কদম। গো আদালতে স্বীকার করেছে—কদমের সঙ্গে তার ঘটনা আছে। চোরা গোকুল—আর তাই ভু বিশ্বাস করে নিয়েছিল।

কদম সেদিন দেখেছিল ভুবনের ভালবাসার পরিমাণ।

লোকটা খায়নি সারাদিন, ঠায় বসেছিল। চটে উঠছিল দারুণভাবে কদমের উপর।

চুপ করে সয়েছে সেই দারুণ অপমান। ভুবনের কাছে সেদিন নির্দোষিতা প্রমাণ করে সাধু বজায় রাখতে চায়নি—কি হবে ওকে কৈফিয়ৎ দিয়ে!

অশোক ওর দিকে চেয়েছিল। কেঁদে উঠেছিল কদম-বৌ।

—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি ছুটবাবু।

অশোক বলে ওঠে শান্ত কণ্ঠে,

—থাক। জানি ওসব মিছে কথা। তুমি শান্ত হও কদম।

কদম জলভরা চোখে সেদিন ওর কাছেই নির্দোষিতা প্রমাণ করতে দাঁড়িয়েছিল।

কেমন যেন মনের সেই বিচিত্র গতিপ্রকৃতির খবর জানতে পারেনি বিচিত্র রহস্যময়ী নারী। ভুবন হয়তো ভুলেছে সে কথা, আবার মেতে উঠেছে নিজের কাজে। তবু কদম ক্ষ করতে পারেনি তাকে।

কদম ক্রমশঃ দেখেছে ভুবন কেমন নীরবে তাকে অবহেলা অগ্রাহ্য করে চলেছে কি মোহে, দর্শের আকর্ষণে সে ঘরের মায়া ভুলেছে।

বুড়ো অতুল কামার গজগজ করে।

—কুথা থাকে সে শালো—ও বৌ?

—জানি না। কদম ছোট্ট করে জবাব দেয়।

—অ। শালোর যেন কিঁ মনে আছে কে জানে। পয়সার নেশা লেগেছে উকে—দুগ্‌গোপুরের কলে যাবেক নাকি শেষতক—হ্যাঁ বৌ?

—কি করে বলবো?

কদমও ঠিক জানে না। তারও ভয় হয়।

গ্রামের সেই জীবন কেমন বদলে যাচ্ছে। কেমন বদ্‌হাওয়া লেগেছে, সবাই যেন ওই দুর্গাপুরের আলোর দিকেই চেয়ে আছে। এ বাড়ি, ও বাড়ি—এ পাড়া, ও পাড়ার অনেকেই চলেছে—গেছেও অনেকে।

কেমন ফাঁকা হয়ে আসছে গাঁ। মনের ভেতরও তার একটা শূন্যতা জাগে।

রাতেও সেদিন জেগে রয়েছে কদম। ঘুম আসে না।

ডাকছে ভুবন। কড়াটা নাড়ছে। এখন ফিরছে বোধহয়।

চমকে ওঠে হঠাৎ ওই কড়ানাড়ার শব্দে। উঠে যায় পিদিমটা জ্বেলে।

ঘরের মধ্যে নীলাভ ম্লান আলোটা জ্বলছে। কেমন ঘুমজড়ানো অলস একটা পরিবেশ।

দরজা খুলে দেয়। হঠাৎ ভুবনকে দেখে চমকে ওঠে।

—এতরাতে ফিরছ যে?

হাসছে ভুবন। ওর মনে অন্য জগতের স্বপ্ন। পাকাবাড়ি, বিজলীবাতি—মাস মাইনে। মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। সারা শরীরে সেই উদগ্র কবোষ্ণ অনুভূতি।

এগিয়ে আসে। কদমের দিকে চেয়ে থাকে নেশা ভরা চাহনিতে। আদুড় গা—নিটোল পুরুষ্ট দেহে লেগেছে প্রদীপের নগ্ন কামনাময় আলো।

কদমকে কাছে টেনে নেয়।

পিদিমের শিয কাঁপছে রাত নির্জনে। ওরই উত্তাপ ভুবনের দেহে। বলিষ্ঠ মদিরবন্ধনে পিষে ফেলতে চায়।

চমকে ওঠে কদম।

ওর দুচোখের চাহনিতে কেমন লাল হিংস্র চাহনি, মুখে সেই বিশ্রী গন্ধ। কদম আর্তনাদ করে ওঠে।

—মদ খেয়েছ?

কথার জবাব দেয় না ভুবন। দুর্বার আক্রমণে আজ নতুন ভুবন ঘোষণা করতে চায় তার নবজাগ্রত পৌরুষের দখলনামা।

শিউরে ওঠে কদম-বৌ—ছাড়! লাজ লাগে না! ছিঃ ছিঃ।

—লাজ! গজরাচ্ছে ভুবন।

সমস্ত শক্তি দিয়ে আজ সে পিষে ফেলতে চায় কদমকে। সে শুধু ভোগ করতে চায়—দখল জানাতে চায়।

—সরে যাও।

অসহায় নারী চীৎকার করতে থাকে—প্রতিবাদের চীৎকার। ওর মুখটা টিপে ধরেছে ভুবন ছিটকে পড়ে দুর্বার আক্রমণে স্তব্ধ পরাস্ত কদম-বৌ। কাঁদছে অসহায় কান্না।

পিদিমটা নিভে গেছে। আবছা অন্ধকারে ভুবনের দুটো চোখ জ্বলছে বুভুক্ষু জানোয়ারের মত—নীলাভ দীপ্তিতে। অন্ধকারে সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

অসহায় কদম-বৌ শিউরে উঠেছে আতঙ্কে—ঘৃণায়।

নিদারুণ বিজাতীয় সেই ঘৃণা। কেমন অবশ হয়ে আসে সারা দেহ। চোখের উপর নেমে আসছে পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার।

কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখি।

ভোর হয়ে আসছে। বাইরে এসে দাঁড়াল কদম, ঘরে থাকতে যেন ঘৃণা আসে। তখনও অসাড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে ভুবন।

ওর দিকে চাইতেও কেমন লজ্জা পায় কদম-বৌ।

মদ খেতে ওকে দেখেনি, আজ দেখে ভুবন ধাপে ধাপে কোথায় নেমে চলেছে। এ যেন তার নিজেরই অতিবড় পরাজয়।

সকালের আলোটুকুও কেমন আঁধারে ঢাকা। অতুল কামার তখনও কাস্‌ছে—খক্ খক্ খক্

জীবনরত্ন টাকাগুলো এনে মণিমালার হাতে তুলে দেয়।

রাত হয়ে এসেছে। থমথমে আঁধার ঢাকা বাড়িখানা বুকচাপা স্তব্ধতার অতলে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। ভাঙ্গা দেউড়ি আজ শুধু খসে খসে পড়ছে—চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে ইঁটের স্তূপ। দরজাভাঙ্গা সারি সারি ঘরগুলো আগে আমলা ফৈলা-দরওয়ানদের কলরবে ভরে থাকতো—আজ সেখানে চামচিকে আর বাদুড় বাসা বেঁধেছে ওর পায়ের শব্দে আঁধারে ওরা বিরক্তিভরে উড়ে গেল, বাতাসে একটা চিমসে বদগন্ধ ওঠে।

জীবনরত্ন ওই পথ দিয়ে উঠে এসেছে অন্ধকারে। দোতলার ঘরে বাতিটা জ্বলছে। তারকরত্নের মহলে আলো নেই, সকাল সকালই শুয়ে পড়েছে সে।

মণিমালা জীবনের দিকে চেয়ে থাকে। শুকনো কণ্ঠে জীবন বলে ওঠে,—রাখো টাকাগুলো

অনেক কষ্টের টাকা। জীবন আজ বহুমূল্য দিয়ে ক্রমশঃ নতুন করে অনুভব করছে সব কিছু। এমন দিন গেছে যেদিন ওই টাকা একদানে জুয়োর বাজিতে এড়েছে। হার-জিতের কথাও ভাবেনি।

ছিটিয়ে দিয়েছে এক রাতে শহরে কোন বিশেষ এলাকায় স্ফূর্তি করতে গিয়ে। এখানেও বাউরীপাড়ায় স্বৈরিণী লাবি বাউরীকেই কিনে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকার ঝুমকো শাড়ি। আরও কত জনকে।

আজ মনে হয় সেই সব বেহিসেবী খরচাগুলোর জবাব পাচ্ছে। রুগ্ন মেয়েটি বিছানায় মিলিয়ে গেছে—ওষুধ নেই, পথ্য বলতে মিছরি আর সামান্য গ্লুকোজ—না হয় পানুর দোকানের একটু বার্লি।

তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে আসছে তার জীবনীশক্তি। মণিমালার দিকে চাইতে পারে না। সুন্দরী রূপবতী সেই মেয়েটি আজ কি এক চরম নিগ্রহ সইছে মুখ বুজে।

—কোত্থেকে আনলে এ টাকা?

মণিমালার কণ্ঠে কেমন যেন চাপা আতঙ্কের ছায়া। স্বামীকে সে কিছুটা জানে। এই অন্ধকার রাত্রে টাকা আনার পিছনে কে জানে কি ইতিহাস লুকোনো রয়েছে। তাই এ আতঙ্ক ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে।

জীবনের অন্তরের সেই বেদনাটা সে হয়তো বোঝে নি।

হাসে জীবন। মলিন ক্লিষ্ট একটু হাসি। জবাব দেয়,

—ধার করে আনলাম। শোধ দিয়ে দোব।

—শোধ দেবে?

মণিমালার কণ্ঠে সংশয়। ওরা ধার করে—করেছেও। কিন্তু শোধ কাউকে এতাবৎ দেয় নি। কারও প্রতি কোন কৃতজ্ঞতার ঋণও দেয়নি ওরা।

জীবন চুপ করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে,

—বিশ্বাস হল না কথাটা?

—না তা নয়।

বলে ওঠে জীবন,—না হবারই কথা। কিন্তু এবার থেকে বিশ্বাস করতে পারো আমাকে, মণি।

মণিমালা কথা বলে না।

রাত্রি নেমেছে। ঘন আঁধার ঢাকা রাত্রি। জানলা দিয়ে চোখ মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। আঁধার আকাশ-সীমা লাল হয়ে উঠেছে আলোর আভায়। দুর্গাপুরের আকাশ বাতাস ঝলসে উঠেছে আলোয়। বাতাসে ভেসে আসে যন্ত্রপাতির গুরুগর্জন।

কি ভাবছে জীবন। কথাটা ক'দিন থেকেই ভাবছে। আজ ওই টাকাগুলো এনেছে—নীরব কোন শপথ জেগে ওঠে মনে। মণিমালাও মনে মনে তাকে অবিশ্বাস করে। পানুও করে—মুখ ফুটে বলেনি। এ সবের জবাব সে দেবে। পথের নিশানা যেন সে পেয়েছে ওই আঁধার-ভাঙ্গা আলোর ইঙ্গিতে।

মিষ্টি ওদের দেখেছে। গ্রামের অনেককে। ওরা যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে গাঁ ছেড়ে ওই নতুন শহরের টানে। সনাতন—গঙ্গাঠাকরুণ গেছে। গেছে বাউরী কাহার পাড়ার অনেকে। এতকালের জীবন, কাজ, মুনিষ মাহিন্দারি ছেড়ে সবাই যেন রাতারাতি অন্যভাবে বাঁচতে চায়। তাই ছুটেছে।

আলোর টানে যেমন ছোটে গঙ্গাফড়িং প্রজাপতি, তেমনি ছুটে চলেছে ওরা।

ছানু দাস আজকাল অনেক ভদ্র হয়ে উঠেছে। তেমন গায়ে গতরে মুনিষ মাহিন্দারের মত না খাটলেও চলে, তাই ধুতির উপর একটা ফতুয়া পরে সাইকেল হাঁকিয়ে চাষবাস—কাজকর্ম—আদায়ওয়াশিল—দোকানের বকেয়ার তাগাদা দিয়ে বেড়ায়। শুকনো কাঠির মতো হাড়ের উপরও মাঁস গজিয়েছে। একটু মাংস চর্বি দানা বেঁধেছে লম্বা তেড়ঙ্গা কাকতাড়ুয়া ওই ছানুর দেহে।

দোকানের বাইরে বসে সেদিন মণি দত্ত, অবনী মুখুয্যে, বিধুবাবু—অনেকেই জটলা করছে। ও জায়গাটা এখনও সেই আগেকার অবস্থায়ই রয়েছে।

সতীশ ভটাচাযকে আসতে দেখে ছানু গড় হয়ে পেন্নাম করে।

—আসুন ভটচায মশায়।

সতীশ গম্ভীরভাবে কুলঝাঁটি ভরা ঠ্যাংটা তুলে একটা চেয়ারে বসল। অবনী মুখুয্যে একটু ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। দেখছে সতীশকে।

এই ডামাডোলের বাজারে সতীশ ভটচাযও গুছিয়ে নিয়েছে। সেই লক্ষ্মীপুজো ষষ্ঠীপুজো তন্ত্রধারকবৃত্তি ছেড়ে সতীশ নিয়েছে ভৃগুসংহিতা, সামুদ্রিক জ্যোতিষ আর করকোষ্ঠী বিচার— আর তেজিমন্দার খবর বলার ব্যবসা। বরাত ফেরানো পাল্লাপাল্লির দিকে ওই ঠিকাদার— দুর্গাপুরের নতুন আড়তদার ব্যবসায়ীদের মনের অতলের খবরটা জেনেছে, ওদের দুর্দম লোভ আর লুণ্ঠনের লালসায় সে ঘৃতাহুতি দেবার পথটাই বেছে নিয়েছে এবং পেরেছেও কিছুটা গুছিয়ে নিতে।

তাই তার বরাতও বদলেছে। পানু তার প্রথম শিষ্য। তার মারফৎই ওর যশসৌরভ বিকীর্ণ হয়েছে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সদরের মাড়োয়ারী মহলে—দুর্গাপুরের লুণ্ঠনযজ্ঞের ঋত্বিকদের কাছেও।

পরনে লাল গরদ, কাঁধে চাদর, কপালে রক্ত চন্দনের টিপ, গলায় পদ্মবীজের মালা একছড়া। পায়ে শুঁড়-তোলা পণ্ডিতী চটি। বলে চলেছে সতীশ ভটচায,

—একবার দুর্গাপুর যেতে হবে ছানু। মোহনদাস মাড়োয়ারীর গদিতে। ওখান থেকে খাগেড়িয়ার মোকামে।

ছানু বলে ওঠে,

—আজ্ঞে বাস এল বলে, আর সেকাল তো নাই যে দিন গেলে দুখানা ছ্যাকড়া গাড়ি, তাও নামিয়ে দিলেক লদীর এপারে—সাঁয়া নদী বালি জল পেরিয়ে ভুবনপুরের মাঠে পরান হাতে করে যাও কোশটাক—তবে দুর্গাপুর। এখন তো চাপলাম কি নামলাম একেবারে দুর্গাপুর বাজারে। দিন একেবারে বদলে গেছে কাকা।

সতীশ ভটচায পা নাচাতে নাচাতে রাস্তার দিকে নজর রেখে গম্ভীর ভাবে সায় দেয়,—তা ঠিকই বলেছিস বাবা।

অবনী মুখুয্যে বলে ওঠে,—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। নাহলে—

ওর কথাটায় যেন কানই দেয় না কেউ। অবনীর সেই প্রতাপ কোথায় হারিয়ে গেছে। সূর্যের তাপে তাতা বালির মত তারা ছিল তারকরত্নকে ঘিরে—গ্রামের সবই চালাতো তারা। আজ কোথায় সেই দিন বদলে গেছে, অনেকেই মাথা তুলছে, স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছে, বাকি যা কর্তৃত্ব করবার আছে তার বেশিরভাগই ছড়িয়ে গেছে—খানিকটা পেয়েছে পানু দাস, বাকিটুকুও পাবার আশা করছে সেই-ই।

সতীশ ভটচায বলে ওঠে,—হ্যাঁরে ছানু, ইট কিছু কিনতে হবে।

—ইট। কেনে? ছানু কেন, অবনীও অবাক হয়। খেতে জুটতো না সেই পোটো ঝাড়া বামুন, আজ চালের খড়-এর ভাবনা নয়, ইট কেনার ভাবনা ভাবে।

বলে ওঠে ভটচায,

—একটু ঘর তুলতাম রে। বাইরে থেকে দু'পাঁচজন ভক্তশিষ্য আসতে চায়। বসাই কোথায় তাদের? সেদিন মোহনদাসকেও কথাটা বললাম। তা মোহনদাস—খাগেড়িয়া—ঝুনটলাল—ওরা সবাই তখুনি রাজি হয়ে গেল—গুরুজীর মোকাম বানাতে হবে।

—তাই নাকি? মণি দত্ত কথাগুলো গিলছে।

চুপসে গেছে অবনী, মনে মনে গজরাচ্ছে অসহায় আক্রোশে।

বলে ওঠে সতীশ,

—শুনছিলাম বড়বাবু—আমাদের তারকবাবু নাকি কিছু পুরানো ইট কাঠ বিচবেন, হ্যাঁ হে অবনী?

অবনীর হাতের সেই 'যুগান্তর' কাগজও আর নেই। তারকবাবু কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তবু এতটা অসহায় ভাবতে পারে না তারকবাবুকে। অবনী জবাব দেয়,

—তা একদিন গিয়েই না হয় জিজ্ঞাসা করো তাকে ভটচায। আগে তো ওখানেই পড়ে থাকতে, খেয়েছও ওদের অনেক।

সতীশ ভটচায উঠে পড়ল, ও প্রসঙ্গ যেন মোটেই শুনতে চায় না সে। বলে ওঠে,—যাদের ভাবনা তারাই ভাবুকগে অবনী। দুগ্‌গা দুগ্‌গা। যাই, বাসের আর দেরি নাই।

পায়ের কুলআঁটিগুলো বোধহয় সদরের ডাক্তার দিয়ে ভাল করিয়েছে। এখন বেশ সোজা হয়েই হাঁটে সতীশ ভটচায, পা টেনে চলতে আর হয় না।

অবনী ওর দিকে চেয়ে থাকে। যেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলে চলেছে একটি নতুন মানুষ। সত্যের অতীত যাকে স্বীকৃতি দেয়নি—মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার ভবিষ্যৎ তাকে বরণ করে নিয়েছে। তার অসার মিথ্যাভাষণের কাঞ্চনমূল্য দিয়েছে।

হঠাৎ মিষ্টিকে আসতে দেখে জায়গাটার রূপ একটু বদলে যায়। এখনও সে যেন তেমনিই রয়ে গেছে। সেই লাস্যময়ী নারী। চুলগুলোতে পাকও ধরেনি, বাঁধনও তেমনি অটুট। পরেছে নীলাম্বরী শাড়ি, সদ্যস্নান সেরে মাথার চুলগুলো রোদে শুকোবার জন্য খুলে রেখেছে।

—মুখুয্যে মশায় যি গো? হ্যাঁ। যেছি একটু মূল গায়েনের বাড়ি। মুড়ি দিতে।

ছানুই বলে ওঠে,—সবাই দুগ্‌গোপুরে যেছে, তা হ্যাঁরে তুই যাবি না? কারিগরকে বল—গেলেই তো চাকরি উর বাঁধা।

হাসে মিষ্টি,—কারিগরের কথা কারিগর জানে।

—আর তুই!

হাসে মিষ্টি। সুন্দর নাক মুখ চোখ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। জবাব দেয় মিষ্টি,

—শহরকে দেখেছি ছানু। কোলকাতা, বর্ধমান—অনেক শহর। উথে আর শখ নাই। উ নেশা তুদের পেথম ছানু, তুরোই যা।

দাঁড়াল না মিষ্টি, মুড়ির ডালাটা নিয়ে চলে গেল শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে। হাসছে ছানু।

—কথায় পারবার যো নাই উটিকে।

সব চিন্তা যেন ওদের তালগোল পাকিয়ে যায়। অবনী মুখুয্যে সেই ধুয়োতে ফিরে আসে।

—তাহলে এবার চায-আবাদের কি হবে?

মণি দত্ত ভাবছে কথাটা,—সত্যিই মহা মুস্কিল হল গো। মুনিষ মাহিন্দর তো আর কেউ থাকতেই চায় না।

ছানু বলে ওঠে,—থাকবেক কেনে? দুগ্‌গাপুর! ওই যে মিষ্টি ঠিকই বলেছে। দুগ্‌গাপুরের নেশা। দিন খাটলেই আড়াই টাকা রোজ। থাকতে খুপরিও দিছে—কে আর রোদে জলে মাঠে গরুবাছুরের সঙ্গে খাটবেক বলো?

—তাহলে কি চাষ হবে না? অবনী মুখুয্যের দল এবার সমস্যায় পড়েছে।

কমজোরী চাষী তারা—তায় আবার বামুন চাষী। পরের হাতে হাল লাঙল সবকিছু। নিজেদের খাটবার সামর্থ্য নেই। মধ্যস্বত্ব—সাজা ধান আদায় এতদিন ছিল, তাই দিয়েই বাইরের ঠাট বজায় থাকতো। তার ওপর খাসহালে সেই দাপট আর প্রতিষ্ঠার জোরে মুনিষ দিয়ে চাষ আবাদ করাতো।

এখন বাইরের সেই রোজকার যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। এখন আর মুনিষ মাহিন্দারও মেলে না। চলেছে সব গ্রাম ছেড়ে।

অবনী বলে,—ব্যাটাদিকে উৎখাত করে দোব, ভিটেছাড়া করবো।

নীলাম্বরবাবুও যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে, ওদের কথা শুনে দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা তিনিও ভেবেছেন। সারা গ্রামের সব জমি চাষ হবে না—অনেকেই চলে গেছে, কারখানায় কাজ পেয়েছে, না হয় ঠিকাদারের কাছে।

ওর কথায় হাসেন তিনি,—ও ভিটে তো ওদের নামেই সেটলমেন্ট হয়ে গেছে। ছাড়াবার মালিক আর তুমি নও অবনী। তাছাড়া মনে হয় ও মাটির তোয়াক্কাও তারা করে না আর।

—তবে? অবনীও কথাটা বুঝতে পারে।

—সেটা আমাদেরই ভেবে বের করতে হবে। জমি চাষ করা দরকার।

নীলাম্বরবাবুর কথাটা তারাও ভাবছে। কোন রোজগার নেই, জমির উৎপন্নই ভরসা। সেই জমি অনাবাদী পড়ে থাকলে তাদের অবস্থাও কোনখানে দাঁড়াবে কে জানে! অবনী বলে ওঠে,

—একটা সুরাহা না হলে সমূহ বিপদ।

—তা তো বটেই। সায় দেন নীলাম্বরবাবু।

ছানু দাস কথাটা তত বেশি ভাবেনি। সে জানে যেমন করেই হোক তার মুনিষমাহিন্দার জুটবেই। লোকজন দিয়ে চাষ করিয়ে নেবে। বরং অভাব অনটন একটু বাড়ুক গ্রামে—মধ্যবিত্ত ওই মুখোশধারী লোকগুলোর এতদিনের দাপট কমবে, মাথা নীচু করে আঁধার রাত্রে আসবে তারা—ছানু দাস টাকা ধার দিয়ে বিক্রি কোবলা লিখিয়ে নেবে।

হাঁ, তামাম গ্রামের আধখানা জমি আবার নামে বেনামীতে সে গ্রাস করবে। মনে মনে ওদের অবস্থাটা কল্পনা করে খুশিই হয়।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন,

—বিপদ কালে অর্ধেকও ত্যাগ করতে হয় দরকার বুঝে।

—তা সত্যি। মণি দত্ত কথাটার সায় দেয়।

—ভেবে দেখো, একটা পথ বের হবেই।

—কিন্তু ইদিকে, যে বৈশাখ এসে যাবে। আদ্দা ভাঙ্গা-জমি চযা, বীজ ফেলা, নানা ঝামেলা, আগে থেকে ব্যবস্থা না হলে?

অবনী আজ সত্যই বিপদে পড়েছে। তারকবাবুর এসব দিকে মন নেই, কেমন একেবারে বদলে গেছে লোকটা, বাজপড়া তালগাছের মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেছে।

তাকে ভরসা করা যায় না। ধরণী মুখুয্যে টাকে হাত বুলোয়।

মণি দত্তই বলে,—দেখুন, না হয় একবার যাবো আপনার কাছে পরে।

—এসো।

নীলাম্বরবাবু চলে গেলেন।

ওরা তখনও বসে আছে। বেলা বেড়ে চলেছে।

শীত চলে গেছে। আসছে উষর প্রান্তরে খররৌদ্রের বিভীষিকা—সারা মাঠ জুড়ে অসীম শূন্যতার মাঝে ধূসর রোদ আর রোদ। লি লি কাঁপছে রোদের লেলিহান শিখা—সব সবুজ ঘাসগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

বুক জ্বলছে মাটির—ধরিত্রীর কোন দুঃসহ বেদনায়।

কদিন বাইরে বাজাতে গিয়েছিল অবিনাশ। সদরে কোন বিয়ে বাড়িতে। সবে ফিরেছে আজ সকালে।

সঙ্গে এনেছে অনেক কিছু। মিষ্টি ওকে দেখে এগিয়ে যায়।

—ওই মুল গায়েন যি গো? ধোঁয়ায় যে ধোঁয়াকার করে ফেলাইছ?

মিষ্টিকে দেখে মুখ তুললো অবিনাশ। সবে বাড়ি ফিরে চা বসিয়েছে উনুনে।

মিষ্টির কথা শুনে ওর দিকে চাইল। ঘন ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে ও এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে নীল শাড়ি, আদুড় গা ঢেকেছে ওর আঁচলে। মুখে মিষ্টি হাসি, কপালে কাঁচপোকার টিপটা ওই সুন্দর মুখের হাসিটুকুকে রঙ্গীন বিচিত্র করে তুলেছে। অবিনাশ ওকে দেখে খুশি হয়।

—ওই মিতেন যি গো।

হাসে মিষ্টি।

—তা চোখ যে জলে ভরে উঠেছে। কার শোগে?

—ভিজে কাঠ উনুনে দিয়ে চোখের জল মুছছি ভাই।

অবিনাশ জবাব দেবার চেষ্টা করে।

মুড়ির ডালাটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসে মিষ্টি।

—সর দিকি, কতবার বললাম একটা মানুষ আনো, মনের মানুষ।

নিজেই ফুঁ দিতে থাকে উনুনে। অভ্যস্ত ফুঁ—উনুন জ্বলে ওঠে সহজেই।

—দেখলা?

হাসছে অবিনাশ,—মনের আগুন উনুনে লেগেছে।

মিষ্টি জবাব দেয় হাসির ছোঁয়া এনে,

—কারও বুকে লাগাতে লারলাম, তাই উনুনেই লাগল। সরো, চা দুধ আনো দিকি, বানিয়ে দিই। তা কদিন কোথায় বায়না ছিল?

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে ওই প্রশ্নে।

মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়ে কোথায় সুদূরে যেন সে হারিয়ে যায়। ও ঐকটি সুরের রেশের মতই দূর থেকে শুধু মন ছুঁয়ে যায়, কাঁপিয়ে যায় সারা মন কি এক হিল্লোলে—কাছে থেকে ধরা ওকে যায় না। অবিনাশ তাই যেন দূরে থেকেই ওকে দেখে।

রংটা ফর্সা—উনুনের কাঠের আগুনের তাপে একটা দিক লালচে হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোও ডাগর—বেশ টানা টানা। কথার সহজ ভঙ্গীটুকুতে মনের একটা মিষ্টি সুর ঝরে পড়ে।

অবিনাশ বুঝতে পারে না—কেন সে তার নিজের পাড়া ছেড়ে এইখানে এসে ঘর বেঁধেছে। ঠিক তার বাড়ির পরিবেশটাই এড়িয়ে এসেছ—না কারো সান্নিধ্য পাবার কামনাও ছিল মনে মনে?

অবিনাশ এবার শহরে একেবারে সাহেব সুবোদের মন ভরিয়ে এসেছে সুর দিয়ে।

এখনও সেই আনন্দের রেশ তার মনে।

কথাটা তাই মিষ্টিকে শোনাতে চায়।

—বুঝলি স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট তো উঠে এসে আসরের সামনে বসলেন। আরও কত মহাশয় লোক। শোনালাম দরবারী—তারপর ললিত—শেষকালে ভৈরবী ঠুংরী। একেবারে বন্দেজী জিনিস, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ঘরের সেই ঠুংরী,—বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়। বিলম্বিত থেকে মধ্য লয়, তার পর দ্রুতে এসে সোম। আহা!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মিষ্টি ওর দিকে।

মাঝে মাঝে তার মনে কেমন যেন ঝড় ওঠে। সেই আগেকার দিনগুলো ফিরে আসে। অবিনাশ সেই আলো আর সুরের দেশের মানুষ।

অবিনাশ বলে চলেছে,—সেবারই কলকাতায় বড়ে গোলাম সাহেবের গান শোনলাম মিতেন। আহা! কি জিনিস! তেমনি ঠুমরী। গজলের কিছু মিশেল আছে কিন্তু সাফ্ দিলমাতানো জিনিস। তুলেছি, বারবার সাধছি মিতেন। বাইরে এখনও শোনাই নি। ইবার কলকাতায় গিয়ে প্রথম শোনাবো—শোনবা তুমি?

গুন গুন করতে থাকে সুরটা। ক্রমশঃ সানাই-এ ফুটে ওঠে সেই সুর। অবিনাশ বাজিয়ে চলেছে ঠুমরীর করুণ সুর।

আওয়ে না কালম্,
ক্যা করু সজনী।।
তড়প্ত জিয়া মোর
উনো বিনা তড়পে।
আওয়ে না বালম্।।

মিষ্টি ওই কথাগুলো বুঝতে পারে। অনেক দিন সে শুনেছে ওই সুর। গৈরিক প্রান্তর—রোদপোড়া শালমহুয়ার বন—ওই তামাটে দিগন্তসীমা কোথায় হারিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্যামসবুজ একটু স্বপ্নস্পর্শ। তারই মাঝে পুঞ্জীভূত শ্যামলিমার মত জেগে উঠেছে

অবিনাশের মুখখানা—দুচোখে কোন মায়ামদির নীলাঞ্জন রেখা। তবু কোন কিছুতেই তার দাবি নেই। সব হারিয়ে যাবে!

—কি হল মিতেন?

অবিনাশও চমকে উঠেছে। কেটলির জল উপছে পড়ছে উনুনে। গরম জল। অপ্রতিভ হয়ে ওঠে মিষ্টি,—এই যাঃ।

তাড়াতাড়ি কেটলিটা নামিয়ে কাপে ঢালতে থাকে মাথা নীচু করে। অকারণেই গায়ের কাপড়গুলো ঠিক করে নেয়—কেমন লজ্জা ছেয়ে আসে সারা দেহে। বলে ওঠে অবিনাশ,

—একটা জিনিস ছিল মিতেন; উ আর আমার কি কাজে লাগবে? তুমিই নাও।

—কি গো? মিষ্টি প্রশ্ন করে।

অবিনাশ ঘরের ভিতর থেকে প্যাকেটটা এনে দেয়।

—ওখানে বাজনা শুনে বকশিস দিলেন এক বাবু, ভালো বিষ্ণুপুরী শাড়ি। তোমার জন্যেই নিলাম। ধবো।

খুশিতে ফেটেই পড়ে মিষ্টি।

—ওমা ! ই যে খাসা গো! ঢের দাম লাগছে।

—দামী লোকই পরবে। জবাব দেয় অবিনাশ।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্‌কাদার শাড়িটা দেখতে থাকে মিষ্টি। দুচোখে ওর খুশির আভা। হাসছে অবিনাশ। তার আনন্দের ভাগ আর একজনকে দিতে পেরেছে এই খুশিতে।

—চলি মিতেন, বেলা হয়ে গেল।

চলে গেল মিষ্টি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অবিনাশ।

মনে আসে গুনগুনানি সুর। রুক্ষ বন্ধুর রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের বুকে যেন শ্যামল ছায়া নেমেছে—দূর দিঘির টলটলে জলে হাজারো মানিকের ঝলঝল আভা।

কথাটা কিছুদিন থেকে কারিগরও ভাবছে।

লোকটা চুপ করে থাকে—কথাবার্তা বলে কম। এতদিন ধরে দেখে আসছে মিষ্টিকে। তবু মনে হয় ওই দিঘির কালো অতল জলের মতই ছন্দময়ী রহস্যময়ী কোন নারী। মেঘ জমলে ছায়াকালো হয়ে আসে দিঘির জল—একটু তারার আলোও স্পর্শ বুলোয় তার বুকে—সূর্যের আভায় ঝলমল করে ওর সারা অঙ্গ।

মিষ্টিও যেন ওরই জাত। তবু ওর বুকের তলের খবর থাকে অজানা।

কারিগর দেখছে গ্রামের সেই শান্ত অলস জীবন-যাত্রার গতি বদলে গেছে। আগেকার সেই সামান্য নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্ন ওদের মন থেকে মুছে গেছে। অভাব সহ্য করেও চুপ করে থাকে না, আজ তারা তাই বের হয়েছে বাইরে ওই দুর্গাপুরের কারখানার দিকে।

বহু যুগ হতে তাদের বুকে চেপে বসেছিল যে ঘরের নেশা তাকে টেনে ছিঁড়ে আজ উধাও হয়েছে যাযাবরের মত। নিশ্চিন্ততা ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়িয়েছে, ঝরণা যেমন করে বনের সীমানা ছেড়ে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

এতদিন সেও বাঁধা পড়েছে মিস্ত্রির বাঁধনে। কোথাও কেউ নেই, যাবাবর মানুষটা হঠাৎ একদিন ভালবেসেছিল, ঘরও বেঁধেছিল কিন্তু আজ কেমন ঝড় ওঠে আবার মনে।

সেই ঘরের ভিত্তিমূলে কোথায় নাড়া পড়েছে। আজ ক্লান্তি এসেছে, দীর্ঘদিনের আলস্যের ক্লান্তি।

পানু দাসের কলে সেদিন ডাইনামোটা বিগড়ে গেছে, ভর্তি মরশুমে কাজ বন্ধ। ওদিকে রাশি রাশি ধান, অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে ভিজছে চৌবাচ্চায়—বেশি ভিজলে চালে গুমো গন্ধ হয়ে যাবে, তাছাড়া পেষাই কলে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে অর্ধেক চাল। সমূহ লোকসান।

পানু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সদরে, দুর্গাপুরে লোক পাঠালেও সঙ্গে মিস্ত্রি মিলবে না। মহা ভাবনা। এমন সময় কারিগরকে দেখে ছানু রসিকতা করে বলে,

—পারবা কারিগর মেসিনটা সারাতে? দিনরাত তো টুং টাং খুট খাট করো।

থমকে দাঁড়াল কারিগর। অতীতের বিখ্যাত মিস্ত্রি। কেমন যেন একটা সাংঘাতিক গোলমালের জন্য ইছাপুরের কারখানা থেকে পালিয়ে এসেছিল, আর যায়নি সেখানে কোনদিন।

অতীতের সেই ফটিক মিস্ত্রির সত্তা আবার যেন জেগে ওঠে। চুপ করে এগিয়ে যায়। যেন ওর কথাটা শুনতেই পায়নি।

—কই হে, শুধুই কারিগর তুমি! ছানু দাস কথা বলে।

থমকে দাঁড়াল কারিগর,—চল, দেখি তোমার কল।

পানু দাস বলে ওঠে,—ছাগল দিয়ে ধান মাড়াই হয় না ছানু, তা'লে বলদ কেউ কিনতো না।

কারিগর কথা বলে না। ডায়নামোটা অভ্যস্ত হাতে শ্লাই-রেঞ্চ দিয়ে খুলে ফেলে। নিমেষের মধ্যে ওর হাতে রেঞ্চের ব্যবহার দেখে পানু একটু চমকে ওঠে। জটপাকানো তারগুলো টেনে টেনে দেখে একটা প্লাগকে টাইট করে লাগিয়ে দিয়ে সুইচ অন করে স্টার্ট দিতেই মেসিন চলতে থাকে।

চলছে মেসিন। হলারটা ঘুরছে।

কথা না বলে আবার ঢাকনাটা লাগিয়ে নাটবল্টুগুলো টাইট করে দিয়ে বলে ওঠে কারিগর,

—দাসমশাই, ও ডায়নামো আর বেশিদিন চলবে না, বাজে মাল দিয়েছে তোমায়। ভিতরের মাল সব পুরোনো, জ্বলে যাবে ও তারগুলো।

পানু দাস মানুষ চেনে। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—তাহলে?

—বদলাও ওসব। তার কিনে আনো, না হয় সদরের ভাল মিস্ত্রি দিয়ে কয়েল বদলাও, রিওয়্যারিং করো।

বের হয়ে এল কারিগর। পানু কি যেন ইশারা করে ছানুকে। ওর পিছু পিছু বের হয়ে এল ছানুও।

ছানু সেই থেকেই পিছু লেগে রয়েছে। অল্প পয়সায় কাজ করানোর জন্যে অকারণেই খাতির করে; কলে নিয়ে যায়—আপ্যায়ন করে লোকটাকে।

কেমন বদলে যাচ্ছে কারিগর। ওই স্যাফটের ঘূর্ণায়মান চাকার গতিবেগ আর বিচিত্র শব্দে সেই হারানো ফটিক মিস্ত্রি জেগে উঠেছে অতীতের বিস্মরণের প্রস্তরস্তূপ ঠেলে।

জেগে উঠছে তার স্বাভাবিক সেই বৃত্তিগুলো এতদিনের পাথর ঠেলে।

তেল গ্রিজ আর লুব্রিকেটিং অয়েল-এর গন্ধ তার নাকে লাগে, প্লাই রেঞ্চ, মঙ্কি রেঞ্চ আর সেই ধাতব পদার্থের কঠিন স্পর্শ নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে তার পথহারানো স্মৃতি সত্তাকে।

রিওয়্যারিং, ওয়েলডিং, ডাইনামো ফিটিং সব করতে শুরু করেছে সে।

হঠাৎ খবরটা মিষ্টির কাছে ধরা পড়ে, এতদিন সব কথাই চেপেছিল কারিগর।

মিষ্টি বাড়ি ফিরেছে, মনে তখনও অবিনাশের সেই সুরটা। ঘরে পা দিয়ে দেখে গরুবাছুরগুলো তখনও জাবনা পায়নি—এদিক ওদিক চাইছে আর ডাকছে কালো চোখ তুলে।

—কারিগর? একটু বিরক্ত হয় মিষ্টি।

কেউ বাড়িতে নেই। মিষ্টি নিজেই জিনিসপত্রগুলো দাওয়ায় নামিয়ে রেখে জল ঢালতে থাকে গরুর পাতনায়। তৃষ্ণার্ত গরুগুলো তাই খাচ্ছে। গজগজ করে মিষ্টি।

—আহা! লোকটা তো বেশ! অবহেলায় মারবে কেষ্টর জীবগুলোকে।

শখ করে চাষ আবাদ করেছে মিষ্টি। বলদও কিনেছে। খড়ও কাটা নেই, বসল নিজেই বঁটি নিয়ে। এরপর রান্না-বাড়া ঘরের কাজ অনেক বাকি। ক'দিন ধরেই দেখছে কারিগরের কেমন উড়ু উড়ু ভাব। বাড়িতেও থাকে না বিশেষ। আজ মেজাজটা বিষিয়ে ওঠে মিষ্টির।

একটু আগেকার ওই মধুর সুরের রেশ মন থেকে মুছে যায় একেবারে। উনুনের দিকে এগোয় না।

ধূ ধূ করে জ্বলছে আগুনটা।

মিষ্টি কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল জানে না। বেলা পড়ে আসছে। চালের মাথায় বৈকালের সোনারোদে নেমেছে, হঠাৎ কারিগরকে ফিরতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

চোখ দুটো লাল—পা টলছে তার। দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে মিষ্টি। ওর দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। হুকুমের স্বরে বলে ওঠে কারিগর,

—ভাত দে!

কারিগর এসে দাওয়ার বসল চেপে।

মিষ্টির চোখের সামনে একটা কালো কাক যেন নরকের মাঝে খাবলা মারচে। স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়,

—ভাত রাঁধিনি।

—তবে কি ছাই খাবো? হাঁক পাড়ে কারিগর।

মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে। কাপড়ে তেলকালির দাগ, হাতেও। চোখ দুটো করমচার মত লাল। এ যেন অন্য কোন নতুন মানুষ বহুকালের বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপ ঠেলে জেগে উঠেছে।

—তাই তো গিলে এসেছিস।

—এ্যাও! খবরদার!

কারিগরের মাথায় যেন রক্ত উঠে পড়ে। অতীতের সেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রা; একটা ছোট্ট কোন কুলিধাওড়ায় অভাব আর অভিযোগের নিত্য জ্বালা—সেই তেলকালির গন্ধ ছাপিয়ে কোন বিজাতীয় তীব্র পানীয়ের মাদক সৌরভ সারা মন ছেয়ে ফেলে। অতীতের একটা স্মৃতি বহুদিন পর আবার ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

ওটাকে এতদিন ভুলেই ছিল ফটিক।

পাটকলের মিস্ত্রি সে একজন। এমনি মত্ত অবস্থায় চোখের সামনে তার স্ত্রীকেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে—লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে শীর্ণ বৌটা। রক্ত! তাজা রক্তে ভিজে যায় কুলি-বস্তির মাটি।

জ্ঞান ফেরে। তারপর থেকেই পলাতক ফটিক। নিজের নামটাও ভুলে গেছে। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। অন্ধকার অতীতের অতল থেকে সেই ছবিটা ভেসে ওঠে।

লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল কারিগর মিষ্টির সামনে, ছানিকাটা বঁটিটা তুলে নিয়েছিল। মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। হঠাৎ অতীতের ওই ছবিটা মনে পড়ে।

আজ তাই কেমন থমকে দাঁড়িয়েছে কারিগর, একই দৃশ্য—একটা ছবির অন্য পিঠ।

—থামলি কেনে?

মিষ্টি বলে ওঠে।

এতদিন লোকটাকে পুষেছে—খাইয়েছে। ভালবেসে ঘরও বেঁধেছে। শান্ত স্থির একটি ভালমানুষ লোক, সাত চড়ে মুখে রা শব্দ নেই, সেই লোক কেমন বেমালুম বদলে গেছে।

চটে উঠেছে মিষ্টি। বেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে,

—কদিন থেকে দেখছি ডান উঠেছে তুর। মরবি?

বঁটিটা ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে কারিগর।

কারিগর কথা বলে না, মাথা নীচু করে বের হয়ে গেল। শূন্য ঘরের দাওয়াতে বসে পড়ে মিষ্টি।

আবছা অন্ধকার নামছে, দিন শেষের অন্ধকার।

গরু বাছুরগুলোও কেমন চুপ করে আছে। পাখি ডাকছে— বাসায় ফেরা পাখপাখালি। অমনি কেমন ক্লান্তি আর হতাশাভরা অন্ধকার সারা মনে নেমে এসেছে মিষ্টির।

আজ মনে হয় একটা প্রচণ্ড নির্মম আঘাতে সব ছিটকে পড়ে খানখান হয়ে গেল, এতদিনের সব সাধ আর সাধনা। সে রাত্রে সে সদরের হাসপাতালে পড়ে পড়ে কেঁদেছিল জীবনের একটা সার্থকতার চরম অপমৃত্যুতে।

মা সে হতে পারেনি, পারবে না কোনদিন।

আজ কাঁদে—ঘর তার ভেঙ্গে যাবে প্রচণ্ড কোন দুর্বার সর্বনাশা আঘাতে। এত সাধ আর সাধনা দিয়ে গড়া জীবনের একটা শান্ত পরিণতি কোন তীব্র জ্বালা আর নির্মম পরিহাসের অট্টহাসিতে ভরে ওঠে।

দাওয়াটা নুইয়ে পড়েছে, জীর্ণ খুঁটি আর ঘরের ভার সইতে পারে না। যে কোন মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে ধ্বসে পড়বে। আলো জ্বালাও হয় না। তেল কেনবার সামর্থ্য সঙ্গতি নেই।

উঠোনে গজিয়েছে কালকাসিন্দে আসশেওড়ার ঝোপ, বাঁশবনের ডালগুলো বাতাসে অশরীরি ছায়ামূর্তির মত দোল খায়। তারাজ্বলা আকাশকোলে শুধু আঁধার আর আঁধার! এর যেন শেষ নেই।

দূর দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে। রক্তলাল। তির্যক রেখায় আলোকস্রোত রক্তচক্ষু মেলে রোষপ্রদীপ্ত নয়নে চেয়ে রয়েছে হারিয়ে-যাওয়া আঁধার-ঢাকা নিশ্চিন্ত গ্রাম-সীমার দিকে।

ওরই দিকে চেয়ে থাকে ওই আজকের দুর্গাপুরের নতুন লৌহদানব—হিংস্র দাবিদারের চোখে। তাই ওর ওই আকাশজোড়া চাহনিতে শুধু জ্বালা আর জ্বালা। ধূ ধূ লেলিহান শিখা ওঠে রাত আঁধারে। সব নিঃশেষ করে চেঁছে মুছে নেবে ওর অতল বুভুক্ষার অনলে।

কাঁদছে নারাণঠাকুর।

অব্যক্ত ভাষায় আর্তনাদ ওঠে রাতের অন্ধকারে। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। শান্তি আর নিশ্চিন্ততা ভরা দিন। দাদা, ভাজ-বৌ, ছোট ভাই-পো সনাতন। সব কোন দিকে তছনছ হয়ে গেল। তাই ছোট বাড়ি—গোয়ালের গরুবাছুর—ধানের মরাই, সবুজ ক্ষেত—কাঁইজোড়ের জলধারার পাশে নবাঙ্কুর, সেই ইক্ষুবনের সবুজ স্বপ্ন! সব তার হারিয়ে গেছে। পুড়ে বিবর্ণ ছাই হয়ে গেছে ওই আগুনে।

কাঁদছে। ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদছে বোবা লোকটা।

জীর্ণ দোতলার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে মণিমালা। খুকীর জ্বর কমবার দিকে নয়—বেড়েই চলেছে। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে ছোট্ট বাচ্চাটা।

রাত হয়ে গেল, নীরব নিশুতি গ্রামসীমা। জীবন তখনও ফেরেনি। গেছে দুর্গাপুরে কি যেন জরুরি কাজে।

কাজটা কি তা জানে না মণিমালা, বাবা মায়ের কাছেও বলেন জীবন। মাঝে মাঝে যাচ্ছে সেখানে।

মণিমালাও দেখেছে জীবনের অন্তরে-বাইরে একটা নীরব পরিবর্তনের ছায়া। আগেকার সেই সহজ সুন্দর সুখী মানুষটা কেমন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলেও জবাব মেলে না।

—এত কি ভাবো? হ্যাগো?

—এমনি ! জীবন এড়িয়ে যায় তাকে।

নীরব হাহাকারে ভরে ওঠে মণিমালার মন। এসে অবধি সে দেখেছে এদের সংসারের কি এক সমৃদ্ধির ছবি ! আর আজ !

সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল! তবু মনে মনে খুব অসুখী হয় নি মণিমালা। স্বামীকে কাছে পেয়েছে, নিকট করে পেয়েছে। এই জীবন যেন নতুন কোন একজনের।

এতদিন সে শুধু দূর থেকেই দেখেছে ওদের অন্তরের বিকৃত স্বরূপ—কেমন ঘেয়োকুকুরের মত একটা লোক কদর্য দৃষ্টিতে মেয়েজাতটার দিকে লোলুপ চোখে চেয়ে রয়েছিল। লাবি-বৌ, গ্রামের আরও ওই জাতের মেয়েদের দেখেছে—দেখেছে জীবনকেও। রাত দুপুরে ঘরে এসেছে মদ্যপ একটি প্রাণী।

ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছে সারা মন—তীব্র বিজাতীয় সেই ঘৃণা। এ বাড়ির হাওয়ার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসত।

লেখাপড়া শিখেছে—ম্যাট্রিক পাশও করেছে মণিমালা। কিন্তু এ বাড়ির এই জগদ্দল পাথরের

ভারে আর ওদের বিষ নিঃশ্বাসে তিলে তিলে শুকিয়ে চলেছে সে। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ।

দূর অন্ধকার আকাশে দেখা দিয়েছে লাল আলোর ফুল্কি। দুর্গাপুরে শুরু হচ্ছে লোহা কারখানা—ব্যারেজের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দুর্দম দামোদর বন্দী হয়েছে, বাঁধা পড়েছে সেই উন্মত্ত ধ্বংসদেবতা।

একা নদী আর ষোল কোশ পথ নয়, এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল। চড়াই-এর ওপারে একটা উৎরাই পার হয়ে নদীর ওপারেই দুর্গাপুর। টানা বাস আসছে—আসছে ঝক্‌ঝকে নতুন ট্যাক্সি, মায় সাইকেল রিক্সাও।

মণিমালার মন সেই পিচ-ঢালা পথ বেয়ে এই বননির্জন পল্লী থেকে ছুটে যায় নতুন শহরের পানে।

কে জানে জীবন সেখানে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, মণিমালাও ভাবে ওখানে এমনি হারিয়ে যাবার কথা। বোধহয় ওখানে শান্তি আছে আজ!

হঠাৎ খুকীর কান্নার শব্দে চমকে উঠল। কাঁদছে ক্ষীণকণ্ঠে বাচ্চাটা। মন ফিরে আসে সেই কল্পনার রঙ্গীন রাজ্য থেকে এবার অন্ধকার ওই ঘরের মধ্যে।

কেমন বন্দী করে রেখেছে তাকে ওই বাচ্চাটাই এই প্রাণহীন বাড়ির সঙ্গে অদৃশ্য কঠিন কোন বাঁধনে। নিস্তব্ধ পুরীতে ওই একটুকুই মাত্র প্রাণের সঙ্কেত—আর সব শব্দ থেমে গেছে—স্তব্ধ হয়ে গেছে।

খুকীকে বুকে তুলে নেয়, গা তার পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

হঠাৎ জীবনকে ঢুকতে দেখে স্বামীর দিকে চাইল মণিমালা। জীবন সাইকেল নীচে রেখে উঠে আসছে। সারাদিন নাওয়াখাওয়া হয়নি, তবু মুখে কেমন একটা নীরব তৃপ্তির ছায়া।

—তুমি! কখন এলে? মণিমালা ওকে প্রশ্ন করে।

—কেমন আছে খুকী?

—তেমনিই!

আবার জ্বরের ঘোরে যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ছে সে। ঘুমিয়ে পড়ে বেহুঁশের মত। বিছানায় শুইয়ে এগিয়ে আসে মণিমালা।

জীবন বলে ওঠে—চাকরি একটা পেলাম।

—চাকরি! কোথায়? অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মণিমালা স্বামীর দিকে। জীবন জানলার বাইরে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়,—ওইখানে!

চুপ করে ওই দিগন্তের আলোর দিকে চেয়ে থাকে মণিমালা। নতুন ব্লাস্ট ফার্নের্সের বুক থেকে গরম লোহার শ্লাগ বের হয়ে আসছে, তারই চোখজ্বালানো, লালদীপ্তি দূর আকাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বলে চলে জীবন,

—অনেক ভেবে চিন্তে নোবই ঠিক করেছি। তবু মাসে নগদ কিছু আসবে। কোআর্টারও পাবো। এতবড় বাড়ি টিকিয়ে রাখা যাবে না, দেখছ না চারিদিকে ফাটল ধরেছে, ধ্বসে পড়বে চুরমার হয়ে একদিন। তাছাড়া—

মণিমালা কি ভাবছে।

একেবারে দিন বদলের কথা, এদেরও ভিত্তিমূলে নাড়া পড়েছে।

ধ্বসছে ওদের অন্তর বাইরের সব রূপ, সব সংস্কার, সব কিছু।

দুঃখ হয় কিন্তু তবু ভাল লাগে। এ বাড়ির কারাগার থেকে মুক্তি পাবে—এখনও নতুন করে সময় আছে, হয়তো বাঁচতে পারবে ওখানে।

বলে ওঠে,—ভালোই হয়েছে।

—সত্যি! জীবন স্ত্রীর দিকে চাইল।

মণিমালা অন্তরের আনন্দ চেপে রাখে, স্বামীর কাছেও তা প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ রতে চায় না এ বাড়ির ধ্বংসে সে আনন্দিত। মণিমালা কোন রকমে বলে,

—এ ছাড়া আর পথ কি বলো?

চুপ করে থাকে জীবন। কত দুঃখে আর বেদনায় তাকে আজ এটা স্বীকার করে নিতে হয়েছে কি করে মণিমালাকে বোঝাবে! লোহা কারখানায় হপ্তা রোজের চাকরি সে পেয়েছে মাত্র। পশচাতে মাইনে বাড়বে।

তারই সংবাদে খুশি হয়েছে মণিমালা—আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে সে নিজেও।

—জানলাটা বন্ধ করে দেবে?

জীবন যেন ওই আলোর দিকে চাইতে পারে না।

মণিমালা বলে ওঠে,—ওইখানেই গিয়ে থাকতে হবে এবার! বাবাঃ যা অন্ধকার এখানে, য় লাগে।

জবাব দিল না জীবন।

ক্লান্তিতে সারা শরীর ছেয়ে আসছে—পরাজিত ক্লান্ত মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে মণিমালা। দারুণ দুঃখ আসে বুক ঠেলে।

এমনি দিনে নতুন পঞ্চায়েত বোর্ড ইলেকশন-এর পর্ব আসে। পঁচিশ বছর ধরে প্রেসিডেন্টের দ আঁকড়ে ছিল তারকরত্নবাবু। আশপাশে সাতজন মেম্বার বলতে ওই অবনী মুখুয্যে—তলার চাটুয্যে—গোপগাঁয়ের নটবার দাস—নমঃশূদ্র মেম্বর নিতাই বাগ্দী এরাই।

সাধারণ গ্রামবাসীরা শুধু হঠাৎ পাঁচ বছর পর দেখত—বাবুরা দু-একদিন এদিক ওদিকে হয়েছে, তারা কৃতার্থ হয়ে যেত।

তারপর আবার আগেকার সেই নামগুলোই বোর্ড অফিসের দেওয়ালে লটকানো হয়ে। তাদের অবশ্য এতে কোন উৎসাহই ছিল না বিশেষ। যেই হোক না কেন, তাদের যে ই অবস্থা থাকবে এটা ধরেই নিয়েছিল।

এতকাল তেমনই চলে এসেছিল, এবার হঠাৎ যেন কেমন একটা সাড়া জাগে। পানু দাস াচ্ছে, তারই কয়েকজন চর অনুচরও ঘুরছে। ওদিকে কামারপাড়া থেকে যারা মাথা তুলেছে াও দাঁড়াবে। আশ-পাশের গ্রামে তন্তুবায় সমিতি, কৃষকসমিতি, আরও অনেক সাধারণ য় এবার মাথা তুলেছে। তারা পথে নেমেছে—সোরগোলে বিভিন্ন গ্রাম পথ মুখর করে

তুলেছে। পানু দাসও একখানা জিপে পতাকা তুলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে সেই গোকুল—ডাকনাম এখন তার চোরা গোকুল।

সেই-ই অভয় দেয়,—গ্যাঁট মেরে বসে থাকুন দাস মশায়, আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

গোকুলও আবার ভাঙ্গা দল জোড়া লাগিয়েছে। আশা রাখে এবার আর রাতের অন্ধকারে গেরস্থর পাঁচিল টপকে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হবে না, দিনে দুপুরেই ওটা করবার আশা রাখে।

পানু ভাবছে। বলে,—তাইতো, কামারপাড়ার ওদিকেই ভয় রে, বড়বাবু তো টেঁসে গেছে। কিন্তু ওরা যে রক্তবীজের ঝাড়। পিছনেও লোক আছে।

কথাটা গোকুলও ভাবে। ওদিকে সে আজও ভয় করে। ওদের দেহে আছে অসুরের মত শক্তি আর পিছনে বুদ্ধি দেবার জন্য আছে অশোকবাবু। সারা অঞ্চলের লোকও যেন আস্তে আস্তে ওই জনতার পিছনে দাঁড়িয়েছে। তাদের তুলনায় পানু দাস যেন অনেক দুর্বল। তবু গোকুলের পানুকেই চাই।

গোকুল চুপি চুপি জবাব দেয়,

—ছাড়েন না ওদের কথা, শেষ ইলেকশনের দিন দোব দুচার বম্ গিরিয়ে সব ভণ্ডুল করে বলেন কেনে দুর্গাপুর থেকে দু'চার ইয়ারবক্সিকে নিয়ে আসবো।

পানু জানে ওটা তার শেষ অস্ত্র। তাই আপাততঃ বলে ওঠে,

—ওসব এখন থাক গোকুল। চল গোপগাঁ থেকে ঘুরে আসি।

গোকুল নিপুণ হাতে স্টিয়ারিং-এ মোচড় দেয়।

পানু ভাবছে কামারপাড়ার পুঞ্জীভূত শক্তিকে কোথায় আঘাত হানবে। মনে মনে খুশি হয়—একটা পথ সে পেয়েছে।

রোদপোড়া ধূসর মৃত্তিকা—বৃষ্টির জল ধুয়ে ধুয়ে লাল কাঁকুরে মাটি খোয়াই-এর সৃষ্টি করেছে। ওপাশে আধমরা শালবনের বিবর্ণতা, তারই পাশ দিয়ে চলছে জিপটা।

দূর থেকে কামারপাড়ার জনতার কোলাহল শোনা যায়। নতুন তৈরি ইস্কুলের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা ভিন্ন গ্রামের দিকে।

এতবড় ঝড় থেকে দীর্ঘদিন পর তারকবাবু সরে দাঁড়িয়েছে—সে যেন বাতিল একটি প্রা[illegible] অবনী মুখুয্যে, শক্তি চাটুয্যে এসেছে। আজ আর বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসও নেই, বোর্ড-এ[illegible] জমকালো অফিসও বন্ধ জনহীন। বিশালদেহ হরিনারায়ণও ক'দিন জিরুচ্ছে, নতুন মনিবের [illegible] এলে আবার বোর্ডের দরজা খুলবে, ততদিন ছুটি করে নিয়েছে বেওয়ারিশ রাজত্বে।

তারকবাবু চুপ করে বসে আছে।

জীবন চাকরির তদারকে গেছে সাইকেল হাঁকিয়ে দুর্গাপুরে। শুনেছে তারকবাবু সব দেখছে নিজের চোখে—বিনা চিকিৎসায় বাচ্চাটা কেমন তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। কোন পথ নেই।

সতীশ ভটচাযকে গোপনে কিছু দরজা জানালা বিক্রি করেছিল, তাই দিয়েই চলছে ক'দিন। পিছনের বাঁশবাগানের কিছু বাঁশও দুর্গাপুরের ঠিকাদারকে বিক্রি করেছে, দিঘির পাড়ের [illegible] পুরোনো তালগাছও বিচবে।

এমনি করে ক'দিন চলবে!

তাই জীবনের চাকরি খোঁজাটাকে মনে মনে সমর্থন না করে পারে না। বৌমার দিকে চাইতে পারে না, মনে হয় মস্তবড় একটা অপরাধ করেছে তারকবাবু নিজেই ওকে এ বাড়িতে এনে।

বড় ঘরের মেয়ে, সেদিন ওরা জীবনকে দেখে ভুলেছিল মাকাল ফল ছেলে। সাজানো এতবড় সাম্রাজ্য, কিন্তু ভিতরে কিছুই নেই। ওরা বাইরে থেকে জীবনকে দেখে বিয়ে দিয়েছিল।

তারকবাবুও ছিল প্রধান উপলক্ষ্য।

আর আজ! আজ মনে হয় মণিমালা তাকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে।

চুপ করে বসে আছে তারকবাবু একাই। ওদের ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। শুকনো কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়।

—এসো অবনী, চাটুয্যে যে—অনেকদিন পর? বসো রমণ।

অবনী ভাঙ্গা চেয়ারে বসে চারিদিক দেখতে থাকে। সারা ঘরে কেমন একটা মলিন বিবর্ণতা। তার ছায়া নেমেছে তারকবাবুর মুখে চোখেও। অবনী বলে ওঠে,

—তুমি এসব দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু? গাঁয়ের মধ্যে মানুষ হল পানু দাস—আর ওই গুণ্ডা কামারপাড়ার ওরা?

রমণ ডাক্তার বলে ওঠে,—ওদেরই মেনে নিতে হবে?

—না মেনে উপায় কি বলো? তারকবাবু জবাব দেন। একটু থেমে বলে চলেন,

—দিন বদলাচ্ছে ডাক্তার, আমরাও ঝরাপাতার মত ঝরে গেছি, দুঃখ করে লাভ কি?

—তাই বলে ওই সব বাজে লোকগুলোকে মাথায় তুলতে হবে?

রমণ ডাক্তারের মন বিষিয়ে উঠেছে নানা কারণে। নতুন সরকারী ডাক্তারখানা খুলেছে দিকেই, অশোকের চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন ইস্কুল—লাল ডাঙ্গার উপর দা ছবির মত বাড়িগুলো গ্রামকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এতকাল এরা যা করতে রেনি—নতুন কালের ওরা তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে। এইটাই যেন সদাপে ঘোষণা র। তারই দাবিতে আজ কর্তৃত্ব অধিকার করতে চায় তারা।

অবশ্য রমণ ডাক্তারের বেশ ক্ষতি হয়েছে ওই ডাক্তারখানার জন্য। ঝাঁঝটা তাই তারই বেশি। ন্তি চাটুয্যে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, সেও বলে ওঠে,

—এমোকালী শুনলাম নাকি গ্রাম-প্রধান হবে। গাঁ ছেড়েই চলে যাবো ভাবছি।

অবনী বলে,—এদিকে ভাসুর, ওদিকে আঁস্তাকুড়, একদিকে পানু, আর ওদিকে এমোকালী। মা তারা দাঁড়াই কোথা?

তারকবাবু চুপ করে থাকে। ধীরে ধীরে বলে,

—এ মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই, ডাক্তার! আমি মেনেই নিয়েছি। তাইতো কোণে এসে বসেছি, লজ্জায় আর দুঃখে। এছাড়া আর করবারই বা কি আছে?

হঠাৎ পানুকে উঠে আসতে দেখে ওরা একটু অবাক হয়। এগিয়ে এসে পানু গুরুজনদের য়র ধুলো নেয় পরম ভক্তিভরে। রমণ ডাক্তার একটু আশ্চর্য হয়। পানু এত বড় অবস্থা ও বদলায়নি।

জোড় হাত করে আবেদন জানায় তারকবাবুকে—যদি দয়া করে অনুমতি দেন—আমি দাঁড়াই, না হলে আপনিই দাঁড়ান বড়কাকা—আমি সরে যাচ্ছি। তবু ওই কামারপাড়া—বাগ্দীপাড়া তাঁতীপাড়া—দশ গাঁয়ের বেহেডগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন না।

অবনী মুখুযো লাফ দিয়ে ওঠে পানুর কথায়। মনের কোণে আশার খবর জাগে। পানু তাকে হয়তো ফেলবে না। শক্তি চাটুযোও ভরসার পায়। তারা কথাটা সমর্থন করে।

—ঠিক বলেছ পানু। হক্ কথা।

পানু ব্যবসা জানে। ভাগ দিয়ে খেতে হয় এটা ও শিখেছে।

তাই বলে ওঠে,—ওদের বলুন। দশগাঁয়ের মানী লোক আপনারা—আজও দাঁড়ালে লোকে আপনাদের কথা শুনবে।

তারকবাবু বলেন,

—ও সবে আমি আর নেই পানু। আমাকে রেহাই দাও।

তারকবাবুর এই ভাবান্তর ওদের দৃষ্টি এড়ায় না। দুঃখ আর বিপদের মাঝে মানুষ চিনতে আর দেরি হয় না। অবনী, শক্তিকেও চেনে তারকবাবু। সব কিছুর উপরই কেমন বিতৃষ্ণা আসে আজ।

এখানে কোন কাজ হবে না।

পানু দাঁড়াল না। অবনী, শক্তি চাটুযোও ওর পিছু পিছু চলে গেল, ওদের উদ্দেশ্যও বুঝতে দেরি হয় না। হাসে তারকবাবু।

—কই, তুমি গেলে না ডাক্তার?

রমণও আশা করেছিল, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের আর দরকার নেই পানুর। পয়সা আছে তুড়ি মারলে পাশকরা ডাক্তার ছোটে। তাই বোধহয় হেনস্থাই করে গেল তাকে।

রমণ কথা বললে না, মুখ কালো করে বের হয়ে গেল।

বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে।

পাখি ডাকছে। নীরব বাঁশবনে হু হু কাঁপে হাওয়া। কেমন অসীম শূন্যতা উঠছে চারিদিকে এ বাড়ির অন্তর বাইরে।

তারকবাবু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। পথও চেনা যায় না। হঠাৎ কার কান্নার শব্দ কানে আসে। ধ্বসেপড়া প্রায়ান্ধকার বাড়িটায় গুমরে কাঁদছে মণিমালা।

এ্যাঁ! চমকে ওঠে তারকরত্ন। পায়ের তলের মাটি কাঁপছে। একমাত্র বংশের প্রদীপ ওই ছোট্ট সুন্দর মেয়েটা।

—বৌমা! এগিয়ে যায় তারকরত্ন। কাঁপছে সারা দেহ।

মণিমালার ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তারকরত্ন। পায়ের শব্দ পেয়ে তুলে চাইল মণিমালা।

জীর্ণ শয্যায় পড়ে আছে বিবর্ণ ফুলের মত শিশুকন্যার প্রাণহীন দেহটা। শুকিয়ে যেন ঝরে গেছে জীবনের বৃন্ত হতে। আপনা হতেই ঝরেনি—কে নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে পিষে ফেলেছে তাকে।

তাদেরই একজন ওই তারকরত্ন, এই প্রাণহীন পুরীর পাহারাদার। মণিমালা ওর দিকে চাইল। বন্দী মণিমালা। পরাজিত, প্রতারিত একটি নারী। ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে জ্বালা। দুঃসহ সেই জ্বালা।

—খুকী চলে গেল ! আর্তনাদ করে ওঠে তারকবাবু।

—হ্যাঁ।

দুঃসহ জ্বালার উত্তাপে মণিমালার চোখের জল শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—জমাট পাথর। তারকরত্ন সরে গেল—ভয় পেয়েছে সেও!

পানু চরম আঘাত হেনেছে একেবারে ওদের ভিত্তি মূলে।

ভুবন কর্মকার আজ প্রকাশ্যে কথাটা পড়ে,—চাকরি পেয়েছি, ভাল চাকরি। কাল থেকেই জয়েন দোব।

—চাকরি!

অতুল কামার ছেলের কথায় মুখ তুলে চাইল। অবাক হয়ে গেছে সে। কদমও চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। ক'দিন থেকে দেখছিল কেমন যেন অমানুষ হয়ে উঠেছে—আজ বুঝতে দেরি হয় না তার প্রকৃত কারণটা।

এমোকালী ইলেকশনের ব্যাপারে ব্যস্ত। একবার খেতে বাড়ি এসেছিল, সবে উঠোনে পা দিয়েছে, ভুবনের কথায় থমকে দাঁড়াল। সেও অবাক হয়েছে।

—চাকরি! কোথায়? দুর্গাপুরে?

ভুবন জবাব দেয়,—না, এখানেই। নতুন কারখানা হচ্ছে, তারই ম্যানেজার।

কালী বলে ওঠে,

—ওই পানু দাসের কারখানায়?

—হ্যাঁ, ঘাড় নাড়ে ভুবন।

গর্জন করে ওঠে বুড়ো অতুল,—কি বললি? পেনোর কারখানায়?

—হ্যাঁ। গদা, ফটিক—লটবর আরও ক'জন যাবে, বাকি কারিগর আসছে বিষ্টুপুর—হাওড়া থেকে।

ভুবন বেশ সদাপে বর্ণনা করে চলেছে। কালী ওর দিকে চেয়ে থাকে, বিস্মিত হয়েছে সে। বলে ওঠে রুদ্ধ কণ্ঠে কালী,

—লাজ লাগে না তুমার? ছিঃ।

কালী রাগে ফুলছে।

ওই পানু দাসই আজ তাদের ভাতে হাত দেবার জন্য কারখানা করেছে, আর যেখানে কাজ করতে যাবে ওই ভুবন আরও ক'জনেকে সঙ্গে নিয়ে।

ভুবন ওর কথায় হাসে।

—লাজ!

ভুবনকে কথাটা সেই রাত্রেও বলেছিল কদম। কামনা মদির উন্মাদ ভুবন আজও ভোলেনি কথাটা। আজ আবার ঠিক সেই কথাই শোনায় এমোকালীও।

কদমের দিকে চাইল ভুবন। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভুবন। ওর চাহনিতে কেমন বিশ্রী একটা কদর্য ভাব—চোখ দুটো একটু লালচে ঠেকে। সেই রাত্রের একটা বুভুক্ষু দানবের কুৎসিত লালসা আর কদর্য সন্দেভরা চাহনি। কালী বলে চলেছে,

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! লাজ তুমার নাই।

ভুবন গর্জে ওঠে,—ইখানে থাকতে লারবো, ভাল কাজ পাই কেনে করবো না?

কালী বলে ওঠে—তাই বলে উখানে, ওই পেনোর কাছে? নিজেদের ঘরের শত্রুর কাছে যাবা কাজ করত?

ভুবন জাবব দেয়,

—বেশ করবো। যেখানে মাইনো পাবো—ম্যানেজারি পাবো, কেনো যাবো না। পাকা বাড়ি—জিপ। দিবি তুরা?

কালী চুপ করে যায়, এসব সেও পায়নি।

অতুল অবাক হয়ে ছেলে দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় এতকাল দুধকলা দিয়েক সাপই একটা পুষেছে। আজ বড় হয়ে ফণা মেলেছে। ছোবল দেবার জন্য হয়ে উঠেছে উদ্যত-ফণা। গর্জে ওঠে বুড়ো, সতেজ কণ্ঠে,

—দুশো টাকা দুব—আমাকে খুন করতে পারবি?

ভুবন বাবার দিকে চেয়ে থাকে। কালী চমকে ওঠে।

—মামা।

কদমও এগিয়ে আসে। অসহায় রাগে কাঁদছে বুড়ো। হাসছে ভুবন। অবজ্ঞার হাসি।

জ্যাযুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে অতুল ছেলের গালে সজোরে একটা চড় কসে।

—*হাসছিস? বেজম্মা কুথাকার।*

—বাবা। কদম ওকে ধরতে যায়। বুড়ো হাতের লাঠিটাই তুলেছে—ভুবন ওটাকে নামিয়ে দিয়ে কদমের হাত ধরে টানে।

—চলে আয়।

গর্জে ওঠে অতুল,—না, যাবে না ও। যেতে হয় তু একাই যা।

ছোবল মেরেছে সেই উদ্যত-ফণা বিষধর সাপটা। নীলাভ তীব্র গরম জ্বালা বুড়োর সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়। ভুবন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এদের আজ জেনেছে পরম শত্রু হিসেবেই।

ভুবন বলে ওঠে,

—তা যাবে কেনে? নাহলে রাসলীলা জমবেক কিসে? ওই এমোকালী—তোমার অশোকবাবু। এত মহাজনের পায়ের ধুলো পড়ে—কত লীলাখেলা হয়। গোক্‌লো সেদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলেনি।

কদম শিউরে আর্তনাদ করে ওঠে,—থামবে তুমি।

হাসছে ভুবন,—কথাটা আঁতে লেগেছে, লয়? তবে যাবি না কেনে ইখান থেকে? বল?

অতুল অসহ্য উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অসহায় প্রাণীর মত। বলে ওঠে বুড়ো পরাজিত কণ্ঠে,

—তুমি যাও বৌমা। এ বাড়ির লক্ষ্মীও যাবে তোমার সাথে সাথে, কিন্তু কি করবে? এ যে লক্ষ্মীছাড়ার দিন মা। সব যাবে। তবু এ কলঙ্ক সয়ে থাকার চেয়ে তুমি ওখানেই যাও।

—বাবা। কদম ওর দিকে চাইল। বুড়োর চোখে জল। কাঁদছে সে। অপমানিত লাঞ্ছিত একটি মানুষ।

—তুমি যাও মা, এ তোমার শাস্তি—কিন্তু পথ কই?

হাসছে ভুবন।

—তবে রংবাজি হচ্ছিল কেন! তুই গুছিয়ে নে—বাসা দেখেই আমি আসছি। আজই, আভি চলা যায়েগা হিঁয়াসে।

বের হয়ে গেল ভুবন বীর দর্পে। কালী তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, চাপা রাগে ফুলছে সে।

—বৌঠান!

কদম কি জবাব দেবে জানে না।

দাঁড়াল না কদম। কান্না আসছে-লজ্জায় অপমানে আর ঘৃণায়। আজ মন চায় প্রতিবাদ করতে, বিদ্রোহী হতে।

কিন্তু তবু পারে না, জন্মগত সংস্কারই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সেই স্ত্রীর পতিভক্তির অন্ধ সংস্কার, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের জ্বালা—অমানুষ পৈশাচিকতার তাণ্ডব, কিন্তু প্রতিবাদের পথ সে জানে না। তাই সহ্য করে আর কাঁদে অসহায় একটি নারী।

ভিতরে চলে গেল কদম। কালী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতুল কামার ওর দিকে চাইল। বের হয়ে যাচ্ছে কালী। অনেক কাজ পড়ে আছে। শালের দিকে গেল সে।

সন্ধ্যা নামছে গাছ-গাছালির মাথায়। পাখিফেরার বেলা। ওদের কলবর কাকলিতে চারিদিক ভরে উঠেছে। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে সন্ধ্যা দীপের আলো দেখা দেয়। শাঁখ-এর শব্দ কানে আসে। কতক্ষণ বসেছিল কদম জানে না।

উঠে বাইরে এল কদম। এ যেন ভূতোপুরী, তখনও সন্ধ্যা পড়েনি। মেজবৌ সেজবৌ ঘাট-এর দিকে গেছে, এখনও ফেরেনি।

নিজেই কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা দিতে যায়।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। অতুল কামারও বার হয়ে গেছে বাইরের দিকে—খামার বাড়িতে এসে থামল কদম। আবছা মুখ-আঁধারী সন্ধ্যা, নির্জনপথে কেউ কোথাও নেই। বাঁশ গাছটা দোল খায় অশরীরী কালো ছায়ার মত।

অশোকও সব খবরই পেয়েছে, ভুবন চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে নতুন চাকরিতে, তাই সঠিক ব্যাপার জানতে আসছিল সে।

পথের ধারে কদমকে দেখে দাঁড়িয়েছে, এক ঝলক আলোয় কদমের সুন্দর মুখখানা ঝলসে

উঠেছে। শাড়ির লালপাড়টা ঘিরে ফুটে উঠেছে সুডৌল মুখের পুরুষ্ট জলে ভেজা আদলটুকু। থমথমে মুখ আলোয় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—কদম।

অশোক এগিয়ে আসে। অতর্কিতে কদমের হাতের পিদিমটা ঝড়ো হাওয়ায় নিভে যায়। এতক্ষণ এতটা পথ আঁচল আড়াল দিয়ে ওই ম্লান শিখাটুকুকে আগলে রেখেছিল—তাও নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

কি নিষ্ফল অভিযানে থমকে দাঁড়িয়েছে কদম আবছা অন্ধকারে, ওর দুটো চোখ জ্বালার ব্যর্থতায় জ্বলছে।

—তুইও চলে যাবি শুনলাম?

অশোকের দিকে চেয়ে অন্ধকার এলোচুলে কোন ব্যর্থ নারী আজ যেন প্রশ্ন করে,—তাতে কার কি আসে যায়?

অশোক একটু অবাক হয় ওর কথায়। মাঝে মাঝে কি এক সুর জেগে ওঠে কদমের মাঝে ওই অতলান্ত আঁধারজ্বলা চাহনিতে।

—কেন?

কান্না ভেজা স্বরে কদম বলে,

—না গিয়ে আমার পথ কই? সব পথেই যে কাঁটা দেওয়া।

চুপ করে চেয়ে থাকে অশোক। মাঝে মাঝে কেমন বিদ্রোহের সুর জাগে কদমের মনে, সব বাঁধন দুর্বলতা ফুঁড়ে বের হতে চায় সেই আদিম নারী; এ কদমকে কোন্ অতীতে হারিয়ে ফেলেছে সে।

তবু সেই দূর সবুজ থেকে তাকে যেন কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে চেতনার প্রত্যূষ বেলায় ডাক দেয় বার বার।

—কোথায় যাচ্ছিল তাহলে?

—নরকে। জবাব দেয় কদম তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

—কি বলছিস যা তা? অশোক চমকে ওঠে।

কাঁদছে কদম। তারাজ্বলা আঁধারে হু হু বাতাসে ওর বুক জ্বলে। কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে কদম,

—যা সত্যি তাই-ই বলছি ছুটবাবু। মেয়েমানুষের নিজের মন নিয়ে বাঁচবার পথ কোথায়? তাই সোয়ামীর পথেই তাকে চলতে হবে, সে সোয়ামী জানোয়ারই হোক আর মানুষই হোক।

—ভুবন কিছু বলেছে? অশোক প্রশ্ন করে।

—আগেকার সে মানুষটা বলেনি কুনদিন, এ যেন নতুন মানুষ, কলের মানুষ বলেছে ছুটবাবু। ওরা সব আজ বদলে গেছে ওই কলের ধমকে।

—আর তুই?

—বদলাতে পারিনি; সব কিছু ভালো-মন্দ মিশিয়ে একাকার করতে পারিনি আজও, তাই কাঁদছি। কাঁদছি হারাবার ভয়ে, যেদিন সব হারিয়ে যাবে সেদিন আর কাঁদবো না, সয়ে যাবে। আমিও বদলে যাবো—হয়তো হারিয়েও যাবো ওরই ভিড়ে।

চুপ করে থাকে অশোক। কি হারাবে ওর—কিসেরই বা ভয় ঠিক বুঝতে পারে না।

হঠাৎ চমকে ওঠে অশোক, কদম কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসেছে কাছে—আরও কাছে। দুচোখের চাহনিতে কেমন টলমল চাহনি।

—আমাকে সেদিন তোমার খুব ঘেন্না করবে ছুটবাবু—নয়? সত্যিই যদি কুনদিন হারিয়ে যাই?

—কি বলছিস যা তা?

হাসবার চেষ্টা করে কদম। জবাব দিল না। বাড়ির দিকে চলতে থাকে খড় গাদার পাশ দিয়ে। হঠাৎ পিছন ফিরে অশোককে আসতে দেখে কদম বলে ওঠে তরল কণ্ঠে,—বাড়িতে কেউ নাই, এখন এসো না ছুটবাবু।

—কেন? অশোক কি ভাবছিল, তারই মাঝে অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করে। হাসছে কদম এত দুঃখেও। অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—তোমার কোন বোধ নাই ছুটবাবু। বুঝেছি এদ্দিনে—প্রীতিদিও কেন এতদূর এগিয়েও পিছিয়ে গেল।

—মানে? অশোকের মনের পুরানো ক্ষত জায়গায় যেন হাত পড়েছে অতর্কিতে। কদম জবাব দেয়,

—এমনিই বললাম। কোন মেয়েই তোমাকে ভরসা করতে পারে না। চিনেছো শুধু কাজ আর কাজ—মানুষ নিয়েই রইলে, জানলে না চিনলে না মেয়েমানুষকে, তার মনের খবরও রাখলে না।

সরে গেল, আবছা আঁধারে মিশয়ে গেল রহস্যময়ী নারী। তারাভরা আকাশের নীচে একাই দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। কি ভাবছে। কেমন যেন বুঝতে পারে না কদমকে—পায়ে পায়ে পথ নেমে এল।

আঁধারে পুরানো বাড়িটা থেকে একক কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল অশোক। মণিমালা কাঁদছে।

জীবনকে আসতে দেখে। দুর্গাপুর থেকে ফিরছে জীবন—সাইকেল থেকে নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল। সাইকেলে ঝোলান শূন্য টিফিন কেরিয়ারটা ঢং ঢং শব্দ তোলে।

শূন্য ফাঁপা একটা শব্দ।

দাঁড়াল না অশোক। অন্ধকার পথে আরও দুচার জন চাকরিসন্ধানী আর ভাগ্যবান চাকরি-ওয়ালাদের আসার শব্দ শোনা যায়।

নিতে বাউরীর সেই গবাও চাকরি পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একটা সাইকেলও কিনেছে। পানু দাসের মহিন্দারীতে জবাব দিয়ে গবা এখন প্যান্ট পরে ছাপা ছিটের হাওয়াই শার্ট লাগিয়ে আসা-যাওয়া করে, মাথায় একটা রুমাল বাঁধা।

শনিবার। একটু খোশমেজাজেই হপ্তা নিয়ে ফিরছে। আঁধার গ্রাম্যপথ তার গানের সুরে মুখর হয়ে ওঠে।

—আওয়ারা হুঁ!

বেসুর বেমানান ঠেকে সব কিছু গ্রামের এই শান্ত পরিবেশে। কেমন বদলে গেছে—গবা নয়, এ-কালের হাওয়া—গ্রামীণ এই সমাজ জীবন। তাই বোধ হয় ভয় পেয়েছে কদম-বৌ।

এই ঘরের শান্ত মধুর পরিবেশ, তার ছোট্ট গৃহ-কোণের স্বপ্ন, জীবনধারা—সব হারাবার ভয়ে।

কিন্তু পথ কই!

গ্রাম ছেড়ে তাই ওদের বেরুতে হয়েছে। যারা এখনও বেরোয়নি তাদেরও বেরুতে হবে মাটি ছেড়ে—সবুজ ছেড়ে ওই রুক্ষ জীবনের কঠিন বন্ধুর পথের টানে। যেমন করে নদীর প্লাবন আসে গ্রামশস্যঢাকা মাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে, তেমনি করেই দুর্বার স্রোত এসেছে, সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

বাড়ির দিকে চলেছে অশোক।

কদমের কথাগুলো কানে ভাসছে। প্রীতির কথাও বলেছে কদম। কোথায় অশোক যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। প্রীতি সরে গেছে—সরে যাবে কদমও।

জীবনের একটু সবুজ ইশারা বার বার তাকে দূর থেকে ডাক দিয়ে সরে গেল দিক থেকে দিগন্তরে। আবছা আঁধারে আজ তারাই তবু ভিড় করে আসে নীরব প্রশ্নের মত সারা মনে।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই হেলু মাস্টারকে দেখে দাঁড়াল অশোক। হেলুবাবু হ্যারিকেন জ্বেলে তারই খোঁজে বেরিয়েছে। এগিয়ে আসে,—এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—কেন?

হেলুবাবু বলে ওঠে,

—ওঁরা এসে গেছেন সন্ধ্যার বাসেই। শহুরে লোক, পাড়া গাঁ তো দেখেননি, শিয়ালের ডাক আর বন দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন।

অশোক বলে ওঠে,—ও সয়ে যাবে।

—আজ্ঞে তা যাবার আগেই ওনারাই না চলে যান। একে শহুরে মানুষ, তায় মেয়েছেলে। আপনিও একবার চলুন।

—কেন, বাসায় সব ব্যবস্থা তো করাই আছে। ঝি—চাকর।

হেলুবাবু বলে,

—তাতো আছেই। বাসাও পছন্দ হয়েছে। নতুন মাস্টাররা এলেন, আপনি সেক্রেটারি একবার দেখা করবেন না? নতুন লোক ওঁরা।

একটু থমকে দাঁড়াল অশোক। সত্যিই কোন শহরের আলো থেকে অন্ধকার অতলে আসছেন তাঁরা, কি একটা কর্তব্য তারও আছে।

—চলুন, একবার দেখা করেই আসি।

হেলু মাস্টারও নিশ্চিন্ত হয় ওর কথায়।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম। দাঁড়ান, আলোটা উসকে নিই, হ্যারিকেনের কাঁচে যেন গ্রহণ লেগেই আছে। কেবলই ঝাপসা।

চুপ করে এগিয়ে চলে ওরা দুজনে রাতের অন্ধকারে।

অশোকের মনে ক'দিন ধরেই চলেছে এমনি এক ছন্ন-ছাড়ার সুর। মাঝে মাঝে দেখেছে কি যেন একটা নিবিড় হতাশা আর বেদনার অন্ধকার ছায়া নামে মনে। সব আলো ঢেকে দেয়, মুছে দেয় সব সুর।

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখেছে সমাজের শুধু এই ভাঙ্গনের রূপ। ভাঙ্গছে সব কিছু। সবকিছুই আজ মূল্যহীন হয়ে গেছে।

শান্তিপূর্ণ সংসার, ভালবাসা, আত্মীয়তার সম্পর্ক, মনুষ্যত্ব—সব। বোবা নারায়ণ ঠাকুর তাই রাত আঁধারে আজও কাঁদে। মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কাঁদে কোন জড় একটি সত্তা।

প্রীতিও গেছে। কোন কিছুরই দাম ওরা দেয়নি। কদমও আজ যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাবে অতুলের এতদিনের সাজানো সংসার, সব গড়ে তোলার সাধনা। তার মাঝে নিজেকে একান্ত অসহায় একাকী বোধ করে অশোক। মনে হয় এই দুর্বার স্রোতকে সংহত করবার চেষ্টা করা—এই আলোড়নের মাঝে ঘর বাঁধা বাতুলতা মাত্র। কেন বা পড়ে থাকবে সে এইখানে—এতদিন এ প্রশ্নটা মনে জাগেনি। আজ জাগে।

—এসে পড়েছি অশোকবাবু?

হেলু মাস্টারের কথায় চমক ভাঙ্গে অশোকের। গ্রামের বাইরেই লাল ডাঙ্গাটায় গড়ে তুলেছে নতুন ইস্কুল, হাসপাতাল—কো-অপারেটিভ স্টোর-এর বাড়িটার তখনও কাজ চলেছে। ওদিকে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা কোআর্টার তৈরি হয়েছে।

সামনে ওই কঠিন কাঁকুরে মাটিতে দুর্বার সাধনায় ফুটে রয়েছে গোলাপ রজনীগন্ধার গাছগুলো। গোলাপ ফুল ফুটেছে—লাল আর সাদা কতকগুলো বড় বড় ফুল। রাতের বুনো বাতাস ওই গোলাপের গন্ধে পোষ মেনেছে।

কয়েকটা আলো জ্বলছে—অন্ধকার আদিম বন্য পরিবেশে মানুষের বাস গড়ে তুলেছে। সেবা আর শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে শহরের আলোময় পরিবেশ থেকে কারা এসেছে অন্ধকার জগতে, যেখান থেকে দুমুঠো অন্নের জন্য একটা নেশার মত ওরা ছুটে চলেছে দুর্গাপুরের দিকে কলকারখানার কি এক নিবিড় আকর্ষণে। এরা পালাচ্ছে, আর ওরা আসছে জয় করতে, ভীত পলায়মান জনতার মনে প্রতিরোধের আর এ মাটিতে বেঁচে থাকার শক্তির সন্ধান দিতে।

অশোক কেমন ভরসা পায় মনে মনে ওদের দেখে।

ওদের পায়ের শব্দে বের হয়ে আসে নবাগত শিক্ষিকাদের একজন—ওর পিছু পিছু আর দুজনও।

হেলু মাস্টার হ্যারিকেনটা দাওয়ায় নামিয়ে একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলে ওঠে,

—এই যে মা-লক্ষ্মীরা, ধরে আনলাম আমাদের সেক্রেটারিকে। নানা কাজের লোক। সকালে উঠে গাঁ দেখবে—দেখবে এই বুনো ডাঙ্গা একা এঁরই চেষ্টায় নতুন করে গড়ে উঠছে সব।

—নমস্কার! নমস্কার জানায় ওরা, অশোকও।

হঠাৎ কেমন যেন একটু আশ্চর্য হয়, এগিয়ে আসে একটি মেয়ে। সুন্দর স্বাস্থ্য—চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি। বলে ওঠে সে,

—অশোকবাবু:

—শিখা!

চমকে ওঠে অশোক। দীর্ঘ কতদিন পর আজও সে আবার দেখা পেয়েছে সেই হারানো শিখার—হারিয়ে যাওয়া অতীতের।

শিখা সহজভাবেই বলে ওঠে,

—ওঃ কতদিন পর দেখা! আমি তো প্রথমে এ জায়গা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছলাম, শীলাদি তো বলে—এ যে বন আর বন।

হেলু মাস্টার জবাব দেয়,

—তা যা বলেছ মা—বনবাসই বটে। দেখ এবার বন কেটে বসত, নতুন বসতে কেমন লাগে। একটা সুবিধা এর আছে—

—কি? শিখা প্রশ্ন করে।

হেলু বাবু বলে ওঠে,

—নতুন বসত—নতুন মানুষ, নিজের মনের মত করে একে গড়া যেতে পারে। গড়া হয়ে থাকলে তাকে বদলানো যেতো না।

হাসছে বর্ষিয়সী মহিলা,—ঠিকই বলেছেন।

হেলু মাস্টার বলে ওঠে,—কোন অসুবিধা হলে তখুনি জানাবেন। আর এ্যাই খুদি—তুই কিন্তু রাতের বেলায় এখানেই থাকবি।

খুদি লোহার মাথা নাড়ে,—হি গো মাস্টারবাবু, দুধ ডিমও এনে দিছি। কাল হাট করে দু'ব।

অশোকও সায় দেয়।

—যা দরকার দেখে শুনে করিস আর মাহিন্দকে কাল সকালে দেখা করতে বলবি। বাইরে থেকে এসেছেন এঁরা, কোন অসুবিধা হলে তোর আমার সবারই নিন্দে হবে। আর শোন—

খুদি ছোটবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল। অশোক বলে ওঠে,

—তোর ডাবা হুঁকো কলকে এখানে আনিস না, তামাক খাওয়ার নেশাটা ছাড়।

হেসে ফেলে শিখা, অন্যান্য ওরা সকলেই। আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে দীর্ঘকায় বয়স্ক একটি লোক এগিয়ে আসে। পরনে একটা খাকি লং প্যান্ট, হাফশার্ট। বেশ কড়া সুরেই বলে ওঠেন তিনি,

— আমি অবশ্য খুদির নিকোটিন এডিক্টেড স্বভাবটা ছাড়াতে পারি, অশোক! অবশ্য ও যদি বলে।

খুদি বলে ওঠে,

—থামেন কেন ডাক্তারবাবু। ছুটবাবুর উসব ছেঁদো কথা। খেতম বটেক—উ থাকতে। লুকটা মরে গেল, আমাকেও মেরে গেল, সেই খেছি তো খেছিই। নতুন করে আর তো ধরিনি তামুক খাওয়া—

হাসতে থাকে সকলেই।

অশোক পরিচয় করিয়ে দেয়,—নতুন মিসট্রেস্—উনি হেড মিসট্রেস।

হাসতে থাকেন সারদাবাবু ডাক্তার।

—পরিচয় আমার আগেই হয়েছে অশোক, আমারই প্রতিবেশী হবেন। ওঁরা—ওঁদের জানবো না? চা পর্বও হয়ে গেছে। ইউ আর রাদার লেট।

হাসতে থাকেন সারদাবাবু। অশোক বলে ওঠে,—রাত হয়ে গেল, ওদিকে আবার কাজকর্ম পড়ে আছে। চলি।

—হ্যাঁ! সারদাবাবু সায় দেন।

হেলু মাস্টার একটু চায়ের আশাতেই বসেছিল, অশোককে উঠতে দেখে বাধ্য হয়েই উঠল।

চুপ করে ফিরছে অশোক।

রাতের নির্জন অন্ধকারে পথটা কেমন বিচিত্র হয়ে ওঠে আলো-আঁধারির আভায়। মনে একটা হালকা সুর জাগে। পথ—সব পথই কেমন বৈচিত্র্যময়; নইলে কোন্ পথের বাঁকে যাকে সেই শিখাকে আজ এখানে দেখবে কল্পনাও করতে পারেনি। অশোকের মনে হয় তারা সবাই কোন অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা। তাই এই পথ থেকে সরে যেতে পারে না। একপথে হারায়— সঙ্গে সঙ্গেই অন্য বাঁকে মানুষ আবার ফিরে আসে।

বাতাসে সুরটা উঠেছে। ধ্বসেপড়া গ্রামের মাঝে অবিনাশ যেন ভালই আছে। ওর বাঁশিতে সুর ওঠে।

সেই স্বপ্ন দেখার সুর—দুঃখ আর আনন্দ মেশানো সুর। অশোকের মনের সেই কালো মেঘটা যেন অনেকখানি কেটে গেছে। আবার আশার আলো ফোটে।

চুপ করে অশোক পথ চলছে।

হেলু মাস্টারও কেমন চুপ হয়ে গেছে। বাঁশির ওই সুরটা বোধ হয় তার অন্তরও স্পর্শ করেছে।

আওয়ে না বালম

ক্যা করু সজনী।

প্রিয়তমকে হারাবার ব্যর্থতায় মন কেঁদে ওঠে। সে কান্নার সুর জাগে আকাশ বাতাসে—ওরের তারে তারে।

তাই বোধহয় কদম-বৌ কাঁদে—সেই প্রিয়তমকে খুঁজে খুঁজে। কাঁদে স্বৈরিণী মিষ্টি লোহার—জীবনের পথে পথে যে মনের মানুষ খুঁজতে গিয়েছিল—আঘাতই পেয়েছে তার বিনিময়ে; শূন্য জীবন পূর্ণ করতে চেয়েছিল জীবনের প্রসাদে, পেয়েছে গরলনীল তীব্র জ্বালা। শিখা নতুন এসেছে, সেও নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে ওই সুর শুনে চেয়ে থাকে তারাজ্বলা আঁধারের দিকে।

—কি ভাবছিস, হ্যাঁরে?

বান্ধবী শীলার কথায় ফিরে চাইল। বলে ওঠে শিখা,

—বেশ বাজাচ্ছে কিন্তু। ভাল বাজিয়ে মনে হয়, বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের ঠুংরী, না রে?

জবাব দিল শিখা। মনের অতলে কোথায় স্পর্শ করেছে সুরটা। এতদিন যাকে ভুলে ভেবেছে, সেই হারানো অতীত, সেই ব্যর্থ স্বপ্নের ঘোরে ওই কান্না আজ যেন সত্য উঠেছে। অশোককে দেখে সেও অবাক হয়েছে।

এখানে এই নতুন গড়ে ওঠা জনপদে আজ নতুন করে আবিষ্কার করেছে সে অশোককে। সেদিনের তরুণ আজ কর্মযজ্ঞের নীরব একটি হোতা।

খুশি হয়েছে শিখা মনের মধ্যে।

--রাত হয়েছে অনেক।

—হঁ্যা।

শিখা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শীলা ওর দিকে। শি কেমন যেন হঠাৎ বদলে গেছে।

সানাই-এর সুর তখনও শোনা যায়।

আজ রাতে কদমের ঘুম আসে না। এ কোথায় যেন তাকে জোর করে ধরে এনে খাঁচা পুরে রেখেছে ওরা। চারিদিকে এর পাষাণ প্রাচীর। সেই গ্রামের সবুজ পরিবেশ এখানে রুক্ষ-বিলীন। চোখের সামনে দেখা যায় কলবাড়ির দীর্ঘ টিনের চালা—আর ধান মেলবার স বাঁধানো টাকপড়া উঠোন।

ভস্ ভস্ করে বয়লারের শব্দ ওঠে—যেন দিনরাত কে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। ত এতদিনের ঘর, সাজানো সংসার—সব কিছু থেকে জোর করে তাকে টেনে উপড়ে নি এসেছে।

আঁধার আকাশে চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে—চাপ চাপ কালো ধোঁয়া।

ভুবন তখনও ফেরেনি বাসায়। কোথায় ও গেছে।

জাগর রাত্রির প্রহর গোনে বন্দিনী নারী স্তব্ধ জমাট অন্ধকারে। তারাগুলোও আর দেখা যা না। সবাই যেন হারিয়ে গেছে কোথায়। মনে মনে সেই চাপা বিদ্রোহটা জেগে ওঠে।

আর জেগে আছে মিষ্টি লোহার।

বুক জ্বলছে তার। অনেক কষ্টে বাঁধা সংসার—আর অনেক আশা সব ব্যর্থ হয়ে যে বসেছে।

রাত কত জানে না, একলাই বসে আছে দাওয়ায়। দেখেছে ধীরে ধীরে কারিগর লোকা কেমন বদলে গেছে। এর মধ্যে আগেকার সেই মানুষটা আবার মাথা ঠেলে উঠেছে—ক উদ্দাম দুর্বার সেই মানুষটা।

মিষ্টি সেদিন যৌবনের বেগে তাকে পরাস্ত করেছিল—আজ বয়স হয়েছে। বাইরের ম চায় ঘরের নিভৃত শান্তি। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হতে চলেছে।

অপমানিত ব্যর্থ মিষ্টি আজ কারিগরের উপর সব আশা হারিয়েছে—মন ভরে উঠে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ব্যর্থতার জ্বালায়। এমনি করে সে ঠকবে, দুঃখ পাবে তা ভাবেনি।

ধীরে ধীরে বের হয়ে এল পথে। অন্ধকার নির্জন পথ। কোথাও কোন শব্দ নেই। শিশি ভেজা পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মিষ্টি।

ভালো লাগে এমনি নির্জন পথটুকু চলতে। একাই সে জেগে রয়েছে—আর সবাই নিবি শান্তিতে মগ্ন।

বাঁশির সুর জেগে ওঠে—সেই দয়িতবিরহের সুর। মিষ্টির মনে হয় তার জীবনটা এমনি

নেক হাসি আর আনন্দে একদিন ভরে উঠেছিল, তবু অতলে সেই দুঃখ কোথায় একটা ছিল, ই বোধহয় সব ভোলবার জন্যই ঘর বেঁধেছিল সে।

মনে হয়েছিল এতদিন সে যা চেয়েছে তার সবই বুঝি পেয়েছে। এই খুশিতেই ভরেছিল মন। হঠাৎ আজ অনেক বেদনায় বুঝেছে সব ফাঁকি। তবে জীবনে সত্যটা কোথায়? তাও জানে না।

কাঁদছে মিষ্টি। ওর ডাগর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। কিসের টানে হঠাৎ যেন এইখানে এসে ঠেছে।

অবিনাশ ওকে দেখে অবাক হয়।

—মিতেন!

কথা কইল না মিষ্টি। কেমন বিরস চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মনের অনেক খবরই অজানতে জেনেছে—তাই বোধ হয় ওর বুকের জ্বালা বাঁশির সুরে ফুটে ওঠে—মন ছোঁয়।

বাঁশি থামাল অবিনাশ। ওর দিকে বিভ্রান্ত চাহনি মেলে বলে,

—এত রাতে!

—রাত-দিন আর ফারাক কই? অন্ধের আবার রাতদিন।

মিষ্টি কথাগুলো বলে কি এক দুঃসহ জ্বালায়।

—কি মনে করে? অবিনাশ একটু অবাক হয়।

—মন কি বুঝি মিতে, ও শুধু জ্বলে, তাই বেরিয়ে পড়লাম। মনের বড় জ্বালা।

অবিনাশ তাই যেন সুরের আবরণে ওকে ঢেকে রাখে, হাসে।

—মিষ্টি মন থাকাটাই জ্বালা মিতেন। ও শুধু শুধু জ্বলে, অবুঝ হয় আর হু হু কাঁদে।

চুপ করল অবিনাশ। বসে আছে মিষ্টি। আবছা আঁধারে কেমন বিবশ তার চাহনি। বলিষ্ঠ হের একটি নীরব মাদকতা ওর দুচোখের চাহনিতে। রাত্রি গভীর।

হঠাৎ চমকে ওঠে মিষ্টি। অবিনাশের হাতখানা ওর হাতে। সারা দেহে কেমন একটা চাঞ্চল্য নে। অবিনাশ এই মায়াবিনী রাতের স্পর্শে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

এ যেন তার মনের কোন নীরব হাহাকার গুমরে ওঠে ওই সুরের নীরবতায়।

মিষ্টিকে তাই কাছে পেতে চায় সে।

—মিতেন! কাঁপছে অবিনাশের কণ্ঠস্বর।

শিউরে ওঠে মিষ্টি। উঠে দাঁড়ালে সে।

—উঠলে যে!

মিষ্টির মন একটি বেদনায় ভরে ওঠে,

—না, না, মিতে! এ আমি চাইনি, এতো আমি চাইনি।

অবিনাশ অবাক হয়।

—কি হল? ওর দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ।

মিষ্টি উঠে দাঁড়িয়েছে। বেদনা ভরা মন নিয়ে বলে,

—কিছু না।

—চলে যাচ্ছো?

অবিনাশের কথার কোন জবাবই দিল না মিষ্টি। সরে গেল—মিলিয়ে গেল মিষ্টি রাত
অন্ধকারে কোন রহস্যময়ী অধরা এক নারীর মতই।

বাঁশি আর বাজান হল না। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ। সত্যি! মুহূ
ভুলে একটা অন্যায় কোথায় করে ফেলেছে সে।

লজ্জা আসে নিজের মনে। হু হু বইছে বন-ফেরা রাত-জাগা বাতাস—কোথায় ডাকছে
একটা ভুলো পাখি, আবার সব চুপচাপ।

সব আঁধারে ডুবে গেছে।

মিষ্টি বাড়ি ফিরছে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে সারা মন। নিজের জীবনে যাদের দেখেছে—তারা তো এমন নয়। এসে
তারা রাতের অন্ধকারে উন্মাদ হয়ে—মদ্যপ লম্পটের দল। জৈবিক ক্ষুধার বীভৎস রূ
দেখেছে। পঙ্কিল সে নরক থেকে বাঁচবার চেষ্টায় সরে এসেছে ঘৃণায়।

এমন মানুষকে সে চোখে দেখেনি যে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বাঁচতে চায়, নিজে বাঁচাতে চা
তাকে। তাদের মাঝ থেকে কারিগরকে তুলে এনেছিল।

অবিনাশ সে জাতের নয়। আজ রাত্রির অন্ধকারে কোন নীরব স্বীকৃতির চকিত সম্প
খুশিতে মন ভরে উঠেছে মিষ্টির। সে সম্পদ হেলায় হারাতে চায় না সে।

বাড়ি ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মিষ্টি। দাওয়ায় সাটপাট হয়ে শুয়ে আছে লোকটা—পর
তেলকালি মাখা প্যান্ট, একটা নীল কাপড়ের হাফ শার্ট, তেলের দাগে সেটাও রঞ্জিত, আর স
গা থেকে উঠছে মদের গন্ধ।

কারিগর বাড়ি ফিরে দেখে কেউ নেই। মিষ্টির রাত অন্ধকারে এই হারিয়ে যাওয়ার অভ্যা
অনেক দিনই ছিল না, হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে মিষ্টি আবার।

কারিগর আজ বেশ মেজাজেই বাড়ি ঢুকেছে। এখানে তার দাবি, অধিকার সে কেড়ে নিয়ে
নিজেই, তাই মিষ্টির এই রাতের বেলায় বেরুনোটা আজ চোখে পড়ে। এতদিন পর আজ মনে
মিষ্টি তাকে ঠকাচ্ছে।

রাগে গরগর করছে লোকটা।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলল কারিগর। বেশ চড়া গলাতেই হেঁকে ওঠে,

—কোথায় গিয়েছিলি রাতদুপুরে? কোন নাগরের কাছে?

লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিষ্টি। কথা কইল না। আজ মনে হয় জানোয়ার
মত মানুষটা যেন ক্ষেপে উঠছে ধীরে ধীরে।

—জবাব দিচ্ছিস না যে? এ্যাই? জানতা নেহি—ছেনালিপনা ঘুচিয়ে দোব?

সেই শ্যামনগরের কারখানার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে পলাতক মানুষটা। আব
জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। এগিয়ে আসে মিষ্টি। রাগ আর জ্বালা ভরা কণ্ঠে বলে,

—দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিন গুণ। বড় তেল বেড়েছে তুর না?

—চোপ! টুঁটি টিপে দোব। গর্জন করে কারিগর।

—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। খুনে মিনষে কোথাকার। দেখবি সব ফাঁস করে দুব এখু

ম্ষ্টি রুখে দাঁড়িয়েছে।

মকে ওঠে কারিগর। জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। সরে গিয়ে লোকটা বিড় বিড় করছে। আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়। আপোশ করে এই ানের সঙ্গে আর বাস করবে না সে। সব শখ তার ঘুচে গেছে, মুছে গেছে মনের সব । বলে ওঠে মিষ্টি,

—যেখানে খাটবি সেইখানে থাকগে। ইখানে কেন?

ারিগর কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—কি বললি?

—ঠিকই বলেছি। সবাইকে শোনাব তুর কথা। আজ মদ মেরে মাতাল হয়েছিস। গায়ে হাত র আর তুকে ঘরে রাখবো?

প করে গেল কারিগর। মিষ্টি ভিতরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দেয়। আজ তার মনে ঝড় ছ, হাহাকার আর শূন্যতাটা বড় হয়ে দেখা দেয়। সব চাওয়া তার ফুরিয়ে গেছে। ওয়াতেই পড়ে থাকে কারিগর।

ারাটা দিন কাজের পর আজ সন্ধ্যাবেলায় একটু আসর জমেছিল কলবাড়িতে। ভুবনও পাকাপাকি আস্তানা বেঁধেছে ওখানে। বৌটাকেও দেখেছে—কেমন নধর পুরুষ্ট, মেয়েটা। গোকুল এনেছিল ভাল দিশি চোলাই মদ।

হল্লোড় জমেছে রাতদুপুর অবধি। কারিগর মেতে উঠেছিল।

বেশ মেজাজ নিয়ে বাড়ি এসে এই ঝামেলা! কথাগুলো শুনে নেশা ছুটে যায় তার। আজ রাগে ফেটে পড়েছে। সব খবরই জানে সে।

ম্ষ্টি জানে তার আগেকার পরিচয়, তাই ওকে নিয়ে এসেছিল সে এই অন্ধকার পল্লীর —তাকে ভুলিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

কারিগরও এতদিনের জীবনটাকে ভুলে গিয়ে নিজেও এই নিভৃত পল্লীর সবুজে হারিয়ে চেয়েছিল, কিন্তু সেই মন আর বুভুক্ষা তাকে রেহাই দেয়নি।

াব কোনদিকে ছারখার হয়ে গেল।

লের নেশা আছে—নেশা আছে সেই মত্ত লৌহদানবের। একবার যে তার পাকে পড়েছে ার রেহাই নেই। বার বার তাকে ডাক দেবে কি দুর্বার আকর্ষণে, তার সব রস নিংড়ে করে নেবে—দেহমনের সব রস। তারপর ছিবড়ে করে ফেলে দেবে।

াই সেই জীবনকে ভুলতে পারেনি শ্যামনগর মোল্ডিং মিলের পুরোনো কারিগর। পারার মত সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে। মন ছাপিয়ে উঠেছিল আবার সেই মাদকতা—উন্মাদনা। াত হয়ে আসে।

প্ দপ্ করে জ্বলছে মধ্য-আকাশের নীলাভ তারাটা। পল্লীর সবুজ স্নিগ্ধতার মাঝে ওকে র অন্য চোখে দেখেছে।

ঠে বসেছে কারিগর। মাথার মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা। চোখের সামনে সেই ছবিটা ফুটে ওঠে। সেই বীভৎস ছবিটা এখনও ভোলেনি সে। মেঝে ভরে উঠেছে রক্তে। ছটফট করছে বৌটা

দুঃসহ যন্ত্রণায়। মদ্যপ উন্মত্ত সেই লোহামিস্ত্রি তখনও পিটে চলেছে তাকে। হাতের সেই কাঠ ফেলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে বের হয়ে পড়েছিল কারিগর।

অতীতের সেই ছবিটা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আতঙ্ক আর ভয়ে কেমন শিউরে কারিগর।

জানে। ওরা জানে, মিষ্টি জানে তার অতীতের সেই কলঙ্কময় ইতিহাস—খুনের ফে আসামী সে।

সব তার হারিয়ে গেল। মাঝখানের এই ক'বছরের দিনগুলো,—শান্তি আর নিশ্চিন্ত দিন। ভয় করে আজ কারিগরের। পালাবে সে।

পালাবে এখান থেকে। আবার হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে যেখানে কেউ আর খ পাবে না তাকে।

পুব আকাশে দুর্গাপুরের ব্লাস্টফার্নেসের আলোটা দীপ্তশিখায় জ্বলছে।

পা পা করে উঠে এল কারিগর দরজার কাছে। পিছনে ফিরেও চাইল না। দরজাটা ভে দিয়ে জনহীন পথে নামল রাতের অন্ধকারে। চলেছে সে। জোরে পা পালিয়ে আঁধারে হা গেল নিঃশেষে।

যন্ত্রদানবের ইশারায় আবার একটি মানুষ সবুজ গ্রামসীমা, শান্তির নিভৃত জীবন নির্বাসিত হল ওই অগ্নিকুণ্ডের দিকে। কারিগরও হারিয়ে গেল।

বাজপড়া তালগাছের মত মুষড়ে পড়েছে অতুল কামার। ভুবন চলে গেছে। ভুবনের নয়, বুকের একখানা পাঁজরা গেছে ওই কদম-বৌ এর সঙ্গে। এ বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী মুছে গে

আজ কামারপাড়ার সমবায়, ওদের সকলকে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে পানু। ভাব পড়েছে তারা। তাই আজ আলোচনা করতে বসেছে সকলেই।

চুপ করে বসে থাকে অশোক—ওরা সকলেই।

ষষ্ঠীচরণ বলে ওঠে, -পানু দাস তো কারখানা জোর চালিয়েছে ট্রাকে করে মাল চা দিছে। ভুবনই উঠে পড়ে লেগেছে। দেখলাম তাকে মহাজনের ঘরে।

বলে অতুল,—চুপ দে! ওর কথা বলিস না যষ্ঠে !

চমকে ওঠে ওরা। বুড়ো বলে ওঠে,

—তোরা পারিস—চালা। তবেই ইয়ার জবাব হবে। ওকে হারাতে পারবি নাই?

বুড়ো কি ভাবছে।

শালের আগুনে গনগন করছে ঘরখানা। কেমন ভাপসা গরম। ভাবনায় পড়েছে কাজের লোক নাই—যা মাল তৈরি হচ্ছে তাও সামান্য। বলে চলেছে যষ্ঠী,

—দরও কম করেছে পানু!

অতুল তবু তেজভরা কণ্ঠে বলে,

—করুক। ট্যানা পরে থাকিস—একবেলা খেয়ে। দিনকতক টিকে থাকতে পারবি না

অতুল কামার ছেলে-ছোকরাদের দিকে চেয়ে থাকে। চোখে ছানি পড়ে আসছে। খে

চোখের সামনে কেমন অন্ধকার নামে। ওদের চোখেমুখে দেখেছে অতৃপ্তির ছায়া। দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নিজের মঙ্গলের জন্যও টিকে থাকবার ক্ষমতা বা জোর ওদের যেন নেই।

গদা কামার কি ভাবছে। পাড়ার পদাই, বসন্ত, খেতন—সবাই কারখানায় চাকরি নিয়েছে। ার বাকি তারা জীবনে কিছুরই স্বাদ পেল না। ভাবছে এখান থেকে তারাও ওই পানুর ওখানে ল যাবে কিনা।

অশোকও মনে মনে কেমন হতাশ হয়।

পানু দাস সত্যিই এদের মূলে আঘাত হেনেছে। পানু দাস নয়—এই যুগ। পানু একটা উপলক্ষ মাত্র। ওরা বিচলিত—বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জানে না কেমন করে এই বিপদ থেকে মুক্ত হবে। নের জোরটুকুকেও যেন হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

হঠাৎ জীবনকে আসতে দেখে দাঁড়ায় অশোক।

জীবন পকেট থেকে ফর্মটা বের করে, দুর্গাপুরে চাকরির ব্যাপারে গ্রামপ্রধানের একটা লাগবে।

—কালী!

অশোকের ডাকে এমোকালী শাল থেকে কয়লামাখা অবস্থাতেই উঠে আসে। বলে ওঠে অশোক,

—একটা সই করে দাও ওতে।

—যাই!

অবাক হয়ে থাকে কালী, ওই ছাপান কাগজে তার সই চাই, দুর্গাপুর কারখানার কর্তারা বেই পাকা চাকরি দেবে ওকে!

রীতিমত অবাক হয়ে গেছে সে, একটু সামলে নিয়ে হাতের কালিঝুলি পরনের ট্যানায় মুছে করে কম্পিত হাতে। কেমন যেন মনে হয় রাতারাতি ওদের একটা স্বীকৃতি নছে।

জীবন কাগজখানা নিয়ে বের হয়ে গেল।

কি ভাবছে অশোক।

তারকবাবুর ছেলে। পঁচিশ বছরের প্রেসিডেন্ট দুর্দান্ত সেই জমিদার। তারই ছেলে আজ রখানায় যাচ্ছে সেমিস্কিলড্ লেবার হয়ে, তার সার্টিফিকেট সই করছে অখ্যাত অজ্ঞাত একটি য—পরগাছা কালীকান্ত কর্মকার। সেই সই না থাকলে ওই চাকরিও জুটবে না।

সাধারণ মানুষকে কি এক নীরব স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছে এযুগ। ওরা হয় তো আজও তার বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারেনি সে দায়িত্বের কথা।

কালীও একটু ঘাবড়ে গেছে।

—ছুটবাবু।

অশোক কালীর দিকে চাইল।

কালী বলে ওঠে,—ব্যাপারটা ঠিক বোঝলাম না ছুটবাবু! চাকরি—

অশোক বলে,

—চাকা ঘুরছে কালী। তোমাদেরও বদলাতে হবে, ওই স্বীকৃতির যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

অতুল কর্মকার উঠে আসে। লাঠিখানায় ভর দিয়ে বুড়ো এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা সে দেখছিল। খুশি হয়েছে মনে মনে।

অতুল বলে ওঠে,

—তাই বোঝান উদিকে ছুটবাবু। শালারা এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখল না, মাথ নীচু করে পা চাটবার জন্যে দৌড়চ্ছে। একশালা আগেই সেই জাহান্নামে—সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে গেছে! মাকে—

কেঁদে ফেলে বুড়ো। কান্নায় ওর গলার স্বর বুজে আসে।

অশোকের সামনে কথাটা আজ সত্য বলেই মনে হয়।

প্রথম চেতনার যুগ। জড় অসাড় পদার্থে প্রথম সাড়া আসছে। তার কঠিন দেহের অণুপরমা কাঁদছে কি এক প্রচণ্ড আলোড়নে। সইতে পারলে তাতে সাড়া বের হবে, সচেতন হয়ে উঠবে সেই সুপ্ত হারানো প্রাণ। সার্থক হবে।

যার ওই কম্পন সইবার ক্ষমতা নেই, সেই প্রচণ্ড আলোড়নের ধাক্কায় সে চুরমার হয়ে যাবে। খান খান হয়ে খসে পড়বে। কিছু খসে পড়ার পরও বাকি যারা থাকবে তারা প্রাণময় হয়ে উঠবে—দেখবে বহু বাধার পর নতুন দিনের আলো ভরা পৃথিবীকে দুচোখে মেলে।

তাই খসছে সবকিছু, ভাঙ্গছে চারিদিক। নতুনকে গড়ে তোলার সাধনায় আজ মানুষকে ভাবতে হচ্ছে অনেক কিছু।

তাই তারকরত্ন বাবুর দুশোবছরের জমিদারির স্বর্গ ভেঙ্গে গেছে। ভেঙ্গেছে নারাণ ঠাকুরের ঘর, বদলে গেছে বাউরীপাড়ার লোকগুলো—এ গ্রামের জীবনযাত্রা।

ফাঁকা পথ দিয়ে আসছে অশোক।

ছানু দাসের দোকানের পাশে ওদের আড্ডা তখনও ভাঙ্গেনি।

দুপুরের রোদ চড় চড়ে হয়ে উঠেছে, আমগাছের বোল গেছে শুকিয়ে, গুটি ধরেছে তালফুলের কাঁদিতে সবে গোল দানা পাকাচ্ছে।

ধরণী, অবনী, ফণী মুখুয্যে, মণি দত্ত—আরও অনেকেই বসেছিল। ক'দিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা করেছে, কোন পথ পায় নি। এইবার সত্যিই বিপদে পড়েছে তা অনুভব করতে পারে তারা।

ডেকে ডেকেও মজুর মুনিষ মাহিন্দার মেলেনি। জমি বেবাক পড়ে আছে তাদের, আরও অনেকেরই। ওই জমি কি চাষ হবে না?

অশোককে দেখে ফণী বলে,

—কি হবে এবার ছোটবাবু? জমি যে ফাটলে যাবে! এখন বয়সও নেই যে কারখানায় কাজ দেবে! আর গাঁয়ের মুনিষ জনও তো কারখানায়, বলে, দেড় টাকা রোজ—বাঁধা ভিটা, কে যাবে কিলা রোদে জলে গরুর পিছনে লাঙ্গল ঠেলতে? এ্যাঁ?

মণি দত্ত বলে ওঠে,—শালোদের মেজাম যেন তাতা তাওয়া, হাত দেবেন তো ছ্যাঁকা উদেরই দিন এয়েছে। দেখছ না কাঁচা পয়সার বছর!

এ নিয়ে অশোকও ভেবেছে, কিন্তু সমাধানের কোন পথ পায়নি। পুরানো পন্থায় আর চলা যাবে না। চুপ করে সরে এল। কথাটা মনে মনে ভাবে।

এই যান্ত্রিক যুগ আর এমনি সভ্যতার আগবাড়িয়ে চলার তালে পা ফেলে সবকিছুকে চলতে হবে। নইলে টিকবে না কিছুই। এই চাষ, কৃষিব্যবস্থা—সে সমস্ত সনাতন রীতিতে চলবে এই যন্ত্রযুগে, ওই যন্ত্রদানবের রাজ্যে এটা কখনও সম্ভব নয়।

চাষ-আবাদ এবার কি করে তাই ভাবছে সকলে। জন মজুর তেমন নেই গ্রামে। সবাই চলেছে কল-কারখানায় কাজ করতে। নিঃস্ব শূন্য মাঠ পড়ে আছে। চাষও দেয়নি কেউ।

চাষ না হলে সমূহ বিপদ। তারা ভাবনায় পড়েছে। অশোকও অনেক ভেবেছে এ নিয়ে, ওদের কথার কোন জবাব দিতে পারেনি তখন।

পাখি ডাকছে। দিঘির কোলে কালো জলসীমার ধারে সবুজের নিশানা। বাইরের অশোক গাছের কালো পুঞ্জীভূত ডালে রক্ত-লাল ছোপ, বকুল গন্ধে উদাস অপরাহ্ন বেলা আমন্থর হয়ে উঠেছে।

অশোক খানিকটা ভেবে-চিন্তে তৈরি হয়েছে এ বেলায়।

নীলাম্বরবাবু, মণি দত্ত, বুড়ো অতুল কামার, কালী, ষষ্ঠীচরণ—আরও অনেকেই এসেছে। ওরাও কথাগুলো শোনে মন দিয়ে। কি যেন আশার কথা।

পরিষ্কার হিসাব কষে দেখায় অশোক।

—যারা গ্রামে ঘর পাঁচশো বিঘে ধানজমি আছে, তাতে চাষ করতে লাগে পঁচিশ জোড়া বলদ, পঞ্চাশজন মুনিষ আর দুজন সরকারই যথেষ্ট। আর যদি একটা ছোট ট্রাক্টর হয়—নিজেদের জমি চাষ তো হবেই, ভাড়াও খাটানো যাবে; তাতেই খরচ উঠে আসবে। এই বলদ মুনিষ আর সরকার রেখে চাষ করে যা উৎপন্ন হবে তাতে দাম মিটিয়ে মালিকদের যা থাকবে নিজের মুনাফা, খরচ করে চাষের থেকে তা কোন অংশে কম নয়।

অশোক একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে,

—আর এখন কি হচ্ছে—এতকাল?

কালী হিসাব করে বলে ওঠে,

—তা আজ্ঞে ঘর ঘর মরুণ্ডে বাছুর ছানা প্রায় জোড়া পঞ্চাশ ষাট মিলবে, মুনিষ কামিন লিয়েও ধরুন লাগে শ দেড়েক দুয়েক, আর সরকার তো ঘর ঘর—তা দশ বিঘের চাষই হোক আর বিশ বিঘের হাল ফালই হোক। আর তার খরচও তেমনি বেশি পড়ে গড়পড়তা।

অশোক বলে ওঠে,—এদ্দিন সকলেই বেকার ছিল, ওভাবে তাই চলেছে। এখন লোকে কাজ পাচ্ছে, কাজ করতে হবে। একশোই হোক আরা আশি টাকাই হোক, এর চেয়ে বেশি পাইনে; তাই চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে। এখন কি আর সেভাবে চলবে? চাষেরও নতুন ব্যবস্থা আর পথ বের করতে হবে।

অতুল কামারও ভেবেছে কথাটা; সেও দেখেছে তার পাড়ার লোকদের এতে পোষাবে না; সামান্য জমি, হাল-ফাল করে সবাই লোকসানই দিয়েছে।

মাথা নাড়ে সে,—ছুটবাবু! জমি আর রাখতে লারবো।

অশোক বলে,

—তাই বলছি এমনিতেই যদি জমি ছেড়ে দেবে, দু এক বছর এই ভাবে যৌথ চাষ করে দেখ। তবু মাটির সম্পর্কটা থাকবে, আর নিজেদের লোকই চাষ করবে।

অতুলের কথাটা ভাল লাগে। ওরা যৌথ ব্যবস্থা করছে বাসনের, নিজেরা ঠিক্ থাকলে লোকসান হবার ভয় নেই। বলে ওঠে,

—হিসাব তো সাফই মনে হচ্ছে ছুটবাবু!

অশোক কি ভাবছে। যন্ত্রপাতিও কিনতে টাকা পাবে, সাহায্য পাবে। একটা প্রচেষ্টা করতে মন চায়। ষষ্ঠীচরণ অতুলের কথার জের টেনে বলে,—হিসেব তো সাফই লাগছে।

অশোক জবাব দেয়,

—দেখতেও সাফ হবে ষষ্ঠীচরণ!

—আর ওই যে কলের নাঙল বললেন?

কালীর কথায় হাসে অশোক,—একটু এগোলেই হবে, একটা পাম্পও আনতে হবে।

অবাক হয় ওরা।

—পাম্প!

—জল সেচ হবে।

—ও! দেখেছি বটে দামোদরে বাঁধ হবার সময়। ভক্ ভক্ জল উঠছে, তেমনি?

—হ্যাঁ।

অতুল ওর দিকে চেয়ে থাকে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে।

অশোক বলে ওঠে,—কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে আগে। না হলে এটা দাঁড়াতে পারবে না।

বুড়ো অতুল বলে ওঠে,

—বিশ্বাস! এ যুগে বিশ্বাস কে কাকে করবে ছুটবাবু! তবু দেখেছি দামোদরের বানে ডোব একই গাছে সাপ আর মানুষ একসঙ্গে বাস করেছে। কেউ কাউকে ছোবল মারেনি।

নীলাম্বরবাবু বলেন,—সেইটাই জীবনের ধর্ম অতুল! তেমনি বিপদের দিনে আজ আমরাও হয়তো শুধু বেঁচে থাকার দরকারেই আপাততঃ ওটা ভুলবো।

কালী তাগাদা দেয়,—তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ডেকে জানিয়ে দিই কারা জমি দেবে—কার দেবে না। তেমনি কাজ শুরু করবো।

—আর আমরা? আমরা কি হিসাবের বাইরেই থাকবো ছুটবাবু?

নিতে বাউরী বসেছিল এক কোণে, সঙ্গে বাউরী, লোহার পাড়ার আরও দু'চার জন। মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

মাটির সঙ্গে আজন্ম সম্বন্ধ তাদের, এ কথায় তারা সার বুঝেছে। তাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

অশোক বলে,—তোদের তো আগেই চাই নিতাই। বাউরী পাড়ার, লোহার পাড়ার যে ক'জন কাজ করতে চায় কালই খবর দে। হপ্তাহে মাইনে পাবি। আর ধান পোঁতার সময়—কাটার সময় দেড়া মাইনে। তার পর আর কি করা যায় ভেবে দেখবো।

অশোকও যেন ডুবে যায় কাজের নেশায়। আবার সেই নেশায় পেয়ে বসে তাকে। যে নেশায় মত্ত হয়ে গড়েছে ছেলেদের স্কুল, গার্লস স্কুল, ডাক্তারখানা, সেই নেশায় আজ দুর্বার শক্তি নিয়ে মেতে উঠেছে গ্রামের এই সমস্যার সমাধান করতে।

বেশ পড়াশোনাও শুরু করেছে, দেশ-বিদেশের কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর কথা, তাদের সমস্যা—তার সমাধান। কতখানি সাহায্য সহযোগিতা কোথা থেকে কি ভাবে আসবে তাও ছক নিয়ে কর্মসূচী করে তুলেছে।

এ নিয়ে অনেকদিন হতে পড়াশোনা—কাজ-কর্ম শুরু করেছে। সদরেও যোগাযোগ করেছে; কিন্তু কথাটা পাড়েনি নিজে থেকে। ওদের দিক থেকে সমস্যাটা বড় হয়ে উঠলে তখনই কথা বলার সুযোগ হবে। তার আগে সে পরিকল্পনাটার সুযোগ বুঝি করে নিতে চায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে কাগজগুলো দেখছে অশোক। হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। অবাক হয়ে যায়,—তুমি।

শিখা এসেছে। সহজ ভাবেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে সে।

—কি এত কাজ করেন জানি না, বৈকালে শুনলাম রীতিমত মিটিং করেছেন?

—হ্যাঁ। একটু ব্যস্ত ছিলাম। কালই একবার সদরে যেতে হবে। একটা বড় কাজে হাত দিয়েছি।

হাসে শিখা,—তা বিরুদ্ধ দলের তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম।

একটু অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল অশোক।

—মানে!

হাসে শিখা সহজ মিষ্টি একটু হাসি। সুন্দর মুখখানাতে সেই হাসিটুকু ছড়িয়ে পড়ে। এখানে এসে শিখা ক'দিনেই এখানকার অতীত দিনের জীবনযাত্রা ও সেই মানুষগুলোকে চিনে ফেলেছে। ওদের কথাও জেনেছে। বলে ওঠে শিখা,

—ওই অবনীবাবু, টাকপড়া এক ভদ্রলোক, আরও সব কারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে মুণ্ডপাত করছিলেন শুনলাম।

হাসে অশোক,—তাই নাকি।

শিখা বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, তারকবাবুর বাড়িতে ওঁরা ছিলেন। মণিমালা আমার পরিচিত, তাই দেখা করতে গিইছিলাম। বেচারা।

অশোক চুপ করে থাকে। শিখাই বলে ওঠে,

—আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি, আগেকার মতই তেমনি গোঁয়ার—একগুঁয়ে রয়ে গেছেন।

অশোক বলে,—মণিমালাকে দেখে খানিকটা বুঝেছেন নিশ্চয় আজকের পরিবর্তনটা। এখানের দিনগুলোও বদলে গেছে।

চুপ করে থাকে শিখা। কি ভাবছে সে। জবাব দেয়,

—হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।

অশোক বলে ওঠে,

—সেই বদলের প্রবল স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে সামগ্রিকভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছি শিখা; একা নয়—সবাইকে নিয়ে। আজও ওরা এ মতে বিশ্বাস করে না তাই নিন্দা করে, করবেও। হয়তো চরম আঘাত হানবে।

অশোক মনে মনে সেই একটার পর একটা আঘাতের কথা ভেবেছে। এতদিনও তারা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে, এখনও করবে। কিন্তু উত্তীর্ণ তাদের হতেই হবে। পরাজয় মানে হারিয়ে যাওয়া, অপমৃত্যু। শিখা প্রশ্ন করে,

—তবুও থামবেন না?

দৃঢ় কণ্ঠে বলে অশোক,

—হেরে যাবো কিনা জানি না, মনে হয় জিতবোই। ওরা এই দারুণ বিপদের কথা স্মরণ করেনি। এখনও বিশ্বাস করে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু এ ভুল যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন বানেডোবা গাছে সাপের হিংসা ভুলে গিয়ে বাঁচার মত তারাও হিংসা ভুলে বাঁচবার চেষ্টাই করবে। আমাদের হাতে হাত মেলাতে বাধ্য হবে।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে শিখা। কালো ডাগর চোখে কি যেন মায়া। একটা কঠিন শপথে যেন অশোকের দুচোখ জ্বলছে।

শিখা চুপ করে চেয়ে থাকে অশোকের দিকে। অতীতে, প্রায় কৈশোরের দিনগুলোয় অশোককে দেখেছিল, অনেক অজানা স্বপ্নই গড়েছিল তাকে কেন্দ্র করে, কত দিন কেটেছে নদীর ছায়া আলো ঘেরা সন্ধ্যায় তাদের দুজনের।

তারপর সব কেমন হারিয়ে গিয়েছিল। পথ চলেছে একা শিখা। ক্লান্ত অসহায় একটি নারীর আজ মনে হয় আবার সব যেন সে ফিরে পেয়েছে। মনের সেই সুর, আনন্দ, সব কিছু তারও জীবনে হারিয়ে যায়নি।

আজ এমনি দিনে নতুন জীবনের এই ভাঙ্গাগড়া তাকেও বিচলিত করেছে। অশোকের কাছে এসে সেই নিবিড় একটি সংবেদনশীল মনের পরিচয় পায়।

শিখার মনে তারই উত্তাপ। বলে ওঠে,

—মনে হয় এখানে এসে ভালোই করেছি।

একটু অবাক হয় অশোক।

—কেন?

—একটা যুগের নিদারুণ ব্যর্থতার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছি এই ধ্বসেপড়া গ্রামের বুকে প্রথমে দেখেছিলাম সবুজ হলুদ বন আর লাল গেরুয়া ডাঙ্গার বুকে হুমড়ি খাওয়া একটা গ্রাম আর তার মানুষগুলোকে। কিন্তু তাদের এত সমস্যা—এত জ্বালা তলিয়ে দেখিনি।

হাসে অশোক, মলিন ক্লিষ্ট হাসি। বলে ওঠে,

—সব গ্রামের, সব ঘরের, প্রতিটি মানুষের বুকে আজ এমনি জ্বালা শিখা; কেউ বুঝেছে—কেউ বুঝতে চায়নি। কিছু লোকও এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, বাঁচতে চায় নতুন করে। দেখছ সেই বাঁচার প্রচেষ্টা?

শিখা আজ নিজেকে কেন্দ্র করেই সেটা বুঝতে পারে। সব হারিয়ে একাই পথ চলছিল। সভ্যজগৎ তাকে দিয়েছে শুধু বেদনা আর ব্যথা। তাই ওখান থেকে বের হয়ে এসেছিল সবুজ পল্লীপ্রান্তরের নির্জনতায়, কিন্তু এখানে এসে ও দেখেছে সেই দুঃখ বেদনা আরও প্রকট। মানুষের আজ কোথাও নিষ্কৃতি নেই, সে বাঁচতে চায় তবু।

শিখাও এখানে এসে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। মনের অতলে সেই আশাটুকু ফিরে পেয়েছে সে।

এই তারাকিনী রাত্রে তাই শিখার মনের আঁধারও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কি নতুন আশার আলোয়।

দেখেছে শিখা মণিমালাকেও, এখানের সব কিছু তাদের চলে গেছে। সারাগ্রামে দেখেছে মধ্যবিত্ত সমাজের অপমৃত্যু! একটা সমাজ লুপ্ত হতে চলেছে। মানুষও বদলে যাচ্ছে।

পুবদিকের আকাশে দুর্গাপুর শ্লাগব্যাঙ্ক-এর আলো, জাগে,—লালাভ প্রচণ্ড জ্বালার দীপ্তিতে সব মুছে ফেলেছে। তারই দিকে চেয়ে বলে ওঠে অশোক,

—ওই দিকে চেয়ে কি মনে হয় জানো?

—কি! অবাক হয়ে প্রশ্ন করে শিখা।

বলে ওঠে অশোক,—ওই যন্ত্রদানবের নীরব চোখরাঙ্গানো দেখে বলি, তুমি জয় করতে পারবে না আমাদের, তোমার আগুনের তাপে শুকিয়ে আমাদের অন্তর—ঘর—সবকিছু ছাই করে দিতে পারবে না। তোমাকে অগ্রাহ্য করে নয়—তোমাকে স্বীকার করে, তোমার পাশেই আমরাও নতুন ঘর গড়ে তুলবো।

বলে ওঠে শিখা—শিল্প-বিপ্লবও মানবেন না?

অশোক বলে,

—মানবো। তবে তার ধ্বংসটাকে ঘটতে দেবো না। মানুষ যদি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যায়, সই সঙ্গে অন্তরের তার পুঁজি কিছু থাকে, শিক্ষার পুঁজি, মানবিকতার পুঁজি—যন্ত্র তাকে মানুষ করে দিতে পারে না।

অশোক কথাগুলো বলে চুপ করে। কি ভাবছে। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে অশোক,

—কিছু ধুয়ে মুছে যাবে, কতক বদলে যাবে, কিন্তু বাকি যারা থাকবে তারা জীবনকে সুন্দর হনীয় করে তুলবে প্রাণের স্পর্শ দিয়ে, ভারতের সেই পুঁজি আছে শিখা। সেই সংস্কার তার রায়নি।

অশোক ভেবেছে কথাগুলো, এমনি পরিবর্তনের দিনে, মানুষ অমানুষ হয়ে উঠতে পারে। ন্তু তার পায়ের নীচে যদি মাটি থাকে সে আবার দাঁড়ায়। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে নতুন বনকে সুন্দরতম করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

শিখা ওর কথাগুলো শুনে চলেছে। বাতাসে বকুলগন্ধ; তারার আলো কাঁপে দিঘির জলে। তজাগা ডাহুক পাখি একবার ডেকেই থেমে গেল।

—রাত হয়ে গেল।

শিখা বলে,—আজ মুড়ে আছেন দেখছি।

হাসে অশোক। বলে ওঠে,

—চল, এগিয়ে দিয়ে আসি তোমায়।

হাসে শিখা,—না, একাই যেতে পারবো। রাত বেড়ানো অভ্যাস এখনও আছে।

হালকা কণ্ঠে বলে অশোক,—তা তো দেখতে পাচ্ছি।

বের হয়ে গেল শিখা। কথাগুলো সেও ভাবছে। কোথায় যেন তার মনেও অশোকের চিন্তার সংক্রমণ দেখা দেয়।

দেখেছে কেমন কালোছায়ার মত একটা হতাশা আর ক্লান্তি এদের আকাশ ঘিরে এসেছে।

নির্জন পথটা দিয়ে শিখা আসছে বাসার দিকে, হঠাৎ কাদের আসতে দেখে দাঁড়াল পথের ধারে। প্যান্টপরা কয়েকটা মূর্তি, মুখে বিড়ি না হয় সিগ্রেট। ওকে দেখেই একজন দাঁড়াল।

—মীনাকুমারী যে বাবা। 'মহল' দেখছি না কি? আয়েগা—আয়েগা!

সরে যাবার চেষ্টা করছে শিখা, কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে।

নির্জন অন্ধকার পথ, গ্রামের পথেও অমনি মাতাল বেপরোয়া মানুষ দেখতে সে অভ্যস্ত নয়, তাই ভয় পেয়েছে।

চমকে উঠেছে শিখা। এখানটার একদিকে দিঘি, অন্যদিকে খানিকটা ক্ষেত। লোকজন নেই বিশেষ।

ওদের বেসুরো কণ্ঠের চীৎকারে ভয় লাগে তার। এগিয়ে আসছে একজন এই দিকেই

শিখা হঠাৎ কাকে আসতে দেখে সরে যাবার চেষ্টা করে। লোকটা আঁধার ফুঁড়ে সাম এসেছে, ওই মাতাল দুজনকে দুহাতে ধরে আশমানে তুলে প্রচণ্ড ভাবে ঠোকাঠুকি লাগি দেয়। গর্জাচ্ছে।

—হারামজাদারা, দুর্গাপুরের পাইপের জল পেটে পড়ে সাহেব হয়েছিস? শুয়োরের বাচ্চা

প্রচণ্ড দুই চড়ে ছিটকে পড়ে দুজনে দুদিকে। উঠতে যাবে, লাথির চোটে ঢালু পাড় দি সশব্দে গিয়ে ছিটকে পড়ল দিঘির জলে। অন্যজন উঠে পড়ে দৌড় মারে সামনের দিকে বনবাদাড় ভেদ করেই।

—আপনি দিদিমণি! লোকটা ভয়ে জড়সড় শিখার দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। শি বলবার চেষ্টা করে,

—আপনি না এসে পড়লে—

—কোন ভয় নাই আপনার। এমোকালীকে এ চাকলার লোক চেনে।

একটু অবাক হয় শিখা,—আপনি কালীবাবু! গ্রামপ্রধান।

হাসছে কালী,—আজ্ঞে আমি এমোকালী। ওসব বলে লজ্জা দেবেন না। চলুন এগি দিই পথটা।

—না, এসে গেছি। আর দরকার হবে না।

হঠাৎ দাঁড়াল কালী,—শুনুন।

—কি!

—এসব কথা ওই সেক্রেটারিবাবু, মানে অশোকবাবুর কানে যেন না ওঠে, তালে ল আর শেষ থাকবে না। ছিঃ ছিঃ। এ আর হবে না কুনদিন।

জলে পড়া লোকটা উঠে আসছিল, চকিতের মধ্যে আর একটা লাথি খেয়ে জলে গড়িয়ে পড়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে। গজরাচ্ছে কালী ওই দিকে চেয়ে।

—শালো উঠবি কি! অ্যাঁ! কোঁৎ কোঁৎ করে জল গিলে হাবুডুবু খা চোয়রাত। উঠেছিস্ কি ফের লাথিতে প্যাট ফাটাবো শালোর—আম্মোও রইলাম দিঘির ধারে ঠায় বসে। আয়েগা—আয়েগা! দেখ শালো তুর যম এয়েছেন ইবার।

শিখা হাসি চেপে বাড়ির পথ ধরে। প্রহরীর মত কালীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে আবছা তারাজ্বলা অন্ধকারে।

অশোকের কথা মনে পড়ে শিখার। কিছু লোকও বেঁচে থাকবে এই দুর্দিনে, তারা অন্তত নতুন করে বাঁচতে শিখবে—মানুষের মত।

তারকরত্ন কথাটা শোনে ওদের। ফণী, অবনী—আরও কারা এসেছে। নীচের বৈঠকখানায় আর সলা বৈঠক বসে না। তারকবাবু নীচে নামে না—শরীর খারাপ। আর সেই তালবেতালও নেই যে রাজা বিক্রমাদিত্য পূর্ণ বিক্রমে নিজের সিংহাসনে বসে বিচার করবে। তাদের কথাগুলো শোনে মাত্র। অবনী গজরাচ্ছে।

—যা ছিল সরকার নিয়েছে জমিদারী উচ্ছেদের নামে। বাকি যা আছে সেটুকু নেবে ওই লিডাররা যৌথ কৃষি ফার্ম-এর হুমকিতে। ঘরের ঢেঁকি কুমির, তোমার ওই ভাগ্নে অশোকের এসব বদবুদ্ধি।

টাকে হাত বুলিয়ে ধরণী মন্তব্য করে,

—জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। খাল কেটে কুমির ঢুকিয়েছ এখন ঠ্যালা বোঝ এইবার। আমার বাবা জমি পড়ে জল খাবে সেও বি আচ্ছা—ওসব ফাঁদে পা দিতে যাবো নাই।

তারকবাবু কথা বলে না। সারা মনে তার একটা দুঃসহ ব্যথা। এতদিনের প্রেসিডেন্টগিরি ছেড়ে দিতে হল। কামারদের কালী হল কিনা গ্রামপ্রধান। নিজের এতদিনের চেষ্টার ফলে ওই ইস্কুল, সরকারী ডাক্তারখানা সব গড়ে তুলেছে অশোক। এতদিনে সে যা পারেনি, অশোক তাই করেছে।

আজ তারকবাবুকে লোকে ভুলে গেছে, সেই লজ্জায় বের হয় না। জমিদারী যথাসর্বস্ব যাবার চেয়ে এ দুঃখ কম নয়। চোখের উপর দেখেছে তার একমাত্র নাতনী মরেছে বিনা চিকিৎসায় একরকম তিলে তিলেই।

ছেলেকে বের হতে হয়েছে লোহাকারখানার কাজে, কি কাজ সে করছে, সেখানে তা দেখেই অনুমান করতে পারে। বৌমার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।

ঘরে বাইরে তার দুঃসহ লজ্জা।

একটু আগেই দেখেছে স্কুলের নতুন মিসট্রেসকে ভিতরে যেতে, মণিমালার বন্ধু।

অশোকও কথাটা পেড়েছিল।

—বৌদিরও মত আছে, আপনি মত দেন, এখানের ইস্কুলের একটা চাকরি ওঁকে দিই।

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ ওর দিকে অসহায়ের মত চেয়ে থাকে তারকবাবু। অশোকের সেই কথাটা ভোলেনি, অশোকও যেন দয়া দেখাতে এসেছে তাকে। কুলবধূ যাবে কিনা ওই স্কুলে

পড়াতে! যে প্রভুত্ব করেছে এতদিন এখানে, সেইখানেই গোলামী করতে হবে আজ তার ঘরের বৌকে! তারকবাবু জবাব দেয়,—এখানে মাস্টারী করা ওঁর চলবে না অশোক।

—কেন?

—তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমার মত চেয়েছিলে সেইটাই জানিয়ে দিলাম। উনি যদি রাজি থাকেন—ওঁর মতেই চলুন। আমি কে?

মণিমালা দরজার বাইরে থেকে শ্বশুরের কথাটা শুনেছিল, মনে মনে অসহায় রাগে গুমরে উঠেছিল।

তারকবাবু তাও দেখেছিল চুপ করে।

তারপর আর অশোক আসেনি এ বাড়িতে অনেকদিন।

তারকবাবুও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আজ এসেছে ওরা সমবায় কৃষির বিরুদ্ধে দল পাকাতে; কিন্তু বাধা দেবার সময় আর তার নেই।

তবু আজ ওরা এসেছে। অবনী বলে ওঠে,

—একটা প্রটেস্ট করা দরকার। ওরা নাকি বলেছে কেউ জমি না দিলে আইনের বলে তা দখল করতে পারে। ব্লাডি—বিলকুল ব্লাডি!

তারকবাবু জবাব দেয়,—এ সম্বন্ধে আমার মতামত কিছুই নেই অবনী। যে ক'বিঘে জমি আমার আছে ক্রমশঃ সবই তা বেচে দোব। বেচতেই হবে আমাকে।

অবাক হয় অবনী!

—তারপর।

হাসে তারকবাবু,—তারপর! দারু ভূতো মুরারি।

ওরা অসহায়ের মত বের হয়ে এল। অবনী বলে ওঠে বেশ জোর গলায়,

—তখনই বলেছিলাম হি ইজ এ ডেড ম্যান নাও।

নীচে অপেক্ষা করছিল ছানু দাস, ভাঙ্গা থামের আড়াল থেকে সে বের হয়ে আসে।

—হল কিছু?

অবনী জবাব দেয়,

—কচু। তুই যা করবি কর ছানু।

—দেখা যাক। ছানুই কর্তৃত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসে।

তারকবাবু একাই স্তব্ধ হয়ে জীর্ণ তক্তপোশটার উপর বসে আছে। রাত্রি নেমে এসেছে—ম্লান তেলের বাতিটা জ্বলছে। স্ত্রীকে দেখে মুখ তুলে চাইল। ক'বছরেই তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। হাতের সব চুড়িগুলো গেছে—গেছে মোটা হার, গহনা—সবকিছু। মাত্র শাঁখা আর লালপাড় শাড়ি আজ সম্বল। এগিয়ে এসে স্বামীর দিকে চেয়ে দেখে। জিজ্ঞাসা করে ভীতকণ্ঠে,

—ওরা কি বলছিল?

—কিছু না!

ভাবিনী স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। কোনদিনই কোন প্রতিবাদ করেনি স্বামীর কথায়। ভয় করে এসেছে, আজও সেই ভয় করে লোকটিকে। আজ বলবার চেষ্টা করে ভাবিনী,

—জীবন কি বলছিল। বৌমাও জেদ ধরেছে। আমি বলি যা ভালো বোঝে ওরা করুক। বাধা দিও না।

তারকবাবু কথা কইল না, স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ হাসতে থাকে তারকরত্ন মলিন বিষণ্ণ হাসি। বলে ওঠে,

—বুঝলে, বুড়ো মা-বাপকে আজ ওদের বোঝা বলে মনে হয়। তাই সরে যেতে চাইছে।

ভাবিনী কথা কইল না। জীবনকে ঢুকতে দেখে তারকবাবু। জীবন যেন এই সুযোগই খুঁজছিল। আজ ক্রমশঃ তার সাহস বেড়েছে। বলে ওঠে,

—সাইকেলে এতটা পথ যাতায়াত করে শরীর টিকছে না। কাজেরও অসুবিধা হচ্ছে। তাই ভাবছিলাম—

মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তারকবাবু বলে,

—তাই ওখানেই বাসা করতে চাও?

জীবন মাথা নাড়ে। বলে চলেছে সে,

—কোম্পানিই কোআর্টার দিচ্ছে। জল-আলো সবই আছে।

—অ!

তারকবাবু ছেলের দিকে চেয়ে থাকে; ওপাশে মণিমালার মুখখানাও দেখা যায়। তারকবাবু ম্লান আলোয় ওদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। মণিমালাও আজ এই কথাটা জানাতো।

ওর মনের ব্যাকুলতা ফুটেছে চাউনিতে। দুর্নিবার কোন বাঁচার প্রয়োজনের তাগিদ আজ ওদের সব কর্তব্যও ভুলিয়েছে। শুধু বেঁচে থাকা—এবং সেটা মুখ্যতঃ নিজেকে কেন্দ্র করেই। ওদের নিষেধ করা মানেই নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়া। ওদের বাধা দেবার কোন অধিকার আজ দুর্বলতা বলেই মনে হয় তারকবাবুর।

তারকবাবু এত অসহায় বোধ করতে পারে না নিজেকে। বলে ওঠে,—বেশ, সেইখানেই যাও।

শূন্যতা নামে সারা ঘরে। জীবনের এটা যেন খারাপ ঠেকে।

বলে ওঠে জীবন,—মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করবো।

তারকবাবু বলে,—বৌমাও যাবেন তো? হ্যাঁ, সেই-ই ভাল। যাচ্ছো কবে?

জীবন স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দেয়,

—ভাবছি কাল সকালেই যাবো। ওদিকে আবার কাজেও জয়েন করতে হবে।

ভাবিনী চমকে ওঠে। তারকবাবু জবাব দেয়,

—বেশ।

এত সহজে কাজ হাসিল হবে জীবন ভাবতে পারেনি। খুশি হয়েই বের হয়ে আসে। ণিমালাও খুশি হয়েছে। দু'চোখে তার আনন্দের আভা। এই কারগার থেকে মুক্তিপত্র পেয়েছে । বাইরের জগতে নতুন করে বাঁচতে পারবে।

সারা ঘরে একটা স্তব্ধতা নামে। পুরোনো বিরাট ঘরখানার কড়িকাঠে বরগার মাথায় দু-কটা ঘুমভাঙ্গা পায়রা নড়ে উঠল। আবার সব চুপচাপ, বুকজোড়া ব্যর্থতা আজ প্রকট হয়ে ঠেছে এখানে।

ভাবিনী আর্তনাদ করে ওঠে,—এ তুমি কি করলে?

তারকবাবু শান্ত ভাবেই জবাব দেয়,—ঠিকই করেছি বড়বৌ। যে পাতা ঝরে যাবে তা যেতে দিতেই হবে। জীর্ণ বাস ত্যাগ করে নতুনকে নিতেই হবে। মিথ্যে তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি?

—তাই বলে মা-বাবাকে ফেলে এই সময়ে চলে যাবে তারা?

স্ত্রীর কথায় তারকবাবু বলে ওঠে,

—ওদের বাঁচতে দাও বড়বৌ, ওরা এখনও এ যুগের মাঝে বাঁচার পথ পেতে পারে। তুমি আমি আজ বাতিলের দলে; অন্ধকারে ধ্বসে-পড়া এই বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যে রায় বংশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে, আমার সেই রায় বংশের শেষ পুরুষ।

কাঁদছে ভাবিনী। দুঃখে—আতঙ্কে ভীত একটি নারী। তার সব যেন হারিয়ে গেল। তারকবাবু কথা বলে না—জানলার বাইরে চেয়ে থাকে। আকাশে বাতাসে সেখানে ওঠে শুধু আগুন আর তার লাল তীব্র শিখা। দুর্গাপুরের ওই আগুনের উত্তাপ তাদের সবুজ শ্যামলিমাকে আজ শেষ করে দিতে চায়। সব কেড়ে দিল তাদের।

কদম-বৌ কদিন নতুন বাসায় এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। বিশ্রী কদর্য পরিবেশ। জানলা দি দেখেছে ধানকলের মজুর আর কামিনদের মধ্যে কি কুশ্রী সম্পর্ক! আকাশ বাতাস ভরে ও ওদের কদর্য ভাষায়। এখানে এসে ওরা সব শালীনতা যেন ভুলে গেছে।

কদম জানালা বন্ধ করে দিয়েছে নিদারুণ ঘৃণায়।

রোদপোড়া ডাঙ্গার একদিকে ছোট্ট বাড়িখানা, ওদিকে একটা পুকুর। অনেক গভীর ক খুঁড়ে তবে এই ডাঙ্গার জল বের করেছে। চারিদিকে উঠেছে কাঁকুরে খাদ, ধারে নরম মাটির পাড়ের উপর কলাগাছ, দু-একটা কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছে পানু দাস শখ করে।

জায়গাটা একটু ছায়াঘন সবুজ।

ভুবন সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে মাল আনতে বা ট্রাকে করে চালান দিতে দুর্গাপুর—বাঁকুড়া-বিষ্ণুপর যায়।

লোকটা কেমন বদলে গেছে। সেই আগেকার সহজ সরল মানুষটি আর নেই, কেমন কঠিন রুক্ষতা এসেছে চেহারায়। কথাবার্তায় ফুটে ওঠে কর্কশভাব। গলার স্বর আর চাহনি যেন বদলে গেছে। হাঁক পাড়ে ভুবন,

—ভাত হয়েছে?

কোনমতে একটু তেলচান করে ভাতের থালায় বসে ভুবন। কদম মুখ বুজে ভাতের থালা এগিয়ে দেয়। এখানের সেই মানুষটার সঙ্গে অতীতের সেই লোকটার মিল নেই। গ্রামের সহজ সরল জীবনযাত্রার কথা সে ভুলে গেছে।

বলে ওঠে,—বুঝলি, ভাবছি মাল যা তৈরি হচ্ছে তার পড়তায় কামারপাড়ার কো অপারটিভকে দোষ লাটে তুলে। ওরা তো শুনলাম মিইয়ে গেছে। তাছাড়া গদাই-ষষ্ঠীও কা এসেছিল।

ভুবন হাসছে। এই হাসিটা কেমন বিশ্রী লাগে কদমের। আগেকার মত মনে রেখাপাত করে না। ভুবনের কথায় চমকে উঠে কদম।

—কেনে? কেমন যেন ভাল লাগে না কথাটা কদমের।

ভুবন হাসতে থাকে বেশ জোরে। হাসি কমিয়ে বলে,

—কেনে আবার, কাজের ধান্দায়। রস যে শুকিয়ে আসছে। গ্রামপ্রধান এমোকালী আর অশোকবাবু। সব ব্যাটাকে দেখবো। তালাই গুটোনো করে দোব এবার। দাসমশাই তো আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে কারখানা।

মাথা নীচু করে কদম ডাল ঢালতে থাকে। ভুবন বলে ওঠে,

—চুপ করে রইলি যি। কথাটা পানি পানি লাগছে না?

কদম জবাব দেয়,

—জাত-জ্ঞিয়াতের সর্বনাশের কথা কারই বা ভাল লাগে?

—অ! ভুবন যেন ঠোক্কর খেয়েছে।

ভুবন কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাঝে মাঝে দেখেছে কেমন বদলে যায় কদম। ওর মুখেচোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য। ভুবন জিজ্ঞাসা করে,

—এখানে তুর ভাল লাগে না, লয়?

একটু বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে ওঠে কদম,

—কেনে ভালো লাগবেক নাই? এত সুখে আছি! খেছি দেছি পাকাবাড়িতে রইছি। বিজলি বাতিও রইছে।

ভুবন মাথা নাড়ে।

—হাঃ হাঃ বাব্বাঃ তবে! থাকতিস উখানে এমনি আরামে?

—না, এত সুখে থাকতাম নাই, তবে—

ভুবন বলে ওঠে,

—তবে কি?

কদম জবাব দেয় বেদনাভরা কণ্ঠে,

—তবু শান্তি ছিল, স্বস্তি সেখানে।

কথাটা বলে দাঁড়াল না কদম, ভিতরে চলে গেল।

—ধ্যুত্তোর! ভুবন বিরক্ত হয়ে ভাতগুলো কোনরকমে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। সদরে যেতে হবে তাকে। এ যেন তার বেশ লাগে।

বেশ রঙ্গীন জীবন। কেনাবেচার ফাঁক থেকে একরাত জাঁকালো ফূর্তি করার খরচটা উঠে আসে। ধেনো আর ভাল লাগে না, শহরের দামী মদই খায়; এখানে ওখানে একটু ঢু মারে—সেই উন্মাদনা আর চাঞ্চল্যের সামনে বিচিত্র কোন নারীমাংস ভালোই লাগে, তাদের তুলনায় কদম অনেক ঠাণ্ডা—হিম। ক্লান্তি এসেছে তাই ভুবনের।

কদমও এটা অনুভব করেছে, জেনেছে ওর অন্তরের স্বরূপ। ক্রমশঃ তাই ভিতরে বাইরে বেপরোয়ার মত বদলে চলেছে ভুবন।

মাঝে মাঝে এমন উধাও হয়ে যায় সে। কেমন বিশ্রী লাগে কদমের।

একা একা কান্না আসে। মনে হয় সে ফিরে যাবে, চলে যাবে আবার ওই গ্রামীণ সমাজের মাঝে তার নিজের ঘরে। দুঃখ অভাব থাক, তবু সেখানে তার একটা সম্মানের আসন আছে, শান্তি আছে, এখানে সে বন্দী হয়ে থাকতে পারবে না।

ভুবন বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কদম এগিয়ে আসে।

—কখন ফিরবে?

ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে ভুবন বের হয়ে যাচ্ছিল, ওর ডাকে দাঁড়াল। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ধ্যুত্তোর। দিলে তো পিছু ডেকে? যাচ্ছি শুভ কাজে— সদরে।

—খুব শুভ কাজ যাহোক।

—আজ ফিরতে না পারলে কাল সকালে আসবো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কদম, কথা বলে না। ডাঙ্গার ধারে এই বাড়িতে একলা থাকতে ভয় করে, লোকজন নেই একটা কথা বলবার। মুখ বন্ধ করে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠে। বলে ওঠে কদম,

—একা থাকতে ভয় করে।

—মাইরি! হাসছে ভুবন বিশ্রী কদর্য হাসি। আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ঘৃণা ভরে সরে গেল কদম। ওর দুচোখে দেখে কি একটা সেই আগেকার অবিশ্বাস—ঘৃণা আর অপমান ভরা চাহনি। ওকে আজও অবিশ্বাস করে—ঠিক তাও নয়, যেন মনে মনে সেটা নিয়ে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েও চলেছে সে কদমকে। ভুবনের মনের সেই নীচ পরিচয় পেয়ে সে শিউরে উঠেছে।

কদম কথা বলল না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বের হয়ে ভুবন কেঁদগাছের নীচে ট্রাকখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ির নীচে একটা গদি পেতে গোকুল কি ঠোকাঠুকি করছিল—রোগা লিকলিকে লোকটা বের হয়ে আসছে ওর দিকে। হাসাহাসি করছে ওরা কি কথা নিয়ে, কদম জানে কি কুশ্রী রসিকতা তারা হয়তো করছে। সদরে যাবার মালপত্রও চাপান হচ্ছে ট্রাকে।

জানলাটা বন্ধ করে দিল কদম-বৌ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জোনাকজ্বলা তারাজ্বলা সন্ধ্যা। সারা আকাশ জুড়ে আঁধার রাজ্যি নামছে।

দুরে দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার হাইওয়ের উপর দিয়ে দুটো জোরালো হেডলাইট জ্বেলে লরিগুলো ছুটে যায়। ওদের ইঞ্জিনের শব্দ আর মাটি কামড়ানো টায়ারের একটানা গর্জন কানে আসে। একপাল দৈত্য যেন দাপাদাপি করে বনের অতলে হারিয়ে গেল—আবার বের হয়ে আসে দু-একটা।

মিলের কাজও বন্ধ হয়ে গেছে, আজকের মত ছুটি।

গ্রামের বেশ খানিকটা বাইরে, একটু ওদিক থেকেই শালবন শুরু হয়েছে, ওপাশে নেমে গেছে সিঁড়ি সিঁড়ি ধানক্ষেত। সন্ধ্যা নামে, পাখিগুলো ফিরে এসে কলরব করছে।

স্তব্ধ বিশাল কলবাড়ি—বাসনের কারখানা। এদিক ওদিকে দু-একটা আলো জ্বলছে, মিটমিটে কম-পাওয়ারের বাল্‌ব মাত্র, ঠাঁই ঠাঁই আলোর আভাষ—আবার চারিদিকে অন্ধকার ভিড় করে আছে।

সন্ধ্যাদীপ এখানে নেহাৎ অস্পৃশ্যের মত জ্বলে। কদমের এখানে ঘরের শান্তি নেই, তাই সন্ধ্যা এখানে কোন শান্ত মধুর আবেশ আনে না। আসে আর এক আভাস নিয়ে।

রাত কত জানে না; হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয় কদম-বৌ,—ওকে এখানে দেখবে বিশ্বাসই করতে পারে না। পানু দাস ঢুকছে।

অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে কদম। দূর থেকে মাঝবয়সী লোকটাকে দেখছে কদম, আগেও দেখেছে। আগেকার সেই ময়লা ধুতি আর ফতুয়াপরা লোকটাকেও দেখেছে গ্রামে।

আজ সে যেন অন্য মানুষ। আদ্দির পাঞ্জাবি—পায়ে পামসু—জামার দামী বোতামগুলো আলোয় ঝিকমিক করছে। বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস। পানু দাস সেণ্ট ছড়িয়েছে গা-ময়। তীব্র তার সৌরভ।

হাসছে পানু,—একলা আছ তাই খবর নিতে এলাম।

জবাব দিল না কদম, লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বন থেকে বের হয়ে আসা ধূর্ত শিয়াল যেমন সন্তর্পণে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায় পলাতক হাঁস মুরগীর সন্ধানে—তেমনি লোভ আর লালসায় দুচোখ জ্বলছে লোকটায়। পানু বলে ওঠে,

—ভুবনও বলছিল, এখানে নাকি মন টিকছে না তোমার। তা সত্যিই তো, ছেলেপুলেও নেই। আর বয়সই বা কি? মন উতলা হবারই কথা। তা একটা রেডিও আনতে বলেছি ভুবনকে —ওটা রেখো। গান-বাজনা শুনবে। তোমার জন্যই আনতে বললাম ওটা।

কদম তখনও চুপ।

পানুই নির্লজ্জের মত বলে ওঠে,—এলাম, কই বসতে বললে না?

চুপ করে আসনটা পেতে দেয় কদম, ঘোমটা একটু টেনেছে, কালো ডাগর দুচোখে কেমন রম মাখানো একটু চাহনি। পানু দাস অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

পানু দাস চেপে বসলো, নিজের দাপে দখল করা মাটিতে তার অধিকার যেন কায়েম করতে য় সে। বেশ দরদভরা কণ্ঠে বলে চলেছে পানু,

—আজ রাতে বোধহয় ভুবন ফিরবে না। এত কি কাজ—আমার ঠিক ভাল বোধ হয় না। কে বলো তুমি। এসব ভালো নয়।

—মানুষটা ভালই ছিল আগে। বলে ওঠে কদম।

হাসছে পানু,—এ মাটির দোষ বলছ? তা বলতে পারো। কিন্তু কই তুমি তো বদলাও নি। । বলো? যা দেখেছি ঠিক তেমনিই আছো।

কথা কইল না কদম। ওর দিকে চেয়ে থাকে। পানু বলে ওঠে,

—দিন বদলেব সঙ্গে মানুষও বদলায়, মানুষের স্বভাবও।

ফস্ করে কদম জবাব দেয়,

—তাই দেখছি। পায়ের কাদাও ধুলো হয়ে মথায় ঠেকে।

এক নিমেষের জন্য চমকে ওঠে পানু।

পানু দাস চুপ করে কথাটা শোনে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কেমন একটা কালো ছায়া ওঠে মুখে।

দাঁড়াল পানু দাস,—চলি কদম-বৌ।

—আসুন।

পানু পিছন ফিরে বলে ওঠে,—আসতে বলছ? কেউ যদি আবার দেখে ফেলে? অবশ্য তোমার তাতে মনে হয় সুনামের বেশ-কম কিছুই হবে না। কি বল?

কদমের সারা শরীর জ্বলে ওঠে। সামনেই পড়ে ছিল ঝাঁটাটা, মনে হয় তাই তুলে নিয়ে আগা-পাশতালা ধোলাই করে দেবে।

বলে চলে পানু,

—গোকুলও এজলাসে দাঁড়িয়ে বলেছিল কথাটা। তা ছাড়া ভুবনই বলছিল, মানে এমোকাল্লী আর ওই যে লিডার তোমাদের অশোকবাবু, ওরাও নাকি বেশ ভালো চরিত্রের লোক নয়।

কঠিনকণ্ঠে বলে ওঠে কদম,—যাবেন? দরজাটা বন্ধ করবো। রাত হয়েছে।

পানু হাসতে হাসতে বলে,

—যাই। দরজাটা ভালো করেই বন্ধ কর কদম-বৌ, বাইরের লোক অবশ্য রাতে এখানে ঢুকতে পারবে না। পাহারাদারও রয়েছে তো! আচ্ছা।

পানু বের হয়ে গেল। জিবের ডগা দিয়ে যতটুকু গরল ছড়ানো সম্ভব সবটুকুই ছড়িয়ে গেল। নীল হয়ে আসে কদমের সারা দেহ বিষের জ্বালায়।

ভুবন আর পানু দাস। ওরা দুজনেই এক সুরেই বাঁধা; কদমের আজ মনে হয় ভুবন করেই মালিককেও লেলিয়ে দিয়েছে। খুশি করতে চায় তাকে। নিজের হীন জঘন্য উদ্দে সিদ্ধির পথ হিসাবেই ব্যবহার করতে চায় তাকে। স্ত্রীর মর্যাদাটুকুও পথের ধুলোয় দিয়েছে। হু হু বাতাস বয় রাতের নির্জন প্রান্তরে—বাধাবন্ধহীন বাতাস।

ভুবনের উপরই রাগ হয় কদমের। এতদিনে ও এতখানি নীচে নেমেছে কল্পনাও কর পারে না। মনে মনে আজ কদমও তৈরি হয়। এমনি একটা চরম অপমান আর আঘাত তার জীবনে এ কল্পনাই করেছিল।

আজ সেই অপমানের কালো ছায়াটা মনের সব আলো নিভিয়ে এগিয়ে আসছে। অনে সহ্য করেছে—এবার সব কিছু তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করবার পর্যায়ে এসে একটা কাঠিন্য জেগে ওঠে ওর মনে।

লোকটা হাওয়ার মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—উপে গেল কর্পূরের মত। কারিগ লোকটা।

মিষ্টির মন কাঁদে না। যদিও একটু মন-কেমন করে তবু মনে হয় ভালোই করেছে সে। ও আর সহ্য করতে পারতো না। পাকা বাঁশে ঘুন ধরার মত লোকটার অন্তরে ঘুন ধরেছি এতদিন চাপা ছিল—সুযোগ পেতেই প্রকাশ পায় তার স্বরূপ। মিষ্টি অনেকের মাঝেই মনের মানুষ—একজন সঙ্গী; চেয়েছিল শূন্য মনকে পূর্ণ করতে কারো প্রীতিস্পর্শে, এমনিভাবে ঠকবে তা জানতো না সে। অবিনাশের কাছে মাঝে মাঝে যায়, ওর সুয়ের যেন সান্ত্বনা খোঁজে সে। বলে,

—আমি নিজের কাছে নিজে ঠকেছি মিতে।

বহু দুঃখেই কথাটা প্রকাশ করে মিষ্টি।

শূন্য ঘর। সাজানো ঘর। অবিনাশও দেখেছে কেমন করে তিলে তিলে লোকটা বদলে গেল, সব হারালো মিষ্টি।

—তা একবার খোঁজ-খপরও করবে না তার?

হাসে মিষ্টি,—বাসি ফুলের মালা আর গলায় নাই বা পরলাম।

অবিনাশ তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আনমনে প্রশ্ন করে,

—তবে?

বহু আক্ষেপের সঙ্গে যেন কথাগুলো বলে মিষ্টি।

— কলসী আর ভরা হোল না মিতেন, যে ঘাটেই গেলাম জল ভরতে, দেখলাম কাদাগোলা জল আর তাতে থিকথিকে পোকা, কলসী তাই শূণ্যিই রয়ে গেল।

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ডোমপাড়ার বাইরে ঝুপড়িগুলো র হারিয়ে গেছে, বন থেকে হাওয়া ভেসে আসছে—কুর্চি ফুলের গন্ধমাখা হাওয়া।

সানাই-এর অন্তরে কি সেই ব্যাকুল সুর তোলে।

—না আওয়ে বালম্।

ক্যা করু—সজনী।

অর্থ বোঝে না মিষ্টি, তবু ওই সুরের আকুল কান্না—সারা ব্যথাবিধুর মন ব্যাকুলতায় তোলে; অবিনাশের অন্তরেও তেমনি নীরব আকুতির ছোঁয়া। বলে ওঠে মিষ্টি,

—বিয়ে সাদি করে সংসারী হও মিতে। এমনি বিবাগী হয়ে ঘুরে মরো না। একা একা ড় পৃথিবীতে পথ চলা বড় দুঃখের। সারা মন খালি হু হু করে কাঁদে আর কাঁদে মিতে। ই বলছিলাম বিবাগী থেকো না। ঘরবাসী হও।

অবিনাশ ওর কথায় একটু অবাক হয়।

মিষ্টি বলে চলেছে,

—তুমি জানো না ঘাটে-ঘাটে ভেসে বেড়ানোর বড়ো জ্বালা ভাই, বড়ো জ্বালা।

মিষ্টির মনে সেই চাপা বেদনাটা ফুটে উঠেছে—দু চোখের চাহনিতে তারই প্রকাশ।

কাল-বৈশাখী নেমেছে। যত দূর চোখ যায় এদিকে লাল রুক্ষ প্রান্তর—আর সবুজ-হলুদ। শালবন সীমা, যেন দেখা যায় কাছিমের পিঠে জিরিজিরি বিড়ালের লোম—ক্রমশঃ উঠে। দিগন্ত সীমা স্পর্শ করেছে। বাটির মত উপুড় হয়ে নামা ধূসর আকাশ ছেয়ে আসে কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, এক কোণ থেকে অন্য কোণ অবধি ছেয়ে ফেলে—দূরে কোথায় গোঁ করছে বন্দী বাতাস।

জনহীন প্রান্তর আর বনের মাথায়—শান্ত জনপদকে আক্রমণ করার চক্রান্ত চলেছে। ছুটে ফিরছে গ্রামের পানে। ত্রস্ত পথচারী আশ্রয়ের জন্য দৌড়চ্ছে। সারা গ্রাম নিস্তব্ধ।

তৃষিত ধরিত্রী উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে, ওর কঠিন বুক খরতাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে কাঁকুরে ডাঙ্গার প্রান্তে কোন রকমে টিকে থাকা গাছগুলো।

অতুল কামার, শুধু অতুল কামার কেন গ্রামের অনেকেই বৎসরের প্রথম মেঘসম্ভারের দিকে চেয়ে আছে। বাউরীপাড়ার অনেকেই। ওরা চায় বৃষ্টি নামুক—ঠাণ্ডা হোক বসুমতী। মাটির বুকে বত্তর আসুক।

কালো মেঘজমা আকাশ হঠাৎ লাল গেরুয়া বর্ণ হয়ে ওঠে। শিখা দাঁড়িয়েছিল বাসার বাইরে, থমথমে বাতাস। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার প্রবাহ; গরম আর গুমোট চারিদিক।

শিখা লাল আগুনলাগা আকাশের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বিচিত্র এর পরিবেশ রুদ্র রূপ আর ধ্বংস এর চারিদিকে। প্রকট হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাসে সেই ভয়াল রূপ।

গর্জন শোনা যায়, অদৃশ্য কোন সৈন্যবাহিনীর কলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে ওঠে আকাশ বাতাসে। দূরে বনের বুকে দেখা যায়—আকাশকোলে কি এক ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী, পাখিগুলো ছোট্ট কালো বিন্দুর মত উড়ছে। গাছের মাথাগুলো ধরে যেন সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে উপড়ে ফেলবে তাদের মাটি থেকে—এগিয়ে আসছে ঝড়।

লাল ধুলোর আভায় কালো আকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কাঁপছে ডাঙ্গার বুকে ঘর ক'খানা

ইস্কুলের সাদা বাড়িটা, ছোট ছোট বাসা, ওই নতুন গজানো কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো, ডাঙার উঁচু ঘর—সব কিছু লালধুলোর মাঝে হারিয়ে যায়।

সারদা ডাক্তার হেঁকে ওঠেন,—শিখামা, ঘরের ভিতর যাও।

শিখা দুচোখ মেলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে এই তাণ্ডব দেখছিল।

ঝড়ের বেগে ওর গলাটাও যেন শোনা যায় না, কাঁকরগুলো তীব্র বাতাসের বেগে ছুটে এসে জানলায় লাগছে পট পট শব্দে, গায়ে মুখে বেঁধে। তবু কেমন আচ্ছন্নের মত ওই ঝড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি।

লাল ধুলোয় সব ঢেকে গেছে—আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি। সব ওই ধ্বংসলীলার মাঝে হারিয়ে যায়। সারা গ্রামকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওই ঝড়। তার পরই কালো মেঘে ছেয়ে বৃষ্টি নামে —তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

তার পরই রূপ বদলের পালা।

ঝড় থেমে গেছে। বৃষ্টিধোয়া আকাশ, শালবন সীমায় থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি শিখা ঝলসে ওঠে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি।

শাল কেঁদগাছ-এর বন ভিজছে—ভিজছে ফুলে ভরা মহুয়া গাছগুলো, আকাশেরও বিরাম নেই। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ ওঠে।

সোঁদা মাটি-ভেজা অদ্ভুত নেশা লাগানো একটি বিচিত্র সুবাস, বাতাসে মৃত্তিকার বুক থেকে ওঠে তৃপ্তির আবেশ; নীরব সেই রহস্যময়ী ধরিত্রীর বুকে খুশির আভা জাগে, তৃপ্ত ধরিত্রী—শান্ত-তৃপ্ত মধুর হয়ে উঠেছে সে। শিখার মনেও তেমনি একটি তৃপ্তির আভাষ।

মাটির এত কাছে কখনও থাকেনি শিখা।

ঝড়ের পর—ধ্বংসের পর বৃষ্টি বিধৌত, মৃত্তিকা, আকাশ বনানীর এই সুন্দর অনুভূতি আর নবরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়নি সে। আজ সে এই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের অতলে দৃপ্ত মধুর রূপটিকে দেখেছে।

হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতিঢাকা কাকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল শিখা। সামনের বাগানের গাছগুলো শুকিয়ে গেছল, উর্বরা মৃত্তিকায় বৃষ্টির জলে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে ফুটন্ত গোলাপ—রজনীগন্ধা স্থলপদ্মের গাছগুলো। শিখা ওকে দেখে অবাক হয়।

—তুমি!

অবাক হয়ে যায় শিখা অশোককে আসতে দেখে। ভিজে গেছে অশোক। বর্ষাতি খুলতে খুলতে বলে,

—সদর থেকে ফিরেই এলাম এদিকে। যা ঝড় উঠেছিল, ভাবলাম ভয় পেয়ে যাবে। ঝড়টা এদিকে এমনি জোরেই হয়। ভাবলাম যাই দেখা করে আসি।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। শিখার মুখে বৃষ্টি-ধোয়া একটু লাবণ্যের উচ্ছলতা, গাছগুলোর মত সেও সবুজ সতেজ প্রাণময়। অশোক একবার চেয়েই কি ভেবে চোখ নামাল।

শিখা কলকণ্ঠে বলে ওঠে,

—কেন? ভেবেছিলে আমরা বুঝি উড়েই গেলাম?

—না! এই বৃষ্টি খুব ভালো লাগলো। বেরিয়ে পড়লাম।

শিখার কাছে মনের এই খুশির খবর সে চাপতে পারে না। বলে অশোক,

—জানো শিখা, কাল থেকেই ফুল-সুইং-এ কাজ শুরু করতে পারবো। কাল থেকে আমাদের কো-অপারেটিভের কাজ শুরু হচ্ছে।

শিখা ওর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে মুখে ওর খুশির দীপ্তি।

সেই খবরটাই তাকে জানাতে এসেছে। তার পরিশ্রম আর তার সাফল্যের সংবাদ।

শিখা বলে ওঠে,

—উঠে আসুন, একটু চা-এর যোগাড় করি।

—না। সময় নেই। ওদের সবাইকে খবর দিতে হবে।

বের হয়ে গেল অশোক অন্ধকারেই বৃষ্টির মধ্যে।

শিখা চকিতের জন্য কেমন খুশি হয়ে উঠেছে। অশোক আজও বদলায় নি। গজরাচ্ছে আকাশ—বিদ্যুতের ঝলকে আর মেঘের গর্জনে। অন্ধকার আকাশকোল, ওদিকের আকাশ দুর্গাপুর কোক ওভেনের বাড়তি গ্যাস জ্বলার আগুন আর ব্লাস্ট ফার্নেসের লালাভ আলোয় ভরপুর; এরই মাঝে বেঁচে থাকার স্বীকৃতি নিয়ে একটি মানুষ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিখা দেখেছে অশোকের চোখে সেই আলোয় আভা।

দাঁড়িয়ে আছে শিখা, হঠাৎ সারদা ডাক্তারকে দেখে ওঁর দিকে চাইল।

—অশোকবাবু এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ। জবাব দেয় শিখা।

সারদা ডাক্তার বলে ওঠেন,

—পাগল মা, ওরা খুশিতে পাগল। নতুন মাটির বুকে ফসল জাগে যে খুশিতে—সেই খুশি ওর মনে। সব ছেড়ে সেই খেয়ালেই রয়ে গেল। নিজের ভবিষ্যৎও দেখল না।

শিখা কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—ও কি ভুল করেছে ডাক্তারবাবু?

শিখার মনে অজানতেই কেমন বেদনার ছায়া ফুটে ওঠে।

সারদাবাবু জবাব দেন,

—ভুল! না মা—ওই লোহাকারখানা আর আশ-পাশের গাঁয়ের এই অবস্থা, ধ্বসেপড়া জীবনযাত্রা দেখে মনে হয় কোন কর্মী নতুন করে এটাকে আবার গড়বে। গ্রাম আর শহর দুই-ই দরকার। একটাকে ছেড়ে অন্যটা নয়। একটাকে অস্বীকার করে অন্যটা নয়। দুটোর সমন্বয়ে আজ নতুন জীবন গড়ে উঠবে, ওই অশোকবাবু সেই মতেই বিশ্বাসী। তাই যে সত্য, সেই পরীক্ষাই ও করছে মা। ও ভুল করেনি। কিন্তু বড্ড একা—চারিদিকে এত বাধা ঠেলে এগোনো বড় কঠিন।

শিখাও এই কথাটা ভেবেছে। দেখেছে এখানে এসে গ্রামজীবনের সঙ্গে ওই এগিয়ে আশা শিল্প-জগৎ আর নতুন সমাজের একটা নীরব সর্বনাশা সংঘাত গড়ে উঠেছে। গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, মোহমুগ্ধ মানুষ কাতারে কাতারে চলেছে ওরই দিকে। গ্রাম নিঃশেষ হয়ে যাবে তাই গ্রামের জীবনেও একটা পরিবর্তন অবশ্যই চাই।

সারদাবাবুর কথাগুলো গভীরভাবে ভাবে সে।

চুপ করে ওঁর কথাগুলো শোনে শিখা। একটি লোকের উদ্যমেই আজ নতুন গ্রাম, তাকে কেন্দ্র করে কৃষিজীবনও আধুনিক পর্যায়ে গড়ে উঠতে চলেছে। এ একা পাতাজোড়ার সমস্যা নয়—আমাদের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষের সমস্যা।

সারদা ডাক্তার বলে ওঠেন,

—দেখছ না চারিদিকে শুধু ভাঙছে। এই ঝড়ের পর যেমন নতুন ফসলের সম্ভাবনা আনে বৃষ্টি, তেমনি এই ভাঙ্গাটাই সব নয়—এর পর গড়ার পর্বও আছে, এই মতে ও বিশ্বাসী শিখা মা।

ভুবনকে পানু দাস অনেক উপরে তুলছে। কতকটা নিজের ব্যবসার খাতিরে, কতকটা বা অন্য প্রয়োজনে। ভুবন সে খবর রাখে না। দুর্গাপুরেই বেশ খানিকটা জমি নিয়ে ফলাও কারখানা করছে পানু দাস। ভুবনকে সেইখানেই প্রমোশন দিয়ে পাঠাবে। ভুবনও কথাটা ভেবেছে।

কেউ এই ভাঙ্গাগড়ার মাঝেও নতুন করে বাঁচে; নদীর দুই তীরের ভাঙ্গাগড়ায় একদিক গড়ে ওঠে, অন্যদিক ভাঙ্গনের মুখে স্রোতের অতলে অবলুপ্ত হয়।

তাই প্রীতি আজ যেন ভেসে চলেছে, তীরের শক্ত মাটি থেকে।

প্রশান্ত আর রাঠী দুজনে ব্যবসা শুরু করেছে। রাঠীর টাকা আর প্রশান্তের বুদ্ধি। দুজনে ধাপে ধাপে উঠেছে, এই চলার পথে এসে জুটেছিল পানু দাস।

সেও এদের চলার তালে পা ফেলে ধাপে ধাপে উঠে চলেছে। ধানকল, শহরে বাড়ি গাড়ি ট্রাক সবই হয়েছে তার। নীচু তলার পানু দাস আজ এদের পর্যায়ে এসে হাজির হয়েছে।

প্রীতি দেখেছে এই পরিবর্তনটাকে। নিজেও তার অজ্ঞাতেই কেমন জড়িয়ে গেছে এই জীবনের ঘূর্ণিপাকে।

শহর থেকে ওরা বাড়ি করেছে দুর্গাপুরের এদিকেও।

প্রীতির জন্যই যেন প্রশান্ত এতখানি উঠেছে।

পার্টি—যত্র তত্র মেলা মেশা অবাধ জীবনের মাঝে প্রীতিই জুগিয়েছে প্রশান্তের জন্য নতুন ঠিকের কাজ-কর্ম, একটার পর একটা কনট্রাক্ট পেয়েছে তারা।

রাঠী প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে।

লাস্যময়ী একটি নারী, দেহে ওর যৌবনের দুর্বার প্রবাহ। দুচোখে ইতিমধ্যেই পড়েছে কালো কালির দাগ, তাকে ঢাকবার জন্যই যেন রং-এর প্রলেপও বেড়েছে।

তবু রাঠীর মনে মাঝে মাঝে নেশা জাগে।

প্রীতি ওর দিকে বিয়ারটা এগিয়ে দেয়। সফেন পানীয়ের গিনিগলা রং, অজস্র বুদবুদ উঠছে অফুরান উন্মাদনা নিয়ে। প্রীতি নিজে দুগ্লাস শেষ করে হাসছে।

রাঠী জানে আজ তার ব্যবসা ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে, এখন আর প্রশান্তকে তার না হলেও চলবে। তাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করেছে ওকে।

প্রীতির দুচোখে গোলাপী নেশা, সে প্রজাপতির জাত। এসব জানে না। আনন্দই তার সব।

—পিজিয়ে!

রাঠীর মনেও সে যেন নেশা যোগাতে চায়। সে দেখতে চায় তার সামনে রাঠী, ওই লোকটা ধীরে ধীরে বদলে যাবে। দুচোখে ফুটে উঠবে লালসার আভা।

কোন বেদেনী যেন সাপের ঝাঁপি খুলে খোঁচা মেরে কাল কেউটেকে জাগিয়ে ওর উদ্যত ফণা দেখতে আর হিস্ হিস্ গর্জন শুনতে চায়।

রাঠীর সারা দেহে মনে পানীরের ওই তীব্র নেশা। কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে সে, ধীরে ধীরে অতলে নামছে।

বাইরে রাত ঘনিয়ে আসে।

প্রশান্ত অফিসে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। এতদিন পর এমনি একটা সর্বনাশ ঘটবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। আজ মনে হয় এই জগতে বন্ধুত্ব, প্রীতি—সব মিথ্যা, অলীক স্বপ্ন।

স্বার্থ আর টাকা এই দুটোই বড়। নইলে রাঠী আর সে নিজের হাতে ব্যবসা গড়েছিল।

কিসের বিনিময়ে সে একটার পর একটা কনট্রাক্ট পেয়েছে তাও জানে। প্রীতিকেই পসরা করেছিল; কিন্তু এত ত্যাগ অপমানের মধ্যে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান থেকে সে উৎখাত হয়ে গেল।

এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করবে ওই লোকটা তা বিশ্বাসই করেনি প্রশান্ত। রাঠী আজ অন্য নামে ব্যবসা করছে।

এই প্রতিষ্ঠান সে তুলে দেবে; প্রশান্তও সেই সঙ্গে পথে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, এর দেনা-দায়িত্বও অনেক এসে পড়েছে তার ঘাড়ে।

রাতের অন্ধকারে এদিকে ওদিকে আলোগুলো জ্বলছে, বাতাসে ওঠে ব্লাস্ট ফার্নেসের একটানা গর্জনধ্বনি। প্রশান্তের মনে হয় ওরা তাকে রক্তচক্ষু মেলে নির্দয় কণ্ঠে শাসন করে চলেছে।

আজ সে পরাজিত একটি মানুষ।

এ জগতে পরাজিতের কোন ঠাঁই নেই।

বাড়ির দিকে ফিরছে প্রশান্ত। সারা মনে নীরব একটা রাগ আর অপমানের জ্বালা। আজ চোখের সামনে অমনি অন্ধকার নেমেছে।

বাড়িতে এসে দেখে ওদিকের ঘরে নীল আলোটা জ্বলছে।

শখ করে রাঠীর পরামর্শেই অনেক খরচ করে ঘরটা ডিসটেম্‌পার করিয়েছিল প্রশান্ত। সব আজ কোনদিকে হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ মনে হয় এই বিপদে প্রীতিই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে, আবার একাই নতুন করে প্রশান্ত তার ব্যবসা গড়ে তুলবে।

ঘরে পা দিয়েই চমকে ওঠে প্রশান্ত। ওই তার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু রাঠী, আর ওই তার স্ত্রী প্রীতি, যার কাছে আশা করেছিল সে সান্ত্বনার। দুজনের মনের গোপন পাপের কালো ছায়া ঘরের আলোটুকুকে গ্রাস করেছে।

প্রশান্তকে দেখে চমকে ওঠে প্রীতি। রাঠীও অবাক হয়ে গেছে।

—তুমি!

প্রশান্ত এগিয়ে আসে। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ! অবাক হয়েছে, না? এতবড় বেইমানি করেও খুশি হওনি; এরপর আবার অন্তঃপুরের শুচিতাটুকুও নিঃশেষ না করে থামবে না তুমি?

—আরে বড্ডো রেগে গেছো তুমি। গোস্‌সা করো, হম্‌ চলি! আচ্ছা, নমস্তে প্রীতিদেবী।

রাঠী ধূর্ত লোক, এই সুযোগে সে সরে গেল।

ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি, নীরব রাগে ফুলছে। রাঠী বের হয়ে যেতেই এগিয়ে আসবে প্রীতি। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

—এসব কথা বলতে এতটুকু বাধল না তোমার?

প্রশান্ত বেদনাহত চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। কোথাও তার জন্য এতটুকু সমবেদনার ছায়া ফুটে নেই। বলে ওঠে প্রশান্ত,

—ওই রাঠী আজ আমাদের চরম সর্বনাশ করেছে। আমার কোন অংশ নেই ওই ফার্মে

প্রীতি সতেজ কণ্ঠে বলে ওঠে,

—এর জন্য মামলা করতে পারো? এটা তোমার ব্যাপার। আমাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন? বাড়ি থেকে লোকটাকে এমনি করে তাড়াবে? আমাকে এতবড় অপবাদ দেবার কোন অধিকার তোমার নেই।

প্রশান্ত চুপ করে থাকে।

প্রীতির দিকে চেয়ে রইল প্রশান্ত। কোন সাড়া, সমবেদনা—প্রীতির স্পর্শ ওর মনে নেই। কেবল নিজের কথাই ভাবে ওরা, তাদের জগতে অন্য কারো জন্য কোন ঠাঁই নেই।

প্রশান্তের আজ যেন সব হারিয়ে যেতে বসেছে। ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে ওঠে,

—আমাকে ভুল বুঝো না প্রীতি !

প্রীতির মুখে ফুটে উঠেছে নিবিড় কাঠিন্য। প্রীতি বলে ওঠে,

—থাক, ওসব কথা নাই বা তুললে। কালই আমাকে শ'পাঁচেক টাকা দিতে হবে।

প্রশান্ত ধীর কণ্ঠে বলে,

—এত টাকা দেবার উপায় এখন নেই।

প্রীতি জবাব দেয়,

—তা জানি না। কালই ও টাকা আমার চাই। আমি দিন কয়েকের জন্য বাবার কাছে যাবো না হয় গ্রামে।

প্রশান্ত আজ চারিপাশের মানুষ, আজকের এই জীবন-যাত্রা—সব কিছুর অন্তরের ছবিটা দেখতে পেয়ে কেমন চমকে উঠেছে।

একটা বিবর্ণ নিষ্ঠুরতার বর্ণহীন ছবি। রাঠী, পানু দাস, আরও অনেকের কথা মনে পড়ে। কেউই তার বন্ধু নয়। নিজের স্ত্রী—তাকে মনে হয় মেকি একটা নকল মানুষ। সব যেন কেমন মিথ্যার উপর গড়ে উঠেছে এতদিন ধরে। বলে ওঠে প্রশান্ত,

—চারিদিকে আজ বিপদ ঘনিয়ে আসছে প্রীতি।

প্রীতি পরিষ্কার জবাব দেয়,

—এর জন্য তুমিই দায়ী।

প্রশান্তের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যাবে।

—প্রীতি !

প্রীতিও আজ মুখোমুখি দাঁড়ায়—চোট খাওয়া নাগিনীর মত। আজ সে প্রশান্তকে ঘৃণা করে।

প্রশান্তও বুঝেছে আজ প্রীতির সঙ্গে তার সম্পর্কের গভীরতা টাকার জন্যেই এসেছিল। এতদিন তার টাকা ছিল—তাই সম্পর্কটাও ছিল তাঁর সঙ্গে।

আজ প্রীতিও জেনেছে প্রশান্তর প্রকৃত অবস্থাটা, তাই সেও যেন একটা অজুহাত খুঁজছে মাত্র।

রাত নেমে আসে।

বাইরের শালবনে বইছে দিকহারা ঝড়ো হাওয়া, তাতে মিলেছে যন্ত্রদানবের ওই ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি। দশটার ভোঁ বাজছে।

ওর প্রচণ্ড শব্দ একটা আর্তনাদ তুলেছে বাতাসে।

প্রশান্ত আজ প্রীতির জবাবে যেন ওই গর্জনটা শুনছে। তাদের সব বিশ্বাস—ভালবাসা—একে একে ওই বুড়ো হাওয়ার দাপটে যেন খসে খসে পড়ছে ঝরে যাবার বেলায় জীর্ণ বিবর্ণ পাতার মত।

ভুবনের কথাটা কদম শোনে মাত্র, জবাব দেয় না। দুর্গাপুরে ভুবনের প্রমোশনের কথাও শুনেছে কদম। প্রাণবল্লভবাবু যে কত ভাল লোক—ভুবনকে কেমন ভালবাসে, সে কথা শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গেছে। ভুবন বলে ওঠে,

—ওকে আজ খেতে বলেছি,—আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি যেন না হয়, বুঝলি? মনিব—অন্নদাতা। কোত্থেকে কোথায় এসেছি—আরও কোথায় উঠবো দেখবি। সারা গাঁয়ের লোককে দেখাবো।

কদম জবাব দেয়,—হ্যাঁ, তা তো দেখছিই।

ভুবন খুশি ভরা কণ্ঠে বলে চলে,

—তবে! গাঁয়ের ওই অন্ধকার পাঁদাড়ে পড়ে থাকলে হতো ইসব? ফিঁচের উপর একখানা ট্যানা জড়িয়ে শালে হাতুড়ি পেটো। রামোচন্দর!

ভুবনের ভাবনা আজ বদলে গেছে।

ভুবন মনে মনে তাই পানু দাসের কাছে অত্যন্ত ঋণী, কৃতজ্ঞ। কদমের দিক থেকে ঋণ কারো প্রতিই নেই, কর্তব্যও যেটুকু ছিল স্বামীর প্রতি স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাও সহ্যের সীমাপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে। তাই কদম ওর কথাটা শুনে চমকে ওঠে—জানতো এমনিই হবে।

তার সামনে এতবড় বিপদ আসবে সে ভাবেনি। জানে না ওর থেকে মুক্তির পথ কোনখানে। চুপ করে কথাটা শোনে।

ভুবন বলে ওঠে,—বাবুকে আজ নেমন্তন্ন করে এসেছি।

কদম ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। প্রশ্ন করে,

—তা আমাকে কি করতে হবে?

সহজভাবে ওকে নিজের দলে, মতে আনবার চেষ্টা করে ভুবন। এটাও ক্রমশঃ শিখেছে সে—এই মাটিতে, এই জীবনে এসে চালাকিটাও রপ্ত করেছে গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে। বলে ভুবন বেশ খুশিভরা কণ্ঠে,

—বাঃ রে, তোর বাড়িতে আসবে কত ভাগ্যির কথা—একটু কথাবার্তা কইবি, আমিও ফিরে আসবো রাতেই। আর হ্যাঁ—একটু খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়ও করবি। মাছ, মাংস গোকুল কিনে দিয়ে যাবে—বলে গেলাম।

কদম কথা বলে না, ক্রমশঃ ওই লোকটার মনের নীচেকার কুটিল অভিসন্ধিটাও বেশ বুঝতে পেরেছে। পানু দাসও আজ ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠে জীবনের কিছুটা সময় শান্তি আর ভোগের ইন্ধন খোঁজে। আগে এ সব কথা শোনেনি তার সম্বন্ধে।

ভুবনও বদলেছে—বদলেছে পানু দাসও। এসব দোষও তার জুটেছে।

ভুবন বের হয়ে গেল।

কিন্তু কদম! মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সায় পায় নি। এগিয়ে যাবার, নিজেকে পণ্যা করে অনেক কিছু অর্জন করার অপরিসীম কাঙ্গালপনা থেকে তার সেই আগেকার খড়ো ঘরে অভ দুঃখে আর তার মাঝে শান্তিটুকুই ছিল অনেক ভালো। এ জীবনকে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে

সে বদলাতে পারেনি। শুধু পারেনি নয়, এ জীবনকে সহ্য করতে পারেনি, পারেনি নিজেকে সেই লোভ মোহ আর অন্ধ কামনার জীবনের সামিল করে নিতে। তাই এসব প্রতারণাকে সে ঘৃণা করে অসহ্য জ্বালা উঠেছে এই জীবনে।

হঠাৎ গলার শব্দ শুনে ফিরে চাইল কদম।

দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে আসছে। ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে, কদর্য বিকৃত একটা ছায়া। গোকুল ঢুকছে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। একটু চমকে ওর দিকে চাইল কদম। প্রায় বছর কয়েক পর ওকে দেখছে কাছ থেকে—আগেকার এমনি একটি বৈকালের ছবি কদমের চোখের উপর

ভেসে ওঠে। একটি বুভুক্ষু রাস্তার ভিখারি সেদিন গোকুল, চোখে মুখে একটি অসহায় পাণ্ডুর ভাব। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অতুল।

খাইয়েছিল কন্দম— ক্ষুদার অন্ন জুগয়েছিল, তৃষ্ণায় দিয়েছিল পানীয়; সেই স্বাভাবিক মানবিক ব্যবহারের মূল্য দিয়েছিল গোকুল—কোর্টে দাঁড়িয়ে তার নামে দুরপনেয় কলঙ্ক দিয়ে।

বেশ দেখেছে কদম সেই মিথ্যা কলঙ্কের দাগ তার সারা জীবনে একটা কালো রেখা টেনে দিয়েছে। অনেকেই আড়ালে হাসাহাসি করে, অনেকে তার স্বভাবের কথা ভেবে এড়িয়ে থাকতেও চেষ্টা করে। লজ্জায় অপমানে কন্দমের মাথা নুইয়ে আসে।

আজও ওই দাগ ভুবনের মনের অতলে রয়ে গেছে, তাই হয়তো ভুবন সাহস করেছে—পানু দাসের সামনে তাকে বিকিয়ে দিয়ে নিজের চাকরির উন্নতি করতে।

একদিনের মিথ্যা অপবাদ তার সবকিছু সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

গোকুল ওর দিকে চেয়ে থাকে। এগিয়ে এসে বলে,

—নিয়ে এলাম, এগুলো রাখো বৌদি।

গোকুল দাওয়ায় চেপে বসে। ঝুলি থেকে শালপাতা মোড়া রক্ত-লাগা মাংস বেশ কিছুটা বের করে দেয়, কিছু আনাজপত্র—আর কাগজে জড়ানো একটা বোতলের মত কি।

গোকুলের মুখে একটা বিশ্রী হাসির আভায।

দেখে কন্দম চমকে ওঠে,—ওটা কি!

হাসে গোকুল—পানুবাবুর ওসব আজকাল এক-আধটুর দরকার হয়। ওটা উঠিয়ে রাখো সামনে থেকে। ভুবনদাই পাঠিয়ে দিলে।

কন্দমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জ্বলছে। গোকুলের মুখ চোখ কেমন চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে। একটা কুৎসিত ভঙ্গীতে হাসবার চেষ্টা করে।

—ভুবনটা এসব বলেনি কিছু তোমাকে? মানে যে পূজোর যে মন্তর আর কি!

কদমের দুচোখ ফেটে লজ্জায় আর অপমানে কান্না আসে। বুকের ভিতরটা হু হু করে জ্বলছে। গোকুল বলে ওঠে,

—এক গেলাস জল দেবা? ওই সুন্দর হাতের একটু মিষ্টি জল।

—জল! চমকে উঠে কন্দম। আবার আজও এসেছে ওই দৈত্যটা তৃষ্ণার জল চাইতে। সবাই কি মনে করে তাকে !

আখের শালের কথা মনে পড়ে, ভেসে ওঠে সেই গুড়-জ্বালানী কড়াই আর রসের হাঁড়িগুলোর কথা; মুনিব আর চাষী গুড়গুলো তুলে নিয়ে চলে যায়—পড়ে থাকে গুড়মাতানো কড়াইটা। কুকুর আর কাক-চিলে ঠুকরে খায়।

গোকুলও যেন তেমনি এসেছে, পানু দাস মুনিবের পাত চাটার পর যদি কিছু অবশেষ থাকে—চেটে-পুটে খাবে। কুকুরের দল। ঘেয়ো নোংরা কুকুর ওরা সব। কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় কন্দম,

—বাইরের কলে গিয়ে খাওগে। যাও।

গোকুল উঠে পড়লো, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, কেমন যেন ভয় পেয়েছে। পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে বলে, ওঠে,

—ওসব কথা যে বলেছিলাম তা দাসমশাই-এর কানে যেন না ওঠে মাইরি। যা রেখেছ তুমি, বাবুকে যদি বলে দাও, বিলকুল নোকরি খতম করে দেবে। হাজার হোক বাবুর আসা-যাওয়া নিয়ে কথা বলা কি নোকরের সাজে?

চাবুক খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে কন্দম-বৌ। থরথরিয়ে কাঁপছে সারা দেহ। প্রতিবাদ করবার, চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাবার সামর্থ্যটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামনে পড়ে রয়েছে মদের বোতল আর মাংসটা।

বের হয়ে গেল গোকুল।

উঠোনে আমগাছের ছায়াটা আঁধার হয়ে আসে। বেলা পড়ে এল। রোদ গেল—এল অন্ধকার। দুঃখ হতাশা আর অপমানের অন্ধকার। বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে কাঁপছে কন্দম।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, অভিযোগ জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কেঁদে লাভ কি? অভিযোগই বা জানাবে কার কাছে? পালাবে? তাই বা পালাবে কোথায়?

কি করে জানাবে কন্দম-বৌ বৃদ্ধ অসহায় অতুল কামারকে তার স্বামীর অমানুষিক হৃদয়হীনতার কথা, লোভের জঘন্য কাহিনী। নিজেরই দুঃসহ এ লজ্জা—দুস্তর এ দুঃখ আর অপমান।

হঠাৎ কি যেন ভেবে কঠিন হয়ে ওঠে। ভাবনার হারানো খেইগুলো একটা সিদ্ধান্তের শেষ সূত্রে এনে গ্রথিত হয়ে ওঠে। স্তব্ধ হয় এলোমেলো চিন্তার জটগুলো।

কন্দমের মুখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য। এই জঘন্য অপমানের সেই প্রতিবাদই করবে। এই জীবনকে সে স্বীকার করে না, করতে পারবে না কোনদিনই।

রাত হয়ে আসে। আঁধারে জ্বলে ওঠে দু-একটা তারার আলো। বনের বাইরের ডাঙ্গায় শিয়ালগুলো ডাকছে, ক্ষুধা আর লালসা ভরা সেই চীৎকার।

হঠাৎ কার জুতার শব্দ শুনে ফিরে চাইল কন্দম। পানু দাস দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ার মত,—একি! আলোও জ্বালোনি যে বৌ?

চমকে ওঠে কন্দম। শন শন হাওয়া বইছে গাছ-গাছালির মাথায়। শিয়ালের ডাকও থেমে গেছে আতঙ্কে। অন্য বড় কোন জানোয়ার বন থেকে বের হয়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে সে বসে বসে লেজ ঝাপটাচ্ছে, গায়ের বিশ্রী বোটকা গন্ধে শিয়ালগুলো পালিয়েছে।

এগিয়ে আসছে পানু দাস। বলে চলেছে,

—ভুবন অনেক করে বলল। তা কেমন আছ!

কন্দম স্থির কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়,—আসুন।

ঘরের ভিতরেই পানু দাস আবছা অন্ধকারে বসল। কি কাজে বের হয়ে যায় কন্দম। গলা তুলে পানু বলে,

—কাছে এসো বসো, একটু গল্পগাছা করা যাক। আর আলো নাই বা জ্বাললে—বেশ তো মুখ আঁধারি রাত—

মহাজন প্রাণবল্লভ দাসও ধান পিতলের হিসাব ভুলে কাব্যিক হতে চায়। কি এক ব্যাকুল কামনার আগুনে জ্বলছে তার সারা দেহ মন। কন্দমকে দেখেছে, আবছা অন্ধকারে দেখেছে রূপবতী অফুরানযৌবনা কোন মোহময়ী নারীকে।

পানু দাসের সারা দেহে কেমন অসহ্য তীব্র একটা জ্বালা। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই। অপেক্ষা করছে পানু দাস, ওৎ পেতে আছে বুভুক্ষু কোন জানোয়ার অন্ধকার বনের আড়ালে। কদম বলে ওঠে,

—বসুন আমি আসছি।

রাত কত জানে না। কদম বের হয়ে পড়েছে তক্ষুনিই।

নিশুতি গাঁ—কোনদিকে যাবে জানে না কদম। পালাচ্ছে। ওই ছায়ামূর্তির ভয়ে এখান থেকে পালাচ্ছে কদম।

বাঁশবনের মাথায় জ্বলছে জোনাকির আলো—কাঁপছে সে পাতা কাঁপার মতই। আঁধারে যেন পথ হারিয়ে গেছে কদমের।

হঠাৎ কাকে দেখে ধরা পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এমনি করে ওর সামনেই পড়বে তা ভাবেনি। অশোক অবাক হয়েছে কদমকে এমনি সময় দেখে।

—তুমি!

অশোক ফিরছিল কো-অপারেটিভ অপিস থেকে বাড়ির দিকে, হঠাৎ নির্জন পথের ধারে ওকে দেখে একটু অবাক হয়।

চমকে ওঠে কদম-বৌ,—ছুটবাবু!

—এত রাত্রে?

কদম যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে, আর সহ্য করতে পারছে না সে এই নিদারুণ দুঃখ আর অপমান। অশোক ওকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

অনেক চেষ্টায় কদম নিজেকে প্রাণপণে সামলে রেখেছে। কথা বলবার সামর্থ্য তার নেই, এখুনি কান্না-ভিজে কণ্ঠস্বর বের হয়ে পড়বে।

অশোক জিজ্ঞাসা করে,

—কি হয়েছে কদম?

কি করে তাকে জানাবে কদম এতবড় অপমানের কথাটা, কিই বা করতে পারবে ও। বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওর শক্তি কতটুকু! সহজ কণ্ঠে বলে,

—এমনি বাড়িতে এসেছিলাম, বাসায় ফিরছি।

—এই পথে? প্রশ্ন করে অশোক।

যেন ধরা পড়ে গেছে কদম। মুহূর্ত মধ্যে রহস্যময়ী নারী সহজভাবেই বলে ওঠে,

—ভাবলাম এসেছি যখন গাঁয়ে, একবার তোমার সঙ্গে দেখাই করে যাই।

—আমার সঙ্গে কেন?

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে কদম।

নির্জন মিশমিশে কালো অন্ধকার। বাঁশবনে হু হু বাতাসের লুটোপুটি। কেমন আজ নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যই মেতে উঠেছে সর্বনাশা নারী।

হাসছে! হাসি আসে। জীবনকে ব্যঙ্গ করার তীব্র মধুর হাসি।

কদম বলে ওঠে,—জানি না। কোনদিনই তোমাকে বোঝাতে পারিনি। সময়ও পেলাম না সময়ও যে আমার নাই ছুটবাবু। চলি!

কদম দাঁড়াল না। এতক্ষণ যে কান্নাটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল, দুর্বার বেগে সেই চাপা কান্নাই যেন ফেটে পড়বে এই বার। ভয়ে সরে গেল কদম। পালিয়ে গেল ওর কাছ থেকে আবার আঁধারের আড়ালে।

আলেয়ার আলোর কোন স্নিগ্ধতা নেই, তাকে ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ করা যায় না। ও আশা তাই কোনদিন করতে সাহস করেনি কদম।

তাই দেখা দিয়েই প্রকাশ করবার আগেই সরে গেছে বার বার। আজও তাই গেল সে —কদম!

অশোক ডাকছে ওকে দূর থেকে, কদম দাঁড়াল না। আঁধারেই মিলিয়ে গেল।

কিন্তু যাবে কোথায়! রুদ্ধশ্বাসে এসে কদম দাঁড়াল কাজলা দিঘির উঁচু পাড়ের উপর, যেখানে এসে পথটা শেষ হয়েছে। তারপরই ওই দিঘির অতলকালো জল—ছায়া-নামা জল কালো জলে হাজারে তারার চিকমিকি চলেছে সেখানে।

নিস্তব্ধ রাত্রি।

কেউ কোথাও নেই। কোথায় একটা কুকুর একবার ডেকেই থেমে গেল। দিঘির অতল-কালো জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কদম।

ঢেউগুলো তীরে এসে ভেঙ্গে পড়ছে। বাতাসে তারই শব্দ।

আজ মনে হয় এছাড়া তার পথ নেই।

ছোট্ট একটি মেয়ে একদিন এসেছিল এই গ্রামে। অভাব-অভিযোগ দুঃখের মাঝেও সে পেয়েছিল একজনের বুক-ভরা ভালবাসা। ঘর বাঁধতে চেয়েছিল কদম।

ঘর বেঁধেও ছিল।

কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সে পথে এল আরও অনেকে। অশোককে দেখেছিল, জীবনের একটি অধরা তারার আলোর স্নিগ্ধতার মত সে এসেছিল তার জীবনে। তাকে পেতে চায়নি দূর থেকে দেখতেই চেয়েছিল। এ গ্রামে তার ঘরবাঁধা তাই আরও ভালই লেগেছিল।

কিন্তু ঝড় ওঠে।

সব কোনদিকে তছনছ হয়ে যায়। ঘর তার হারিয়ে গেছে।

যাদের একদিন মানুষ বলে জেনেছিল, অবাক হয় তাদের সমূহ বদলে যেতে দেখে।

ভুবনকে আজ ঘৃণা করে। দেখেছে পানু দাস, গোকুল—আরও অনেককে।

এমনি একটি অমানুষের ভিড়ে ভরা পৃথিবীতে বাঁচতে আর তার সাধ নেই। যে ঘর থেকে একদিন বের হয়ে গেছে সেখানেও আজ আর ফেরা যায় না।

ওরা সবাই এমনি নিকষ আঁধারে পথ হারিয়ে গেছে।

বুক-ভরা জ্বালা আর হাহাকার নিয়ে উন্মাদ কোন দানবের মত তারা ফিরছে, ওদের লালসার আগুনে সব জ্বালিয়ে দিতে।

কদম-বৌ তাই ওদের ঘৃণা করে, এই দিনগুলো অসহ্য বলে মনে হয়। চমকে ওঠে, পিছনে যেন পানু দাসের ছায়াটা দীর্ঘতর হয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, কোথায় পালাবে কদম!

সামনে দিঘির কালো জল যেন দুহাত দিয়ে ডাকছে তাকে। বাঁধের নীচে ওইখানে জল অনেক গভীর। স্তব্ধ শান্তির কোন রাজ্য।

একটা শব্দ ওঠে বাতাসে। জলে কি যেন পড়ল উঁচু থেকে।

শীতল জলরাশির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে কদম, স্তব্ধ শান্তির সে রাজ্য। কেমন হালকা মনে হয়! দুচোখের সামনে ফুটে ওঠে অতল কালো একটা ছায়া; এখানে তবু জ্বালা নেই!

কদমের সব জ্বালা একটা কালো যবনিকায় ঢাকা পড়ে, অতল কালো আঁধার দুচোখ ভরিয়ে দেয়। হারিয়ে যাচ্ছে সে!

হারিয়ে গেল দিঘির অতলে।

পালাল। এই দুঃখ-কামনার আগুন জ্বালা জীবন থেকে সরে যাচ্ছে অনেক দূরে—কোন নীল স্বপ্নের দেশের একটি নারী।

সকালের আলো ফুটে উঠেছে। ভুবন তখনও অসাড়ে পড়ে আছে। রাত দুপুরে সদর থেকে ফিরছে মদ্যপ অবস্থায়। কোন খেয়াল নেই ওর।

পানু দাস ক্ষুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ভুবনও এসে দেখেছে বাড়িতে কেউ নেই। মাতাল গর্জন করে,—আসুক সে মাগী, সতী! কেটে ফেলাব ছাপ। রাত দুপুরে কোথায় যায় সে!

রেগে সেই দাওয়ায় আবার শুয়ে পড়েছে ভুবন। সকালেও নেশার ঘোরে পড়ে আছে—স্বপ্ন দেখছে কদমকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে সে। বেদম প্রহারে জর্জরিত করে তুলেছে। সকালেব রোদ এসে পড়েছে গায়ে। ভুবনের তবু হুঁশ নেই।

হঠাৎ কাদের ডাকাডাকিতে নেশার জড়তা ভেঙ্গে উঠে বসল ভুবন লাল চোখ মেলে। বাদল, এমোকালী, যষ্ঠীচরণ ডাকছে তাকে।

—একবার এসো গাঁয়ে!

ভুবন পলকেই বোতলটার বাকি পানীয় শেষ করে বলে,

—কেনে হে? ওই আবার গাঁয়ে কেনে? সেটো কোথায়?

কালী বলে,

—দরকার আছে। বিশেষ দরকার। এখুনি চল তুমি।

গর্জে ওঠে ভুবন,

—বৌটো পালিয়েছে উখানেই বোধ হয়? অ্যাঁ—চল্ মাগীর চুলের মুঠি ধরে তুলে আনবো। সতী! গাঁ-ময় পিরিতের নাগর ছড়ানো তার—ঘরবসত করবে কেনে? চল, দেখ্‌বি আজ তার একদিন কি আমার একদিন।

টলতে টলতে আসছে ভুবন। চোখ দুটো তখনও লাল করমচার মত।

কাজলা দিঘিল কাঁকুরে পাড়ে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই জুটেছে। মিষ্টি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুচোখে জল।

কদম ডুবে মরেছে। হয়তো নিষ্কৃতি পেয়েছে কুকুর-শিয়ালের টানা-ছেঁড়া থেকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

গত রাত্রের সেই কথাটা মনে পড়ে। কি যেন বলতে চেয়েছিল কদম, কিন্তু পারেনি। একটা পুঞ্জীভূত অভিযোগ জমা হয়েছিল তার মনে, কিন্তু কেন? কার বিরুদ্ধে? কি সেই নালিশ—কেউ জানল না।

ভুবনকে ওদের সঙ্গে আসতে দেখে চেয়ে থাকে। টলছে ভুবন। ক'দিনেই সে অনেক বদলে গেছে। ওকে দেখে মনে হয় মূর্তিমান একটি ধ্বংস। পরনে নীল তেল-কালি লাগা প্যান্ট চোখদুটো লাল। দুটো পা সমানে পড়ছে না।

লোকগুলো ভিড় ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ভুবন এগিয়ে এসেছে কদমের প্রাণহীন দেহটার পাশে অতুল কামার ছানিপড়া চোখ মুচছে। আর স্তব্ধ মৈনাকের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ভুবনকে আসতে দেখে জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে ওর গালেই সজোরে বসিয়ে দেয় একটা চড়। গর্জন করছে বুড়ো।

—তুই! তুই-ই মেরে ফেললি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে। তুর লোভ আর পাপই হল কাল সেই পাপেই সব হারালাম আমি। তুই আমার ছেলে। শত্তুর। কাল শত্তুর।

ওকে সরিয়ে নিল অশোক। বৃদ্ধ তখনও ফুঁসছে অসহায় রাগে। দুচোখ ফেটে জল নামে হু হু জলধারা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভুবন।

দুচোখে তার বিস্মিত চাহনি, দেখছে কদমকে।

সুন্দর সুঠাম দেহটা ফুলে উঠেছে—তবু দুচোখের দৃষ্টি তার তখনও তেমনি কঠিন। সেই নীরব ঘৃণা আর অভিশাপ ফুটে উঠেছে।

ধিক্কার দিয়ে গেল সে এই জীবনকে—কুৎসিত ওই মানুষগুলোকে। ওরাই তাকে নিঃশেষে হত্যা করেছে এতদিন ধরে, আজ সেই কাজের শেষ পর্যায়।

পানু দাসও এসেছিল।

ওই মৃতের তীব্র চাহনির দিকে চেয়ে সরে গেল সে। ভয় পেয়েছে পানু দাস। স্তব্ধ জনতার সারা মনে বেদনার ছায়া।

একজন শুধু আর্তনাদ করছে, সে ওই নারাণ ঠাকুর।

আধপাগল অসহায় ভাষাহীন লোকটা চীৎকার করছে অব্যক্ত ভাষায়। তারও সব গেছে ওই কারখানার আগুনে। ওই অদৃশ্য কোন দানব তার সব কেড়ে নিয়েছে, আজ আবার দেখছে অন্য জনকেও সব হারাতে। তার ঘর গেছে—গেছে জীবনের সব আশা-ভরসা। সনাতনও তাকে ফেলে গেছে। অমানুষ করে দিয়েছে তার সব আত্মীয়-পরিজনকে।

আর কদম! সে শুধু দিয়ে গেল এই দিনের উপর তীব্র অভিশাপ—আর নীরব ধিক্কার।

সরে এল মিষ্টি লোহার। ওর মৃত্যুর কারণটা সেই একমাত্র কিছুটা জানে। তাই নিজেও শিউরে উঠেছে অজানা আতঙ্কে আর ভয়ে। একে একে ওদের সব কিছু কেড়ে নেবে ওই অদৃশ্য দানব। তার লোকটাও হারিয়ে গেছে ওই জগতের ডাকে।

কদমের মৃত্যু তাই স্তব্ধ এই পল্লীর বুকে নীরব তীব্র একটা আলোড়ন এনেছে। মানুষগুলো তাই ভয়ে কেমন শুকিয়ে গেছে।

কাঁদছে অতুল কামার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। নিষ্ফল রাগে ফুলছে এমোকালী।

—ছুটবাবু!

অশোক ওর দিকে চাইল। এর প্রতিবাদ কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয়। একটি যুগ, একটি কালের বিরুদ্ধে তাদের দাঁড়াতে হবে। মানুষের জীবনকে এরই মাঝে সহনীয় করে তুলতে হবে।

তাদেরও শান্তি অর্জন করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। সেই কথাই ভাবছে অশোক। এমোকালীর দুচোখে জল নামে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই অশোকের।

ভুবন ফিরছে তার বাসার দিকে, সারা মন বিষিয়ে উঠেছে। একটু তীব্র উষ্ণ পানীয় চাই। চিন্তাগুলো কেমন সব জট পাকিয়ে আসে। কি যেন হারিয়ে গেল তার—হ্যাঁ কিছু একটা হারিয়ে গেল, এতদিন যা তার ছিল খুব নিকট হয়ে। ভুবনের মনে ধাক্কাটা লেগেছে। অসাড় হয়ে আছে তার সারা মন।

সকালের গেরুয়া রোদ গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

রোদে তাপ বাড়ছে—ধূ ধূ জ্বালাপোড়া ধরানো রোদ উঠবে রুক্ষ কাঁকুরে ডাঙ্গার বুক ফুঁড়ে। এমনি একটা জ্বালার সংক্রমণ ভুবনের অসাড় মনে। পাখির ডাকও কানে আসে না।

পিছনের ওরা চেয়ে রয়েছে তার দিকে—বিচিত্র প্রশ্নভরা চাহনিতে।

অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর কানে আসে।

—ব্লাডি ফুল।

লাল চোখ দুটো মেলে ওর দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে মাত্র ভুবন। আবার চলতে থাকে।

কেমন যেন অমানুষের মত চলছে—পা দুটোও নিজের বশে নেই। তবু চলছে—চলছে ভুবন এ গ্রামের একটি ভূতপূর্ব মানুষ।

একদিকে মৃত্যু আর হতাশার অন্তহীন অন্ধকার, তবু এদের চলাও থামেনি। নতুন উদ্যমে—নতুন উৎসাহে এরা লেগেছে।

এমোকালীর মনে কদম-বৌ-এর মৃত্যুটা কঠিন আঘাত হেনেছে—স্তব্ধ হয়ে গেছে অশোকও। অতুল কামার অসহায় দর্শকের মত দেখেছে আর কেঁদেছে নিষ্ফল অভিযোগে।

অশোক এই আঘাতটাকে—অপমানটাকে সহজ ভাবেই নেবার চেষ্টা করেছে।

এমনি অপমৃত্যু—জীবনের এমনি অপচয় সে ইতিপূর্বেও দেখেছে। প্রীতিও আজ তার কাছে মৃত, মৃত অতীত; কারিগর লোকটাকে দেখেছিল- -সেও বদলে গেছে। এই পরিবেশ থেকে কলের মানুষ কলের জগতেই ফিরে গেছে।

হারিয়ে গেছে সনাতন, গঙ্গামণি—নারাণ ঠাকুরের জগৎ থেকে। তারকরত্ন, অতীতের

একটি প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনধারা—তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবন, মণিমালাও সরে গেছে নতুন ভাবে বাঁচবার আশায়। ভুবন মেনে নিয়েছে এই জীবনকে—কদম-বৌ পারেনি সহ্য করতে এর তীব্র নীলাভ গরল-জ্বালা।

এ গ্রামের চারিদিকে শুধু ভাঙ্গন আর পরাজয়। এখানের মানুষগুলো কি এক নিষ্ঠুর চাপে শুধু মরছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এর থেকে বাঁচার পথ কোথায় তাই খুঁজছে তারা। এমোকালী আজ বেশ মুষড়ে পড়েছে, অতুল কামারও।

বুড়ো বলে,—সারা গাঁয়ে আজ মানুষ নাই ছুটবাবু। সবাই পালাচ্ছে ওই কলে, না হয় দুগ্গাপুরে। যারা যায়নি—তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তাদের ঘর গেল, ইজ্জৎ গেল—মান গেল। পড়ে পড়ে শুধু ধুঁকছে। শেষে একদিন এমনি করেই বার হয়ে পড়বে সব ছেড়ে। কারে নিয়ে—কি নিয়ে গাঁ বাঁচবে বলতে পারেন?

অশোকও তা দেখেছে, চোখের উপর মিষ্টিকে দেখেছে, দেখেছে নারাণ ঠাকুর, অতুল কামার, কালীচরণকে। আজও সেই কথাই ভাবছে।

এরা ধুঁকছে তবু গ্রামেই আছে। শহরের আলোয় ফিরে যেতে পারেনি। চোখ ধাঁধায়নি এখনও তাদের। বলে ওঠে অশোক,

—আমরা এক যুগ—একটা মহা দানবের সঙ্গে লড়ে চলেছি অতুল। ও চায় গ্রামজীবন সমাজ, মানুষের অন্তরের দয়ামায়া ভালবাসা, সব সুন্দরকে কেড়ে নিতে। আমরা সেইটা বড় করে দেখেছি। তারই মায়ায় পড়ে আছি এখানে। তাই এই আঘাত তো আসবেই। এতদিনে তবু দেখেছি, গ্রাম মরেনি। সে নতুন করে জন্ম নিয়েছে।

—সেদিনের আর কত দেরি?

অতুল কামার যেন আর্তনাদ করছে।

অশোক জবাব দেয়,

—সেদিনের দেরি নাই অতুল। গ্রামের রূপও বদলাবে। এখানের মানুষও এখানে সবুজে মাঝে বাঁচার পথ পাবে।

অশোকও সেই পথেই এগিয়ে গেছে। নতুন করে অর্থনৈতিক কাঠামোতে এ জীবন গ উঠবে। গ্রামের অভাব মিটলেই মানুষ গ্রামেই শান্তি পাবে।

মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। এমোকালী চুপ করে বসে আছে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরি মত। অতুল চোখে আর ভাল দেখতে পায় না, তবু ওই নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে দূরের সীমান্তে ধোঁয়া উঠছে, চাপ চাপ ধোঁয়া। দুর্গাপুরের কলের ধোঁয়া উঠছে।

বৈশাখের খর রোদে তেতে ওঠা মাটি বৃষ্টির জলে সরসা, ফলবতী হয়ে উঠেছে। চারিদি বিগত কালবৈশাখীর চিহ্ন। রোদে ভিজে মাটি থেকে একটা ধোঁয়া ধোঁয়া ভাপ উঠছে।

যতদূর চোখ যায় মাটির বুক মসৃণ হয়ে রয়েছে। এদিকে ওদিকে সার-গোবর ছড়ানো কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এই বতরের সময় ওই মাটির বুকে লাঙল দিতে পারলে নরম মাটি সজীব হয়ে উঠবে। কিন্তু এ বতর বৃথাই চলে গেল।

মুনিষ-মাহিন্দার নেই। সারা মাঠ পড়ে আছে, কোথাও ঠাঁই ঠাঁই একটু চাষ হয়েছে মাত্র। একদিকের সব জমির মালিক ওই ফণীবাবু, অবনীবাবু, ধরণী মুখুয্যে—ওরা অনেকেই।

শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে থাকে, দিন বয়ে যাচ্ছে। এখনও জমিতে তাদের চাষ পড়ল না। ওরা আশা করে আছে ছানু দাস কবে পশ্চিম অঞ্চল থেকে দল বেঁধে সাঁওতাল কুলি কামিন আনবে।

ধরণী বলে ওঠে,

—তা তাদের আনবে কবে হে? এদিকে বতর চলে যাচ্ছে, এখনও জমির আদ্দা ভাঙ্গা হয়নি।

অবনী গজ গজ করে,

—ব্লাডি ফুলস্।

ধরণী মুখুয্যের মন-মেজাজ ভালো নেই। এই সময় অন্য বছর ধান-বীজ ফেলা হয়ে যায়। জমিতে একটা দুটো করে চাষ—সার ছিটানো হয়ে যায়, এতকাল তাই হয়ে এসেছে।

এবার আর তা হয়নি। অবনীর কথায় চটে ওঠে ধরণী।

—জমি পড়ে পড়ে জল খেছে আর তুমি ইংরেজি ঝেড়ো না।

বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে শূন্য পরিত্যক্ত জমির দিকে চেয়ে। আজ চাষ করবার লোক নেই। দু-একজন যা আছে তারাও কেন জানে না এখানে কাজ করতে রাজি নয়।

হঠাৎ শব্দটা ওঠে। গুর গুর শব্দ।

দক্ষিণের মাঠের দিক থেকে শব্দটা উঠছে। ওরা আকাশের দিকে চায়—কেউ বা রাস্তার দিকে। কে জানে এরোপ্লেন না হয় মটরই হবে বোধ হয়।

ওদিককার মাঠে এখনও ঠিক ধানটান হয়নি, নতুন বন্দোবস্ত নিয়ে কামারপাড়ার লোক চাষ করেছে, তার নীচেই অশোকবাবুর—আরও অনেকের জমিগুলো।

শব্দটা সেই দিক থেকেই আসছে। হঠাৎ চমকে ওঠে অবনী, ফণীবাবু। একটা পগারের য় উঠে চেয়ে থাকে। ধুলো উড়ছে।

হলদে মত একটা কি যন্ত্র বনের দিক থেকে এসে মাঠে নেমেছে। গড়িয়ে আসছে মাঠের কে। পিছু পিছু অনেকে ভিড় করেছে। অবনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দামোদরের ব্যারেজ হবার সময় দেখেছে সে ওই যন্ত্রগুলোকে,—ট্রাক্টর।

ফণী মুখুয্যে রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে রয়েছে ওই দিকে। দেখেছে ও যন্ত্রের ক্ষমতা। মাটি তোলাপাড় দিতে পারে। কিন্তু ওটা আসলো কোত্থেকে?

শুধু তাই নয়; চলেছে—গাড়িতে বসে আছে এমোকালী।

—তাই তো হে!

ওরাও পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। তাদের চোখের উপরই এতবড় কাণ্ডটা ঘটে যাচ্ছে। বনগড়ানী জোড়ের মাথায় সব জল গিয়ে নেমেছে, সেখানে গড়ে উঠছে মস্ত বাঁধ, মাস জল থাকবে সেখানে।

ওর দুদিকের ক্ষেতে সোনা ফসল—রবিশস্য ফলবে।

মাথায় একটা হলদে টুপি লাগিয়ে এমোকালী ট্রাক্টর চালাচ্ছে, পিছনে জমির নরম মাটি ধারাল ফলার আঘাতে খাতের সৃষ্টি করে চলেছে। দুপাশে ভুসভুসে হয়ে উঠেছে মাটি।

উঁচু ডাঙ্গার বুক থেকে অনেক নীচে খুঁড়ে—মাটি সরিয়ে তারা বড় বড় জমি তৈরি করেছে অহল্যা মাটির নবজন্ম ঘটছে। বড় বড় চাপ মাটি উপড়ে পড়ছে ফলার মুখে।

বাতাসে ওঠে মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে বুক ভরে ওঠে।

বীজ ছড়াচ্ছে ওরা বীজ ধানের ক্ষেতে। পা দেবে যাচ্ছে নরম মাটিতে। ওদিকে দাঁড়িয়ে দেখছে নারাণ ঠাকুর। এমন চাষ জীবনে সে দেখেনি।

জমিটুকু চলে যাবার পর আর এদিকে আসেনি সে। আজ এসেছে, মাটির বুকের ওই মিষ্টি সোঁদা গন্ধটুকু তাকে আনমনা করে তুলেছে, আবার সেই দিনগুলোর স্বপ্ন দেখে সে।

মুঠো মুঠো করে চন্দনের মত ভুরো মাটি দুহাতে কুড়িয়ে ছিটুচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে আর খুশির দমকে অস্ফুট চীৎকার করে পাগলের মত নারাণ ঠাকুর।

মাটির ভুলে যাওয়া সৌরভ তার যৌবন-স্বপ্নকে ফিরিয়ে এনেছে।

আবার জীবনের সুর খুঁজে পেয়েছে নারাণ ঠাকুর।

কালীর হাতে কাঁপছে ওই কঠিন স্টিয়ারিংটা। শক্ত হাতে গিয়ারটা টানে। অনুভব করে মাটির গভীরে বসে গেছে ফলাগুলো; দুর্বার শক্তিতে সে মাটির বুক বিদীর্ণ করে চলেছে, এমনি করেই সগর রাজার বংশধর ভগীরথ যেন গঙ্গার খাত কেটে প্রবাহিত করেছিল গঙ্গার ধারা। বদ্ধ জীবনের একটা বদ্ধ স্রোত বইবে এবার এই নতুন গতি-পথে। আজ কদমের ক মনে পড়ে। তার অসহায় মৃত্যু যেন ওর বুকে একটা জোর এনেছে।

শক্ত মুঠিতে কালী স্টিয়ারিং ধরেছে।

ওপাশে ফণী, অবনী, ধরণী মুখুয্যে দেখে শুনে চুপ করে সরে গেল মহুয়াগাছের ওদিকে

ওদের ভাবনা বেশ বেড়ে গেছে। চারিদিকে চাষের প্রস্তুতি চলেছে। পানু দাসের সাম আছে, যেমন করে হোক লোকজন দিয়েও চাষ করাবে সে।

আর তাদের মত উট্‌কো চাষীরাই বিপদে পড়েছে।

দল বেঁধে ডোনপাড়া থেকে বাউরীপাড়া থেকে ছেলেরা প্যান্টশার্ট পরে বের হচ্ছে দুর্গাপুরে কারখানায় ডিউটিতে। সাইকেল চলেছে অনেকগুলো। হ্যান্ডেল থেকে টিফিন কেরিয়ার ঝুলছে ওদের মাথায় রঙ্গীন রুমাল বাঁধা। একটা হিন্দিগানের সুর গুনগুনিয়ে গেয়ে চলেছে তারা।

মাঝখানে একটা শ্রেণী—ওই অবনী, ফণীবাবু, ধরণীর দল; একদিকেওই দুর্গাপুরতীর্থযাত্রী দল, অন্যদিকে মাঠে এমোকালী নেমেছে ট্রাক্টরে, সেচের জন্য পাম্প-এর জল তুলছে।

এর মাঝে এরা যেন কেমন অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। অবনীবাবুর চোখের সামনে তখন ওই ট্রাক্টরের চাষ দেওয়াটা ভাসছে। বলে চলে বেশ ভবিষ্যযুক্ত হয়ে,

—বুঝলে ফণী ভায়া, তা কলের লাঙল ওই ট্রাক্টর আজকাল দেখছি এসেনশিয়াল।

ফলা! টেনিসন-এর নাম শুনেছো? মস্তলোক। সেই তো বলেছিল, ফারো ফলোড ফ্রি। চড় চড়িয়ে হাঁটু ভোর লাঙল চলেছে। না, দেখালে বটে অশোক।

ধরণী মুখুয্যে গজ গজ করে।

—নিজের কথা ভাবো এইবার। চাষে থাকবো, না বুড়ো বয়সে দুগ্‌গোপুর গিয়ে রসুইদার বামুনের কাজ খুঁজবো? লেখাপড়া তো শিখিনি, তাই বড় কলম নিয়েই থাকতে হবেক।

ফণীবাবু ভাবনায় পড়েছে। চারিদিকে একটা ঝড়ের মত পরিবর্তন এসেছে, এখন টিকে থাকার সমস্যাটাই বড় বলে মনে হয়।

হঠাৎ সাইকেলে করে ছানুকে যেতে দেখে চীৎকার করে, —ও দাসমশাই!

আজকাল ছানুকেও দাসমশাই বলতে হয়। ছানু তাগাদায় যাচ্ছিল। ওদের দেখে লম্বা দুটো মেলে মাটি ছুঁয়ে একটু দাঁড়াল। ফণীবাবু এগিয়ে আসে। ধরণী বলে,

—ওই ঝিলিবাদ থেকে সাঁওতাল আনবে বলেছিলে, তা বতর তো গেল, এদিকে চাষ-আবাদও বাকি—

ছানু বাক্যব্যয় না করে পা দুটো মাটি থেকে তুলে নিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে বলে,

—ও বলে দিইছি, তারা আসবেক।

—কবে?

ছানুর আর জবাব দেবার সময় নেই। হাতটা নেড়ে ওদের সান্ত্বনা দিয়ে আবার বনের মাঝে পথের দিকে এগিয়ে গেল সে।

এরা পরিত্যক্তের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ধরণী বলে ওঠে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য,

—ওই চাষই করছে ওরা। দেখ না শালাদের মাঝে মারামারি লাঠালাঠি লাগলো বলে। সমবায় চাষ হবে? কাঁচকলা হবে।

ফণীও বলে,

—তা আবার বলতে? ওদের প্যাঁচে পা দিলে জমিই বেহাত হয়ে যাবে। থাকুক জমি পড়ে—তবু তো আমাদেরই থাকবে।

এ যেন ওদের শেষ সান্ত্বনা। কিন্তু মনে মনে ভয় ধরে গেছে।

সদ্য কর্ষিত মাটির বুক থেকে উঠেছে মিষ্টি মিষ্টি আবেশ আনা সৌরভ। পাখি ডাকছে কেঁদ গাছে। ওদিকে জোড়ের ধারে আখক্ষেতে বাতাস শন শন আওয়াজ তোলে।

এ মাথা থেকে জঙ্গলের রাস্তা—ওই পর্যন্ত কয়েকশো বিঘে পতিত জমি, ডাঙ্গাকে ওরা চাষ দিয়ে সমতল করে আবাদী করে তুলেছে।

এতবড় প্রচেষ্টার কাছে কটি মানুষ যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে।

—পেন্নাম গো!

হঠাৎ ধরণী মুখুয্যে মিষ্টিকে এখানে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়। ও যেন ধরে ফেলেছে এদের মনের ভয় আর দুর্বলতাটা। একটু সামলে নিয়ে সাড়া দেয় ধরণী।

—এই! তুই আবার এখানেও আছিস?

মিষ্টি হাসছে। ওরা পা চালিয়ে বামুন পাড়ার দিকে ফিরে গেল।

এমনি আধবেলার সোনা-হলুদ রোদে বনের ধারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে মিষ্টি। ক'দিন থেকে মনটা ভাল নেই।

এর মাঝেও অবিনাশের বাঁশির সুর উঠছে। দুঃখে মনটা ভরে ওঠে।

বারবার মিষ্টি এই কথাটাই ভেবেছে। দিন শেষ হয়ে যায়। রাত্রি নেমে আসে। মিষ্টি চমকে উঠে। শিউরে উঠেছে কদমের ওই নিষ্ঠুর মৃত্যুতে। মনে হয় সে একা—জীবনের কোন আশা—আলো নেই। কোন পথ নেই।

হঠাৎ তাই আজ নতুন করে চেনে জীবনকে। চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইছে—নতুন করে আবিষ্কার করে, পথের ধারেই কি এক অবলম্বন তার জন্য রয়ে গেছে।

যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে দেখা এ পৃথিবী নয়, ভাল লাগা—আর ভালবাসার মাঝে ফিরে ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে তার মন।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন পথে বার হয়েছে। কেমন সুন্দর সব!

কি তিথি জানে না, চাঁদ উঠেছে বেণুবনসীমায়। কুচলে গাছের লাল টুকটুকে ফলগুলোয় ছেয়ে গেছে ওর বুক। অবিনাশের বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

পাখিডাকা রাত্রি। মনে কেমন আবেশ আনে মিষ্টির। অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মহুয়া সৌরভ-মাখা বাতাস।

—কি খবর মিতেন?

মিষ্টি বলে ওঠে,—মিতে বড় ডর লাগে মিতে।

অবিনাশও ওর দিকে চেয়ে থাকে। ফিসফিসানি বাতাসে কিসের কান্নার শব্দ। কদমের অতৃপ্ত আত্মা যেন কাঁদে চিরন্তন নারীর মাঝে।

অনেক ভুল করেছে মিষ্টি, মনে হয় একটার পর একটা ভুলই তার জীবনে জমা হয়ে গেছে কারিগরকে ভালবেসেছিল, কিন্তু সেও হারিয়ে গেল। শূন্য মন হাহাকার করে ওঠে।

অবিনাশের কথায় মিষ্টি আজ ধরা গলায় জবাব দেয়,

—একা বোঝা বওয়ার বড় জ্বালা মিতে। আজ রূপ নাই, গুণ নাই, বাতিল পুঁজির মেয়েমানুষ তাকে কিসের আশায় কে ভালবাসবে বলো?

অবিনাশও দেখছে মিষ্টিকে। ও যেন কার সুরের অধরা রূপ। ওকে আজ কাছে টেনে নেয় অবিনাশ। ওর হাতখানা তার হাতে।

বহু দিন পর শূন্য মন পূর্ণ হয়ে ওঠে মিষ্টির।

তবু হু হু করে মন। মনে হয় এ যেন কোন নিশি রাতের স্বপ্ন। এও যেন দিনের আলোয় ফুরিয়ে যাবে।

—ভয় কিসের মিতেন!

বলে ওঠে মিষ্টি,

—শহরের ভয়—দুগ্‌গোপুরের ডর। ওই আমাদের সব যাবে, ঘর—সুখ—শান্তি—সব

তোমাকেও কুনদিন টেনে লেবে, আর একজনের মত তুমিও সেদিন সব ফেলে পালাবে ওই নেশার টানে।

হাসে অবিনাশ,—সেদিন মরেই যাবো মিষ্টি।

মিষ্টি অবাক হয়।

—কেনে?

বলে চলেছে অবিনাশ,

—ধরে বেঁচে থাকবো, মনটা মরে যাবে। আমায় বাঁশিতে সুর জাগে, এই মাটির সুর—এই মাটিতে কালবৈশাখী নামে, ঝড় ওঠে, তারই সুর বাজে আমার বাঁশিতে মেঘরাগে। রাতের তারায় তারায় নিঝ্‌ঝুম বনে কান্না জাগে, কত জনের কন্তে মনের কান্না—ললিতরাগে তাই বেজে ওঠে; ফুলফোটা বনে ভ্রমরের গুনগুনানি, নানা রং-এর রং-বাহার সানাই-এ বসন্তের সুরে আমেজ আনে। গোঁসাই প্রভুর নাম শুনেছ মিতেন—জ্ঞান গোঁসাই বিষ্টুপুরের?

মিষ্টি ভক্তিভরে মাথা নোয়ায়,—অয় বাপ্ শুনবো নি?

অবিনাশ বলে চলে,

—তিনি বলতেন, শালগাছ দেখেছিস অবা, বনের ভিতর থেকে মাটিতে শিকড় গেড়ে মাথা তোলে আকাশে, বনের সীমানা ছাড়িয়ে; তেমনি শহরে যাবি মাথা তুলতে, জয় করতে, মূল শেকড় থাকবে তোর মাটিতে পোঁতা—সেই ত যোগাবে তোকে বেঁচে থাকবার রস—সব সবুজ। আমি দেখেছি মিতেন—এই আমার ঘর। শহরের ভাড়াটে আমি, দুদিনের যাত্রী। ফিরে আসতেই হবে আমাকে এখানে।

চুপ করে থাকে মিষ্টি। ওর চোখের কোলে কি এক মধুর স্বপ্নের আবেগ। ক্লান্ত পথহারা দুজনে আজ যেন একটি মনের গহনে নিজেদের একাত্ম করে তোলে। বলে ওঠে মিষ্টি,

—ভেবেছিলাম ঠকে গেছি।

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে, অকারণে মিষ্টির চোখে জল নামে, সুন্দর মুখমাখা ব্যাকুল বেদনায় ভরে উঠেছে।

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—কেনে!

মিষ্টি বলে চলেছে,

—দেখলাম বাঁচবার জন্য ভালবাসার দরকার মিতে, ঠকে ঠকেও মানুষ ভালবাসে। বেঁচে আছি, ভালবাসাটা তারই সাবুদ।

হাসে অবিনাশ, —আবার ঠকবে তুমি !

নিজেকে আজ ওর আমন্ত্রণে সঁপে দেয় মিষ্টি। ফুরিয়ে দিয়েও নিজেকে যেন ফিরে পেতে চায়, বাঁচতে চায়; অফুরান প্রাণমন তাই ভরে ওঠে প্রীতির প্রসাদে।

হাসছে মিষ্টি,—ঠকেও জিতবো মিতে।

কদমের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি, অনেককে কাজের মাঝে এগিয়ে দিয়েছে। মিষ্টির মনে নিবিড়

হতাশার মাঝে বাঁচবার আগ্রহ এনেছে। আবার সে সব হারিয়ে হতাশার অন্ধকারে মরতে চায় না। তাই ভালবাসে, বাঁচতে চায় আবার।

বাঁচতে চেয়েছিল মণিমালাও। সেও একটি পুরোনো বনেদি বংশের কুলবধূ হয়ে এসেছিল, ঘর বাড়ি দেবসেবা-পুকুর বাগান জমিদারী—সবই ছিল। তার কোলেও এসেছিল সন্তান।

কিন্তু সব একে একে কোনদিকে নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

দেখেছিল এ বাড়ির শেষ অবস্থা। এখানের বন্দী পুরীতে মুখ বুজে অভাব সয়ে বাঁচা যায় না।

তাই চলেই গিয়েছিল দুর্গাপুরে জীবনের বাসায়।

সেখানে গিয়েও চমকে উঠেছিল। এতবড় আঘাতটা সহজে সইতে পারেনি। দেশের এতবড় বাড়ি, এত সম্মান পরিচয় তার কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে !

ছোট এক কুঠরির এইটুকু ঘর আর সামনে একফালি টিনের শেড দেওয়া বারান্দা, এই তার সংসার।

চারিপাশে নানা প্রদেশের বাসিন্দার ভিড়। নোংরা আধনেংটা ছেলেমেয়েদের কলরব ওঠে দিনরাত।

মণিমালার মনে হয় এর চেয়ে অন্য যে কোন ঠাঁই ভালো। জীবন কাজে বের হয়েছিল, ফিরছে।

পরনে তেলকালি লাগা প্যান্ট, পায়ে কোম্পানির সেই ভারী বিবর্ণ জুতো, নীল রং-এর একটা শার্ট।

মণিমালা অবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। কারখানায় আট ঘণ্টার খাটুনির পর লোকটা যেন টলতে টলতে আসছে। ওর সব জীবনী শক্তিটুকু টেনে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে।

মণিমালা স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে,

—কি কাজ করো এখানে?

জীবন মুখ-হাত থেকে তেলকালি আর ঘাম মুছতে মুছতে বলে,

—ইঞ্জিনিয়ার নিশ্চয়ই নই!

মণিমালা ওর দিকে চেয়ে থাকে। চড়াই-এর ওপাশে ছায়াঘন সুন্দর কোআর্টারগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—ওই বাসাগুলো কাদের?

ক্লান্ত কণ্ঠে জীবন জবাব দেয়, — স্টাফ কোআর্টার। সেকেন্ড স্টাফদের বাসা, ওদিকে আছে সাহেবদের বাংলো।

মণিমালা চুপ করে থাকে।

ওদিকে হঠাৎ একটা আর্তনাদ ওঠে। একটি বৌ চীৎকার করছে। মণিমালা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। জীবন বলে,

—বিপিন ওর বৌকে পিটছে বোধহয়।

মণিমালা অস্ফুট ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে,

—বৌকে মারে এমনি করে?

বাতাসে তখনও মেয়েটার পরিত্রাহি চীৎকার শোনা যায়, বিপিনের মদ্যপ কণ্ঠের চীৎকার ভেসে আসে। জীবন বলে,

---মদ খেয়ে এসে ঘরে মারধোর করে।

মণিমালা অজানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এ কোন্ নরকে এসে পড়েছে সে! জীবনের দিকে চেয়ে থাকে। এখানে এলে সবাই কেমন বদলে যায়, অমানুষ হয়ে যায়।

রাত্রি নামে। বৌটা কেঁদে কেঁদে কখন থেমে গেছে। মণিমালার ঘুম আসে না। অজানা কোন্ ভয়ে সে ভীত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে মণিমালা।

এখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই। এত আলো, ওই ফার্নেসের ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি ওদের মনের সব শ্রী-শান্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। রাতের আকাশে বাতাসে কার অট্টহাসির শব্দ শোনা যায়।

—শুনছ!

ভয় করছে মণিমালার। ওই আগুন তার সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, বাকি যেটুকু আছে তাও নিঃশেষ করে দেবে।

জীবনের কোন সাড়া নেই। ঘুমের মাঝে হারিয়ে গেছে সে। আতঙ্কিত মণিমালা একাই জেগে থেকে বিনিদ্র রজনীর প্রহর গোনে।

এখানে তার মন বিষিয়ে উঠেছে।

তাই মুক্তির পথ খুঁজছে সে। বাঁচতে চায় নতুন করে। জীবনকেও বলেছে কথাটা।

সারাদিন বন্ধ ঘরে বসে থাকে। বাইরে হল্লা, মদ্যপকণ্ঠের কোলাহল ওঠে, কারা অশ্লীল গান গায় তাকে শুনিয়ে। হাসাহাসি করে। মণিমালার অসহ্য মনে হয়।

জীবনকেও বলেছে।

—এখান থেকে চলে যেতে পারো না?

সারাদিনের কাজের পর ফেরে জীবন, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত একটি মানুষ। মণিমালার কথায় তার দিকে ফিরে চায়। মাথা নাড়ে জীবন।

—কোথায় যাবো?

যাবার ঠাঁই তার আর নেই। এমনি করেই ঘর হারিয়ে উৎখাত হয়ে ভেসে বেড়াতে হবে তাদের বানে-ভাসা খড়-কুটোর মত। জবাব দেয় জীবন,

—যাবার ঠাঁই আর নেই মণি, এমনি করে তিলে তিলে আমাদের মানুষের পরিচয় থেকে নির্বাসিত হয়ে যেতে হবে। মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙ্গে ভেঙ্গে খসে পড়বে। আমাদের দেখে তা বুঝতে পারছো না?

মণিমালা জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

তাই সে এখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। দরখাস্তগুলো পাঠিয়েছে অনেক জায়গায়। যদি সামান্য স্কুল মাস্টারি পায়—তাও চলে যাবে।

রাতের অন্ধকারে ঘর-দরজা বন্ধ করে বসে থাকে মণিমালা।

জীবনের নাইট ডিউটি; দরজায় কাদের ধাক্কার শব্দে ভয়ে শিউরে ওঠে।

কার মদ্যপ মাতাল কণ্ঠের হাসির শব্দ শোনা যায়।

—ভয় পেয়েছে মেয়েটা।

হাসছে তারা। জানলাটাও বন্ধ করে দিল মণিমালা ভয়ে। এ কোন্ অন্ধকার শ্বাপদ অরণ্যে সে এসে পড়েছে। মানুষ নয়—রাতের অন্ধকারে এখানে রক্তলোভী জানোয়ারের দল ঘুরে বেড়ায়।

মানুষ ধীরে ধীরে আদিম হিংস্র হয়ে উঠেছে এখানে।

তাই চিঠিখানা আসতেই খুশিতে ফেটে পড়ে সে।

বর্ধমানের কোন পল্লী অঞ্চল থেকে স্কুল মাস্টারির খবর এসেছে। মণিমালা ভাবে এই রাজ্য থেকে তবু অজানা কোন সবুজের মাঝে গিয়ে শান্তি পাবে সে।

জীবন আসতেই খবরটা দেয়। বলে ওঠে মণিমালা,

—এখান থেকে চলে যাবো ভাবছি।

জীবন স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। ও যেন আজ দূরের মানুষ, ওর উপর দাবি, জোর সব হারিয়ে ফেলেছে জীবন। আজ সব ভেঙ্গে পড়ছে—সব বন্ধন, সব দাবি। জীবন যেন অনুনয় করছে।

—না গেলেই নয়?

মণিমালা আজ মুক্তি চায়। বলে ওঠে,

—বাধা দিও না। এখানে আমি থাকতে পারবো না। আসবো মাঝে মাঝে।

জীবন কথার জবাব দিল না।

এই যে তার ভবিতব্য। একা তার নয় অনেকেরই। আজ ব্যক্তিগত মত আর পথও গড়ে উঠেছে। দুমুঠো অন্নের জন্য মানুষকে আজ এমনি করে সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে।

মণিমালা চলেই গেল ক'দিন পর।

স্টেশনে গিয়েছিল জীবন ওকে তুলে দিতে। জনতার ভিড়ে আজ অতীতের একটি কুলবধূ ঘরের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে ওরই মাঝে হারিয়ে গেল। আজ মানুষের সামনে ঘর নেই। সবাই কেমন ঘরছাড়া, দুর্বার স্রোতে ভেসে যাওয়া অসহায় কোন জীব।

মণিমালাও তাই হারিয়ে গেল। ট্রেনটা বাঁকের মাথায় সরে গেছে, জীবন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

—জীবনবাবু!

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে। এখানে ও নামে তাকে বড় একটা কেউ ডাকে না। সে আর এখানে বাবু নয়। সে পরিচয় অনেকদিন আগেই এখানে হারিয়ে গেছে।

—কার্তিক!

জীবন এগিয়ে আসে। তাদের গ্রামের অতুল কামারের ছেলে কার্তিক। কার্তিক বলে ওঠে,

—আপনাকে খুঁজছি, বাসায় গেইছিলাম, শোনলাম ইস্টিশানে আইছেন। কর্তার খুব অসুখ। ওষুধ নিতে আইছি। আপনাকেও যেতে হবেক।

জীবন অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে,—বাবার অসুখ!

—আজ্ঞে।

জীবন কি ভাবছে। কার্তিক বলে ওঠে,

—আপনি এই বাসেই চলে যান, ওষুধ আর ফল কিনে আমি পিছনে যেছি। দেরি করবেন নাই আজ্ঞা।

জীবনের মনে হয় ওসব কেমন স্বপ্ন। বাবা, মা—সেই বিরাট বাড়িখানা, অতীতের সেই দিনগুলো শুধু স্বপ্নই।

তবু যেতে হবে।

মণিমালা এতক্ষণ কতদূরে গেছে কে জানে, সে আর এখানের খবরের জন্য উদ্বিগ্ন নয়। যে বাড়ি, যে মানুষগুলো তাকে আশ্রয় দিতে পারেনি, দিতে পারেনি মুখের অন্ন, পরনের কাপড়, এতটুকু নিশ্চিন্ততা—তার জন্য মণিমালার মনেও কোন দুর্বলতা মায়া-মমতা থাকতে পারে না।

বাসটা এসে পৌঁচেছে তাদের গ্রামের ওদিকের রাস্তায়। একটু থেমেই আবার চলে গেল বাসটা শালবনের বুক চিরে।

জীবন নেমে চলেছে গ্রামের দিকে।

কয়েক মাস এদিকে আসেনি জীবন। বনের বাইরে দু-একটা বড় বড় শাল মহুয়া গাছের পরই ছিল বিস্তৃত তৃণহীন প্রান্তর। মাঝ দিয়ে বয়ে যেত বন-গড়ানী গভীর খাত, বর্ষার জল নামতো।

আজ সেখানের রূপ বদলে গেছে।

ট্রাক্টর-এর ফলায় তার সবকিছু বদলে গেছে, দিগন্তের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি সমতল হয়ে গেছে, বনের মুখেই উঁচু বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করেছে।

কয়েকটা বর্ষণের জমা জলে তা ভরে উঠেছে, নীচে থেকে শুরু হয়েছে সবুজ ক্ষেতের নিশানা।

দূরে একটা ট্রাক্টর চলছে।

এ যেন অন্য জগৎ। তার অন্ধ পাড়াগাঁ আজ বসে নেই, সেও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাটার ধারে গাড়া হচ্ছে ইলেকট্রিকের পোস্ট, বিজলী বাতি আসছে, টেলিগ্রামও এসে গেছে গ্রামের পোস্টাপিসে।

বাতাসে ওই তারগুলো কেমন একটানা সুরে কাঁপে।

জীবনের মনে হয়, এতসব কর্মকাণ্ড চলেছে, কিন্তু এখানে এই মাটিতে তার আর কোন ঠাঁই নেই।

আজ তারকবাবুও এই কথাটা ভেবেছে।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছে এই জমিদারী, তার দফরফ সব হারিয়ে গেল। ওদিকে নতুন দুর্গাপুর গড়ে উঠেছে। তাই এই অপমৃত্যু গ্রামের।

সবাই চলে যাচ্ছে, এরা এক পাশে পড়ে মরবে।

কিন্তু পরে দেখেছে এরা মরেনি। এত দুঃখ, এত দূরের ডাক, এত বঞ্চনা আর এত মৃত্যুর মাঝে গ্রামও আবার নতুন করে বেঁচে উঠছে।

বুনো মাটি—ওই ঊষার ডাঙ্গা বুলডোজার দিয়ে সায় করেছে। এত যুগের বালি ঠেলে ওর অন্তর থেকে মানুষ বের করেছে মাটি, সফলা মৃত্তিকা। জলের অভাব নেই।

আবার সবুজ শ্যামল করে তুলেছে তাকে।

কিন্তু তারকবাবুর আজ কোন ঠাঁই নেই সেখানে। সে এই নব চেতনার দিনে হারিয়ে গেছে একেবারে।

সারা শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে।

অবনী, ফণী, ধরণী মুখুয্যে—আরও অনেকে এসেছিল তার কাছে।

তারকবাবু চুপ করে জানলার বাইরে চেয়ে আছে, ওদিকের ডাঙ্গায় চাষ-আবাদ চলেছে, বিজলী বাতি আসছে গ্রামে তারই খুঁটি গাড়া হচ্ছে।

তার বাড়িখানার এখন চুন পলেস্তারা খসে গেছে। দু-একটা জানলা-কপাটও পড় পড় হয়ে আছে। এতবড় বাড়িটা কেমন শোকের ভারে স্তব্ধ।

জীবনও নেই, সে আজ কলের মজুর মাত্র।

শূন্য বারান্দা দখলে রুদ্ধদ্বার ঘরে পায়রা আর চামচিকে উড়ে বেড়ায়। ঢুকল ফণী-অবনীর দল।

ওরা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঢুকে দেখে তারকবাবু বিছানায় বসে আছে, আর নীচে নামে না। এই জগৎ থেকে তারকবাবু ধীরে ধীরে সরে গেছে। আজ সে বাতিল একটি প্রাণী।

একদিকে ওই সবুজ নতুন ক্ষেত, অন্য দিকে দিনের পড়ন্ত রোদে ঝকঝকে পানু দাসের ধানকলের লম্বা-শেড গুদাম। আরও কি সব কলকারখানা গড়ছে সে। ওদিকে চাওয়া যায় না।

রোদের তাপে চোখ ঝলসে ওঠে, পানু দাসকে ঘিরে আজ একটা ওমনি ঝলসানি উঠেছে।

হঠাৎ ওদের দেখে তারকবাবু মুখ তুলে চাইলো।

ধরণী এগিয়ে আসে।

—এবার কি চাষ হবে না তারক?

তারকবাবু কিছু বলবার আগেই অবনী বলে ওঠে,

—অল ব্লাডি ফুলস্! কোন মজুর ব্যাটাকেই পেলাম না। অল ডোমপাড়া নাও দুর্গাপুর, বাউরীপাড়াও গন্ প্রায়....

তারকবাবু বলে,

—জমি তো আমার প্রায় শেষ করেই এনেছি অবনী।

ওরা চুপ করে গেল। কথাটা সত্যিই। সব জমিই প্রায় বেহাত হয়ে গেছে তার। মলিন বিষণ্ণ হাসি হাসে তারকবাবু।

—বিশেষ আর ভাবনার কিছু নেই আমার।

এককালে এই গ্রামেই প্রায় দুশো বিঘে খাস জমি ছিল তার, জমিদারী ছাড়া। সবই প্রায় গেছে। তারকবাবু বলে ওঠে,

—আজ আর ভাববার দরকার নেই অবনী।

অবনী তবু আমতা আমতা করে।

—হাজার হোক তুমি গ্রামের মাথা!

হাসে তারকবাবু, ও কথাটা কেমন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত শোনায়! বুকের ভিতরটা টন টন করে ওঠে দুঃসহ ব্যথায়, আজকাল প্রায়ই ওই বেদনাটা দেখা দেয়। জীবন, বৌমা চলে যাবার পর থেকেই ওটা বেড়ে চলেছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তারকবাবু, জানলাটা ভেজানো। দিনের আলো কেমন সইতে পারে না। ওই স্তব্ধ বাড়িটার মত একটা মলিন হতশ্রী ওকে ঘিরে ধরেছে।

চুপে চুপে উঠে গেল তারা।

তারকবাবু কথা বলে না, অতীতের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। অবাধ্য প্রজাকে কেমন করে শাসন করতে হয় তা জানে সে, অতীতে করেছিল অনেক। ওই কাছারিবাড়ির থামটায় অনেককে বেঁধে চাবকেছে।

অনেকের আর্তনাদ আর কান্নার সুর আজও এ বাড়ির বাতাসে মিশে আছে। তারা অভিশাপ দিয়ে গেছে, তীব্র ঘৃণা ভরা অভিশাপ! বেদনাটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা বেদনা।

—মামাবাবু।

দরজাটা ঠেলে ঢুকছে অশোক। তারকবাবু ওর দিকে চাইল, বেদনাটা একটু কমছে।

—কেমন আছেন মামাবাবু?

হাসে তারকবাবু; ও যেন মৃত্যুর মত ছায়া বিষাদময় সেই হাসি। বলে ওঠে তারকবাবু বেদনা চেপে,

—তোমার কথাই ভাবছিলাম।

অশোক এগিয়ে যায়।

অনেকদিন থেকেই কথাটা চলছে। একটা হাসপাতাল গড়ে ওঠবার আশা আছে, যদি এই বড় বাড়ির খানিকটাও পায় তারা, বাকি টাকা কিছু অন্যত্র যোগাড় হয়ে যাবে।

এতবড় বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে।

তারকবাবুকে কথাটা বলেছে অশোক, তারকবাবুও ভেবেছে।

আজ তার অভাব সত্যিই। বিশেষ দান ওরা দিতে পারবে না, তবু একটা সংকাজে লাগবে। তারকবাবুও ভেবেছে কথাটা।

গ্রামেও ইতিমধ্যে হয়তো জানে অনেকে।

তারকবাবু বলে,—আমি ভেবে দেখি অশোক। আমারও বিশেষ অমত নেই। একটু সময় দাও।

অশোক বিশেষ চাপ দিতে চায়নি।

কথাটা আর কেউ না শুনুক পানুর কানে ঠিক উঠেছে। কিছু দিন থেকে সে ভেবেছে কথাটা মনে মনে। কুঁড়ে ঘর থেকে রাজপ্রাসাদেই উঠতে হবে তাকে। ব্যবসায়ে নেমেছিল, আজ দুহাত ভরে পয়সা পেয়েছে।

মনে অন্য ভাবনাও জাগে।

কদমের মৃত্যু তার অন্তরে একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে। শহরে দুর্গাপুরে যায় মাঝে মাঝে, সেখানের জীবনের একটা ভোগ-তৃপ্তি তার মনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এনেছে।

এই বড় বাড়িটার দিকে তার নজর ছিল অনেকদিন আগেই। বহুদিন এখানে এসেছে হাত জোড় করে প্রসাদ ভিক্ষা করতে, এইখান থেকেই তার ভাগ্যের উন্নতির সূত্রপাত।

আজ সেখানে মাথা উঁচু করেই এসেছে পানু দাস।

তারকবাবু অবাক হয়। সে ভাঙ্গা দেউড়ি আজ ধ্বসে পড়েছে, বাগানও নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখান ওখানে দু-একটা গোলক চাঁপা গন্ধরাজ শিউলি আর টগর গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

জিপটা এসে একেবারে ভিতর বাড়িতে দাঁড়িয়েছে।

উঠে আসে পানু দাস। তারকবাবুকে আগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো, এখন এসে দাঁড়াল মাত্র।

তারকবাবু ওকে এ সময় দেখে একটু অবাক হয়।

—তুমি।

পানু হাসে,—এমনি এলাম খবর নিতে। শুনলাম শরীরটা ভাল নেই।

তারকবাবু কথা বলে না। আসল কথাটা পানুই বলে,

—শুনলাম খানিকটা বাড়ি নাকি ছেড়ে দেবেন, তাই এলাম যদি কথাবার্তা বলেন।

তারকবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকে।

অতীতের দিনগুলো মনে পড়ে। পানু এসে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে কাছারির রকের একপাশে জোড় হাত করে বসে থাকতো, সেই পানু আজ এসেছে তার বাড়ি কিনতে!

একটা আঘাত আর অপমান তীব্রতর হয়ে বাজে তারকবাবুর মনে। পানু বলে ওঠে!

—কথাটা বলে গেলাম, ভেবে দেখবেন। শহর থেকে আসছি, এগুলো এনেছিলাম।

কতকগুলো আপেল বেদানা নামিয়ে রেখে পানু বের হয়ে গেল।

তারকবাবুর হঠাৎ নজরে পড়ে ওই ফলগুলো, পানু দয়া করে আজ ওকে।

ডাকতে যাবে তারকবাবু, হঠাৎ বুকের ভিতরে সেই বেদনাটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে, তীব্রভাবে দম বন্ধ হয়ে আসে।

স্তব্ধ বাড়িটার কেউ নেই, বড়বৌও ওদিককার ঘরে। একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনে ছুটে আসে সে।

তারকবাবু সেই দিন থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে গেছে।

রমণ ডাক্তার আসে। ওষুধপত্তর ইনজেকশন দিয়েছে, একটু সামলেছে তারকবাবু।

কিন্তু রমণের সাহস হয় না। সেও দেখে অবাক হয়েছে। এতবড় মানুষটার কাঠামোখানাই টিকে আছে মাত্র, ভিতরে ওর ফোঁপরা হয়ে গেছে, তাই ভয় হয়। বলে ওঠে,

—শহরের বড় ডাক্তারকে আনুন একবার। না হয় দুর্গাপুরে জীবনের ওখানেই মান, শুনেছি ভালো হাসপাতাল হয়েছে।

হাসল তারকবাবু, মাথা নাড়ে স্তব্ধ ভাবে। ওখানে ছেলের সামান্য একটা বাসা, একটা নাকি খুপরি আর ওই চাকরি। তার আশ্রয়ে গিয়ে জীবনের শেষদিনগুলো কাটবে!

কথার জবাব দিল না তারকবাবু।

বড়বৌ বলে,—শহরের ডাক্তার তো অনেক টাকা নেবে।

—তা শতখানেক।

কি ভাবছে তারকবাবু। একদিন ও টাকা ছিল তুচ্ছ, আজ জীবনমরণ সমস্যার দিনে কোন উপায়েই এত টাকা বের করা সম্ভব নয়। আরও অনেক খরচ আছে।

তিলে তিলে প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। অসহায় এ মৃত্যু। চোখের সামনে বড়বৌ দেখছে এই দৃশ্যটা।

এ তার কাছে অসহ্য ঠেকে। সোনাদানা যা ছিল তাও নিঃশেষিতপ্রায়, এখনও কতদিন বাঁচবে কে জানে, আজ তার সামনে নিশ্চিত অনাহার আর দুঃখটাই বড় হয়ে ঠেকে।

পানু দাসও এমনি দিনের অপেক্ষাতেই ওৎ পেতে বসেছিল। কথাটা সেদিন গিন্নীমার কাছেই পাড়ে।

বাইরের মহলটা বাগান সমেতই কিনতে চায় সে। অবশ্য বাগান বলতে এখন আর কিছুই নেই। পানু বলে চলেছে,

—এমন একটা লোকের চিকিৎসে হবে না! এটা কি কথা মা। তাই ভাবলাম যাই বলি গিয়ে।

তারকবাবু আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে।

চোখের সামনে অতীতের সেই দিনগুলো ভেসে ওঠে, কত সুর আলো আর আনন্দমুখর সেই সব দিন!

—বড়বাবু। পানু ডাকছে তাকে।

ঘোলাটে চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে তারকবাবু। কেমন চেনা কণ্ঠস্বর। কাছারির সেই দিনগুলো আজও যেন যায়নি। তারকবাবু ধমকে ওঠে,

—এখন ওসব খাজনা মাপ-টাপ্ হবে না! খাজনা দিতে না পারিস্ ঠাণ্ডাঘরে থাকতে হবে। এ্যাই রাম সিং।

পানু চুপ করে থাকে! রামসিং অনেক আগেই এ বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে বর্তমানে পানু দাসের ধানকলে দ্বারোয়ানী করছে।

পানু দাস টাকাটা বড় বৌ-এর হাতেই দেয়, উকিল সাক্ষীর যোগাড় সেই-ই করবে।

টাকা! বড়বৌ টাকাগুলো হাতে নিয়েছে! হাত কাঁপছে, কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ।

সব যাক! গেছেই সব। তবু মানুষটা বেঁচে উঠুক। অতীত সে যতই জীর্ণ হোক তবু মানুষ তাকে ভুলতে পারে না। সদর থেকে ডাক্তার আনতে গেছে রমণ ডাক্তার।

তারকবাবু যেন নাচঘরে বসে আছে, ওপাশে আলবোলায় উঠছে অম্বুরী তামাকের সুবাস, দীর্ঘ জরির কাজ করা নলটা পাক দিয়ে উঠেছে।

মস্ত একটা পাখায় বাতাস করছে পাখা-বরদার।

মার্বেল পাথরের মেঝের মাঝখানে গালিচা পাতা। তবলার সুরেলা আওয়াজ উঠছে।

সারা মনে এখনও একটা সুরের অনুরণন জাগে।

বাইরে পুণ্যাহের উৎসব চলেছে, ঢোল সানাই-এর শব্দ আসে, প্রজা নায়েব গোমস্তা আমলারা কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যাপার তদারক করছে।

জমিদারীর একটা শুভ দিন।

ঘরের ভিতর সুরটা উঠছে। মিষ্টি আবেগ ভরা আকুতিময় সেই সুর।

—বাবা!

কে যেন ডাকছে তাকে। দূর থেকে ডাকটা শোনা যায়।

তারকবাবু চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে। কেমন আচ্ছন্ন সেই দৃষ্টি।

—কে!

জীর্ণ হাতখানা এসে পড়ে জীবনের হাতে।

জীবন এসেছে। কোন স্বপ্নরাজ্য থেকে কঠিন বাস্তবে এসে পড়ে তারকবাবু!

—তুমি!

ছেলের দিকে চেয়ে থাকে সে। তার সব সম্পদ স্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গেছে। জীবনের পরনে তেলকালি লাগা প্যান্ট, আর হাফশার্ট। দীর্ঘ পেটা চেহারায় রুক্ষতার ছাপ।

আজকের দিনের একটি সংগ্রামী মানুষের ছবি। তারকবাবু তার সন্তানের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেনি, সব কেড়ে নিয়ে ওকে যেন ত্যাজ্য পুত্রের মত পথে বের করে দিয়েছে।

কোন সুখ-শান্তিও দিতে পারেনি। জীর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে তারকবাবু,—বৌমা! বৌম এলো না?

জীবন কথাটা বলতে গিয়েও পারে না। কি করে জানাবে ওকে যে জীবনের সত্যিই সব হারিয়ে গেছে। এতটুকু ঘর তাও আজ ভেঙ্গে গেছে তার। বলে ওঠে জীবন,

—সেও আসবে।

তারকবাবু ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ধরাগলায় বলে ওঠে,

—তোমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে গেলাম জীবন। তুমি আমায় পারো তে ক্ষমা করো!

জীবন বলে,

—বাবা! আপনি আবার সেরে উঠবেন।

হাসে তারকবাবু, মনে হয় ও স্থির জেনেছে যে আর তার দরকার নেই।

বাঁচার উপর কোন আকর্ষণ আর তার নেই। বলে ওঠে,

—দিনটা বড় তাড়াতাড়ি বদলে গেল জীবন, তাল রাখতে পারলাম না। তবু বলবো তোমরা সুখী হও।

তারকবাবুর কণ্ঠস্বর কেমন ভারী হয়ে আসে।

চোখের সামনে নেমে আসছে নীল একটা আভা।

সেজের বাতিগুলো একে একে যেন নিভে আসছে নাচঘরে। তখনও সুরটা গুমরে ফেরে এর দেওয়ালে।

—কে!

একটা ছায়ামূর্তি তখনও স্তব্ধ নাচঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে। আবছা আলোয় ওর দুচোখে যৌবনের দীপ্তি, ডাক দেয় তাকে কোন আলোর পারে অতল অন্ধকারে।

—বড়বাবু!

কোথায় আকাশে আকাশে মেঘ জমেছে। কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আর মাতাল হাওয়া চারিদিকে মেতে উঠেছে। গুরু গুরু শব্দ ওঠে। তরুণ তারকরত্ন সেদিন এমনি একটি ঝড়ের রাতে নতুন রূপে জেগে উঠেছিল।

আজও সেই অশরীরী যেন তাকে ডাক দেয়। অন্ধকার! চোখের সামনে নেমে আসে গাঢ়তর অন্ধকার।

আলো।

দুচোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে।

—বড়বাবু!

রমণ ডাক্তার ডাকছে। সদর থেকে বড় ডাক্তারও এসেছে। কিন্তু আর করার কিছুই নেই। তারকরত্নের চোখের সব আলো চিরতরে নিভে গেছে।

—বাবা!

জীবন আর্তনাদ করে ওঠে।

স্তব্ধ আকাশে সুরটা তখনও উঠছে।

—বাবুল মেরে নৈহার ছুটকে যায়।

কার সাজানো ঘর, অতীত যুগ সব ফুরিয়ে গেল। কোন পরম বেদনায় রাজ্যচ্যুত নবাব এই গান রচনা করেছিল। একটি স্বর্ণযুগ, জীবনের কত আলোভরা দিন সব তার হারিয়ে গেল।

সেই অতীতের তীর হতে আজও এই গ্রামের আকাশ বাতাসে যেন ভেসে আসে কার করুণ কান্নার সুর।

একটি যুগ, একটি প্রাসাদ ওই তারকবাবুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে মুছে গেল।

—মিতে!

মিষ্টি খবরটা শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছে। অবিনাশ ওর দিকে চাইল। মিষ্টির দুচোখে জলের আভাস।

—বড়বাবু মারা গেলেন শুনেছ? বড়বাড়ির তারকবাবু গো!

অবিনাশ শুনেছে খবরটা। তাই যেন ওর মনের জমাট কান্না ফুটে ওঠে ওই করুণ সুরে।

—চার কাহার লে যাই—

চার জনের কাঁধেই কোন সিংহাসনে চড়ে মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার পার হয়ে চলেছে মানুষ, পিছনে পড়ে রইল তার সব কিছু সঞ্চয়। গড়া ঘর ভেঙ্গে গেল।

—বাবলু মেরে নৈহার ছুট যায়।

আর্তনাদ করে ওঠে মিষ্টি।

—ওই কান্নার সুর থামাও মিতে। শুধু কি কেঁদে কেঁদেই সব ফুরিয়ে যাবে। সব ফুরিয়ে যাবে।

মিষ্টি আর অবিনাশ কাঁদে একটি মানুষের, একটি বিগত যুগের বিচ্ছেদ বেদনায়। এ গ্রামের আকাশ বাতাসে নেমেছে বিচ্ছেদের ছায়া।

অতুল কামারও এসেছে। এসেছে এমোকালী, কার্তিক—প্রায় সকলেই। অশোক স্তব্ধ হয়ে সিঁড়ির ধারে বসে আছে। কান্নার একটা ক্ষীণ সুর ওঠে বাতাসে।

এ জীর্ণ প্রাসাদের অন্তরে ওই কান্নার সুর গুমরে ওঠে।

অতুল কামার ছানিপড়া চোখে দেখতে পায় না কিছু। হাতড়ে হাতড়ে তারকবাবুর পা দুটো খুঁজছে। বলে কান্নাসিক্ত কণ্ঠে,

—একবার শেষ পেন্নাম করে যাই ছুটবাবু, এ গাঁয়ের মাথা আজ খসে গেল। বুঝবি—তোদের শেষ রাজাবাবুও চলে গেল।

বুড়োর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে।

সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে একটি লোককে শেষ বিদায় জানাতে। আসেনি শুধু পানু দাস। সে নাকি শহরে গেছে, সেইখানেই রয়েছে কিছুদিন জরুরি দরকারে।

রাত্রি হয়ে গেছে। ওরা ফিরেছে শ্মশান থেকে।

নারাণ ঠাকুরও গেছল ওই সঙ্গে। ফিরেছে সকলেই।

নারাণ ঠাকুরের বাড়ির পাঁচিলও পড়ে গেছে।

দাওয়ায় আবছা আবছা অন্ধকারে কাদের বসে থাকতে দেখে এগিয়ে যায় সে। অনেকেই ফিরছিল সঙ্গে। কার্তিক, এমোকালী, অশোক—সকলেই।

তারা নারাণ ঠাকুরের আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসে। হারিকেনের আলোতে দেখা যায় দাওয়ার উপর সনাতন—সেই তেজী জোয়ান ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্র্যাচের উপর ভর দিয়ে, একটা পা নেই। একটা হাতও আধখানা চলে গেছে। নারাণ ঠাকুর আর্তনাদ করছে, ডুকরে আবার নতুন করে কাঁদছে গঙ্গামণি ঠাকরুণ।

মেসিনে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে মরতে মরতে রয়ে গেছে সে, হাসপাতালে গিয়ে কোনরকমে বেঁচে এসেছে মাত্র প্রাণে।

এ শুধু বেঁচে থাকাই।

সেখানে কাজের জগতে এমনি পঙ্গু অকর্মণ্য অসহায়—একটি প্রাণীর কোন ঠাঁই নেই। বাতিল একটি জীব। কোম্পানির বাসা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

যাবে কোথায়। তাই আবার এইখানেই ফিরে আসতে হয়েছে। কালী বলে ওঠে,

—দেখছেন ছুটবাবু, ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক সেই গর্তেই এসে পড়তে হবেক।

গঙ্গামণি আর্তনাদ করে।

—কি হবে ছুটবাবু!

অশোক চুপ করে করে কি ভাবছে। ওই যন্ত্রদানবের গ্রাস থেকে যারা বেঁচে ফিরবে তাদেরও এইখানেই আশ্রয় দিতে হবে।

বলে ওঠে,

—যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। কেঁদে কি করবেন?

তবু মন মানে না। মায়ের মন। বলে,

—আমার এমনি সর্ব্বোনাশ হবে জানলে যেতাম না ওখানে।

কিন্তু জানে অশোক, না গিয়েও উপায় ছিল না।

তাই যেতেই হবে এদের।

গঙ্গামণি কাঁদছে। ধূ ধূ আগুনের আভা উঠছে আকাশসীমায়। দুর্গাপুরের কারখানার স্লাগ ব্যাঙ্কে বোধ হয় গলিত বাতিল লোহার স্লাগ ঢালাই চলেছে।

আগুনের ওই আভা এত দূরের সব সবুজকেও যেন শুকিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু তবু এরা মরেনি!

মূক নারাণ ঠাকুর ভাইপোর সর্বাঙ্গে হাত বোলাচ্ছে, অসহায় কল্যাণস্নেহময় সে স্পর্শ!

ইশারায় দেখায় সে, এখনও তার হাতে জোর আছে, কোদাল পেড়েও খাওয়ারে তাদের। ওরা ভুলে ছিল এই ভাষাহীন মানুষটাকে। সে কিন্তু আজও তাদের ভোলেনি।

প্রীতি শেষ পর্যন্ত প্রশান্তকে মেনে নিতে পারেনি! তাই বাবার ওখানেই ফিরে এসেছে শহরে।

নীলাম্বরবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। কেমন গম্ভীর সেই মুখ চোখ।

—কি হয়েছে?

নীলাম্বরবাবু ভয়ই করেন। তিনি বেশ বুঝেছেন এ যুগের এদের মনের কোন দয়া-মায়া বা প্রতি-কর্ত্তব্য নেই। নিজেরা জ্বলে নিজেদের চারিপাশ জ্বালিয়ে তোলে।

প্রীতি বাবার কথার জবাব দিল না।

নীলাম্বরবাবু কথা বলেন না, মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন মাত্র। খবরটা তাঁর কানে আসে। চুপ করেই থাকেন তিনি।

প্রীতি ক'দিন শহরে আসার পর অনেক ভেবে চিন্তেই আজ রাঠীর ওখানে চলেছে। শহরের পথ দিয়ে যাচ্ছে। এর স্তিমিত-জীবন যাত্রাতে একটা রদবদল এসেছে।

রাঠী এখন পুরোদমে ব্যবসা চালাচ্ছে এখানেও। তার আদি ব্যবসা দুর্গাপুরে তো আছেই। প্রশান্তের সঙ্গে গোলমালের পর পানু দাসকে নিয়ে ব্যবসা গড়েছে। এখন তার মারফৎ ধানচালের কারবার—সরষের আমদানী ব্যবসাও খুলেছে, চলেছে কাঁসা-পিতলের কারখানা।

পানু দাস তাই এখানে আসে প্রায়ই।

মিঃ রাঠীকে সুখবরটা দিতে এসেছে পানু একদিন পরে তার একটুকু মকান্ হয়েছে। জমিদারের বাড়ি আজ ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়েছে। একেবারে ন'কড়ায় ছ'কড়ায় পাওয়া বললেই চলে, তবে খরচ করে সে আগাগোড়া সারাবার ব্যবস্থা করেছে।

পানু দাস এমনি সময়ে প্রীতিকে এখানে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। তবে ব্যবসাদার লোক, কার কি দরকার কে জানে, তাই প্রীতি তাকে দেখবার আগেই সে ওদিকে চলে গেল।

মিঃ রাঠী আজ প্রীতিকে তার বাড়িতে আসতে দেখে বিশেষ খুশি হয়নি।

বাইরে যা করে সেটা বাইরেই থাক, তাদের বাড়ি এখনও সেকেলে। রাজস্থান ছেড়ে বাংলা

মুলুকে এসেও সেই বুকচাপা, জাফরি-বন্ধ ঘর বারান্দা গড়েছে, চারিদিকে লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। ঘরের দেওয়ালেও চড়া রং। দেওয়ালে বড় বড় ঠাকুর দেবতার, কাশী বিশ্বনাথ-বংশীধারী-হনুমানজীর বড় বড় ছবি টাঙ্গানো। মেঝেতে শোফা চেয়ার কয়েকটা আছে, তবে উঁচু গদি আর তাকিয়াই প্রধান। আজও একদিকে শোভা পাচ্ছে কাঠের একটা হাতবাক্স।

রাঠী বলে ওঠে,

—আইয়ে।

প্রীতিও কেমন অস্বস্তি বোধ করে এখানে এসে। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। সেই সন্ধ্যায় দেখা লোক এ নয়। মোটা গলায় হাঁক পাড়ে,

—এতোয়ারী, মালাই চা লাগাও।

প্রীতিও বলে ওঠে, — চা খাবো না। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

—বলেন? তবে ওই যে প্রশান্তবাবুর সঙ্গে ফয়সল্লা ওটা কোর্টেই হোবে।

প্রীতি বলেন,—ওখান থেকে চলে এসেছি আমি।

রাঠী একবার ওর দিকে চাইল, পরক্ষণেই সাফ জবাব দেয়,

—লেকিন উতো আপনাদের আপোশের বাত আছে। আচ্ছা—নমস্তে। এ্যাই এতোয়ারী, কাটিহার মোকাম কা তাম্বাকু আর সরিযাকা জাবেদা লাও।

কাজে মন দেয় রাঠী।

প্রীতি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, সারা মনে একটা নীরব অপমানের জ্বালা। এমনি এক অপমান সইতে হবে এখানে তা সে ভাবেনি। মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বের হয়ে আসছে, হঠাৎ সিঁড়ির নীচে পানু দাসকে দেখে দাঁড়াল।

পানু দাস ওর দিকে চেয়ে থাকে, তার গ্রামেরই মেয়ে। দেখেছেও এর আগে।

পানুই বলে ওঠে,

—চলুন, ওই দিকেই যাবো, আপনাকে পৌঁছে দিই।

প্রীতি বের হয়ে এসে দাঁড়াল, পানু দাস আজ গাড়িতে করে ওকে নিয়ে চলেছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে প্রীতি।

পানুই বলে ওঠে,

— গ্রামে যান নি অনেক দিন, চলুন, একদিন বেড়িয়ে আসবেন।

প্রীতি কি ভাবছে। একটু নির্জনতা তার দরকার, তাই বলে,

—দেখি, যাবো হয় তো।

—গেলে দেখা করবেন কিন্তু।

পানু দাসের কথার সুরে একটা বৈচিত্র্য এসেছে। প্রীতির তা চোখ এড়ায় না। আজ নিজের উপরই আসে একটা অভিমান, চারি পাশের জগৎকে সে দেখেছে। এ যেন শ্বাপদ একটা লালসাভরা রাজ্য।

এখানের মানুষের তৃপ্তি নেই, চাওয়ার শেষ নেই।

পানু দাসের চোখের দৃষ্টিতে, ওর কথার সুরে একটা পরিবর্তন এসেছে।

প্রীতি বলে ওঠে,

—এইখানেই আমি নামবো, একটু কাজ আছে।

পানু দাস গাড়ি থামিয়ে ওকে ক্ষুণ্ণ মনে নামিয়ে দিল। যাবার সময়েও আমন্ত্রণ জানায়,

—গ্রামে গেলে দেখা করবেন কিন্তু, ততদিনে নতুন বাড়িতেই উঠতে পারবো। একটু গেস্ট হাউসও করছি।

প্রীতি ওর কথাগুলো যেন ঠিক শুনতে পায়নি, এগিয়ে চলে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে।

জীবন ব্যাপারটা প্রথমে জানতো না। জীবন কেন, তার মাও ঠিক বুঝতে পারেনি পানু দাস সেদিন কি করে গেছে।

অশোক, এমোকালী, কার্তিক, সারদাবাবু—ওরাও কেউ জানতো না। আশা করেছিল অশোক হাসপাতাল নতুন করে বাড়াতে পারবে এই বাড়িতে এলে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেছে।

পাড়বে কথাটা অশোক জীবন আর তার মায়ের কাছে, এমনি দিনে পানু দাস দলিল-পত্র নিয়ে হাজির হয়।

আজ পানু বিনয়ের সঙ্গেই কথাটা বলে।

—আজ্ঞে বাড়ি তো তাহলে ছেড়ে দিতে হয়। আমিও মেরামেত ইত্যাদির ব্যবস্থা করছি।

জীবন আকাশ থেকে পড়ে।

—মানে!

পানু বলে ওঠে, —আপনার মা-জননীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সাক্ষীও সঙ্গে এনেছে সতীশ ভটাচাযকে। এখন সেও দালানবাড়ি করেছে। মাঝে মাঝে তার বাড়িতেও এখন গাড়িতে করে শহর থেকে, দুর্গাপুর থেকে ব্যবসায়ীর দল আসে। পানু তো আছেই। সেও গুছিয়ে নিয়েছে। সতীশ বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, উনিই সম্যক অবগত আছেন।

পানুও দলিল বের করে দেখায়।

—আজ্ঞে খোস কবলা দিয়ে গেছেন তিনি এ বাড়ির সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে।

জীবন কথাটা ভাবতেই পারে না, সবকিছু থেকে সে এমনি করে উৎখাত হয়ে যাবে জানতো না। পায়ের নীচে শক্ত মেঝেটা মনে হয় নীচের দিকে বসেই চলছে, দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই।

—মা!

মাও ঠিক ভাবতে পারে না।

—বলছিলেন অর্ধেকটা দেবেন। পিতৃপুরুষের ভিটে—

হাসে পানু, —মিছে কথা বলতে আসিনি জীবনবাবু! স্বচক্ষে দেখুন কাগজপত্র। তিনমাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবার কথাই রয়েছে।

জীবন্ত সাক্ষী সতীশ ভটাচায সটিকি মাথা নাড়ে। বলে ওঠে ভটাচায,—তুমি যোগ্য পুত্র। পিতৃসত্য পালন করে তাঁকে শান্তি দেবে নিশ্চয়।

পানু যাবার আগে দলিলপত্র গুছিয়ে নিয়ে বলে বেশ মোচড় দিয়ে,

—কথাটা জানিয়ে গেলাম জীবনবাবু। আপনাদের কর্তব্য আপনারা করুন, তবে আমাকে যেন পাঁচজনের চোখে খেলো করবেন না, মানে ধরুন পুলিশ-টুলিশ এনে উৎপাত করতে বলেন, পারি। তবে মা-জননী—মানে বুঝে দেখবেন। পরে আসবো।

পানু বের হয়ে গেল সতীশ ভটচাযকে নিয়ে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জীবন, আর তার মা। সব কেমন যেন ধ্বসে পড়েছে তাদের সামনে, এ বাড়ির সবকিছু।

—মা!

জীবনের ডাকে ওর দিকে চাইল বড়-বৌ। কেমন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে সে। বলে ওঠে,

—তাছাড়া আর কি পথ বাবা? অভাব দুঃখ কষ্ট হোক তবু সেইখানেই মায়ে-পোয়ে শেষদিনগুলো কাটাবো।

জীবন আজ নতুন মানুষ। সব বিপদের মাঝেও আজ তাকে দাঁড়াতে হবে। একটার পর একটা আঘাত আসছে। বিষয়-আশয় গেল, ঘরবাড়িও। বাবাও চলে গেলেন, চলে গেছে মণিমালা।

সে তবুও টিকে আছে। বাঁচার সব আশ্বাস ফুরিয়ে গেলেও মানুষ তবু মরে না।

আবার নতুন করে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। বলে ওঠে জীবন,

—তাই চল মা! এমনি করে সব ভেঙ্গে পড়বে তা ভাবিনি, সব হারিয়ে এবার শুধু টিকে থাকার চেষ্টাই করবো। বেঁচে থাকা নয়, টিকে থাকা মাত্র, তারই চেষ্টা করবো দুজনে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে।

ধ্বংসপ্রায় বাড়িটাকে ঘিরে জমে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধার। একটা তারাও দেখা নেই—সব অতল নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

দূর হাসপাতালে—কারখানার শেডে আলো জ্বলছে। এখানে ওই আলো এসে পৌঁছেনি। আর মাত্র ক'টা দিন!

বরবৌয়ের দুচোখ জলে ভরে আসে; এই বাড়িতে সে এসেছিল কত বৎসর আগে জানে না, কত দিন রাত্রি বৎসর—কত স্মৃতি মিশে রয়েছে এর সঙ্গে।

স্বামীর কথা মনে পড়ে।

এ বাড়িতে আজও তার শেষ নিঃশ্বাস মিলোয়নি, সব ছেড়ে যেতে হবে তাকে।

ধ্বসেই পড়বে এই বাড়ি। চোখের সামনে তেমনি করে তিলে তিলে ফুরিয়ে যাবার দুঃখ পাবার থেকে একবার হারানোই বোধ হয় ভালো।

তবু মন মানে না।

চোখ দিয়ে জল বের হয়। জীবন মায়ের কাছ থেকে সরে গেল।

এসব পরিচয় ভুলে গিয়ে আবার বাঁচবে সে—ওই দূরের মানুষের ভিড়ে। স্মৃতিবিলাসের সময়ও সেখানে নেই। এক মুষ্টি অন্ন আর আশ্রয়ের ভাবনাতেই সব সময় মানুষ সেখানে ব্যস্ত।

এ যুগ তাদের কেড়ে নিয়েছে, বেঁধেছে কোন যন্ত্রে কারাগারে। একমুষ্টি অন্নকে এমন

মহার্ঘ্য করে তুলেছে যে সেই সমস্যার সমাধান করতেই তার সব জীবনীশক্তিটুকু ফুরিয়ে যাবে; স্মৃতি ভালবাসা শ্রদ্ধা সব ওই একমুষ্টি অন্নের জন্য বিকিয়ে দিতে হয়েছে তাদের।

তবু বেঁচে আছে কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে। জীবন, ওর মা-ও তাই বোধহয় বাঁচবে ওই পরমাটিতেও, জাতিচ্যুত হয়ে গোত্রান্তরিত হবার পরও।

বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল অশোক, কিন্তু তার মামীমা কোন কথাই শোনেনি। অশোক জানে এখানকার এই পরিবেশ, নীরব সম্মান ছেড়ে ওখানে থাকা কষ্টকর হবে। তাই বলে জীবনের মাকে,

—ওখানে থাকতে পারবেন না, মামীমা। তাছাড়া আমার এতবড় বাড়ি তো পড়েই রয়েছে, একটা দিক ছেড়ে দিচ্ছি। জমিজায়গা এখনও আপনার দু'দশ বিঘে আছে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আপনার দিন ভালোই চলে যাবে।

তারকবাবুর স্ত্রী আজ এখানে আর থাকতে চায় না। চোখের উপর এতবড় বদলটাকে দেখতে পারবে না সে। বসত বাড়ি পর্যন্ত বেদখল হয়ে গেল অন্যায়ভাবে। ওর কথায় বলে গিন্নীমা,

—এখানে আর থাকতে পারবো না, অশোক। ওসব যা রইল—থাক, জীবনের ওখানেই চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা নামছে; পাখিগুলো ফিরছে বাসায়; বনের ওদিক থেকে আসে সন্তাপদগ্ধ গ্রামের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার আবেশ।

আকাশে মেঘ জমেছে। বর্ষার মেঘ আসবে এইবার আকাশ ছেয়ে।

গ্রামে গ্রামে তারই সাড়া পড়ে গেছে। কালী, কার্তিক—আরও সকলে মাঠের আলগুলো দেখছে, রাতে বর্ষা হলে সার-দেওয়া চাষ-খাওয়ানো জমিতে জল যেন আটকে থাকে।

আষাঢ়ের প্রথম দিকেই চাষ হলে ধান পাবে ষোল আনা। ওদিকে হাঁস-মুরগীর লম্বা ঘরটার দরজা বন্ধ করছে, শিয়ালের উপদ্রবও দেখা দিয়েছে। একটানা বিস্তৃত আখ ক্ষেতের বুকে হাওয়া কাঁপছে।

এ গ্রামের নতুন জীবনের ছন্দ থেকে এমনি দিনে হারিয়ে গেল জীবন আর গিন্নীমা। সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে মুখ লুকিয়ে ওরা যেন এই মাটি থেকে বিদায় নিল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক, সারা মনে ওর নিঃস্বতার হাহাকার। ওর চোখের সামনে দেখেছে কেবল খসে যাবারই পালা, অনেক কষ্টে তবু নিজে কেন কাজ করে চলেছে জানে না।

বাস রাস্তা থেকে একাই ফিরছে গ্রামের দিকে। ডাঙ্গার মাঝে ইস্কুল হাসপাতালে আজ বিজলী বাতি জ্বলছে। চড়াই-এর ওপাশে কামারপাড়ার সমবায়ের কারখানায় পিতল কাঁসার বাসন পালিশ করার মোটরের শব্দ ওঠে।

সব পরিবর্তনই ঘটছে, কিন্তু বাইরে মনের অতলে এখনও সেই মন আজ হারানো অতীতের জন্য কাঁদে। আরও কি যেন পেতে চায়। ওই যন্ত্রদানব আর গ্রামজীবনের সমন্বয়-এর ব্রত

ছাড়াও কাজ আরও অনেক কিছু আছে যারা সন্ধান জানে না অশোক। মাঝে মাঝে মনের অতলে সেই নীরব হাহাকার জাগে।

চুপে চুপে বাড়ির দিকে ফিরছে অশোক।

মাঝে মাঝে দু-একটা বিজলী বাতি জ্বলছে পথে, কালো আঁধারঢাকা। পাতাগুলোয় সবুজ আভা জাগে। ঠাই ঠাই অন্ধকার, আলো-আঁধারি মেশা পথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে অশোক। আজ যেন তার সব কাজেই একটা ক্লান্তি নেমেছে।

চোখের সামনে একটা মহাকাব্যের শেষ অধ্যায় যেন রচিত হয়ে গেল, তারকবাবুর সব চিহ্ন মুছে গেল গ্রাম থেকে। পানু দাস কিনেছে ওই বাড়িখানা।

জমিদারের প্রাসাদ। কি ভাবে ঠকিয়ে নিয়েছে তা শুনতেও ঘৃণা বোধ হয়। পথের ধারে ক'টা ট্রাক থেকে মালপত্র নামছে। পানু দাস তার ওদিককার গুদাম থেকে ইতিমধ্যেই লাইন টেনে বাড়িতে আলো ফেলে দিনেরাতে কাজ করাচ্ছে, যাতে শীঘ্রই বাড়িটার কাজ শেষ হয়ে যায়।

সমারোহে গৃহপ্রবেশও নাকি করবে সে।

অশোক দাঁড়াতে পারে না।

পা চালিয়ে সরে এল ওখান থেকে। অতীতের ইতিহাস মুছে যাবে দ্রুত, সেই খালি সিংহাসনে এইবার অভিষেক হবে নতুন একটি শ্রেণীর।

এরা কতখানি নিষ্ঠুর, কত শঠ হবে সেই বিগত জমিদার গোষ্ঠীর চেয়ে কে জানে!

বাড়িতে ঢুকেই দেখে বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। নীল মৃদু আলোটা জানলার ফাঁক দিয়ে এসে যুঁই কামিনী গাছের মাথার উপর পড়েছে। বাতাসে ফুলের মৃদু গন্ধ।

এগিয়ে যায় অশোক। ঘরে ঢুকে দেখে প্রীতি বসে আছে।

বেশ অবাক হয় সে। অনেকদিন পর দেখা, তবু এখনও সে তেমনি সুন্দর আকর্ষণীয় রয়ে গেছে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে অশোক,

—তুমি! হঠাৎ?

প্রীতি অনেক ভেবেছে। দেখেছে শহরের চেনা মানুষগুলোকে, সেদিন ভুলই করেছিল সে প্রশান্তকে তার জীবনে জড়িয়ে। রাঠী—দুর্গাপুরের আরও অনেক হোমরা-চোমরাকে দেখেছে, শেষতক দেখেছে পানুকেও।

সবাই অদৃশ্য কোন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছে।

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে। ক'বছর পর ফিরছে সে গ্রামে, গ্রামের রূপ বদলাচ্ছে। এ জীবনে যে মানুষ বাঁচতে পারে শান্তির স্পর্শ দিয়ে এটা প্রমাণ করেছে অশোক।

এখানেই সে নতুন একটি দিনের জন্য পরীক্ষা করে চলেছে তাকে ঘিরেও ফুটে উঠেছে তেমনি নির্মল একটি প্রশান্তি।

প্রীতি এতদিন কি যেন আলেয়ার পিছনেই ফিরেছে আলোর সন্ধানে। বলে ওঠে প্রীতি,

—ফিরে এলাম এইখানে।

—মানে : তোমার ঘর-স্বামী?

অশোকের কথায় হাসে প্রীতি, মলিন বেদনাময় একটু হাসি। বলে,—ভেবেছিলাম জীবনে ওইটাই সব। টাকা, সম্মান, আর ওই বিলাসের জীবন। কিন্তু তার চেয়েও আরও অনেক কিছু আছে যা সেদিন দেখেও দেখিনি, চিনি নি!

অশোক চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ওর কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না। আজ প্রীতির ভুল ভেঙ্গেছে। যাদের আশায় ওর ঘর ছেড়ে আসা তারা যে কি প্রকৃতির তা বুঝেছে। আজ ভুল তার ভেঙ্গেছে অনেক বেদনায়। বলে প্রীতি,

—তোমাকে সেদিন ভেবেছিলাম একটা অপদার্থ, পলায়নী মনোবৃত্তির লোক, আজকের এই শিল্প-বিপ্লবকে এড়িয়ে থাকতে চাও। তাই তোমাকে সেদিন ঘৃণা করেই দূরে সরে গিয়েছিলাম।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। প্রীতি বলে চলেছে,

—আজ দেখলাম তোমার মত আর পথের প্রয়োজন আছে। আজকের এই যাযাবর বৃত্তির দিনেও মানুষের আশ্রয় চাই, একটি নিভৃত কোণ চাই যেখানে মানুষ তার আনন্দের জন্য সাধনা করবে, এই মুমূর্ষু মানুষের জন্য রাখবে একটু সবুজ আকাশের স্পর্শ।

অশোক কথাগুলো শুনছে। সে নিজের মতেই পথ চলেছে, সে পথ তুলনামূলক ভাবে সত্য কিনা জানে না।

অশোক বলে,

—সত্য-মিথ্যা জানি না প্রীতি, তবে এ পথেও অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা, বাধা। তা চিরকালই ছিল—থাকবেও। পাশাপাশি দুটো বিরুদ্ধ শক্তি মানুষকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক সত্যপথে নিয়ে যায় যাতে তার ধ্বংস বা অপমৃত্যু না ঘটে। ওই যন্ত্রও থাকবে—থাকবে রাঠী, পানু দাস, আরও নতুন গজানো একটি শ্রেণী, তাদের মধ্যে মানুষকে শুভবুদ্ধি আর চেতনা নিয়ে বাঁচতে হবে।

—আজ তোমাকে শ্রদ্ধা করি অশোক। তোমার কাজে কি আসতে পারি না আমি?

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

এ সব সে ভুলতেই চেয়েছিল। ভালবাসার অবকাশ যেদিন ছিল, তারা সেদিন আসেনি। সব হারিয়ে গিয়েছিল তার। তাই যেন এ পথেই এসেছিল।

মনের সব দিকগুলো ব্যর্থ শূন্য হয়ে গেছে।

বলে ওঠে অশোক,

—তোমার ঘর-সংসার আছে।

হাসে প্রীতি।

—সেদিন ধর্মের জন্য কত বিধবাকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। কত কষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে স্বামী-পরিত্যক্তা অনাথাকে। আজ একটি যুগের নির্মমতা আর গ্লানির সাক্ষী হিসাবেই যদি ঘরছাড়া পথহারা হয়ে থাকি তাহলে আর কিছু না হোক, ওই আলো যে আলেয়া, আমাদের পথ ভুলিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে, এ সত্যটা লোকের চোখের সামনে ফুটে থাকবে। লোকে সাবধান হবে; এরও কিপ্রয়োজন নেই অশোক?

অশোক বলে ওঠে,—এ তোমার অহেতুক রাগ। এ যুগের সবটাই খারাপ নয়, যে যুগে বাস করবো তাকে মেনে নিতেই হবে। সহনীয় করে নিতে হবে। দোষ কি তোমারও ছিল না প্রীতি?

প্রীতি কি ভাবছে। আজ নিঃসঙ্কোচে জবাব দেয় সে,

—দোষ নয়, বল ভুল। ভুল করেছিলাম, কত আলোয় চোখ ঝলসে গিয়েছিল। তার অনেক দাম দিয়েছি।

অশোক বলে,

—একটা জায়গায় তুমি হেরে গেছো প্রীতি, ভালবাসতে পারোনি! এ যুগে ওই ভালবাসাটা যেন একটা দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের কাছে ওটা তার ধর্ম। সে তাকে সব আঘাত থেকে বাঁচায়, কাজের সাড়া জাগায়। সব দুঃখ কষ্ট ব্যথা ভুলে তাকে পথ চলতে সাহায্য করে। মানুষ যে অমানুষ হয়নি, ভালবাসাটাই তার পরিচয়। সে যে-কোন মানুষকে কেন্দ্র করেই হোক।

প্রীতি বলে ওঠে,—কোন আদর্শকে কেন্দ্র করে—

হাসে অশোক,—বোধহয় ওটা সত্যি নয়, আদর্শ আজ যা আছে দুবছর পর তা এই পরিবর্তনের দিনে বদলে যায়, ভালবাসা, তা যায় না। মানুষ এই পরিবর্তনের মাঝেও অচল অটল, তাকে নিয়েই সমাজ, আদর্শ। তাকে ভালবাসা, তার মঙ্গল চিন্তায় ভালবাসার প্রকৃত ধর্ম। অন্তত এই আমার বিশ্বাস। তুমি প্রশান্তবাবুকে ভালবাসোনি, নিজেকে ভালোবাসতে পারোনি!

প্রীতিকে আজ কঠিন অভিযোগ করছে অশোক, মনে হয় ওর কথাগুলো সত্যি। তবু প্রীতি বলে ওঠে কান্নাভেজা কণ্ঠে,

—হয়তো আর কাউকে ভালবেসেছিলাম, সেখানে হেরে গিয়েই এমনি ব্যর্থ শূন্য হয়ে গেলাম।

অশোক জবাব দিল না।

রাত হয়েছে। জনহীন হয়ে আসে পথটা। আকাশে মেঘ জমেছে। দিগন্ত কোন অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে বর্ষণের শান্তি স্পর্শের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

বলে ওঠে অশোক,

—প্রশান্তবাবু ক'দিন আগে এসেছিলেন। সবই শুনেছি।

প্রীতি ওর দিকে জলভরা দুচোখ মেলে চাইল। অশোক বলে চলেছে,

—ওদের কারবার বন্ধ করে দিয়েছে রাঠী। আমিও পাথর কোয়ারী-মাইন সাইটে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। অবশ্য রাঠী, পানু দাস এসেছিল, তাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করাতে, টাকাও অনেক দিতে চেয়েছিল। আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি তাদের। প্রশান্তবাবুকেই আসতে বলেছি, আমরা ব্যবসা চালাবো অন্য ফার্ম করে। অবশ্য রাঠী নাকি মামলা করেছে আমার নামে। তা করুক গে।

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

হাওয়া বইছে—রাতের হাওয়া।

অশোকের মনে একটি নীরব বেদনার সাড়া, এমনি রাতে কদম-বৌ-এর কথা মনে পড়ে। তার মনে একটি স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলছে সে।

বলে ওঠে,—কদম-বৌকে মনে পড়ে প্রীতি?

প্রীতি মাথা নাড়ে। সুন্দর সেই মেয়েটি গ্রামের ছায়াঘন পথে একটি অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। অশোক বলে,

—অনেক দুঃখে বেদনায় সে ওই কাজলাদিঘির জলে ডুবে মরেছিল প্রীতি। নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল। এ জ্বালা তোমার মনেও আছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখেছো; এ যুগকে চিনতে হবে, সহনীয় করে নিতে হবে। অন্য কেউ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাক, এ দুঃখ আমি আর দেখতে চাই না প্রীতি। একে সইতে হবে, জয় করতে হবে।

প্রীতি কথা কইল না। কি ভাবছে।

অশোককে আজ আবার যেন নতুন করে চেনে। অনেকে দেখেছে সে, দেখেছে কি বুভুক্ষা তাদের মনে, দুচোখের চাহনিতে।

অশোককে সে বিশ্বাস করে। মনের অতলের সেই চাপাপড়া সুরটা সব চেতনাকে আবার ভরিয়ে তুলেছে। জিজ্ঞাসা ভরা কণ্ঠে বলে প্রীতি,

—তুমি নিজের জন্য কোনদিন কিছুই চাওনি?

ওর প্রশ্নে চমকে ওঠে অশোকে। বলে,

—পাবার জন্যও নিজেকে তৈরি করতে হয়। সে সাধনা আমার কই? চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

হাসে প্রীতি,—না থাক। একাই যেতে পারবো। গ্রামে আর আঁধার নেই।

বের হয়ে গেল সে। হঠাৎ মনে পড়ে কালই সদরে কতকগুলো স্কুলের কাগজপত্র পাঠাতে হবে এডের জন্য। হাসপাতালের কয়েকটা জরুরি কাজ আছে। সারদাবাবুও এসেছিলেন বৈকালে।

রাত্রি তত হয়নি। বের হয়ে পড়ে অশোক। চাকরটা বাধা দেয়,

—খেয়ে যান! এই তো এলেন?

—এসে খাবো।

বের হয়ে গেল সে গ্রামের বাইরে ওই লাল ডাঙ্গার দিকে।

শিখা এখানে জীবনে এসে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে, দেখেছে অশোককে, এই জীবনের স্রোতে। নিজেও নেমেছে।

শিখা শহরের থেকে সরে এসেছিল, অনেক জ্বালা আর হতাশা নিয়ে। মাকেও আনবে এইবার সেই কলোনির ছিটে বেড়ার অস্থায়ী ঘর থেকে, একটা স্থায়ী আশ্রয় সে পেয়েছে এখানে।

ওর ভাই এখনও জেলে।

সব দিক কেমন তছনছ হয়ে গেছল শিখার।

মনের জ্বালা ভুলে আছে সে, এখানে সবুজের স্পর্শে শূন্যতার মাঝে অশোককে দেখেছে। মনে মনে কি একটা সুর উঠছে।

পাখি-ডাকা দিগন্ত, সবুজ-হলুদ শালবন আর প্রশান্তর সীমায় মেঘগুলো তাকে হাতছানি দেয়।

হঠাৎ সেই সুর যেন কেমন ছিন্ন হয়ে যায়। কতকগুলো কাজ নিয়ে অশোকের ওখানে গিয়েছিল, সন্ধ্যার পরও অশোক আসেনি, কাল সকালেই তো সেইগুলো সদরে পাঠাতে হবে।

নিজেই গেছে শিখা ওর বাড়িতে।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াল, একটি অচেনা মেয়ে, রূপবতী একটা মেয়ে

অশোকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কি কথা বলছে। ঘরের আলো পড়েছে ওর মুখে। দুচোখে জলের আভাস।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে নিবিড় বেদনা আর ভালবাসার আভাস। শিখা নারী হয়ে নারীর মনের এই ব্যাকুলতার খবর জানে।

তাই হঠাৎ চমকে উঠেছে সে।

অশোকবাবুর সঙ্গে আর কারও যে নিবিড় পরিচয় থাকতে পারে, জানে না। কেমন থমকে দাঁড়াল।

নিজের উপরই রাগ হয়, লোভী কাঙ্গাল মন তার অজ্ঞাতেই অনেকখানি পাবার জন্য কবে সঙ্গোপনে বেড়ে উঠেছিল, আজ না পাওয়ার সেই বেদনাতে চমকে উঠেছে শিখা।

স্তব্ধ হয়ে ফিরে আসে সঙ্গোপনে। আকাশে মেঘ জমেছে স্তরে স্তরে। বিজলীর আলোটুকু উলসে উঠেই ফুরিয়ে যায়। ও যেন মনের খুশির রুদ্ধ আবেগ, এক-একটি মুহূর্ত পরম আনন্দের আভাস ভরে তুলে আবার দুঃখের তমসায় ফুরিয়ে যায়।

শিখাও তাই ভাবে।

একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই সে যেন ওই জায়গাটাকে ভালোবেসেছিল; ভালোবেসেছিল তার কাজ, আদর্শকে কিন্তু কাঙ্গাল মনের সেই ভালোলাগা যে এত ঠুনকো তা ভাবেনি।

চুপ করে বসে আছে। সহকর্মিণীরা ডাক দেয়।

—খেতে যাবি না?

—যাচ্ছি, চল!

শিখা আবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করে, হঠাৎ ঝড়ো হাওয়াটা দৈত্যের মত দিগন্ত সীমার গাছগুলো নাড়া দেয় ঝুঁটি ধরে। শোঁ শোঁ হাওয়া আর বৃষ্টি নামে।

অশোকও ভিজতে ভিজতে এসে ওঠে দাওয়াতে। ঘরে আলো জ্বলছে। এ সময় এখানে ওকে দেখে শিখা একটু চমকে ওঠে; চকিতের মধ্যে তার সারা দেহে একটা চঞ্চল রক্তস্রোত বয়ে যায়; নিরাশ মনে ভালোলাগার একটি শিহর জাগে।

পরক্ষণেই সামলে নেয় শিখা। অশোক গা-মাথা মুছতে মুছতে ভিতরে আসে।

—ইস, যা বৃষ্টি নামল! দেরি হয়ে গেছে, ওগুলো তৈরি আছে?

নিজেই গায়ের জল ঝেড়ে বসে প'ড়ে খাতাগুলো দেখতে থাকে।

শিখা আজ জেনেছে ও যেন দূরের মানুষ। ও স্কুলের সেক্রেটারি আর শিক্ষিকা সে—এ ছাড়া কোন পরিচয় থাকতে পারে না।

অশোক ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। শিখার দু চোখে কাঠিন্য, কেমন থমথমে একটা ভাব। দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপাশে। অশোকের দিকে কাগজ-পত্রগুলো এগিয়ে দেয় মুখ বুজে।

বাইরে বৃষ্টির ধারাপাত চলেছে; মাঝে মাঝে উলসে ওঠে আকাশসীমা।

—শিখা!

শিখা ওর দিকে চাইল, থর থর কাঁপছে, ওর চোখের পাতা আর নীরব ঠোঁট দুটো। এ যেন অতীতের একটি হারানো স্বপ্নমন অন্য কোন জনকে ডাক দেয়।

শিখা ওকে এড়িয়েই ভিতরে চলে গেল।

ও সামলে নিতে চায় নিজেকে।

বার বার দেখেছে শিখা, জীবনের পথের বাঁকে অনেক আশা, অনেক পাওয়া কেমন মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। আঘাতই পেয়েছে বার বার।

আজ আর সে আঘাত পেতে চায় না।

অশোক কেমন বিস্মিত হয় ওকে দেখে। এমনি বর্ষণমুখর মেঘগুলোর মতই ওরা অভিমানিনী, কেবল দুচোখই ঝরে ওদের।

—চা নিন।

শিখা সহজ ভাবেই এসে চায়ের কাপটা নামিয়ে দেয়। অশোক বলে ওঠে,—কি হয়েছে তোমার?

শিখার মনের সব ঝড় যেন ভেঙ্গে পড়বে। বলে ওঠে,

—কই না তো। কিছুই হয়নি। ক'দিন শরীরটা ভাল নেই; ভাবছি ছুটি নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

অশোক ওর কথার সুরে মনের সেই ঝড়ের খবর পায়। বলে ওঠে,

—ছুটি নেবে, না সরে যেতে চাইছ এখান থেকে?

শিখা কথা বলে না; নীরবে একবার ওর দিকে চেয়ে দৃষ্টি নামাল। জানলা দিকে ঢুকছে জলো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপ; উতরোল হাওয়া চলেছে মেঘের সঙ্গে।

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভা আর মেঘের ডাক নিস্তব্ধ দিগন্ত ভরিয়ে তুলছে। অশোক নিজেকেও আজ কেমন অসহায় মনে করে। এমনি বর্ষণমুখর রাতে মনে পড়ে আরও কাদের।

কদম-বৌকে মনে পড়ে, মনে পড়ে অসহায় তারকবাবুর কথা; আরও অনেককে যারা হেরে হেরে ফুরিয়ে গেল।

সামনে তার দুর্গম পথ, একক সে যাত্রী।

ঝড়ের রাতে আজ প্রীতিকে দেখেছে, জীবনে ওদের অতলান্ত দুঃখ আর বেদনা; শিখার মনেও তার ছায়া। এক একটি মানুষ যেন এক একটি দ্বীপ, উদ্বেল উর্মিমুখর সমুদ্রে ওরা কেবল হারিয়ে যায়, রোদন ভরা হাহাকার আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে।

অশোক বলে ওঠে,

—তুমি চলে যেতে চাও ওই আলোর জগতে? অন্ধকারের মানুষ, তাদের জগতকে কে চায় বল?

ওর কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটে ওঠে। শিখা একটু চমকে উঠেছে। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। অশোক বলে চলেছে,

—আমার জীবনে দেখলাম, শুধু বারবারই হারাবার পালা; কি ব্যাপার জানি না, কেবল হারালাম আর তিলে তিলে নিজে ফুরিয়ে গেলাম।

বিজলীর একটা ঝলক এসে মাঝে মাঝে শিখার সুন্দর মুখখানা উদ্ভাসিত করে যায়, ওর মনেও অমনি আলো-আঁধারির খেলা চলেছে। আশা আর নিরাশার দোলায় দুলছে ওই ঝড়ে পড়া পাতার মত তার সারা মন। অশোক বলে চলেছে,

—একটা গল্প আছে কি জানো, একটি লোক তার প্রিয়জনকে একটি ফল দিয়ে বললো, এটা তুমি তোমার চেয়ে প্রিয়জনকে দিও। এমনি করে সে ফল এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরতে লাগলো, সকলেই নিজের প্রিয়জনকে দেয় সেটা, কিন্তু একবার ভুল করেও কেউ সেই ফলদাতাকে

আর ওটা দিল না। ভালোবাসারও তাই শুধু দেয়াই যায় শিখা, পাবার আশা করা দুরাশা মাত্র, দুঃখই পেতে হয় তাকে।

শিখার সারা মন নীরব বেদনায় মুচড়ে ওঠে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। অশোক উঠে দাঁড়াল।

—চলি, রাত হয়ে গেছে।

শিখার সারা মন যেন চীৎকার করে আজ ওই বেদনাতুর লোকটিকে একটা কথা জানাতে চায়। সে জীবনে কিছু পেতে চায় না—ওই ফলদাতার মত ভালোবাসা দিয়েই তৃপ্ত থাকতে চায়।

কিন্তু কোথায় যেন দুর্বার লজ্জা তার কণ্ঠ রোধ করেছে। কি এক বেদনা নির্বাক করে দিয়েছে তাকে। অশোক বের হয়ে গেছে। আঁধারে বিদ্যুতের একটি ঝলকে উজ্জ্বল আলোকবিন্দুর মত একবার তাকে দেখা যায় মাত্র।

শিখা তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবিষ্কার করে সে কাঁদছে, বর্ষণমুখর ওই আকাশের মত সে চোখের জল ফেলে ব্যথা বিমুক্ত হয়ে চায়।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ প্রশান্তের মনে কোন জ্বালা নেই, প্রীতিও বর্ষণ রিক্ত মেঘের মত আজ শান্ত রূপময়ী।

বৃষ্টির ধারা নেমেছে।

বন—দূরে নীল পাহাড়ছায়া, শাল মহুয়ার সবুজ সব ওই সাদা যবনিকার অতলে হারিয়ে গেছে। বনগড়ানি জলধারা এসে জমছে ওই বাঁধে; আর মিটার বুক ধুয়ে নিঃস্ব করে সে হারিয়ে যায় না।

মানুষ তাকে আটকে কাজে লাগিয়েছে।

ওই বৃষ্টির মাঝেই ভিজছে ওরা, সবুজ ধানশিশুর দল মাটিতে মাথা তুলছে, নিষ্ফলা মাটি আজ নবাঙ্কুরের স্বপ্নে ভরে উঠেছে।

অশোকের অবসর নেই।

সকলেই মাঠে নেমেছে। যত দূর চোখ যায় পোড়া ডাঙ্গা আজ সবুজ জমিতে পরিণত হয়েছে। নবাঙ্কুর আখের ক্ষেতে বাতাসের সবুজ নেশা জাগে।

নারাণ ঠাকুর বহুদিন পর আজ মাঠে নেমেছে আবার; কাদামাটির স্পর্শ তার সব দুঃখকে ভুলিয়েছে। নিতে বাউরী, পটু—আরও অনেকে গুছি পুঁতে চলেছে।

বর্ষার মলিন বিবর্ণ আকাশের নীচে গ্রামসীমা, ক্রমনিম্ন মাঠ, ওই শালবন সীমা সব কেমন হারিয়ে যায়। আবার বৃষ্টি নামছে।

ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে আসে দুর্গাপুর কারখানার ভোঁ-এর শব্দটা, ও যেন নীরব আক্রোশে গর্জাচ্ছে। ওরই নাকের উপর আবার পরাজিত মানুষ নতুন করে ঘর গড়ে তুলেছে, যে ঘরকে সে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল।

তা পারেনি, তাই ওই ক্রুদ্ধ গর্জন ফুটে ওঠে বাতাসে।

পানু দাসও একটু আশ্চর্য হয় এদের কাজকর্ম দেখে। গ্রামের সব ভাঙ্গন, সব মতান্তর প্রায়

যেন মিটে গেছে। সমস্ত জমি আর খণ্ড-বিখণ্ড নয়। একটি মত, একটি ঐকান্তিক সাধনার রূপ এদের মন থেকে বাইরে প্রকাশ পেয়েছে।

বাইরের ওই খণ্ড-বিখণ্ড টুকরো জমিগুলো এক হয়ে উঠেছে, আলের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তারা সব বিচ্ছিন্নতাকে সবুজে ভরে তুলেছে।

পানু দাসই আজ একা ওদের বাইরে; তাই বড় বাড়িখানা আজ গ্রামে মাথা তুলেছে। পানু দাস তারকরত্ন মশাইয়ের বিরাট বাড়িখানাকে সারিয়ে তুলেছে, সাদা আর গোলাপী রং-এর বাড়িটা মাথা তুলে আছে এই সবুজের বুকে নতুন একটি সদ্যজাগর শক্তির প্রতীক হয়ে।

তবু ওদের সংহত জীবনযাত্রা থামেনি; সেখানে জাগে পাখির ডাক আর চোখ জুড়ানো সবুজের নেশা।

অশোকের ক'দিন দম নেবার সময় ছিল না। সারা মাঠ ঘুরেছে—প্রথম কাজ শেষ করে আজ সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। চারিদিকে সবুজ ধান ক্ষেত, জঙ্গলের বাইরে বাঁধটার কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে জল, ধান আর অনাবৃষ্টিতে সহজে মরবে না।

এবার ওদের বুকে আশা জাগে।

বিকালের পড়ন্ত রোদে মাধবীলতায় ঢাকা গাছটা ফুলে ভরে উঠেছে। মেঘভাঙ্গা রোদে আর ভিজে বাতাসে আজ কেমন শূন্যতার স্পর্শ আনে।

অবিনাশ চুপ করে বসে আছে। আজ তার ডাক এসেছে, আবার দূরের ডাক।

মিষ্টিও শুনেছে কথাটা। কলকাতা, দিল্লী, আরও ক'জায়গায় রেডিওতে সানাই বাজাবার আমন্ত্রণ এসেছে। দূর থেকে এসেছে তার স্বীকৃতি। অবিনাশের মন তাই আজ কি স্বপ্নে ভরে উঠেছে।

অশোক ফিরছিল মাঠের দিক থেকে, অবিনাশকে দেখে দাঁড়াল।

দাওয়াতে একটা টুল এগিয়ে দেয় অবিনাশ।

রেডিওর শর্তটা এগিয়ে দেয় অশোকের দিকে। অশোক পড়ছে—দেখছে সেটা। খুশিতে ভরে ওঠে সে। বলে,

—বেশ তো! যাও।

আজ মনে হয় অবিনাশকে নয়, এদের গ্রাম—এদের চেতনা-রসে নিষিক্ত একটি শিল্পীসত্তাকে ওরা স্বীকৃতি দিয়েছে।

বলে ওঠে অবিনাশ,—তাহলে যাবো?

অশোক সায় দেয়।

—নিশ্চয়ই যাবে। দেশ-দেশান্তর জয় করে তুমি আবার ফিরে আসবে গাঁয়ে। তোমার জয়ে এ গ্রামেরই জয়। গ্রাম থেকে সবাই চলে গেল শুধু নিজেদের পেটের ভাতের সন্ধানেই, ভিড়ে হারিয়ে গেছে তারা। তুমি যাবে এ মাটি থেকে জীবনের অমৃতসঞ্চয় নিয়ে দেশ-দেশান্তরের মানুষকে তারই স্পর্শ দিতে।

অবিনাশ অশোকের কথাগুলো শুনে চলেছে স্বপ্নাবিষ্টের মত। মন ভরে ওঠে একটি সুন্দর অনুভূতিতে, ওই-ই সে বার বার প্রকাশ করতে চেয়েছে তার সুরে। এই মাটি, এ গ্রাম, ওই সবুজ বনসীমা, এদের দুঃখ—ব্যর্থতা সব তার মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার সুরের বেদনা আনন্দে ঝরে পড়ে।

সন্ধ্যা নামছে, অশোক ওর ফর্ম ভর্তি করে দিয়ে গেছে। কিছুদিনের জন্য বাইরেই যাচ্ছে অবিনাশ।

তবু মনে একটা বিচিত্র আবেশ জাগে।

মিষ্টি ওর দিকে ডাগর দুচোখ মেলে চেয়ে থাকে, বৃষ্টির জলভরা মেঘের মত সজল ব্যথাতুর সেই চাহনি।

মিষ্টির জীবনে সব যেন হারাবার পালা, একটি মানুষকে ভালবেসেছিল সে কিন্তু নির্মম ভাবে ঠকে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই লোকটি।

অবিনাশটি ভাল লেগেছিল, ওরই সুরের আনন্দে তার নিঃস্ব মন ভরে উঠেছিল জীবনের একটি সুরের স্পর্শে।

আজ সেও যেন হারিয়ে যাবে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে মিষ্টি,

—ফিরে আবার আসবে তো মিতে? এ মাটি থেকে যে যায় সে যে আর পথ চিনে ফিরে আসে না।

হাসে অবিনাশ। মিষ্টির হাতখানা ওর হাতে। বলে ওঠে,

—আবার আসবো মিতেন। এ মাটি, এই সবুজ ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। তোমাকেও এখানের একটি সুর বলে মেনে নিয়েছি মিতেন, তাই আমাকে ফিরে আসতেই হবে।

মিষ্টির দুচোখের জল বাধা মানে না।

আকাশের বুকে তারাগুলো নীল আভায় জ্বলছে। দুটি মন একটি বেদনায় ভরে উঠেছে। মিষ্টি আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলে,

—তোমার পথ চেয়ে থাকবো মিতে।

ব্যাকুল একটি নারী আজ অবিনাশের মনে ঝড় তুলেছে।

ব্যর্থ মৃত্তিকা শ্যাম সবুজের স্বপ্ন নিয়ে যেন প্রতীক্ষা করবে অবিনাশের ফেরার, অবিনাশও কি এক অক্ষয় অমৃত সঞ্চয় রেখে গেল এই মাটির বুকে।

এর পূর্ণতার মাঝেও একটা জায়গায় অশোকের মন শূন্যতায় ভরে ওঠে। একদিন আসে, মানুষ সেদিন সব হারায়। দিন-প্রতিদিনের তুচ্ছ পাওয়া কুড়িয়ে কুড়িয়ে মনের ভাঁড়ার পূর্ণ হয়ে ওঠে, রূপ রং বর্ণ রসে মনের সব শূন্যতা ভরে ওঠে; একদিন আসে আবার ঝরে যাবার পালা।

অশোকের মনের অতলে সেই শূন্যতার সুর বাজে, সেই রাত্রের পর শিখার সঙ্গে আর কথা বলার অবকাশ পায়নি। অশোক সেই রাত্রে নিজেকে কি যেন দুর্বলতার বশেই প্রকাশ করে বসেছিল, পরে বুঝেছে আর লজ্জাই পেয়েছে।

এমনি বৃষ্টি বিধৌত কত অপরাহ্নের সোনালী আলোয় মনে হয়ে চারিদিকের পূর্ণতার মাঝেও অন্তরের শূন্যতা সে ঢাকতে পারেনি, তাই নীরব হাহাকারে মন কাঁদে।

তাকে ভালবেসেছিল অশোক, পেতে চেয়েছিল একান্ত আপনার করে। জীবনের একটি করুণ মিষ্টি সুর, বার বার তাকে ডাক দিয়েছে কোন স্বপ্ন জগতের দিকে।

দুঃখ পেয়েছিল। ওরা তার আপন জন।

ওদের তাই সুখী দেখতে চেয়েছিল। যেদিন আবার প্রীতি আর প্রশান্ত একসঙ্গে তার ওখানে গিয়েছিল খুশি হয়েছিল অশোক।

অন্যের সুখ-শান্তির জন্য তিলে তিলে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে। তাই তার জীবনে এমনি খসে যাওয়াটাই সত্যি। আনন্দ পায়, কিন্তু মন কাঁদে অতলে কোন শূন্যতার হাহাকারে!

তবু সান্ত্বনা রয়েছে, এতবড় অবিশ্বাসকে সে ওদের মন থেকে দূর করেছে। গ্রামের জীবন বদলাচ্ছে।

এখানেও বাস করার, বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে ওই নারাণ ঠাকুর, নিতে বাউরী, এমোকালী—আরও অনেকে।

মাঠের দিক থেকে রাস্তায় উঠে এল অশোক।

মহুয়া গাছের পাতাগুলো সবুজ কালো রং-এর আবেশে ভরে উঠেছে। জিপটা কাছে এসে থামল।

—তুমি।

অশোককে দেখে নামল প্রীতি। প্রশান্তও স্টিয়ারিং-এ বসে আছে। ওকে দেখে বলে প্রীতি,

—ফিরে চলছি দুর্গাপুরে।

খুশি হয় অশোক।

—বেশ তো।

—যাবে একদিন। প্রীতি ওকে আমন্ত্রণ জানায়।

—যাবো।

আজ প্রীতির মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি, নিজের ভুল বুঝেছে সে। প্রশান্ত অশোকের হাতটা আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে,

—একদিন আসবেন কিন্তু।

গাড়িখানা চলে গেল বনের আড়ালে, গাছের ভিরে আর দেখা যায় না। ওদের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অশোক, ওরা সবাই এমনি করে হারিয়ে গেছে।

প্রীতিও।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল অশোক।

শিখা এগিয়ে আসছে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, কলরব; করে চলেছে ছেলেমেয়ের দল।

শিখা ওখে দেখে দাঁড়াল।

শান্ত আলোরং-এর একটি জগৎ, প্রজাপতিগুলো দল বেঁধে উড়ে চলেছে।

অশোকের মুখে একটা থমথমে ভাব।

আজ সে সবকিছু ত্যাগের জন্য তৈরি, জীবনে কোন কিছুরই দাম নেই তার। পথের দুধারে কেবল ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। নিঃস্ব বঞ্চিত একটি মানুষ। মাকেও মনে পড়ে না, বাবার স্নেহও সে পায়নি, জীবনেব প্রথম দিন থেকেই সে বঞ্চিত একটি সত্তা, তাই দুঃখটাও তার সয়ে যাবে।

শিখাকে দেখে ওর দিকে চাইল। ওই চাহনির স্তব্ধতা শিখার সারা মনে ঝড় তোলে। অনেক ভেবেছে সে। দেখেছে অশোককে সেই রাত্রে, চকিতের জন্য ওর ব্যর্থ বেদনাহত মনের নীরব হাহাকার শুনেছে শিখা।

একটি মানুষ, সবাই তার কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। ও নিঃস্ব হয়ে চলেছে তিলে তিলে।

তবু কোন দিনই কারো কাছে কোন দাবি জানায় নি, নীরবে সব দুঃখ সহ্য করেছে। শিখাও নিজেকে চেনেনি।

সেই রাত্রে সে নিজেকে নতুন করে দেখেছিল।

শিখা অশোকের দিকে চেয়ে থাকে। বৃষ্টি-ভেজা উস্কোখুস্কো চেহারা, মাথার চুলগুলো এলোমেলো। শিখা প্রশ্ন করে,

—শরীর খারাপ?

নিজের কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা নিজেরই কাছে ধরা পড়ে শিখার।

অশোক মাথা নাড়ে।

—না। ওসব কিছু নয়। ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ছুটি নেবে বলছিলে না?

শিখা ওর দিকে চাইল। অশোক বলে ওঠে,

—দরখাস্ত দিতে পারো। দরকার হয়—যাবে।

শিখা চকিতের মধ্যে যেন নীরব বেদনায় ফেটে পড়বে। পাখিডাকা বনভূমির বুকে রং লেগেছে, সূর্যের সেই হলুদ-সোনালী আলোটুকু কেমন বেদনাময়।

বলে ওঠে শিখা,

—আমি যদি না যাই?

অশোক একটু অবাক হয়, ঠিক ওর কথাটার অর্থ যেন বোঝেনি সে।

—মানে?

শিখা কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলে,

—আমি যাবো না। তুমি—তুমি কি মানুষ না একটা পাথরেব দেবতা যে শুধু যুগ যুগ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়েই রক্তাক্ত হয়ে শূন্য হাতে ফিরে যাবে সবাই!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শিখা। বনের বাতাসের হাহাকারে ওর ওই ফোঁপানির শব্দ মিলেছে

—শিখা !

অশোকের সারা মনে একটি সাড়া জাগে, ওর মনে হয় জীবনের সবটাই ব্যর্থ নয়। ধরিত্রীর মত সেও একদিন সবুজ স্বপ্নময় হতে পারে, তার আকাশেও জাফরানী রং-এর মেঘ ভেসে আসে, পাখি ডাকে।

শিখা ওর দিকে কান্না-ভিজে চাহনি পেলে ধরল, বহু ত্যাগ আর বেদনার মাঝেও যেন ওর জীবন-শতদল নীরব সুবাসে ভরে উঠেছে।

অশোক আজ এই মাধুর্যটুকুকে অস্বীকার করতে পারে না, এরই জন্য পাখি ডাকে— ফুল ফোটে, ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজে ওঠে।

আজ ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে সে তৃপ্ত হতে চায়।

মনে তাই খুশির সুর জাগে।

ওরা ফিরছে গ্রামের দিকে সবুজ দিগন্তপ্রসারী মাঠের পাশ দিয়ে। অফুরান রূপ রস বর্ণ সম্ভার—বনসীমার সবুজ শোভা মানুষের অন্তরের চিরআনন্দলোককে স্পর্শ করেছে।

আবছা আলোয় দেখে রেডিওটা খোলা, দূর দিল্লী কেন্দ্র থেকে সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশ বায়েন। পাতা-জোড়ার একটি মানুষ আজ সীমা থেকে অসীমের দিকে ঘোষণা করেছে এ মাটির না বলা সুর, অধরা শ্যামস্পর্শ।

—ছুটবাবু।

চেয়ে দেখে অশোক, স্বৈরিণী মিষ্টির দুচোখে জল। মুখে তার খুশির আভা। বলে ওঠে,

—মিত্তে ফিরে এলে তুমি একটা মেডেল দিও উকে।

হাসে অশোক, কালীচরণ—আরও অনেকে।

অবিনাশকে আজ বাইরের জগৎ স্বীকৃতি দিয়েছে—অবিনাশের মাধ্যমে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে এ মাটির মানুষের অন্তরকে—তার রূপ-মাধুর্যকে।

মিষ্টির দিকে চেয়ে থাকে অশোক—ও বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র পেয়েছে। অফুরান ভালবাসার স্বাদে স্পর্শে ও বেঁচে থাকবে, যার এতটুকু স্পর্শের জন্য কাঁদে রূপবতী ঐশ্বর্যবতী প্রীতি। কেঁদে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল কদম-বৌ।

যার সন্ধান করেছে অশোক আর শিখা তাদের দুজনকে কেন্দ্র করে নিভৃত নিরালা কোন বনের সবুজে।

এ যুগের সব গ্লানি বেদনার জ্বালা সইবার ওইটুকুই যেন একমাত্র অবলম্বন।

সুরটা দুঃসহ কোন বেদনার রং-এ বর্ণময় হয়ে ওঠে, বনতলে প্রজাপতি রঙীন ডানা মেলে ফিরছে ব্যাকুল বেদনায় ফুলের সন্ধানে। আকাশের তারার রোশনীতে মৃত্তিকার জন্য সেই চিরন্তন ব্যাকুলতা।

অবিনাশ ওদের না বলা কথা প্রকাশ করেছে সুরের স্পর্শে।

বাতাসে জাগে চেনা একটি সুর।

মনের আবেশ আর এই জগতের স্পর্শ মিশেছে ওই সানাই-এর সুরে।

মিষ্টি দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে ওদের দেখে,

—আমাদের বায়েন বাজাচ্ছে ছুটবাবু।

—অবিনাশ!

দিল্লী স্টেশন থেকে প্রোগ্রাম করছে অবিনাশ।

সেই ভৈরবীর মিষ্টি সুরটা উঠছে—আবেশ-মধুর একটি সুর।

এ মাটির একটি মানুষ আজ দিক দিগন্ত জয় করেছে—আকাশ বাতাসে তারই ঘোষণা, তাদেরই একজন আজ ভিড়ে হারায়নি। এ মাটির মত সেও সার্থক হয়েছে—তাই ওর বাঁশিতে ফুটে ওঠে আজ আনন্দের আভাস।

এখানেও বাঁচা যায়, মানুষ সার্থক হতে পারে, অবিনাশ তাই দেখিয়েছে।

মিষ্টি বলে ওঠে,

—অনেক দূর, না গো?

দূর আজ তার কাছে এসে গেছে! অবিনাশের সুরে ওদের সেই অতীতের দিনগুলোও মনে পড়ে।

মনে কেমন করে।

পড়ন্ত বেলার মেঘ-মেদুর আকাশে বাজছে সুরটা।

তৃপ্তি আর আনন্দের সুর। শূন্যতার মাঝে ওর স্পর্শে সব দুঃখকে সহনীয় করে তুলেছে। অবিনাশের সানাই বাজছে! এ মাটির অন্তরের সুর ওঠে।

বেঁচে আছে বৃদ্ধ অতুল কামার। চোখ দুটোতে ছানি পড়েছে! আবছা হয়ে আসে দৃষ্টি। মেজ ছেলে কার্তিকের ছোট বেটাকে নিয়ে পথে বের হয় মাঝে মাঝে।

হু হু বুক কাঁপে—মন কাঁদে বুড়োর।

ভুবন চলে গেছে দুর্গাপুর কারখানায়; কদম-বৌ হারিয়ে গেছে কবে। তবু অতুল বেঁচে আছে।

বর্ষার শেষ। ঢালু জমিতে সবুজের ইশারা। বনের দিকে চলেছে সে। চারিদিকে মাঠ, ঊষর প্রান্তরে আজ সবুজের স্পর্শ। রোদ লেগে মেঘ-ভাঙ্গা আকাশ রঙ্গীন হয়ে উঠে—ওপাশে আবার পুঞ্জমেঘ জমেছে।

নাতিটা বলে চলেছে,

—বুঝলা দাদু, সব সবুজ, লকলক করছে ধান আর ধান। দূরে ওই বন পর্যন্ত।

আঁধার দুটো চোখে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে অতুল। পারে না। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার। আগামী দিনের ওই নাতির চোখেই দেখছে সে পৃথিবীকে।

—তারপর?

—উই একঝাঁক বক উড়ে আসছে দাদু, কারখানার দিক থেকে। চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। শুনছো?

—হ্যাঁ!

বাতাসে ওই বলাকার পাখার শন শন বিধূণম। ঊষর মরুতীর হতে সুধাশ্যামল ধানঢাকা ক্ষেত বনতলের দিকে চলেছে তারা কালো মেঘের কোলে কোলে।

মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বুড়োর। মনে উধাও ডানার ওই সুর।

সবুজ-এর স্বপ্ন।

কার পায়ের শব্দ ফিরে চাইল বুড়ো। অশোক এগিয়ে আসে তার দিকে।

—ছুটবাবু!

—হ্যাঁ।

বলে ওঠে বুড়ো,

—ভাবছি চোখ দুটোর ছানি কাটিয়ে আসবো। না'লে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি না কিচ্ছু। ভেবেছিলাম—সবই গেল যখন, তখন আর বেঁচে লাভ কি! দেখলাম—বাঁচার আনন্দ ফুরোয় না ছুটবাবু। তাইতো বাঁচতে চাই—দেখতে চাই আবার নতুন এই পৃথিবীটাকে।

ছোট্ট ছেলেটা চীৎকার করে ওঠে,— উই দাদু। আর এক ঝাঁক—

সবুজ ধানক্ষেত—যতদূর চোখ যায় সবুজ আর আগামী দিনের ফসলের সম্ভাবনায় তৃপ্ত ধরিত্রী। মেঘঢাকা আকাশ-বলাকা চলেছে।

পিছনে ভেসে আসে কারখানার ভোঁ-এর শব্দ—দূর পথ আসতে আসতে ওটা যেন বাতাসের স্তরে স্তরে হারিয়ে যায়।

ঘণ্টা বাজছে—ইস্কুলের ঘণ্টা। মৃদু গম্ভীর স্বরে কোন উদার আহ্বানের মত শব্দটা বৈকালের নির্জন ক্ষেত, বন-ভূমি, চড়াই-এর বুক ভরে তোলে।

বাতাসে অতুলের পাকা চুল উড়ছে—উড়ছে ওর জীর্ণ উত্তরী। পাশে দাঁড়িয়ে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ছোট্ট ছেলেটা উড়ন্ত বলাকার শ্রেণীর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

—আয়, আয়,—আয়।

ওরা উড়ে গেল দূরে—অনেক দূরে।

বুড়োর বুজে আসা চোখে জল নামে—কদম বৌকে মনে পড়ে। এদিনে সেও রইল না।